বীরভূমি]

মাসিক পত্রিকা

[৮—১

কার্ত্তিক, ১৩৩৩

জয়দেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৮—১
কার্ত্তিক, ১৩৩৩

জয়দেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

জয়দেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

১। গোপীপ্রেম

সকলেই স্বীকার করিবেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিশ্চয়ই কিছু গভীর ও মূল্যবান নূতন কথা বলিয়া গিয়াছেন ; মানুষের ভাবজীবনের তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য তিনি নিশ্চয়ই কিছু নূতন উপাদান দিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে এই চারিশত বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান্' ভাবিয়া, তাঁহার নামে নাচিয়া, গাহিয়া ও কাঁদিয়া নিজেদের কৃতার্থ ও ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিত না। আমাদের উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি কি নূতন কথা বলিলেন, কি কি নূতন ভাব দিলেন। একদিনে ইহার উত্তর মিলিবে না—ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথম কথা এই বলা যাইতে পারে, তিনি জানাইলেন 'গোপীপ্রেম' কি ? তাঁহার কৃপায়, এই 'গোপীপ্রেম' মানবের সাধনরাজ্যের বিষয়ীভূত হইল। ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান দান বা মূলদান।

নদীয়া-লীলা অবসান ! শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর নদীয়া ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবেন ! ঠিক্ তাহার পূর্ব্বে একদিন তিনি আত্মহারা হইয়া "গোপী, গোপী" এই কথাটি উচ্চৈঃস্বরে জপ করিতেছিলেন। পূর্ব্বে কেহ কখনও এই ভাবে এই নাম জপ করে নাই, পরিচিত কোনও শাস্ত্রে এই নাম এই ভাবে গ্রহণ করার বিধানও নাই। তাঁহার এই নূতন প্রকারের আচরণ দেখিয়া কয়েকটি ছাত্র তাঁহাকে বলিয়াছিল,—'আপনি একি ব'লতেছেন, কৃষ্ণের নাম করুন।' মহাপ্রভু তখন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এই ছাত্রগণকে প্রহার করিয়াছিলেন বা প্রহার করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই নদীয়ার ব্রাহ্মণ-সমাজের একদল লোক শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন, এই ঘটনায় বিরোধ আরও বাড়িয়া গেল, তাঁহার ও তাঁহার দলের বিরুদ্ধে রীতিমত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। মহাপ্রভু সকলই বুঝিলেন—এবং গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। 'গোপী'

এই শব্দ জপ করাই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী হওয়ার নিয়োজক ও উদ্দীপক কারণ। (Immediate and exciting Cause).

গোদাবরী-তীরের সুবিখ্যাত কথোপকথনে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ) রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন, "গোপীপ্রেম হইতেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের বশীভূত। (গোপালতাপনী শ্রুতি, নারদ-ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রে একথা আছে।) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা আছে. তাঁহাকে যেভাবে যে ভজনা করিবে, তিনি তাঁহাকে ঠিক সেই ভাবে ভজনা করিবেন বা কৃপা করিবেন। ভগবদ্গীতায় এই প্রতিজ্ঞা সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। গোপীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইলেন, গোপীগণের প্রেমের অনুরূপ ভজনা করিতে পারিলেন না, (Could not reciprocate) গোপীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ ঋণী হইলেন। এই ঋণ চিরকালেও শোধ হইবার নহে। শ্রীমদ্ভাগবত ইহা বলিয়াছেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ কথা,—ইহাই বৃন্দাবন-লীলার শেষ কথা। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের পরকাষ্ঠা হইলেও, তিনি যখন ব্রজগোপীর সঙ্গে থাকেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য বাড়িয়া যায় ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতের কথা।"

রায় রামানন্দের মুখে এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"এই গোপীপ্রেমই সাধ্যের সীমা, (The highest spiritual ideal to which man can aspire)—তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমি জানিতে চাই, ইহার পর আর কিছু আছে কিনা। যদি কিছু থাকে, তাহাই আমাকে বল।"

এই অনুরোধ শুনিয়া রামানন্দ রায় বিস্মিত হইলেন। গোপীপ্রেমের পরে কিছু আছে কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে নাই; ইহাই রায় রামানন্দের ধারণা ছিল। তাঁহার এই ধারণা বদ্লাইয়া গেল। মহাপ্রভুর অনুরোধে তিনি বলিলেন—"ইহার পরের কথা বলিতেছি। গোপীপ্রেমেরও তরতম (Varieties) আছে। গোপীপ্রেমের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্য-শিরোমণি।"

২। শ্রীরাধার প্রেম

মহাপ্রভু বলিলেন,—"বল, এই কথাই বল। তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃতনদী

বহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে চুরি করিয়া শ্রীরাধাকে লইয়া লুকাইয়া পলাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা আছে, একথা শুনিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চাহেন, কিন্তু গোপীগণকে ভয় করেন। সুতরাং এই প্রেম গাঢ় নহে, নিরপেক্ষ (Absolute) নহে ; ইহা সাপেক্ষ (Relative)।”

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥
প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাতে করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥

শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎভাবে গোপীগণকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি গাঢ় বা নিরপেক্ষ অনুরাগ প্রকটিত হইত।

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দ রায় বলিলেন—“তবে প্রেমের মহিমা শুনুন। ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের রাসমণ্ডল ছাড়িয়া শ্রীরাধার জন্য বনে বনে বিলাপ করিয়া ঘুরিতেছেন। রাসমণ্ডলে শতকোটি গোপী, তাহাদের সহিত রাসবিলাস হইতেছে। এই শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও শতকোটি মূর্ত্তি ধরিয়া বিহার করিতেছেন। শতকোটি গোপীর প্রত্যেকের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। ইহার নাম সাধারণ প্রেম, সর্ব্বত্র সমতা ইহার লক্ষণ। এই সাধারণ প্রেমের অভিনয় দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমে ‘বামতা’ হইল। শ্রীরাধার প্রেম কুটিল। ফলে, শ্রীরাধা ক্রোধ করিয়া মানময়ী হইলেন এবং রাসমণ্ডল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীহরি ব্যাকুল হইলেন।

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥

শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে আর রাসলীলার ইচ্ছা নাই, কাজেই শ্রীকৃষ্ণও মণ্ডলী ছাড়িয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে বাহির হইলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও শ্রীরাধাকে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কামবাণে খিন্ন হইয়া বিষাদ করিতেছেন।

শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ॥

৩। গীতগোবিন্দের প্রমাণ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এই শেষ চিত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের চরম কথা ও বিশেষ কথা। কিন্তু, এই কথাটি জয়দেবের গীতগোবিন্দের। রায় রামানন্দ গীতগোবিন্দের দুইটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এই রহস্য ব্যক্ত করিলেন। শ্লোক দুইটি এই—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

গীত গোবিন্দের তৃতীয় সর্গের এই শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়া রায় রামানন্দ বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিলেন—

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥

গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধ মধুসূদন'। এই সর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিলে শ্লোক দুইটি বুঝিবার সুবিধা হইবে। গীত-গোবিন্দের প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ দামোদর' আর দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশ কেশব'। এই দুই সর্গে শ্রীরাধামাধবের উৎকর্ষ ও শ্রীরাধ র উৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার হেতু—শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারী-গণের সঙ্গে বিহার করিতেছেন। এই কথা শ্রীরাধা প্রথমে সখীগণের মুখে শুনিলেন

তাহার পর নিজেও তাহা দেখিলেন। তৃতীয় সর্গে কবি বলিতেছেন, শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িয়াছে—তিনি অন্যান্য ব্রজনারীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনুতপ্ত, তিনি ভাবিতেছেন কেন শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিলাম। এখন কি করি? কি করিলে আবার মিলন হয়? এই প্রকারের দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনা-সমীপবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে বসিয়া বিষণ্ণ মনে খেদ করিতেছেন।

'কংসারিরপি'—শ্রীকৃষ্ণও; অথবা যদিও শ্রীকৃষ্ণ কংসারি তথাপি। কংস একটি অসুর, দ্বাপর যুগের শেষ-সময়ে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং অন্যায়পূর্ব্বক রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই কংসকে বধ করেন বা বধ করিয়াছিলেন, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ কংসারি। এই গেল ঐতিহাসিক কংস। লীলাতত্ত্ববিদ্ বলিবেন—এই ঐতিহাসিক কংস, নিত্য কংসের বা কংসতত্ত্বের প্রাকট্য বা ঘনীভূত মূর্ত্তি—Concretized form or the Eternal principle known as Kansa. এই তত্ত্ব-কংস কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি চিন্তাপূর্ব্বক পাঠ-করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাহিত্যরসিক বলিবেন, 'কম্' ধাতু হইতে 'কংস' শব্দের উৎপত্তি, সুতরাং 'কংসারি' বলিলে শব্দের ব্যঞ্জনা বৃত্তির দ্বারা (by suggestiveness) কামজয়ী বা কামের অরি, এই ভাবটি স্বভাবতঃই মনে জাগে। অতএব 'আপ্তকাম'—এই ভাবটি মনে জাগাইয়া এই শ্লোকটির আস্বাদন করিতে হইবে। অতএব অর্থ হইল—যদিও শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম বা আত্মারাম, তথাপি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভেও 'অপি' পদ এই ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্'—সম্যক্ সারভূতা যা বাসনা তস্যা বন্ধে দ্রঢ়ীকরণে শৃঙ্খলা নিগড়রূপিণীং তাং—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণেরও বাসনা আছে, যিনি পূর্ণ, তিনিও কিছু চাহেন। এই বাসনার যাহা সাররূপা অর্থাৎ সকল বাসনার যাহা মূল, সেই মূল বাসনায় শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেম লাভই শ্রীকৃষ্ণের সারভূতা বাসনা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে শ্রীরাধার কথা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ ত্রিবিধ, লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ, আর ব্রজাঙ্গনাগণ। ব্রজাঙ্গনাগণই কান্তাগণের সার বা

মূল। শ্রীরাধা গোপীগণের মূল। শ্রীরাধা অংশিনী, অন্যান্য সকলে অংশরূপা। শ্রীরাধা হইতেই কান্তাগণের বিস্তার হইয়াছে।

৪। শ্রীরাধাতত্ত্ব

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥

* * * * * *

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকানাম পুরাণে বাখানে॥

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীরাধাকে "সর্ব্বকান্তিঃ" বলা হইয়াছে। 'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এক অর্থ—

সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥

'সর্ব্বকান্তি' শব্দের আর একটী অর্থ আছে।

কিম্বা কান্তি শব্দ কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ-বিবরণ॥
জগত-মোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥

গীতগোবিন্দের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার প্রথম শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই স্থানে যে প্রসঙ্গে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ।

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥

শ্রীরাধাসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার একটি গূঢ় কথা প্রচার করিয়াছেন।

কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্তঘ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর রস আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমায় করে সুশীতল।
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥

গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকের প্রথম শ্লোকটির অর্থ এইবার বিচার করা যাউক। শ্লোকটির অর্থ এই—কংসারিও 'সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলা' শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া অর্থাৎ ব্যাকুল চিত্তে শ্রীরাধার কথা ভাবিতে ভাবিতে, অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিলেন।

৫। পুরুষবাদ বা লীলা

পূর্ণকাম ও সত্যকাম শ্রীভগবানের এই লীলা অনুভব করিতে হইবে। এই

বিশ্বব্যবস্থার মূলে একজন পরম পুরুষ আছেন—তিনিই সত্য। আর যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার জন্য। ধ্যানযোগে নয়ন মুদ্রিত করিয়া বুঝিলাম, তিনি পূর্ণ। তাহার পর নয়ন খুলিয়া যখন এই প্রকটিত বিশ্বের মধ্যে জাগিয়া উঠিলাম, এই রূপরস-গন্ধভরা জগৎ, এই স্নেহ প্রেম ভালবাসা-ভরা বিশ্বনাট্যের রঙ্গমঞ্চের অভিনয়, এই হাসিকান্না দিয়া গড়া মানুষের এই সুখ দুঃখের হাট, যখন আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল ; কেবল জ্ঞানের বিষয় নহে, যখন এই বিশ্বযাত্রায় মিশিয়া রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে, স্নেহে প্রেমে ভালবাসায় মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া এই হাটে বেসাতি করিতে আসিলাম, এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন মনে হইল এই সমুদয়ই সেই একের খেলা, আমার জীবনেও তাঁহারই লীলা। সেই 'এক' বদ্ধ হইয়াছেন, বহু হইয়া বহুর ভিতর দিয়া নিজেরই ঐক্য অন্বেষণ করিতেছেন। যিনি স্বরূপে নিত্যমুক্ত, তিনি সখ্ করিয়া এই অসংখ ও অগণ্য বাঁধনে নিজেকে বাঁধিয়াছেন, বাঁধন পড়িয়া বাঁধন ছিড়িতে চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহার সব আছে, তাঁহার যেন আজ কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বস্ব হারাইয়া সেই হারানিধির অন্বেষণ করিতেছেন। বাঁধন পড়িয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ; আর সেই হারানিধিই শ্রীরাধা। কোথায় আমার প্রাণের রাধা ? ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আকুল অন্বেষণ ! শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁধন পড়িয়াছেন, নিদারুণ বাসনা-বন্ধনে যখন নিজেকে বাঁধিয়াছেন, তখন তাঁহার ভুল হইবে পদে পদে ; এই ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া হাসিয়া ও কাঁদিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে ; ইহাই তাঁহার লীলা। তিনি শ্রীরাধাকে ধরিয়াও ধরিতে পারেন না ; চিনিয়াও চিনিতে পারেন না ; তিনি যে শ্রীরাধাকে চাহেন, শ্রীরাধাই যে তাঁহার সর্ব্বস্ব, ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। বস্তু আছে, বস্তুর অংশ আছে, বস্তুর বিম্ব, প্রতিবিম্ব আছে। বস্তুকেই চাই, কিন্তু ঠিক্ বুঝিয়া ধরিতে পারি না, বস্তুর ছায়া বা প্রতিবিম্বের পশ্চাতে ছুটি। এইভাবে ছুটিতে ছুটিতে সেই বস্তুর কথা মনে পড়ে ; তখন আর অংশ লইয়া বা প্রতিবিম্ব লইয়া সাধ মেটে না, আশা পূর্ণ হয় না ; তখন সেই বস্তুর জন্য আকুল হইয়া তাহারই অন্বেষণ করি। সেই যে বস্তু, তাহাকে পাই কিন্তু আবার হারাই, প্রতিবিম্বে মুগ্ধ হইয়া দূরে চলিয়া যাই—আবার কাতর হই, বস্তুর স্মরণে কাতর হইয়া উঠি। ইহাই লীলা। এই যে বস্তু, ইহা আমা হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথক্, [illegible] কেবল পাওয়া আর হারানো—ইহাই নিত্যলীলা। জয়দেব

বুঝিতে হইলে জীবনের ও জগতের এই মৌলিক রহস্য (Mystical conception) অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভব যাহার নাই, তাহার পক্ষে জয়দেব না পড়াই উচিত।

গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটির অর্থ এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে পীড়িত। 'শ্রীরাধাকে সর্বোত্তমা বলিয়া জানিয়াও কেন প্রত্যাখ্যান করিলাম' এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুতাপ করিতেছেন। শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যমুনা-তট-প্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই খেদ একটি সঙ্গীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতিভয়েন॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূকোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি॥
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব—রোহিণীরমণেন॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥

আমি গোপাঙ্গনাপরিবৃত ছিলাম। শ্রীরাধা তাহা দেখিয়া [illegible]

আমি অপরাধী, এই জন্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারি নাই। হরি, হরি, আমি অনাদর করিলাম, এইরূপ ভাবিয়া তিনি কুপিতা হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। আমার সহিত এই দীর্ঘবিরহ, এ সময়ে প্রিয়া কি করিবেন, কিই বা বলিবেন ? হায়, আমার এখন ধনেই বা কি হইবে, জনেই বা কি হইবে, বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি হইবে, গৃহেই বা কি হইবে ? হরি, হরি, অনাদর করিয়াছি বলিয়া তিনি কুপিতা হইয়া বুঝি চলিয়া গেলেন ! তাঁহার সেই মুখখানি মনে পড়িতেছে, তিনি কুপিতা হইয়াছিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার মুখখানি ভ্রমরসমূহপরিব্যাপ্ত রক্তপদ্মের ন্যায় দেখাইতেছিল। শ্রীরাধা আমার হৃদয়-বিহারিণী, প্রগাঢ় প্রেম, তাঁহার সহিত মনে মনে আমি সর্ব্বদাই রমণ করিতেছি, তবে আর বনে বনে অনুসরণ করি কেন ? কেনই বা তাঁহার উদ্দেশে বৃথা বিলাপ করিতেছি ?

হে তন্বি, অন্য ব্রজনারীর সহিত বিহার করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তোমার হৃদয় ঈর্ষায় খিন্ন হইয়াছে। তুমি কোথায় গিয়াছ জানি না, এই জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও পারিতেছি না। তুমি যেন আমার সম্মুখেই রহিয়াছ, যাওয়া আসা করিতেছ ; কিন্তু হায়, পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন দান করিতেছ না। সুন্দরি, ক্ষমা কর, আর কখনও তোমার অপ্রিয়াচরণ করিব না ; আমাকে দেখা দাও, আমি বিরহ জন্য বড়ই কষ্ট পাইতেছি।

সমুদ্রে যেমন রোহিণীনাথ চন্দ্রের উদয় হয়, সেইরূপ কেন্দুবিল্ব গ্রামে শ্রীজয়দেব প্রণত হইয়া হরির এই বিরহ বর্ণনা করিলেন।

যাঁহারা ভাবসত্তাবাদী ও চৈতন্যবাদী, তাঁহারা ধ্যানযোগে চৈতন্যের রহস্য Mysteries of consciousness অবধারণ করিয়া, সেই রহস্যের আলোকে জীবনের ও জগতের যাবতীয় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে চাহেন। চৈতন্যের দুইটি লক্ষণ—প্রবৃত্তি ও প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ প্রবৃত্তি-রূপ, আর শ্রীরাধা প্রকাশ-রূপ। এই দুই মূলে বা স্বরূপে এক, লীলায় দুই হইয়াছেন। ইহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্বও ইহাই—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হইলা এক ঠাঁই॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই যে প্রধান সিদ্ধান্ত, ইহা শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে রহিয়াছে।

৬। যুগলতত্ত্ব

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব আর একটু বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা দরকার। বিশ্বের দুইটি অবস্থা আছে, অব্যক্ত (unmanifest) বা কারণরূপ, আর ব্যক্ত (Manifest) বা কার্য্যরূপ। সত্য কথা এই যে আমরা অব্যক্ত সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবে যে তাঁহার কথা বলি তাহার কারণ আমরা 'অব্যক্ত আছেন' ইহা না মানিয়া চিন্তাই করিতে পারি না (It is a Logical Necessity)। 'ব্যক্ত' লইয়াই আমাদের কারবার। অব্যক্ত হইলেন নির্গুণ ব্রহ্ম (Abstract universal) ব্যক্ত হইলেন সগুণ ব্রহ্ম (Concrete universal)। দুই না হইলে ব্যক্ত হয় না—(Manifestation is a Duality)। প্রাচীনতম শাস্ত্রে এই দুই এর কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইই পুরুষ ও প্রকৃতি ; চেতন ও জড়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (subject and object) এইভাবে অনুভূত হয়। এই প্রকাশিত বিশ্ব, ইহাকেই যদি প্রকৃতি বলা যায়, তাহা হইলে ইহাকে আমরা জড় বা অচেতন বলিতে পারি না। এখনকার দিনে সকলেই বলিতেছেন, বিশ্বে এই যে পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ হইতেছে, তাহার মূলে একটি জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়ান্বিত। ইংরাজী ভাষায় এই শক্তিকে Cosmic urge বলে, evolutionary impulse বলে। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকী চিন্তা প্রকৃতির তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছে কিন্তু প্রকৃতির এই আবেগ ছাড়া পুরুষেরও ইচ্ছা বলিয়া একটি তত্ত্ব আছে। আমাদের দেশে যুগল উপাসনাই প্রধান উপাসনা। লক্ষ্মী নারায়ণ, সীতারাম, হরগৌরী, উমামহেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি।

শ্রীজয়দেবের গ্রন্থে প্রথমেই বসন্তকালের কথা। এই বসন্তকালে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের আবেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। বসন্তে ফুল ফুটিয়াছে—বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের আবেগ এই বিকশিত ফুলের মধ্যেই পরিব্যক্ত। এই ফুলগুলির শোভা ও সৌরভ একদিন একটি অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় অবরুদ্ধ ছিল।

বীজ অচেতন নহে, সে বিকশিত হওয়ার জন্য,—ঐ সুন্দর ও সুরভি ফুলগুলি বাহিরের আলোবাতাসে ব্যক্ত করার জন্য, বহুদিন ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই নাম Cosmic urge বা বিশ্বের মৌলিক প্রেরণা। জয়দেব বুঝিয়াছেন ফুল ফুটিয়াছে, আর সেই বসন্তের ফুলের বনে একটি কিশোরী বালিকা; তাহার দেহখানি ঐ ফুলের সুষমার সারাৎসার দিয়া গঠিত। সেই কিশোরী বিরহ-ব্যাকুলা, বসন্তের বনে ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিতেছেন তাঁহার কান্ত কোথায়? এই কিশোরীই শ্রীরাধা। বিশ্বের প্রাণের ভিতর যে ব্যাকুলতা রহিয়াছে, তাহার উন্নততম ও পবিত্রতম মূর্ত্তিই শ্রীরাধা।

এখনকার দিনে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে বিশ্বের মর্ম্মস্থলে ক্রিয়াম্বিত সমুদয় শক্তি মানুষে আসিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই মানুষের মধ্যে এক নিত্যমানুষ আছে —সেই নিত্যমানুষের লীলাই সর্ব্বোত্তম লীলা, তাহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা। এই প্রণালীতে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি শ্রীরাধাকৃষ্ণ কেবল সম্প্রদায়-বিশেষের উপাস্য নহেন, ইঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বের সকলের। কিন্তু সে কথা পরে। আপাততঃ ভারতবর্ষকে বলা যাইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সেই তত্ত্ব ও বিগ্রহ, যাহার মধ্য দিয়া, যাহার উপাসনা করিয়া ভারতের যাবতীয় সাধনাধারা, ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ববিধ অভিজ্ঞতা, এক চরম ও পরম সমন্বয় অন্বেষণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে—"That principle and personality, in and through which the great Indian syuthesis was, is being and will be worked."

Humanism ও Naturalism, বর্ত্তমান যুগের এই দুইটি সাধনধারা বুঝিলে জয়দেব বুঝিবার সুবিধা হয়।

৭। মূর্ত্ত আদিরস

এইবার আর একটি মূল সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। রায় রামানন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন, তাহার শেষ কথা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, ভগবান্ সম্বন্ধে বা পরতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলের ধারণা (Conception)

ciple) বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের ধারণা কিরূপ, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহো সভার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজ যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥
নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

ইহাই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। কথাগুলি অতিশয় সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ধীরভাবে বিচারপূর্ব্বক প্রত্যেক কথাটি বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবানের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য অনন্ত ও ধারণাতীত। আমরা সেই ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতে পারি। ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, চিন্তা করিতে করিতে আমরা ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। এই প্রকারের ভগবদ্‌চিন্তায় আমরা অনেকেই অভ্যস্ত এবং এই

একমাত্র চিন্তাপ্রণালী নহে, অন্য প্রকারেরও চিন্তাপ্রণালী আছে। মানুষ ইচ্ছা করে, জানে, আর অনুভব করে—Wills, knows and feels। এই তিন প্রকারের ক্রিয়া মানবচৈতন্যে বিদ্যমান। কেবল জানার দিক দিয়া অগ্রসর হইলে মহিমা বা ঐশ্বর্য্য চিন্তাই স্বাভাবিক। সেই ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়া এখন আসুন, আমরা আমাদের অনুভব করিবার বা আস্বাদন করিবার (To feel, to enjoy) যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করি। আমরা কি চাই? আমরা শ্রীভগবান্‌কে চাই, না, শ্রীভগবানের আস্বাদ চাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলুন ও বুঝিতে চেষ্টা করুন, আমরা শ্রীভগবান্‌কে লইয়া কি করিব? বেদ বলিয়াছেন শ্রীভগবান্ মধু, শ্রীভগবান্ রস। আমরা শ্রীভগবানের আস্বাদন চাই। আমরা চাই Not God but Realization or Enjoyment of God। এই যে আস্বাদন বা উপভোগ ইহাই ভক্তের আকাঙ্ক্ষার ধন, ভক্তের একমাত্র সম্পদ্। একান্ত জ্ঞানবাদী বলিবেন, এই আস্বাদন প্রাপঞ্চিক, সুতরাং অনিত্য ও নশ্বর। একান্ত ভক্তিবাদী বলিবেন, এই আস্বাদন চিন্ময়, নিত্য ও অবিনশ্বর। এই রসই অমৃত। ভক্তমাত্রেই এই 'রসামৃত' উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক ভক্তের আস্বাদন, ঠিক্ একরূপ নহে। শ্রীভগবান্ রসামৃত-সিন্ধু—সুতরাং ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুযায়ী তাঁহাকে আস্বাদন করিতেছেন। এইবার একটি তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইবে। ভক্ত ও ভগবান্। ভক্ত ও ভগবানে সম্বন্ধ কি? ভক্ত, ভগবান্‌কে আস্বাদন করিতেছেন। তত্ত্ববিৎ বলিতেছেন, ভক্তকে দ্বার করিয়া শ্রীভগবান্ নিজেকেই নিজে আস্বাদন করিতেছেন। এইটুকু বুঝিলেই বুঝিবেন—

নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥

তিনিই বিষয়, তিনিই আশ্রয়; ইহাই প্রথম কথা। তাহার পর প্রকট লীলায় দেখিবেন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, আর শ্রীরাধা আশ্রয়। শ্রীচৈতন্য লীলায় দেখিবেন—বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়াছেন—রসরাজ ও মহাভাব, একরূপ হইয়াছেন।

পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন, শৃঙ্গার রসই সকলের আদি ও সকলের পরিণতি। এই শৃঙ্গার রসই আদিরস। এই রসই যখন মূল ও আদি, তখন এই রস 'আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর'। এই শৃঙ্গার রস মূর্ত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই সেই মূর্ত্ত শৃঙ্গার-রস। রসের বর্ণ আছে, শৃঙ্গার রসের বর্ণ, 'ইন্দ্রনীলমণিশ্যাম'। লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতার, লক্ষ্মী আদি নারী, এমন কি স্বয়ং রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ।

এই একটি মূল কথা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু জগৎকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'মূর্ত্ত শৃঙ্গাররস'। এই কথাটিও আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই; আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন গীতগোবিন্দের শ্লোকটি এই—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা শ্রীমতী রাধিকাকে একজন সখী দেখাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অদূরে অনেকগুলি গোপাঙ্গনা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বিহার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্রীমতী রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

"সখি, বসন্তকালে মুগ্ধ হরি ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি যেন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস। তিনি বিশ্ববাসী সকলকে তাহাদের নিজ নিজ বাঞ্ছার অতিরিক্ত দান করিয়া প্রীত করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গ সমূহ নীলোৎপলশ্রেণী অপেক্ষাও শ্যামল, শীতল ও সুকুমার। ঐ অঙ্গসমূহ পলে পলে নূতন হইয়া উঠিতেছে। তিনি তাঁহার অঙ্গ সমূহের দ্বারা সকলেরই অনঙ্গোৎসব (কামোল্লাস) সংবর্দ্ধিত করিতেছেন। ব্রজসুন্দরীগণ স্বচ্ছন্দে তাঁহার প্রতি-অঙ্গ গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতেছেন।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে দর্শন করিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে শ্রীরাধিকা মহাভাব আর শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ। মহাভাবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার-রস। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বলিয়া এই মহাসত্য জগতে প্রচারিত করিলেন।

৮। স্বরূপ দামোদর

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ। রায় রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-কার তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ কথোপকথনে রায় রামানন্দ যে শেষ কথা বলিয়াছেন, তাহা জয়দেব হইতে গৃহীত, তাহা আমরা দেখিলাম। এইবার স্বরূপ দামোদরকর্তৃক প্রচারিত বলিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে সমুদয় শিক্ষা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায়, সেগুলিও যে জয়দেবের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বরূপ দামোদরের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা জগতে প্রচার করাইয়াছেন, তাহা অতিশয় গূঢ়, বেশ চিন্তা পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে হইবে। ভগবান্ সম্বন্ধে সকলের ধারণ একরূপ নহে। কেহ বোঝেন শ্রীভগবান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় রাজ-রাজেশ্বর, গদা ও চক্রহস্তে তিনি অসুর বিনাশ করিতেছেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্ত্তা, নিজের অমিত বিক্রমের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে সুনীতি ও সদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কেহ বোঝেন ভগবান্ কর্ম্মফলদাতা, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে ফলভোগ করে, তাহা তাঁহার ব্যবস্থা। ভগবান্ অনন্ত, তাঁহার সম্বন্ধে সমুদয় কথা কেহই জানে না এবং কেহই বলিতে পারে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করিতেছে। এই প্রকারে উন্নত হইতে হইতে মানুষ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া ফেলিল। এখন এই মানুষের চরিত্রে বা জীবনে কামের গন্ধমাত্রও নাই এই প্রকারের মানুষের নিকট ভগবান্ কিরূপ-ভাবে প্রকাশিত হইবেন, ইহাই প্রশ্ন। এই যে মানুষ, ইহারা ভবের মানুষ নহে, ইহারা ব্রজের মানুষ। ইঁহারাই কৃষ্ণ-উপাসক। কেবল কৃষ্ণ-উপাসক নহেন, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের উপাসক। স্বরূপ দামোদর যাহা শিখাইয়াছেন, তাহা এই প্রকারের অধিকার-সম্পন্ন অনুরাগী ও রসিক ভক্তের জন্য, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাই সর্ব্বোত্তম। এই ব্রজলীলায় তিন প্রকারের লীলা আছে। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। কৌমার লীলায় বাৎসল্য, পৌগণ্ড লীলায় সখ্য, আর

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্যাস॥
কৈশোর বয়স কাম, জগত সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥

জয়দেব ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের বয়োধর্ম্মানুযায়ী এই ত্রিবিধ লীলার মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহাই অর্থাৎ কৈশোর লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই যে লীলা, এই লীলার মর্ম্মকথা বা তত্ত্ব কি ? দামোদর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—

দামোদর কহে— কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর॥
প্রেমময়বপু কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥

এই উক্তি আশ্রয় করিয়া তত্ত্বালোচনা করা যাউক। আমি ভাবিতেছি আমি দ্রষ্টা, আমি দেখিতেছি। আপনি ভাবিতেছেন, আপনি দ্রষ্টা, আপনি দেখিতেছেন। এই প্রকারে প্রত্যেকেই ভাবিতেছে, আমি দ্রষ্টা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে একজন দ্রষ্টা। আমাকে আপনাকে, আমাদের সকলকে আশ্রয় করিয়া বা নিমিত্ত করিয়া তিনিই দেখিতেছেন। তিনিই পরম পুরুষ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রকারে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা ও কর্ত্তা। এখন শেষ কথা বুঝিতে হইবে, তিনিই একমাত্র ভোক্তা বা আস্বাদক।

৯। রস-আস্বাদ

মহাভারতে আছে, শ্রীভগবান্ কেমন ?

যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ।

আবার

যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞী যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞসাধনঃ॥

শ্রীভগবান্ নিজেই যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্ঞকারী, যজ্ঞের অঙ্গ ও যজ্ঞবাহন। তিনি যজ্ঞের পোষক বা ধারক, যজ্ঞকারী, যজ্ঞী, যজ্ঞের ভোক্তা ও যজ্ঞের সাধন।

এই প্রকারে শ্রীভগবানকে বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম পুরুষবাদ। বেদে এই পুরুষবাদ আছে। ইহাই লীলাবাদ, পুরাণ-সমূহে লীলাবাদ বিস্তারিত হইয়াছে। কবি জয়দেব এই লীলাবাদেরই অন্তরতম গূঢ় কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এই গূঢ় কথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীভগবানের এই পরিচয় হৃদয়ের দ্বারা উত্তমরূপে গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নের শ্লোকগুলি ধীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

> অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
> মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
> পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
> বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সামযজুরেব চ॥
> গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
> প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯ম অঃ ১৬।১৭।১৮

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতিশাস্ত্রের পঞ্চযজ্ঞ, আমিই শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম, আমিই ঔষধ, আমিই হোমাদির সাধন, আমিই আহবনীয়াদি অগ্নি, আমিই হোম। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফলবিধাতা এবং পিতামহ। আমিই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু, আমিই পবিত্র ওঙ্কার, ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ। আমিই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু, পোষণ-কর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার ও লয়-স্থান, আমিই অক্ষয় বীজ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই প্রকারের অনেক উপদেশ আছে। এই প্রকারের উপদেশ কেবল গীতায় নহে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ শাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হইবে। এই উপদেশগুলি লইয়া ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা ভগবচ্চিন্তায় অভ্যস্ত হইব ও লীলা-রহস্য বুঝিতে পারিব। এই লীলা-রহস্যের চরম কথা শ্রীভগবানই সকল রসের একমাত্র আস্বাদক।

বেদে ও গীতায় শ্রীভগবানকে 'ভোক্তা' বলা হইয়াছে। সেখানে 'ভোক্তা' কথার অর্থ 'আস্বাদক'। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের একালের কথায় 'ভোক্তা' বলিতে যাহা বুঝি, 'আস্বাদন', তাহা হইতে একটু পৃথক্। কথাটা বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। আমরা

দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ভোগ করি, তাহা 'রস' নহে, তাহা 'রসাভাস' অর্থাৎ রসের ঈষৎ প্রতিবিম্ব (Fragmentary reflection)। এই ভোগের দ্বারা আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হই। বেদে আছে ভগবান্ই রস, তিনিই রসের ভোক্তা। শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় শ্রীভগবানের রমণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, এই বিহারে দৈহিক ক্ষয় নাই। 'দৈহিক ক্ষয় নাই' এই বাক্য শ্রীধরস্বামী অন্তর্জগতের কোন গূঢ় সত্যের দ্যোতক বা প্রতীকরূপে (Symbolically) ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীভগবানের বিহার আত্মারামের রমণ, ইহা আস্বাদন মাত্র। এই কারণে শ্রীবৃন্দাবনে কৈশোর লীলা বর্ণিত হইয়াছে, যৌবনের প্রসঙ্গ নাই। মানুষেরও কৈশোর বয়স পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আস্বাদনের ও ভালবাসা গ্রহণের সময়। এইবার লীলার রহস্য চিন্তা করা যাউক।

সংসারে আমার পুত্র, আপনার পুত্র, আমাদের প্রত্যেকেরই পুত্র রহিয়াছে। আর, আমরা পিতারূপে মাতারূপে পুত্রকে ভালবাসিতেছি, অর্থাৎ আমাদের উদ্বেলিত বাৎসল্য রস প্রদান করিয়া ধন্য হইতেছি। কিন্তু এই যে পুত্রগুলি ইহারা কে? আকাশে এক সূর্য্য। এই সূর্য্যের রশ্মি যেখানে পড়ে সেইখানেই সূর্য্য দেখা যায়। নদীর প্রত্যেক তরঙ্গের মধ্যে একটি একটি সূর্য্য, থালার জলে সূর্য্য, ঘটির জলে সূর্য্য। সেইরূপ সত্য করিয়া এক নিত্য পুত্র আছে One Eternal Son। সেই নিত্য পুত্র নিত্যমাতার কোল আলো করিয়া নিত্য লীলায় চিরবিরাজিত। নিত্য মাতার অসীম হৃদয়ের বাৎসল্য রসসিন্ধু সেই নিত্য শিশুকে অবলম্বন করিয়া নিত্য উচ্ছ্বসিত হইতেছে। আমাদের মাতৃত্বও যেমন সেই নিত্য মাতার প্রতিবিম্ব, আমাদের পুত্রত্বও তেমনি সেই নিত্য পুত্রের প্রতিবিম্ব। সেই নিত্য পুত্রই মা যশোদার ননিচোরা। বন্ধু-সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এক বন্ধু, নিত্য বন্ধু আছেন; তিনি ব্রজের রাখালরাজা। সংসারের বন্ধু আমার আপনার বন্ধু, সেই নিত্যবন্ধুর প্রতিবিম্ব। তেমনি এক পরম প্রেমিক আছেন, (One Supreme Lover) সংসারের প্রেমের খেলায় প্রেমিকের বা নায়কের সাজ পড়িয়া যাহারা মুগ্ধ হৃদয়ে হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে, তাহারা সকলেই প্রতিবিম্ব; অথবা তাহাদের সকলের অনুভূতি ও আস্বাদনের মধ্যে সেই এক পরম প্রেমিকেরই প্রেমলীলা প্রকটিত হইতেছে। স্বরূপ দামোদর ইহাই বলিতে চাহেন, কবি জয়দেবও

১০। গীতগোবিন্দের আস্বাদন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-সম্বন্ধে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দ কোন্ অবস্থায় আস্বাদন করিলে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, অথবা গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিবার অধিকারী কে? গীতগোবিন্দ গ্রন্থেই এই প্রশ্নের উত্তর আছে। জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয়, যদি বিলাস-কলায় কুতূহল থাকে, তাহা হইলে এই গীতগোবিন্দ শ্রবণ কর। হরি-স্মরণে মন সরস হওয়া আর বিলাস-কলায় কুতূহল হওয়া কি, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে বেশ সুন্দররূপেই বুঝিতে পারা যায়।

অন্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে সময়ে নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, নিম্নের ঘটনাটি সেই সময়ের।

একদিন বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লইয়া ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুকসারী পিক্ ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান॥
'ললিত লবঙ্গ লতা' পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥

হৃদয়ের একটি বিশেষ প্রকারের জাগরণ না হইলে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রকৃত প্রভাব ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে আমরা এই

জাগরণের পূর্ণাবস্থা দেখিতে পাই। রসিক ভক্তগণের মধ্যে এই জাগরণের পূর্ণাবস্থা না হইলেও বহুল পরিমাণে এই জাগরণ আছে। হৃদয় যে সকল সময়েই এইরূপ জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাহা নহে; তবে যাঁহারা সহৃদয়, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত উদ্দীপনের সাহায্যে তাঁহাদের হৃদয়ে এই জাগরণ আসিয়া থাকে। পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনায় আমরা দুইটি জিনিষ দেখিলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অনুগত ভক্তগণের সঙ্গ। ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই এই দ্বিতীয় উপাদানটি অধিক প্রবল। এই অবস্থায় গীতগোবিন্দের সুবিখ্যাত পদ 'ললিতলবঙ্গ-লতা' গীত হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় সেই গানের ফলে কি হইল, তাহারও বর্ণনা আছে।

প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধে ভরিয়াছে উদ্যানে।
সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হইলা অচেতনে॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখিকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥

মানুষের যে সব ইন্দ্রিয় রহিয়াছে ও ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের অবস্থান্তর হয় বা তাহাদের শক্তি খুব বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এই প্রকারের অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎ স্বপ্নের মত মিলাইয়া যায় এবং আর এক জগৎ, যাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক জগৎ বা নিত্য জগৎ বলিতে পারি, তাহা আস্বাদনের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। জয়দেবের কবিতা তাহার ছন্দ, সুর, শব্দ ও অর্থ মানবকে এই প্রকারের চিন্ময় অনুভূতিতে লইয়া যায়। ইহাই গীতগোবিন্দের প্রয়োজন'। সকলে ইহার অধিকারী নহেন। যাঁহারা রসিক ও ভাবুক, তাঁহারাই ইহার অধিকারী।

জয়দেব বলিয়াছেন হরিস্মরণে যদি মন সরস হয়, আর শ্রীভগবানের বা শ্রীহরির বিলাসকলা আস্বাদন করিবার জন্য যদি ঐকান্তিক আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই গ্রন্থ শ্রবণ করুন। জয়দেবের উক্তিতেও এই অধিকার ও প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। চিরসুন্দর ও চিরমধুর, লীলারসবিভোর শ্রীভগবান্ শ্রীহরি আমাদের সহিত খেলা করিতেছেন। আমরা জানিনা, কিন্তু তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া আমাদের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত। শ্রীহরির এই আকর্ষণ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের আর দুঃখ নাই, শোক নাই, অবসাদ নাই, নৈরাশ্য নাই। তাঁহারা বেশ জানেন সংসারের এই দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা, নিতান্তই সাময়িক, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তাঁহারাই গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিবার অধিকারী।

গীতগোবিন্দের পদ মহাপ্রভু কিরূপ অবস্থায় আস্বাদন করিতেন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহা আর একস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও অন্ত্যলীলার অন্তর্গত এবং নীলাচলেই ইহা ঘটিয়াছিল।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি-পড়ি চাহি বুলে যথা যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপাখ্যানে আছে, যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া নিরতিশয় বিরহকাতরা ও উন্মাদিনী হইলেন এবং তরুলতা প্রভৃতির নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? এই যে কৃষ্ণান্বেষণ, ভক্তের অনুভূতিতে ইহা একটি নিত্য সত্য। বৃন্দাবনও নিত্য সত্য। আমাদের পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের মেলা বসে, ফুল ফুটে, পাতা কাঁপে, মলয় পবন বহিয়া

হই। কিন্তু কিছুই থাকে না। ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী থামিয়া যায়, আমরাও শুকাইয়া মরিয়া যাই। সকলই নশ্বর। কিন্তু এই নশ্বরের ভিতরেই অবিনশ্বর নিত্য সুন্দর লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নিত্যলীলা হইতেছে, লীলাময় শ্রীগোবিন্দ বিশ্বানুগ বা বিশ্বগত, কেবল বিশ্বাতীত নহেন। ফুলের বাগানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রাণেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে হারাইলেন এবং বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি তিনি আবৃত্তি করিতে-ছেন নিজের ভাষায় তাহা গান করিয়া বলিতেছেন, আর অন্বেষণ করিতেছেন। ইহাই প্রকৃত আস্বাদন।

আম্র পনাস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সভে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা—পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এসব পুরুষজাতি— কৃষ্ণের সখার সমান॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায়॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে॥
তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ॥
উত্তর না পাঞা পুন ভাবেন অন্তরে।
'এ ত কৃষ্ণদাসী' ভয়ে না কহে আমারে॥
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া॥
কহ মৃগি, রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক অন্যথা॥

রাধার প্রিয় সখী আমরা ; নহি বহিরঙ্গ ।
দূরে হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ সঙ্গ ॥
রাধা অঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত ।
কৃষ্ণ কুন্দ মালা সঙ্গে বায়ু সুবাসিত ॥
'কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা, ইঁহো বিরহিণী ।'
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প ফলভরে ॥
শাখা সব পড়ি আছে পৃথিবী উপরে ॥
'কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার ॥'
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে ।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্য চিত্তে ॥
তোমার প্রণাম কি করিয়াছে অবধান ?
কিবা নাহি করে ? কহ বচন প্রমাণ ॥
'কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত ।
কিবা উত্তর দিবে ? ইহার নাহিক সংবিত ॥"
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে ।
দেখে তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥
কোটি-মন্মথ মথন মুরলী-বদন ।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র মন ॥
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা ।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল ।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥
পূর্ব্ববৎ সভে মেলি করাইল চেতন ।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করে দরশন ॥
কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন ।

পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলী বদন।
তাঁহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥

*　　*　　*　　*

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইনুঁ।
আপনার দুর্দৈবে পুন হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥
স্বরূপ গোসাঞিকে কহে, গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ত সংবিত॥
শুনি স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীত গোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা॥

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসম্॥

স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল।
ভাবোদয় ভাবসান্ধ ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ—সভার প্রাবল্য॥
একেক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, বাড়য়ে নর্ত্তন॥
এই মত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি পদ কৈল সমাপন॥
'বোল বোল' বলি প্রভু কহে বার বার।
না গায় স্বরূপ গোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর॥

'বোল বোল' প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিগে সভে মিলি করে হরি ধ্বনি॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
বীজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥
প্রভু লঞা গেলা সবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুন লঞা আইলা ঘরে॥
ভোজন করাঞা প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি সভে গেলা নিজস্থান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ও তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্যাষ্টক স্তবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতেও আমরা বুঝিলাম গীতগোবিন্দের পদ কিরূপ অবস্থায় যথার্থরূপে আস্বাদন ও উপভোগ করা যায়।

প্রকৃত কথা শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য হইলেও লৌকিক কবিতার ন্যায় সমাজে গৃহীত হয় নাই। যাঁহারা অধ্যাত্ম-জীবনকেই সত্যজীবন বলিয়া মনে করিতেন, সেই অধ্যাত্ম জীবনের তুলনায় এই প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা সেই অধ্যাত্ম-জীবনের চিন্ময় রস সম্ভোগের উদ্দীপনরূপে গীতগোবিন্দের আস্বাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং আমরা এই অমর কাব্য গীতগোবিন্দ এবং তাহার কবি শ্রীজয়দেবের চরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেছি।

পরিশিষ্ট

(১) সমাজ-জীবনে আত্মদর্শন

একজন মানুষের বা ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যেমন 'আত্মদর্শন' বলিয়া একটি ব্যাপার বা ঘটনা আছে, অনেকগুলি মানুষের বা একটি জনসমাজের জীবনেও সেইরূপ 'আত্মদর্শন' হইয়া থাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যে একবার এইরূপ 'আত্মদর্শন ঘটিয়াছিল। এই 'আত্মদর্শন' কি ?

ব্যক্তিবিশেষের জীবনে অর্থাৎ আমার বা আপনার জীবনে এই আত্মদর্শন কি, প্রথমে তাহাই বুঝা যাউক। আমি একজন মানুষ, আমি অনুভব করি, আমার একটা মূল্য আছে। এই মূল্য কত? প্রত্যেকেই হিসাব করে, এবং হিসাব করিয়া নিজ নিজ মূল্য অবধারণ করে। আমিও যাহা হউক একটা কিছু মূল্য ঠিক করিয়াছি। এই মূল্য খুব বেশী নহে। কেহ টাকা দিয়া, কেহ মান দিয়া, কেহ বিদ্যা দিয়া, কেহ বা ভোগ দিয়া এই মূল্য অনুভব করে। অধিকাংশ লোকই এই প্রকারের হিসাবী ও দাম-বাঁধা মানুষ ইহারা ভাল মানুষ, সংসারে ও সমাজে গৌরবান্বিত মানুষ। এই প্রকারের মানুষের ভিতর হঠাৎ একজন লোক মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়—সে বে-হিসাবী। সে মনে করে তাহার দামের পরিমাণ নাই, সে মনে করে আমার দাম অনন্ত, আমার দাম 'সর্ব্ব'। অন্যান্য মানুষ মিতব্যয়ী, নিজেকে বাঁচাইয়া চলে; সে অমিতব্যয়ী, সে সাধারণ মানুষের মত নিজেকে বাঁচাইতে চাহে না, সে নিজেকে বিলাইয়া ও ছড়াইয়া দিতে চায়। তাহার কামান নাই, বন্দুক নাই, হাতি ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত, রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই; কিন্তু তাহার মাথা যেমন উঁচু তেমন উঁচু মাথা কোনো সম্রাটের নাই; তাহার বুক যেমন চওড়া তেমন পাটাওয়ালা চওড়া বুক কোন দিগ্বিজয়ী মহাবীরেরও নাই। সে বুঝিয়াছে আমি, আমি; আমি নিত্য, আমি ফুরাইব না, ফুরাইতে পারি না। ব্যক্তি বিশেষের জীবনে যদি এই প্রকারের অবস্থা কখন হয়, তাহা হইলে আমরা বলি—ইহার আত্মদর্শন হইয়াছে।

প্রত্যেক দেশেরই ইতিহাসে দেখা যায় কখন কখন এক একটি জনসংঘের বা সমাজের জীবনে এই প্রকারের পূর্ণতা-বোধের এক অপরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে বাঙ্গালাদেশে এই প্রকারের অবস্থা হইয়াছিল। তখন পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াছিল, বোবায় কথা কহিয়াছিল, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইয়াছিল। সে যুগে অকস্মাৎ আপনা হইতেই ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোলাকুলি করিয়াছিল; প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কাঙ্গালের পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল; বড় বড় রাজমন্ত্রী, রাজগুরু ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভিখারী সাজিয়াছিলেন, কৌপীন পরিয়াছিলেন। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, পরিবারে, সমাজে এক নবভাবের বন্যা আসিয়াছিল। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগ।

অনেকের মনে হয়, এই জাগরণ আকস্মিক। কিন্তু ইহা আকস্মিক নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বুঝিতে গেলে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এই ভাবধারার মধ্যে শ্রীজয়দেবের ভাবধারাই প্রধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কবি জয়দেব তাঁহার জীবনে একটি মহাসত্য পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজার সভাসদ্ ছিলেন জয়দেব, তিনিই গীতগোবিন্দের কবি। হিন্দুজাতির রাজনীতিক স্বাধীনতা থাকিবে না, কিন্তু তাহার ভাবজীবনের স্বাতন্ত্র্য অন্ততঃপক্ষে সুদীর্ঘকাল থাকিবে ও মানবজীবনের হিতসাধন করিবে, ইহা গীতগোবিন্দের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইঁহারা যে ভাবধারায় সিদ্ধ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচনদাস, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরও সেই ভাবধারারই মানুষ। মহাপ্রভুর অনুগত সকলেই এই ভাবধারার অন্তর্গত নহেন। অন্যপ্রকারের ধারাও আছে। কিন্তু এই ধারাটিই প্রধান। অন্যধারার লোকেরাও এই ধারার দ্বারা অভিভূত ও প্রভাবান্বিত; ইহাতেই বুঝিবেন জয়দেবের স্থান কত উচ্চ।

সমাজের জীবনে ও ব্যক্তির জীবনে একবার আত্মদর্শন হইলেই যে তাহা চিরস্থায়ী হইবে, তাহা নহে। আলোকের পরেই অন্ধকার, জাগরণের পরেই নিদ্রা। আত্মদর্শনের পরেই একটা অন্ধতা, চাতুরী ও কৃত্রিম অভিনয়ের যুগ আসে। এই যুগকে গোঁড়ামি বা ব্যবসাদারীর যুগও বলা যায়। তাহার পর আসে অবিশ্বাস ও সংশয়ের যুগ। তাহার পর সদ্ব্যাখ্যা ও সাধুসমালোচনার যুগ। এই তিনটি যুগকে তমঃ, রজঃ ও সত্বগুণের যুগ বলা যায়। তাহার পর, যদি ভাগ্যে থাকে তাহা হইলে আবার আত্মদর্শনের যুগ ফিরিয়া আসে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগের সেই 'আত্মদর্শন' আজ আর আমাদের সমাজজীবনে নাই। এখন পরবর্ত্তী তিন যুগেরই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজ এক বিস্মৃতি আসিয়া আমাদিগকে অবসন্ন করিয়াছে। মনে হয়, আবার আত্মদর্শন' হইবে, সৌভাগ্যের যুগ আবার আসিবে বা আসিতেছে। এবারকার 'দর্শন' আরও ব্যাপক হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে দিনের সেই দর্শনকে অবলম্বন করিয়াই তাহা হইবে। কাজেই সেদিনের সেই

(২) গোপীপ্রেম

"গোপীপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। ইহাই যুগধর্ম্ম।" এই কথাটি নানাপ্রকারে বুঝিতে পারা যায়। পুরুষ ও নারী মূলে এক। প্রাচীনতম উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকে আছে—প্রথম পুরুষ প্রজাপতি—স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। প্রজাপতি একেবারে একাকী বলিয়া প্রীতি অনুভব করিলেন না, কেহই একাকী থাকিতে ভালবাসে না। তিনি নিজের প্রীতির জন্য স্ত্রী কামনা করিলেন। শাস্ত্রানুসারে পুরুষে চিদংশ, আর নারীতে আনন্দাংশ অধিক। মানুষের অনেকরূপ বৃত্তি বা শক্তি আছে। তাহার মধ্যে দুইটি সকলের উপরে। একটি আধ্যাত্মিক (Spiritual), আর একটি মানসিক (Intellectual)। বিশ্ব ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতেছে। এক সময়ে মানসিক শক্তির উৎকর্ষসাধন (Evolution of the Intellect) প্রধানরূপে প্রয়োজন। তাহার পর আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশ দরকার। এই আধ্যাত্মিক বৃত্তি নারীতে অধিক। To seize the Spiritual অর্থাৎ অন্তরতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের অধিক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালাদেশে যে নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহা ক্রমশঃ ভারতবর্ষে এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই যুগের সাধ্যসীমা বা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শ গোপীপ্রেম। যাঁহারা পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের পৌরুষ নষ্ট করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি, বিশেষতঃ প্রজ্ঞা (Intuition) উত্তমরূপে বিকশিত করিবেন। রসাস্বাদন-সামর্থ্য,—সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায়, নৃত্যকলায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-উপভোগে, বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত মানবের সহিত এবং সর্ব্বজীবের সহিত সঙ্গের দ্বারা ও সর্ব্বজীবের প্রেমপূর্ণ সেবার দ্বারা যাহা বিকশিত হয়, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। মানসিক শক্তির, বা দৈহিক শক্তির প্রয়োজন আছে, সেগুলি থাকিবে ও বাড়িবে, ম্লান হইবে না, ধ্বংশ হইবে না, কিন্তু সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যে আনিতে হইলে এই আনন্দবৃত্তির বা গোপীভাবের সাধনা করিতে হইবে। "গোপীপ্রেম' সাধনাদর্শ," ইহার এইরূপ অর্থ।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের মধ্য ...

ধর্ম্মে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, জনসেবায় স্ত্রীলোকেরা উচ্চাধিকার লাভ করিতেছে। আমরা জানি ক্রমে আরও উচ্চাধিকার পাইবে। স্ত্রীলোকের যুগ (The Age of Woman) আসিয়াছে। চিন্তা করিয়া বলুন, মহাপ্রভু সমগ্র পৃথিবীর যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কি না।

(৩) বিভিন্ন ভাবধারা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, একটি সুবৃহৎ সমন্বয়ের ধর্ম্ম। আজকাল বাঙ্গালাদেশে ও অন্যত্র ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যে সব চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহার মূল প্রেরণা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ' শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, বিভিন্ন প্রকারের ভাবধারা বা সাধনপ্রণালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই বিভিন্ন ভাব-ধারার মধ্যে দুইটি প্রধান---একটি আর্ত্তভক্তের ধারা—The spiritual culture of the sick soul। আর একটি রসিক ভক্তের ধারা—The culture of the healthy-minded জয়দেবকে এই দ্বিতীয় ধারার প্রধান বা প্রথম ব্যক্তি বলিয়া ধরিতে পারা যায়। প্রথম ধারায় শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতিকে ধরিতে হইবে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

কেবা আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।

ক্রমশঃ এই উভয় ধারার মিলন হইয়াছিল এবং অনেকের ভাবান্তরও হইয়াছিল. এই দুই ধারার প্রথমটিতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, দ্বিতীয়টিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। এই উভয় ধারার মিলনই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম।

প্রথম ধারার সাধক যাঁহারা, তাঁহারা অনুভব করেন, এই রক্তমাংসের দেহ অপবিত্র, এই সংসার অশাশ্বত ও দুঃখালয়, সুতরাং এই সব ছাড়িয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয় ধারার লোক বলেন, এই দেহ শ্রীভগবানের সেবার জন্য, এই বিশ্ব ভগবানের লীলাস্থলী, সুতরাং ছাড়িব কেন ?

উভয় ধারার যখন মিলন হইল, তখন বুঝা গেল এই দেহ দিয়া নিজের সুখ খুঁজিও না, শ্রীকৃষ্ণের সুখ অন্বেষণ কর। বড় কঠিন কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহাই সত্য।

মনোহরসাহী কীর্ত্তন

যে সমুদয় বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ে—বৈদেশিক প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলে—প্রধানতঃ রাঢ়, বরেন্দ্র ও শ্রীহট্টের কথা আলোচনা করিতে হয়। রাঢ় বলিতে যেমন প্রাচীন উড়িষ্যা ও কলিঙ্গের প্রত্যন্ত-সন্নিহিত সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ বুঝিতে হইবে, বরেন্দ্র বলিতে মিথিলাকে সীমান্তে রাখিয়া যেমন উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গ ধরিয়া লইতে হইবে, শ্রীহট্ট বলিতেও তেমনি সেকালের বঙ্গ (সমতট বা হরিকেল) এবং আসামের কথা মনে রাখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচণ্ড প্রবাহ যদিও বাঙ্গালাকে এক অভিনব পরিবর্ত্তনের পথে বহুদূরে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, যদিও এই অগ্রগতি আরো কতদূর গিয়া সীমারেখা নির্দ্দেশ করিবে কেহ বলিতে পারে না, এবং এই পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে বাঙ্গালার প্রাচীনরূপ বিপর্য্যস্ত হইতেছে, বিপুল ভাঙ্গনে অতীত সভ্যতার বেদী ধ্বসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তথাপি এই দুঃসময়কে অসময় কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখনো সময় আছে; জাগ্রত আত্মচেতনা, সুবিকশিত অনুভূতি, অনুশীলিত শক্তি, পরিণত বিচারণা, এবং মার্জ্জিত রুচি ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন কোনো সাধক চেষ্টা করিলে দেশমাতৃকার পীঠ-বেদীর স্রোতোভগ্ন উপকরণগুলি এখনো সংগৃহীত হইতে পারে। এখনো বাঙ্গালার প্রাচীন রূপের সন্ধান মিলিতে পারে।

দিগ্‌দর্শন হিসাবে আমরা রাঢ়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালার সভ্যতায় রাঢ়ের অবদান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, তক্ষণশিল্প, সাহিত্য অথবা দর্শনের কথায় মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতে—তথা যাত্রা ও কীর্ত্তনে রাঢ়ের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব বর্ত্তমানেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্গীত ও সঙ্গতের আসরে বনবিষ্ণুপুরের নাম আজিও সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অবশ্য 'সঙ্গীত' শব্দ কীর্ত্তনে সুপ্রযুক্ত হইবে কিনা, প্রশ্ন উঠিতে পারে, কারণ সঙ্গীতে সুরেরই প্রাধান্য থাকে। 'গীতে' ভাবই প্রধান স্থান অধিকার করে বলিয়া অনেকে কীর্ত্তনকে "গীত" সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আমাদের মনে হয় ভাব এবং সুরের অপূর্ব্ব সমাবেশে কীর্ত্তন-গানের সৃষ্টি হইয়াছে, কীর্ত্তনে কথা এবং সুর, কেহ কাহাকেও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই।

যাত্রাগানে পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ যোগ্য, তিনি রাঢ়দেশেরই অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দ অধিকারী এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাত্রা গানে অন্যতম বিশিষ্ট রীতির প্রবর্ত্তক মতিরায়কে লইয়া রাঢ়দেশই গর্ব্ব করিতে পারে।

রাঢ়দেশই কীর্ত্তন গানের জন্মভূমি। বড় বড় কীর্ত্তনীয়া রাঢ়দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আজিও দেশপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণ রাঢ়দেশে জন্মভূমি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন। এখনো বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদের গায়কগণই কীর্ত্তনের আসরে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। 'রাঢ়দেশে গান শিক্ষা করিয়াছি', 'ময়নাডালে খোল শিখিয়া আসিয়াছি' এই পরিচয়ই শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সম্পূর্ণতার পরিচয়,—সে কালেও ছিল আজিও আছে।

কোন সময় কীর্ত্তন গান সৃষ্ট হয়, কেহ বলিতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ দিয়া বলিতেছেন—"সেকালে কীর্ত্তন গান ছিল, তখনকার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য রাঢ়দেশের নাড় পণ্ডিত সদলে কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইতেন, সেকালে মাদলে 'সঙ্গত' হইত, মৃদঙ্গ মহাপ্রভুর আমলের সৃষ্টি।" 'বৌদ্ধগান ও দোহায়' পুরানো কীর্ত্তন গানের একটা আদ্‌রা পাওয়া যায়, কিন্তু নাড় পণ্ডিতের পর হইতে চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত মাঝখানে প্রায় পাঁচ শত বৎসরের কোনো খবর পাওয়া যায় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয় যে বৌদ্ধাচার্য্যগণ ঐ সমস্ত গানে আপনাদের সাধনার কথা,—তথা বৌদ্ধধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব ও মহিমার কথা জনসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে প্রতি-উত্তরে হিন্দুসমাজের নেতৃগণও ঐরূপ গানের মধ্য দিয়াই আপনাদের পক্ষের বক্তব্য সমূহ প্রচারের ব্যবস্থা-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, এবং এইরূপ ধর্ম্মান্দোলনে ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস সুগায়ক এবং সুকণ্ঠ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু স্ব-রচিত সুধা-সুমধুর পদাবলী তিনি কি সুরে এবং কোন্ তালে গাহিতেন, সেই সুর ও তাল তিনি কোথায় কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই। তবে অনতি-পরবর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় এই গান যেরূপ উন্নত, সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হইয়া উঠে তাহাতে মনে হয় চণ্ডীদাসের সমকালে ইহার অবস্থা নিতান্ত অনুন্নত ছিল না।

এদিকে শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে বুঝিতে পারা যায়, কেন্দুবিল্বের কবি-কোকিলের কণ্ঠে যেন বঙ্গবাণীকুঞ্জে বাসন্তী উষার গৌরব-পূর্ব্বাভাষ ঘোষিত হইয়াছে।

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী"

বাঙ্গালায় "ত্রিপদী" রূপে দিব্য চলিয়া যাইতে পারে। আবার—

"সরসমসৃণমপিমলয়জপঙ্কম্"
"নয়ননলিনমিববিদলিতনালম্"

প্রভৃতি পদ যে "পয়ারের" পূর্ব্বরূপ, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মনে হয়—

"সঞ্চর দধর সুধা মধুর ধ্বনি
মুখরিত মোহন বংশম্"

এইরূপ পদের মাত্রা অনুসারেই—কীর্ত্তন গানে—

"শুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী
শ্রবণে নিবারনু তোর"

প্রভৃতি পদ রচনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীগীতগোবিন্দের অনেক সুর তালও যে কীর্ত্তন গানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

মহাপ্রভু যখন সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন, তখন তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ গানের সুরে এবং তালে যে রাঢ়ীয় পদ্ধতিরই অনুসরণ করিতেন, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। অন্ততঃ তাঁহার সমকালে কীর্ত্তনের কোন শ্রেণী-বিভাগ প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। শ্রীবাস-অঙ্গনে নাম-কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, পরে নীলাচলে অবস্থিতিকালে স্বীয় প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরকে অনন্যসাধারণ অধিকার দান করিয়া মহাপ্রভু রসকীর্ত্তন গান প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তাই অনেকে শ্রীপাদ স্বরূপকে রসকীর্ত্তন গায়কগণের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দেবীদাস, নীলাচলে গিয়া স্বরূপের নিকট কীর্ত্তন-গান এবং মৃদঙ্গবাদ্য শিক্ষা করিয়া আসেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে ইহাঁরই প্রিয় শিষ্য দাস-গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশেও তখন গায়ক, বাদকের অভাব ছিল না। আকাইহাটের স্বনামখ্যাত কীর্ত্তনীয়া কৃষ্ণদাস, কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস ও গোকুল দাস দুই ভাই, তদ্ভিন্ন কুলীনগ্রাম, শ্রীখণ্ড, কাঁদরা, বোরাকুলি প্রভৃতি গ্রামের বহু কীর্ত্তন-গায়ক এবং ঠাকুর গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি বাদকগণ এদেশে সেকালে স্বাধীনভাবে গীতবাদ্য চর্চ্চায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রস-কীর্ত্তনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি এবং পালাবন্দী গানের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়,—মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে,—রাজসাহী জেলায় খেতরীর মহোৎসবে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব সম্মিলনে রাজা সন্তোষ দত্তের আলয়ে। রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, প্রেমিক, ভক্ত, সুকবি, সুগায়ক ঠাকুর নরোত্তম —বাদক দেবীদাস ও গৌরাঙ্গদাস এবং গায়ক শ্রীদাস ও গোকুলদাস প্রভৃতির সহায়তায় এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এদেশের প্রাচীন পদ্ধতিতে নূতন নূতন সুর তাল সংযোগে তিনি কীর্ত্তনের যে বিশিষ্ট রীতির প্রচলন করেন, খেতরীর মহোৎসবে অনুমোদিত হইলে, পরগণায়

নাম-অনুসারে তাহা 'গরাণহাটী'রীতি নামে পরিচিত হয়। পরগণার নামে কোনো প্রথা, সম্প্রদায় বা জাতির 'থাকের' নামকরণ সেকালের অন্যতর বিশেষত্ব ছিল।

খেতরীর মহোৎসবে—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবীদাসে॥

* * * *

* * * *

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তাল পাট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই কিবা মন্দ মন্দ বাদ্য বায়ে॥
তদুপরি নব্য নব্য বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে।
অমৃত অঙ্কুর যৈছে বাড়ে ঘণে ঘণে॥

* * * *

এথা সর্ব্ব মোহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে॥

* * * *

* * * *

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বয়ে।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়ে॥
অনিবদ্ধ গীত বর্ণালাপ স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥"

খেতরীতে গিয়া দেবীদাসের বাদ্য ও গোকুলের গান শুনিয়া বীরচন্দ্র প্রভু—

"শ্রীদেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে।
কি অপূর্ব্ব বাদ্য কহি ধারা বহে চক্ষে॥

* * * *

গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা কতেক তারে অধৈর্য্য হইয়া॥"

সংগীতজ্ঞগণ বলেন, সুরের গতি আপন পরিমিত কালের মধ্যে আদ্যন্ত সমভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিলে, তাহাই 'লয়' নামে অভিহিত হয়। এই লয় প্রদর্শনের নামই 'তাল'। সঙ্গীতশাস্ত্রে তালকে

'ছন্দ' বলে। ছন্দ আবার কতিপয় সমানুপাতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি 'মাত্রা' নামে পরিচিত। আমরা সংগীতজ্ঞগণের ভাষায়—সুরের কারিগরী, বিলম্বিতলয়, ছন্দের দীর্ঘতা ও মাত্রার জটিলতা, গরাণহাটী গানের বিশেষত্বরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। অনেকের মতে, বৈঠকী গানে ধ্রুপদের স্থান যে পর্য্যায়ে, কীর্ত্তনে গরাণহাটীও সেই পর্য্যায়ে অবস্থিত। আমাদের কোনো গায়ক-বন্ধু বলেন—'অনুকূল রুচি ও শিক্ষাসম্পন্ন শ্রোতা বিশেষ ধৈর্য্যশীল হইলে, তবেই তাঁহার গরাণহাটীর আসরে উপস্থিত হওয়া উচিত। সেকালে বারকুলি বা বোরাকুলিতে (মুর্শিদাবাদ জেলা) এই গানের সবিশেষ চর্চ্চা এবং উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গৌরগোপাল দাস প্রভৃতি এই ধারার স্বনামধন্য কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। অধুনা, বৃন্দাবনবাসী নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবাবাজী মহাশয়, এই সুরের একজন অনন্যসাধারণ গায়ক।

খেতরীর পর, শ্রীখণ্ডে ও কাটোয়ার মহোৎসবে এই গান শুনিয়া রসজ্ঞগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। কিন্তু ইহা সাধারণের তেমন চিত্তগ্রাহী না হওয়ায়, কাঁদরার গায়কগণ অন্য একটী নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। মঙ্গল-বংশীয় বংশীবদন ঠাকুর ইঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় কীরিট-কোণা গ্রামে মঙ্গল ঠাকুরের পূর্ব্বনিবাস ছিল ; পূর্ব্বাশ্রমের উপাধি পালধী, এই জন্য ইহার বংশধরগণ 'কীরিটকোণার পালধী, শূলপানি মহাপাত্রের সন্তান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঙ্গল, শৈশবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান কাঁদরার পশ্চিমস্থিত রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন, সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পণ্ডিত গদাধর ইহাঁকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ময়নাডাল গ্রামের কোনো অধিকারী কন্যাকে বিবাহ করিয়া ইনি তিনটী পুত্র লাভ করেন। এই তিন পুত্রের নাম রাধিকাপ্রসাদ, গোপীরমণ ও শ্যামকিশোর ; বংশীবদন শ্যামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র। বদনের প্রবর্ত্তিত সুর, পরগণার নামানুসারে 'মনোহর সাহী'-সুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। কথিত আছে—বাবা আউলিয়া মনোহর দাস বদনকে অতি যত্নে কীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছিলেন ; এবং সেই শিক্ষাবলেই তিনি 'মনোহর-সাহী' সুর প্রবর্ত্তনে সমর্থ হন। আউলিয়া মনোহর দাস দীর্ঘজীবি ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বৈরাগীর 'আখড়া' বাঁধিয়া বাসের প্রথা, এ-অঞ্চলে তিনিই প্রচলিত করেন। সেইজন্য আজিও এ দেশের বৈরাগীর আখড়ায় যে কোনো পর্ব্বাহে, উৎসবে, এমন কি কোনো সামান্যতম অনুষ্ঠানেও, অগ্রে মনোহর দাসের ভোগ দিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। খেতরীতে রস-পর্য্যায় অনুযায়ী পালা-গান শুনিয়া ইনি ঐরূপ একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থের অভাব অনুভব করেন, এবং বহু শ্রমে, নানাস্থান ঘুরিয়া বিপুল যত্ন ও অতুল অধ্যবসায়ে 'পদসমুদ্র' নামে পদাবলী-সংগ্রহের এক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেন। অনেকের মতে, মনোহরসাহী সুর ইহাঁরই সৃষ্টি। প্রিয় বন্ধু জ্ঞানদাস ও মঙ্গলের সঙ্গে খেতরী, শ্রীখণ্ড ও কাটোয়ার মহোৎসব হইতে কাঁদরায় ফিরিয়া (ইনি কাঁদরার অধিবাসী

ছিলেন) গরাণহাটী হইতে এ দেশের রীতিকে চিহ্নিত করিবার জন্য রাঢ়ের প্রাচীন পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ইনি তাহাকে 'মনোহরসাহী' নামে অভিহিত করেন। পরে, ইহাঁর সঙ্গীত-শিষ্য বদনের দ্বারা এই ধারা দেশে প্রসার লাভ করে।

মাধুর্য্যে প্রসাদগুণে সুর ও তালের অপেক্ষাকৃত সারল্যে, মনোহরসাহী ধারা জন সমাজে ও যেমন, রসজ্ঞ সমাজেও তেমনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ কীর্ত্তনীয়া প্রায় মনোহরসাহী ধারার গায়ক বলিয়াই পরিচিত। বীরভূম ইলামবাজারের নিমাই চক্রবর্ত্তী, নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী, মনোহর চক্রবর্ত্তী, ময়ন ডাঙ্গের রসিকানন্দ, বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর প্রভৃতি, কাঁদরা গ্রামের শ্যামানন্দ ঠাকুর, বনমালী ঠাকুর এবং বলদেব দাস প্রভৃতি দেশ-প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। অধুনা গণেশদাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই ধারার খ্যাতনামা গায়ক।

গরাণহাটী ও মনোহরসাহী ভিন্ন, কীর্ত্তনগানে আরো তিনটী ধারা প্রচলিত আছে,—যথা— রেনেটী, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। সরকার সপ্তগ্রামের অন্তর্গত (অধুনা বর্দ্ধমান সাতগাছিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত রেনেটী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম) পরগণা রাণীহাটী হইতে 'রেনেটী'-ধারার নামকরণ হয়। রেনেটীর নিকটবর্ত্তী দেবীপুর নিবাসী বিখ্যাত পদকর্ত্তা বিপ্রদাস ঘোষ এই সুরের প্রবর্ত্তন করেন। রেনেটী সুরের 'গোষ্ঠ'-গান দেশ বিখ্যাত। এই গানের বিশেষত্ব—'আখর' খুব কম। অনেকের মতে, বৈঠকী গানে যেমন খেয়াল, কীর্ত্তন গানে তেমনি মনোহরসাহী, এবং রেনেটী প্রায় ঠুংরীর সামিল। কিন্তু বন্দীপুর নিবাসী আখরিয়া গোপালের ভাগিনেয়, বাসুদেবপুরের (হুগলী) বেনীদাস কীর্ত্তনীয়ার গান শুনিয়াছেন, এ কালে এমন অনেক লোক এখনো বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা বলেন— রেনেটী সুর মনোহরসাহীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত হালকা হইলেও, মিষ্টতায় এবং সৌন্দর্য্যে কোনো অংশে ন্যূন নহে। বেনীদাস রেনেটী সুরের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন।

'মন্দারিণী' সুর সরকার মান্দারণের অন্তর্গত কোনো উড়িষ্যা-ঘেঁসা স্থান হইতে প্রবর্ত্তিত বলিয়া শুনিয়াছি। সেরগড়বাসী গোকুল, ঝাড়খণ্ডী সুরের সৃষ্টি করেন। ইঁহার উপাধি ছিল 'কবীন্দ্র'।

মনোহরসাহী গানের—কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট এই পাঁচটী অঙ্গ।

কথা—সঙ্গীত শাস্ত্রেও, লক্ষ্য লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য অর্থে গান অর্থাৎ 'কথা' আর লক্ষণ তাহার (রাগ ও নিয়মাদি) শাস্ত্র। এখানে কিন্তু 'কথা' মানে কেবল গান নহে, 'কথার' অন্য অর্থও আছে। শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণের কিম্বা সহচরীগণের উক্তি প্রত্যুক্তি, এক গান হইতে অন্য গানের যোগসূত্র, গানের কোনো একটী চরণের অর্থ—অনেক সময় মূল গায়ককে কথা কহিয়া বিশদ করিয়া দিতে হয়। কীর্ত্তনে ইহাকেও 'কথা' বলে।

দোঁহা—ছন্দে বদ্ধ দুই বা চারি চরণে সূত্রাকারে অভিব্যক্ত বিষয় 'দোঁহা' নামে পরিচিত।

'দোঁহা'-শব্দ কতদিনের পুরাতন বলিতে পারি না। বৌদ্ধদের রচিত হাজার বৎসরের আগের লেখা পুঁথির 'দোঁহাকোষ' নাম পাওয়া গিয়াছে। দোঁহা হইতেই "দোঁহার" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্কেতে গানের সুত্র ধরাইয়া দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা, এবং আসরে সুরের রেশ্ জমাইয়া রাখা দোহারদের কাজ। 'চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের পয়ার বা ত্রিপদীর দুই এক চরণ, অথবা 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের অংশ-বিশেষ, কীর্ত্তনে দোঁহ'-আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আখর—কীর্ত্তনে 'আখর' কাহাকে বলে, শুনিয়া বুঝিতে হয়। ইহাকে কীর্ত্তন গানের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাই পদকর্ত্তাগণের বিনা সূতায় গাঁথা মালার রহস্য-গ্রন্থী উন্মোচনের অমৃত-মন্ত্র। ইহা রসের ভাণ্ডারের চাবী, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বার্ত্তিক।

তুক,—অনুপ্রাসবহুল, ছন্দোময়, মিলাত্মক আখর 'তুক' নামে পরিচিত। কোনো কোনো তুকে গানের মত দুই চারিটী কলিও দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি সাধারণত 'তুক' বা 'তুক গান' নামেও পরিচিত। এগুলি কোনো পদকর্ত্তার নিজস্ব নহে, সাধারণত কীর্ত্তন গায়কগণই পুরুষানুক্রমে শিষ্যানুশিষ্য পর্য্যায়ে তুক গানকে পুষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য প্রণেতাগণের রচিত গানেরও দুই এক চরণ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে তুক গান, অজ্ঞাত পদকর্ত্তার পদ বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ছুট—বড়তালের গান করিতে করিতে ছোট তালের 'ফেরতা' বা 'কাটান' দেওয়ার নাম 'ছুট'।

বাঙ্গালার অন্যান্য প্রাচীন সম্পদের মত, কীর্ত্তন গানও লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশের রাজা জমিদার ও সমাজ নেতৃগণের উৎসাহের অভাবই ইহার প্রধানতম কারণ। এখন পিতৃশ্রাদ্ধে বাইজীর কীর্ত্তন নহিলে অনেকের তৃপ্তি হয় না। কীর্ত্তন গান চাই, নহিলে হয় তো সমাজে একটা নিন্দা হয়—তাই বাইজীর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। পুত্র পৌত্রের অন্নপ্রাশনে উপনয়নে বাইজী, ছেলের বিদ্যারম্ভে বিদ্যাচর্চ্চার সাফল্যে বাইজী, বন্ধু বান্ধবের সম্মান-ভোজে বাইজী! তার উপর সর্ব্বনেশে গ্রামোফনের জ্বালায় কণ্ঠ-সঙ্গীত প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাহা আছে, হারমোনিয়মে গলা সাধিবার সোহাগে তাহাও বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। এই অগ্নি-মূল্যের বাজারে, এ হেন দুর্দ্দিনেও অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কল্যাণে, আজিও যে কয়জন কীর্ত্তন গায়ক কোনো রকমে বাঁচিয়া আছেন, কয়েকজন পরলোকগত কীর্ত্তনীয়ার স্মৃতি তর্পণের সঙ্গে, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা আলোচনারও ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৮ পদকর্ত্তা—গোকুলচন্দ্র

[গোকুলচন্দ্রের একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে—বঃ লাঃ পুঃ—২১৯০]

উঠ মোর ভাইরে কানাঞি।
প্রভাত হইল নিশি, খগ গেল দশ দিশি
আঁখি মেল আর ঘোর নাঞি॥
বয়ান মার্জ্জনা কর, খাও দধি দুগ্ধ সর
কটিতটে পর পীতবাস।
বৎস গাভী করি সঙ্গে, নানা খেলা রস রঙ্গে
চল আজু বৃন্দাবন পাশ॥
বৃন্দাবন নিরমল, আছে কত পদ্মফুল
আম জাম পনস পিয়াল।
তুলিব সে সব ফল, সিঙ্গা ভরি লব জল
সুখে খাব সকল রাখাল॥
বলরাম দাদা আগে, নিতুই বিহানে জাগে
তোরে কেনে জাগাইতে হয়।
এ গোকুল চন্দ্রে কয়, আর নিদ্রা ভাল নয়
তোর মুখ চাঞা সভে রয়॥

৯ পদকর্ত্তা—লালু নন্দলাল

[এই সুবিখ্যাত কবি-সঙ্গীত রচয়িতার একটি মাত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছি—বঃ লাঃ পুঃ—২১৭১ তাঁহার কয়েকটী কবি-সংঙ্গীতও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, পরে করিবার ইচ্ছা আছে]

তথাচ তাঁহার প্রেম ছাড়িতে নারিব।
যে বলে সে বলুক লোকে ছাড়িতে নারিব॥
শ্যামকে মিনি সূতে হার গাঁথি গলেতে পরিব।

তথাচ ॥ সুখের ভ্রমরী হঞা, দুঃখের কাননে গিঞা
গুণ গুণ গুণ রবে প্রিয়ার তব গুণ গাইবন্॥
শোন বলি প্রাণ প্রিয়া, জাহ্নবীর তীরে গিয়া
গোপীকান্ত আরাধিঞা, তনু তেয়াগিব ॥
লালু নন্দলালে রটে, যা বল তাই বটে
শ্যামের লাগিয়া আমরা যোগিণী হইব ॥

১০ পদকর্ত্তা—নিকুঞ্জবিহারী গোসাঞী

[এই পদকর্ত্তার একটি মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে—রঃ লাঃ পুঃ—২১৭১]

তারে কত সাধিব ওগো, যার কথায় কথায় অভিমান।
অধন যতন করি, ধন তেয়াগিলাম
পাইঞা পরশমণি হেলায় হারালাম।
বিরহিণী হঞা সই আমি কত কান্দিব।
চোরের রমণী হঞা আমি কত কান্দিব ॥

গলে প্রেম কান্দ, গগনের চাঁদ, আনি দিতে মোর হাতে।
আমা দেখিবারে, কত যতন করিঞা, দাড়াঞা রহিতে পথে ॥
আদর আরতি, বাড়াইলে নাথ, নবীন পীরীতি খানি।
চূড়ার ফুলেতে, চরণ সেবিতে, ঘাটে হঞা মহা দানী ॥
এ সকল কথা জানএ ললিতা, বিশাখা তাহাতে সাখী।
যমুনা যাইতে পথ আগুলিয়া, দাসখত দিলে লিখি ॥
সেই খত লঞা দিব ফেলাইঞা, যত ব্রজাঙ্গনার মাঝে।
পড়িঞা শুনিঞা বিচার করিঞা যার মনে যেবা লাগে ॥
কহেন গোসাঞী নিকুঞ্জ বিহারী শুন বিনোদিনী রাই।
আপনে গড়িলে আপনে ভাঙ্গিলে দোষ দিব বল কায় ॥

১১ পদকর্ত্তা—গোপাল দাস

[মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত খাগড়ার অপর পারে, বুঁধুইপাড়া নামক পল্লীতে, বৈষ্ণব পদকর্ত্তা গোপাল দাস বাস করিতেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। গোপাল দাস, সুন্দররূপ কীর্ত্তন

গান করিতে পারিতেন। পদকর্ত্তা গোপাল দাসের ৯টি পদ 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদের রচয়িতা সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি—বঃ লাঃ পুঃ—২২৯৬]

ভাণ্ডির তলা অতি রম্য স্থান।
সেইখানে বসিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥
রামকৃষ্ণ সখা সহ বিশ্রাম করিঞা।
নানাবিধ খেলা খেলিলেন তাহাই রহিঞা॥

ঘনশ্যাম শরীর কলা রস ধীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়্যা বলরাম সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী॥
নানা বেশ ধরে শিখিচাঁদ শিরে বনমাল উরে করে কঙ্কনী।
নবরঙ্গ ধটী পহিরল কটি সব অঁচর ডোল ডোলে পবনা॥
ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল ডাল অঙ্গে গিরি লাল কিয়ে চলনি।
বাজিছে কিঙ্কিণী নিপিছে পাঁচুনী পদ নপুর ঝন্ ঝন্ন শুনি॥
কত সিংহ অজে করতাল বাজে সব মণ্ডল বেণু বিনা মুরলি।
কত গান সুতান বাজাওত মান কলারস গান করি সুমেলি॥
কেহ নাচত রঙ্গ দোলাওত অঙ্গ তাহে কত রঙ্গ ত্রিভঙ্গ কলা।
মৃদু মন্দহি হাস মিঠি মিঠি ভাস তাহে করু লাস পরাগ ধূলা॥
ভ্রম এক ডালে নানা ফুল ফলে তাহে শুক বলে কুহলে কুহুলি।
নব লোল লতা তাহে কৃষ্ণ মাতা খেলে ফুল পাতা শ্রম এত বলে॥
যব বেণু পুরে মৃগ পাখ ঝুরে পুলকে তরুগণ পাঁচ ফুলে।
রঙ্গিণী ঠাঠ দেখি রঙ্গ নাট প্রেমানন্দ অন্তর ডোল ডোলে॥
কেহু রূপ চায় কেহু গুণ গায় কেহু কানক প্রেম বোল কহে।
গোপাল দাস মনে অভিলাষ ওরূপ হৃদি জাগি রহে॥

ত্রয়োদশ দণ্ডে ভাণ্ডির কাম্যবনেতে বিহার।
দাসগণ করে সেবা যার যেই অধিকার॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

প্রাচীন দপ্তর

[১৭৪৮—১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা *]

(১)

কড়ি—ইংরাজ আগমনের প্রথমাবস্থায় এদেশে, মূল্য বিনিময়ে সাধারণতঃ কড়ি ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে এই কড়ির কথা প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আমলের বহু সনন্দাদিতেও এই কড়ির উল্লেখ আছে। ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থায় (১৭৬১ খ্রীঃ) প্রতি টাকার বিনিময়ে ২৬৵৹ কড়ি গৃহীত হইত। তদানীন্তন কলিকাতা বোর্ডের আফিসে প্রচুর পরিমাণে কড়ি মজুত থাকিত—জেলার কর্ম্মচারিগণ তথা হইতে আবশ্যক মত কড়ি আনাইয়া লইত। ১৭৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজস্ব বিনিময়ে কড়ি গ্রহণের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে জাহাজের তলদেশ ভারী করিবার জন্য যেমন লবণ, কয়লা প্রভৃতি বোঝাই করা হয়, সেকালে তদ্রূপ প্রতি বিলাতযাত্রী জাহাজে ১০ টন বা ৩০০ শত মন করিয়া কড়ি বিলাতে প্রেরিত হইত। কিন্তু বিলাতে প্রেরণ কালে জাহাজে চুরি, ধৌত করার ফলে ওজন কমতি ও ভাঙ্গতি প্রভৃতি জন্য নানারূপ অসুবিধা অনুভব করিয়া; ১৭৫৩ খ্রীঃ কলিকাতায় একটি টাকশাল স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখন টাকশালের সমস্ত কারবারই জগতশেঠের করগত। তাহা নিজ হস্তগত করিতে হইলে বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে ভাবিয়া, ইংরাজগণ তখন এই চেষ্টা হইতে বিরত হন। তাহার পর ১৭৬০ খ্রীঃ ইংরাজগণ দিল্লীর বাদশাহগণের নিকট হইতে স্বতন্ত্র টাকশাল স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। ইহার পর হইতে কড়ির প্রচলন ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে। পূরবর্ত্তী কালে কড়ির প্রচলন উঠিয়া গেলেও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কেননা, অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এদেশের স্থানে স্থানে, এবং এমন কি, রাজধানী কলিকাতায়ও মূল্য বিনিময়ে কড়ির প্রচলন দেখা গিয়াছে। চলিত কথা বার্ত্তায়—'ধন কড়ি,' 'টাকা-কড়ি', 'পয়সা-কড়ি', 'কড়ি-কপালে' প্রভৃতিতে 'কড়ি' আপনার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

---

* ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায়, ১৭৪৮ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৭ খ্রীঃ মধ্যে লিখিত যে সকল ঐতিহাসিক বা সামাজিক তথ্যমূলক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র আছে, তৎসমুদয় হইতে তদানীন্তন বঙ্গের অবস্থা-বিজ্ঞাপক কতকগুলি পত্র সংগৃহীত করিয়া, ১৮৬৯ খ্রীঃ রেঃ লঙ্ সাহেব, গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত একখানি বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলিত করেন। অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইল।

(২)

ভিক্ষুক বা ফকীরের দল—ইংরাজ কোম্পানীর প্রথম আমলের প্রাচীন দপ্তর মধ্যে দেখা যায় যে, কলিকাতায় একটি প্রায় দুই শত ব্রাহ্মণাদি ভিখারীর দল ছিল। তাহারা ফকীর বা সন্ন্যাসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কোম্পানীর আমলের প্রথম হইতেই তাহারা প্রতি দোকান হইতে পাঁচটি করিয়া কড়ি, 'তোলা' স্বরূপ সংগৃহীত করিত। এই জন্য তাহারা, তদানীন্তন কাউন্সিলের নিকট সনন্দ বা অনুমতি-পত্রও লাভ করিয়াছিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দোকানদারগণ এই অযথা কর বা 'তোলা' বন্ধ করিয়া দিলে, তাহা আদায় করিবার অধিকার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য, জীবন দাস বৈরাগী, বাসুদেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভিক্ষুকগণ স্বাক্ষরিত কোম্পানীর কাউন্সিলের নিকট একটি আবেদন করিয়াছিল। প্রাচীন দপ্তর মধ্যে এই আবেদন পত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তদানীন্তন বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র সন্ন্যাসী বা ফকীর দলের কথা শ্রুত হওয়া যায়। তাহারা দলবদ্ধভাবে দেশে অবাধে লুটপাট করিয়া বেড়াইত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান হোয়াইটের সহিত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ এক ফকীরের দল, বীরভূম ও বর্দ্ধমান রাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিবার কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। ১৭৬৩ খ্রীঃ ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ বাখরগঞ্জ অঞ্চলে একদল মুসলমান ফকীরদলের লুটপাট করিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঢাকাতে এইরূপ এক ফকীর দলকে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগকে দুর্গ মেরামতের জন্য কুলীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

(৩)

দণ্ড-প্রণালী—কোম্পানীর আমলের প্রথমাংশে ইংরাজগণ এ দেশে যে কয়প্রকার দণ্ড-ব্যবস্থার অনুসরণ করিত, তাহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) 'শূল'—১৭৬৪ খ্রীঃ সুন্দরবন অঞ্চলে জলদস্যুর প্রভাব বৃদ্ধি হইলে, ধৃত দস্যুদিগের প্রতি শূল দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বাখরগঞ্জের নিকট জলদস্যুগণ, রোজ নামক এক ইংরাজকে হত্যা করিয়া তাহার যাবতীয় অর্থাদি লুট করিয়া লয় এবং সীতারাম রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নিমিত্ত কোম্পানীর সিপাহীগণদ্বারা জল দস্যুগণকে ধৃত করাইয়া, শূলারোপে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়।

(২) নাসা-কর্ণচ্ছেদ—১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, রঙ্গপুরের গবর্ণর ভান্সিটার্টের কুঠীলুণ্ঠনের পর, তথাকার ফৌজদার গবর্ণরের পরিচারকগণের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত হয়। এই জন্য

কাপ্তেন ডাও, গবর্ণরের যাবতীয় দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে, তাহাদের নষ্ট বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের ঠিক্ হিসাব দিতে আদেশ প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন যে, যদি কোন ব্যক্তি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অতিরিক্ত লাভ করিবার প্রত্যাশায় ভুল হিসাব প্রদান করে, তাহা হইলে তাহারা ত কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবেই না—প্রত্যুত, কৃতকর্ম্মের দণ্ড স্বরূপ, তাহাদের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করা হইবে।

(৩) কাষ্ঠ খণ্ডে আবদ্ধ রাখা—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ইজারদারগণের প্রতি উপদেশাবলী মধ্যে অন্যতম একটি এই—ভূমি-সংক্রান্ত বিবাদকালে যদি কেহ বল প্রয়োগ করে, বা কাহাকেও আঘাত করা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৩৲ টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। যাহারা এই অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হইবে, তাহাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে, একটি কাষ্ঠখণ্ডের ছিদ্রমধ্যে হস্ত পদ প্রবিষ্ট করাইয়া সমস্ত দিন দণ্ডায়মান অবস্থায় তৎসহ বিলম্বিত রহিতে হইবে।

(৪) কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া—মোগল-আমলে এই দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত হত্যা অপরাধের জন্য, ইংরাজ কোম্পানী তাহাদের ২৪-পরগণা জমীদারী মধ্যে, বেত্রাঘাত দ্বারা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিত। কিন্তু বোর্ডের মেম্বরগণ, এই প্রকার ব্যবস্থা তাদৃশ ফলপ্রসূ নহে ভাবিয়া, কামানের মুখে গোলা দ্বারা উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। নয়ান নামক এক সূত্রধরকে সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবস্থায় হত্যা করা হয়। ১৭৬১ খ্রীঃ একজন ডাকাইতের সর্দ্দারকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার কথার উল্লেখ আছে।

(৫) ফাঁসী—জালকরা অপরাধে ইংরাজগণ, ১৭৭৫ খ্রীঃ মহারাজ নন্দকুমারের সর্ব্ব প্রথম ফাঁসীর আদেশ প্রদান করেন বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু তাহার প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬৩ খ্রীঃ কাশীমবাজারের মিঃ গ্রের গোমস্তাকে হত্যাকরার জন্য হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। আবার, ১৭৬৬ খ্রীঃ একটি দান-পত্রের জাল করা অপরাধে গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসীর আদেশ হয়। এই হত্যাদেশ রহিত করিবার জন্য কলিকাতা এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বহুখ্যাতনামা ব্যক্তি স্বাক্ষিত এক আবেদনপত্রে, তদানীন্তন গবর্ণর ও প্রেসিডেন্ট জন স্পেন্সারের নিকট প্রেরিত হয়। ইংরাজের আইন ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ, তাহার দেশীয় ভাষায় কোনরূপ অনুবাদ নাই,—তাহার মর্ম্ম এ দেশবাসী অবগত নহে—এবং ইংরাজের বিচার-প্রণালীও দেশবাসীর অজ্ঞাত—ইত্যাদি কারণ, তাহাদের আবেদনের হেতু। এখানে কোন ফলের প্রত্যাশা না রহিলে, তাহারা তাহাদের আবেদনপত্রখানি বিলাতে রাজার নিকট প্রেরণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(৬) বিলাতে নির্ব্বাসন।

(৭) কারাবাস—দেনার দায়ে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজের ইজারদারগণ সময় মত

খাজনা আদায় দিতে না পারিলে, তাহাদের কারাবাসের আদেশ এবং তাহাদের ও তাঁহাদের জমিদারগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। ইহাতেও দেনা পরিশোধ না হইলে, ইজারদার বেত্রদণ্ড ভোগ করিত। বলা বাহুল্য, এই দেনাদার ইজারদারগণ, পরবর্ত্তী বৎসরে আর খাজনা আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইত না। তখন কলিকাতা-লালবাজার পল্লীতে সামান্যমাত্র একটি জেলখানা ছিল। কোন কোন জেলে, স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীগণের স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা ছিল না।

(৮) জলমগ্ন - নৌকা হইতে নিক্ষেপ করিয়া, বস্তার মধ্যে পুরিয়া অপরাধীকে জলমগ্ন করিয়া হত্যা করা হইত। মুঙ্গেরের অত্যুচ্চ দুর্গশিখর হইতে এইরূপভাবে নিক্ষেপ করিয়া মীরকাসীম, জগৎশেঠের প্রাণনাশ করিয়াছিল।

(৯) বেত্রাঘাত কারাদণ্ডিত অপরাধীকে, অপরাধের গুরুত্বানুসারে, দুই তিন মাস ধরিয়া প্রতি শুক্রবার ১০১ বেত্রাঘাত অসহ্য করিতে হইত। কলিকাতার কাউন্সিল-গৃহের সম্মুখস্থ একজন ইংরাজ, এক ব্রাহ্মণসন্তানকে হস্ত পদ বান্ধিয়া বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া চাবুক মারার কথার উল্লেখ আছে। আবার, এই ব্রাহ্মণের মুখে গো-মাংস প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার জাতিনাশের চেষ্টার কথাও বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীশিবরতন মিত্র

সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ

আত্মকথা—'বীরভূমি', মাসিক পত্রিকার অষ্টম খণ্ড আরম্ভ হইল—বাঙ্গালা ১৩৩৩ সাল, কার্ত্তিক মাস। 'খণ্ড'—বর্ষ নহে। কারণ আমরা নিয়মিতভাবে এখনও এই পত্রিকা বাহির করিতে পারিতেছি না। ইহার একমাত্র কারণ, আমাদের অক্ষমতা। চেষ্টা চলিতেছে, শ্রীভগবান্ সহায় হউন, কৃপা করুন, যেন নিয়মিতভাবে মনের মত করিয়া পত্রিকাখানি বাহির করিতে পারি। আমাদের কাগজ অনিয়মিত হওয়ায় গ্রাহকদিগের কাগজ পাইতে বিলম্ব হয় সত্য, কিন্তু গ্রাহকগণের আর্থিক ক্ষতি কখনও হয় নাই এবং কখনও হইবে না। অধিকাংশ গ্রাহকই, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিচিত, অধিকাংশ গ্রাহকেরই নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়া হয় না। কিন্তু এখন হইতে অগ্রিম মূল্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। নিয়মিত করিতে হইলে, অনেকস্থলে অগ্রিম মূল্যের ব্যবস্থাই ভাল।

'বীরভূমি' মাসিকপত্রিকা প্রথম বাহির হইয়াছিল, সন ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কীর্ণাহার গ্রামের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সৌরেশ-চন্দ্র সরকার, এই দুই ভ্রাতার অর্থসাহায্যে, চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রাহক স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায়, এই পত্রিকা প্রথম বাহির হয়। আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, বীরত্বের একবিন্দুও আমাদের নাই; 'বীরভূমি' থামিয়া থামিয়া চলিতেছে। ১৩০৬ সালের কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ হইয়া 'বীরভূমি' তিন বৎসর কয়েক মাস চলিয়াছিল, তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। প্রায় দেড় বৎসর বন্ধ থাকার পর, আবার ১৩১১ সালের পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হয়। এবারে এক বৎসরের কিছু অধিককাল চলার পর আবার বন্ধ হইয়া যায়।

১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে 'বীরভূমির' নবপর্য্যায়। সেই সময় হইতে আবার নূতন করিয়া বর্ষ বা খণ্ডগণনা আরম্ভ হয়। সেই নবপর্য্যায়ই চলিতেছে। এবারে আর পৃষ্ঠপোষক নাই, জনসাধারণের প্রতি, বা নারায়ণের প্রতি চাহিয়া আমরা এই পত্রিকা চালাইতেছি। ইহাও মধ্যে কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে ছয় মাস করিয়া বন্ধ রাখা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা আমাদের অক্ষমতার পরিচায়ক। দেশে সাহিত্যানুরাগী লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে; সুতরাং আমরা পরিশ্রম করিলে ইহার উন্নতিই হইবে। শ্রীভগবান্ জয়যুক্ত হউন।

প্রথম হইতেই একটি সাধুসঙ্কল্পের প্রেরণা, 'বীরভূমি'-পরিচালনার পশ্চাতে আছে। স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা ও আমাদের ভূমিকা, যাহা ১৩০৬ ও ১৩১৭ সালে লেখা হইয়াছিল, আগামী সংখ্যায় তাহা পুনর্মুদ্রিত হইবে; তাহা পড়িলে আমাদের প্রাণের কথা সকলেই বুঝিবেন।

১৩০৬ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র একজন সাহিত্যসেবক, এই 'বীরভূমি'র সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 'বীরভূমি' প্রচারের প্রথম সঙ্কল্পের সময়ে তিনি ছিলেন, প্রথম সংখ্যা হইতে বরাবর নিয়মিতভাবে লিখিয়াছেন; নবপর্য্যায়ের সঙ্কল্পকালেও তিনি ছিলেন, এখনও আছেন এবং প্রবন্ধের দ্বারা, পরামর্শের দ্বারা, সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেছেন। তিনি শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র। বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহকার্য্যে তিনি যত কাজ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে কেহই তত কাজ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' নামক অভিধান খানির কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাভাবে ইহার প্রকাশ এখনও সম্পূর্ণ হইল না! বড়ই দুঃখের বিষয়! আমাদের আশা, শীঘ্রই ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইবে। এ বিষয়েও শ্রীভগবান্ সহায় হউন।

কত মূল্যবান্ পুরাতন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। ধন্য দেশে এই বীরভূম! কত রত্নই ইহার গর্ভে এখন লুক্কায়িত! শিবরতনবাবু এই পুঁথিগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। কবে যে এগুলি

প্রকাশিত হইবে, তাহা শ্রীভগবানই জানেন। তবে তাঁহার করুণার জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। সাধু উদ্দেশ্য, নিশ্চয়ই সফল হইবে।

প্রথম হইতেই 'বীরভূমি' এই নষ্ট রত্ন উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলও হইয়াছে। সাফল্যের দুইটি প্রকৃষ্ট পরিচয়—স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী," আর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত "উজ্জ্বল চন্দ্রিকা"। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি নয়নানন্দ ঠাকুর মহাশয় বীরভূম জেলার ময়নাডিহিগ্রামের; তাঁহার গ্রন্থ "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-রসকদম্ব" বীরভূমির নবপর্য্যায়ের তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। নয়নানন্দ ঠাকুরের সমগ্র গ্রন্থাবলী তাঁহারই সম্পাদকতায় অচিরে প্রকাশিত হইবে। কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও কত লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়াছে, তাহার তালিকা পরে প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-সম্মিলন—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন বীরভূম জেলার সদর সিউড়ি সহরে হইয়া গেল—২০শে চৈত্র ও ২১শে চৈত্র ১৩৩২, শনিবার ও রবিবার। মূল সভার সভাপতি প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সাহিত্য-শাখায় শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ইতিহাস-শাখায় শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান-শাখায়—শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত সভাপতি হইয়াছিলেন। শেষদিন যখন ধন্যবাদদান, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ প্রভৃতি চলিতেছিল, সেই সময়ে কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, সকলেই অতিশয় চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, এমন অনেক লোক সভায় ছিলেন; কাজেই অতিশয় ব্যস্ততার মধ্যেই সভার কার্য্য শেষ হইয়াছিল।

বীরাষ্টমী-সমিতি—২২শে চৈত্র ১৩৩২, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া সিউড়ি সহরে এক বক্তৃতা করেন, তাহার ফলে বীরাষ্টমী সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্যের এবং দৈহিক ও মানসিক উন্নতি-বিধান এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতির কার্য্য বেশ ভালরূপ চলিতেছে।

৺ধর্ম্মদাস বসু—অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় গত ৪ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম আশী বৎসর হইয়াছিল। চাকুরী করার সময় ইনি সিউড়িতে ছিলেন, সিউড়িতে 'হিল্‌ভিউ' নামক সুন্দর বাড়ী করিয়া, জীবনের শেষ সময় সিউড়িতেই থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর সিউড়িতে ছিলেন। সিউড়িতে একটি শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর, সিউড়ির বাড়ী বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

মহাশয় আমাদের দেশের ছেলেদের বিদেশে পাঠাইয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য যখন একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সিউড়ি টাউন হলে যে-সভা হয়, তাহাতে বসু মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের প্রথম বৎসর ৩০শে আশ্বিন সিউড়িতে যে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, তিনি নগ্নপদে সেই শোভাযাত্রার সহিত সমগ্র সহর পর্য্যটন করিয়াছিলেন, জনসাধারণের সভাতেও উপস্থিত ছিলেন। ইনি কলেরার ঔষধরূপে ইন্দ্রযবের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন। উহা ব্যবহার করিয়া অনেকেই ফল পাইয়াছেন। তিনি সাহসী, দেশহিতকর প্রত্যেক কার্য্যেই উৎসাহী ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। সিউড়ি সহরে ব্রাহ্মসমাজের একখানি ঘর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই ঘরখানি যাঁহাদের চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার একখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে। 'নব্যভারত' পত্রে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।

দুবরাজপুরে গুণ্ডামী—সিউড়ির উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়ের একখানি পত্র কলিকাতার 'নায়ক' ও রামপুরহাটের "রাঢ়দীপিকা" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা কেবলমাত্র একটি সামান্য ঘটনা নহে, ইহার মূলে এমন একটি বড় কথা আছে, যাহার জন্য দেশে বিশেষভাবে আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। এই যুগের নাম—জনসাধারণের জাগরণের যুগ। জনসাধারণকে শিক্ষাদান করিয়া এমন অবস্থায় আনিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া ও শক্তিশালী হইয়া নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া লইতে পারে। এই সংগ্রাম শান্তিময় উপায় অবলম্বন করিয়া যাহাতে হয়, দেশের প্রত্যেক লোকের হৃদয়ের যাহাতে পরিবর্ত্তন হয়, বিজ্ঞ নেতৃগণ সেজন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। আমরা পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। প্রতিকার কি—সে-সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

"গত ২৬শে অক্টোবর ৯ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার আমি, 'কংগ্রেস'-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মণিলাল ঘোষ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, মহাশয় দুবরাজপুর গিয়াছিলাম। পূর্ব্বদিন দুবরাজপুরে প্রচার করা হইয়াছিল যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুবরাজপুরে আসিয়া সভা করিবেন ও ভোটারদিগের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিবেন। কোন কারণে জিতেনবাবু যাইতে না পারায় আমরাই গিয়াছিলাম। দুবরাজপুরের হাটতলায় সভা করার কথা ছিল। আমরা দুবরাজপুরে প্রবেশ করিয়াই সংবাদ পাইলাম যে, এই সভা যাহাতে হইতে না পারে, তাহার জন্য হেতমপুরের রাজা বাহাদুর রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা মোটরে চড়িয়া হাটতলায় উপস্থিত হইবামাত্র চারটী ঢাক, কয়েকটী ঢোল চড়চড়ি জোরে বাজান হইতে লাগিল। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর

ভাড়াটীয়া লোক মদ খাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা 'হল্লা' করিয়া তুমুল গোলযোগ সৃষ্টি করিল। বাজারের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গেল। চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। স্থানীয় মুন্সেফবাবু ও কয়েকজন উকিলবাবু ব্যাপার কি জানিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। আমি অনুভব করিলাম, এই সমুদয় লোক মারামারি করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বহু লোকের সমাগম হওয়ায় তাহারা মারামারি করিতে পারে নাই। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল অতি ভয়ঙ্কর হল্লা করিল। সভা হইল না। আমরা মোটর লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া আসিলাম। বক্তৃতা করিবার ও বক্তৃতা শুনিবার অধিকার, বর্ত্তমান সভ্যজগতে মানুষের প্রাথমিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আমাদের কোন দুঃখ নাই। কিন্তু দুবরাজপুরের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী স্থানের ভদ্র অধিবাসিগণ এই অধিকার কেমন সুন্দরভাবে ভোগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আমার প্রশ্ন - ইহার প্রতীকার কি?"

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

মদনমোহন—আস্বাদন

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বীরভূমি, ৮—২, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩।
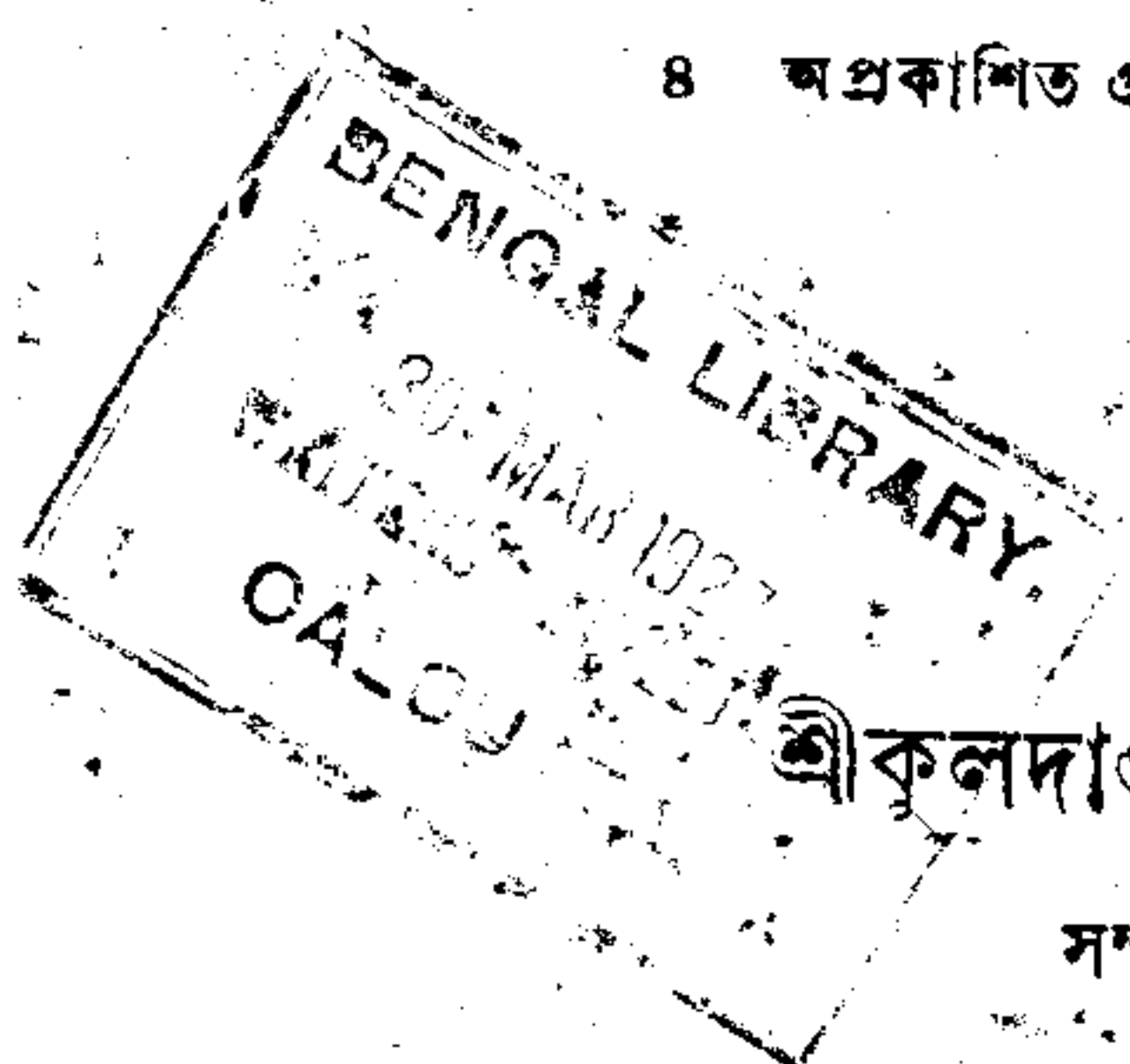
মদন মোহন—আস্বাদন

১। লীলার সত্যতা

তোমার নিকট, বা আমার নিকট, বা আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ নরনারীর নিকট, শ্রীভগবান্ অজ্ঞাত বলিয়া, তিনি যে একেবারেই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়, তাহা নহে। তুমি, বা আমি, বা আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ নরনারী শ্রীভগবান্‌কে সুস্পষ্টরূপে জানি না বলিয়া, তাঁহাকে কেহ কখনও জানে নাই বা জানিতে পারে না, তাহা নহে। শ্রীভগবান্ ধরা দিয়াছেন, মানুষ তাঁহাকে জানিয়াছে, তাঁহার সঙ্গ করিয়াছে, একমাত্র প্রিয় ও প্রিয়তম বলিয়া তাঁহার সঙ্গসুখ আস্বাদন করিয়াছে। যাঁহাদের নিকট তিনি ধরা দিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্ত। যে বৃত্তি বা শক্তির নিকট তিনি ধরা দিয়াছেন, সেই বৃত্তি বা শক্তির নাম 'ভক্তি'। ভগবান্ যেমন নিত্য ও সত্য, ভক্তও তেমনি নিত্য ও সত্য। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ ছাড়া আর যাহা কিছু দেখিতেছি বা ভাবিতেছি, সকলই নশ্বর।

ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের যে প্রকাশ বা 'ধরা দেওয়া', তাহারই নাম 'লীলা'। ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তি যেমন নিত্য, লীলাও সেইরূপ নিত্য; সুতরাং চিন্ময়, মায়িক নহে। ভক্তের ভাব নানারূপ, শ্রীভগবানের প্রাকট্যও নানারূপ, সুতরাং লীলাও নানারূপ। এই যে নানারূপ লীলা, ইহার মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। নরলীলার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের কৈশোরলীলা সর্ব্বোত্তম। এই কৈশোরলীলায় শ্রীশ্রীরাসলীলা যাবতীয় লীলার মুকুটমণি।

কোনও লীলা বুঝিতে হইলে সেই লীলার যাঁহারা পরিকর, যাঁহাদের অনুভব ও আস্বাদন আশ্রয় করিয়া সেই লীলার প্রাকট্য হইয়াছে, সেই পরিকরগণকে বুঝিতে

হইবে। সকলের হৃদয়বৃত্তি একরূপ নহে; অনুভব ও আস্বাদন নানারূপ। কোনও লীলার পরিকরগণের হৃদয়বৃত্তি যখন আমার হৃদয়বৃত্তি হইবে, তখনই সেই লীলা আমার নিকট সত্য হইবে বা প্রকট হইবে।

২। শ্রীরাধার আস্বাদন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীশ্রীরাসলীলার উদ্দেশ্য, কন্দর্পের দর্পজয় বা মদন-মোহন। শ্রীরাসবিহারী ও শ্রীরাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তগণের নিকট 'স্বয়ং নব-কন্দর্প' ও 'অপ্রাকৃত নবীন-মদন' বলিয়া পরিচিত।

এই 'মদন-মোহন'-কারী শ্রীভগবান্ একদিন ব্রজগোপীর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আশ্রয় করিয়া, ভক্তের ভাষায়—'ব্রজগোপীর মনোরথের রথী হইয়া'—প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন; অর্থাৎ সাধকের ধ্যান-রাজ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। তাহার পর সহস্র সহস্র সাধক-ভক্ত এই সাধনা-পথে পর্য্যটন করিয়াছেন। এই সুপবিত্র সাধনপথ একদিন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এই সাধন-পথ একরূপ সার্ব্বজনীন করিলেন।

মদনমোহন-তত্ত্ব পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এবারে তাহার আস্বাদন দেওয়া হইল। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'। এই গ্রন্থখানি নিত্য-লীলার গ্রন্থ। এই শ্রীগ্রন্থের ৮ম সর্গের ছয়টি শ্লোকে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক 'মদন-মোহন'এর আস্বাদন কথিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আস্বাদনরূপে এই শ্লোকগুলি ও তাহাদের বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া সুপরিচিত বৈষ্ণব কবি শ্রীযদুনন্দন দাস মহাশয় 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা এই উপকরণগুলি পরিবেশন করিলাম, সুহৃদয় ভক্তগণ আস্বাদন করিবেন।

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়গণ একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের জন্য অতিশয় প্রবল লালসায় আকৃষ্ট হইতেছে। তিনি তাঁহার হৃদয়ভাব বিশাখা সখীকে বলিতেছেন—

৩। প্রথম শ্লোক—সর্ব্বেন্দ্রিয়-আকর্ষণ

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃকোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥

'গোবিন্দ-লীলামৃত' ৮।৩

হে আলি, (হে সখি) মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি (আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই) শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ (ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) বলাৎ কর্ষতি (জোর করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন)। সেই শ্রীকৃষ্ণ কেমন ? সৌন্দর্য্যামৃত-সিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ (তাঁহার সৌন্দর্য্য অমৃতের সমুদ্র, সেই সমুদ্রের তরঙ্গরাশির দ্বারা রমণীগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে প্লাবিত করিতেছেন। পর্ব্বতকে প্লাবিত করিতে হইলে তরঙ্গ খুবই উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। এই সৌন্দর্য্যের দ্বারা তিনি চক্ষু দুইটিকে আকর্ষণ করিতেছেন। কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ (আর শ্রীকৃষ্ণ কেমন ? তাহার সনর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাসযুক্ত রম্যবচন, রমণীয় বাক্য কর্ণের আনন্দদায়ী, সেই বাক্যের দ্বারা তিনি আমার কর্ণযুগলকে আকর্ষণ করিতেছেন)। কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ (আর শ্রীকৃষ্ণ কেমন ? তাঁহার অঙ্গ অতি সুশীতল, কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত। সেই অঙ্গের দ্বারা আমার স্পর্শেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন।) সৌরভ্যা-মৃতসংপ্লবাবৃত জগৎ (শ্রীকৃষ্ণের সৌরভ-বন্যার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সমগ্র জগৎ প্লাবিত করে। সেই সৌরভের দ্বারা তিনি আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন)। আর কেমন ? পীযূষরম্যাধরঃ (তাঁহার অধরামৃত রমণীয়। এই অধরামৃতের দ্বারা আমার রসনেন্দ্রিয়কে তিনি আকর্ষণ করিতেছেন।) শ্রীকৃষ্ণের সকলই অমৃত। সৌন্দর্য্যের দ্বারা চক্ষু, বাক্যের দ্বারা কর্ণ, শীতল অঙ্গের দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়, সৌরভের দ্বারা ঘ্রাণ ও অধরামৃতের দ্বারা রসনেন্দ্রিয়, এই প্রকারে একই সময়ে, আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জোর করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একদিন জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ; দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ এককালে স্ফুরিত হইল।

পঞ্চগুণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একই সময়ে সজোরে আকর্ষণ করিতেছেন। বড়ই কঠিন অবস্থা। মন একটি, তাহাকে একসঙ্গে পাঁচদিকে টানিলে বড়ই কঠিন অবস্থা। মন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে শ্রীজগন্নাথের উপল-ভোগের সময় হইল। ভক্ত-গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মন্দির হইতে সরাইয়া বাসায় লইয়া গেলেন। বাসায় গিয়া মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের গলা জড়াইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে শ্রীরাধার যেমন উৎকণ্ঠিত অবস্থা হইয়াছিল, মহাপ্রভুর এখন ঠিক্ সেই অবস্থা। এই অবস্থায় শ্রীরাধা বিশাখাকে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভু ঠিক্ তাই বলিয়া বিলাপ-পূর্ব্বক মনস্তাপ ব্যক্ত করিতেছেন। মহাপ্রভু প্রথমতঃ পূর্ব্বের শ্লোকটি বলিলেন, তাহার পর বলিতেছেন—

কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভি পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায়॥
সখি হে, শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুগণ,
সভে করে, হরে পরধন॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচদিগে টানে
একমন কোন্ দিগে যায়?
এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায়॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সভার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন॥

এই অংশটি ভূমিকা। ইহার পর উদ্ধৃত শ্লোকের শব্দগুলির অর্থ বলিবেন। ভূমিকার তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ ও অধরামৃত, ইহারা যে কত মধুর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় লুব্ধ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ একা

একা কিছুই করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণের কাহারও নিজের কোন শক্তি নাই। মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা, মনের সাহায্য পাইলেই ইন্দ্রিয়েরা কাজ করিতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয় পাঁচটি, আর মন একটি। মন ঘোড়ার মত। ইন্দ্রিয় সেই মনের ঘোড়ায় চড়িতে পাইলে, অর্থাৎ মনের সাহায্য পাইলে কাজ করিতে পারে। মনের সাহায্য না পাইলে তাহারা অক্ষম। যদি এক সময়ে একটি ইন্দ্রিয় মনের ঘোড়ায় চড়িয়া নিজের কার্য্য সাধনের জন্য যায়, তাহা হইলে কোনরূপ গোলোযোগ হয় না। কিন্তু, এখন শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই একই সময়ে নিরতিশয় লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বিবেচনা নাই। তাহারা পাঁচজন একই সঙ্গে একটি ঘোড়ার উপর চড়িয়া এককালে ঘোড়াকে পাঁচদিকে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এ যে বড় ভয়ানক অবস্থা। ইহাই আমার দুঃখের কারণ। আমার ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় লম্পট, লুব্ধ হইলে তাহাদের আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। দস্যুপনাই তাহাদের কাজ, পরের ধন হরণ করাই তাহাদের কাজ। একই সময়ে পাঁচটি ইন্দ্রিয় একটি ঘোড়াকে পাঁচদিকে টানিতেছে, মন কোন্ দিকে যাইবে। সকলেই একসঙ্গে টানিতেছে, ঘোড়ার প্রাণ গেল; আমি আর এই দুঃখ সহিতে পারি না। এখন কি করি?

ইন্দ্রিয়গণকেই বা কি দোষ দিব? না, তাহাদের কোন দোষ নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও অন্যান্য গুণের আকর্ষণী-শক্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণের রূপ প্রভৃতি পঞ্চগুণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে টানিতেছে, ইন্দ্রিয়গুলিরও প্রাণ যায় যায়। আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আর বাঁচি না।

এইবার শ্লোকের শব্দার্থ বলিতেছেন।

কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
এক বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণের বচন মাধুরী, নানারস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,

কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভাভর, মৃগমদ মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব ধন,
জগৎ নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারী মন।
ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥

ভক্তের, ভাব ও অধিকার ভেদে, শ্রীভগবান্ ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। 'মদন-মোহন' রূপে যখন তিনি আসেন, তখন ভক্ত অনুভব করেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ—তিনিই সকল রসের একমাত্র আস্বাদক। এই অবস্থায় ভক্ত আরও অনুভব করেন—অন্যান্য সকলে প্রকৃতি বা নারী, শ্রীকৃষ্ণের দাসী। এইটুকু মনে রাখা দরকার। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রভাব বুঝাইবার জন্য নারী-প্রকৃতিতে তাহার ক্রিয়া কিরূপ তাহাই বলা হইয়াছে। কারণ, মদন-মোহন যখন প্রকাশিত হয়েন, তখন নিখিল-বিশ্বে যাহা কিছু সমস্তই নারীরূপে প্রতিভাত হয়। এইবার পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য্য বলা হইতেছে।

স্ত্রীলোক ধৈর্য্যের মূর্ত্তি। স্ত্রীলোকের চিত্ত, উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায়। তাহাকে প্লাবিত, অভিভূত বা বিচলিত করা খুবই কঠিন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসিন্ধুর তরঙ্গের একটি বিন্দুর দ্বারা নিখিল নারীর চিত্ত উন্মথিত হয়। অন্য স্থানে বলা হইয়াছে—

পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে তেন লক্ষ্মীগণ।

অন্যান্য কথাগুলির অর্থ স্পষ্ট। অভিভূত বা মুগ্ধ হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া ও আত্মহারা হওয়া, প্রকৃতির ধর্ম্ম; এই কারণেই নারীর কথা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে।

এই প্রকারের আর্ত্তি-প্রকাশ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিরূপ অবস্থা হইল, তাহাই বলা হইতেছে।

এত কহি গৌরহরি, দু'জনের কণ্ঠে ধরি,
কহে—শুন স্বরূপ রাম রায়।
কাঁহা করো, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥

এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥
সেই দুই জন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোকপঠন॥
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥

৪। দ্বিতীয় শ্লোক—চক্ষুর আকর্ষণ

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্র মুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥

পূর্ব্বের শ্লোকে একই সঙ্গে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইতেছে, এই কথা বলা হইয়াছে। এখন পরবর্ত্তী এক একটি শ্লোকে এক একটি ইন্দ্রিয় কিভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহাই বলা হইবে।

হে সখি, সেই মদনমোহন আমার নেত্রের স্পৃহা বিস্তারিত করিতেছেন। 'মদন-মোহন' এই কথাটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ 'মদনের মোহন'; আর এক অর্থ—"মদয়তি সম্ভোগাংশে হর্ষয়তি, বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়তি চেতি মদনঃ 'মদীহর্ষ-গ্লাপনয়োঃ' তাভ্যাং মোহয়তি স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ।" তিনি সম্ভোগের দ্বারা হর্ষিত করেন, বিপ্রলম্ভ বা বিরহের দ্বারা সন্তপ্ত করেন, এই দুই প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা সকলকে বশীভূত করিয়া থাকেন, এই কারণে তিনি 'মদন-মোহন'।

মদনমোহন কি প্রকারে নেত্রস্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন, তাহাই বলিতেছেন। নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ—নবাম্বুদাদপি লসন্তী দ্যুতির্যস্য সঃ—কোথায় লাগে নূতন মেঘ? শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি তাহাকে পরাস্ত করিয়া বিলসিত হইতেছে। নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ—, কোথায় লাগে নূতন বিদ্যুৎ, শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বস্ত্র তাহাকে পরাস্ত করে। সুচিত্র মুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দ চন্দ্রাননঃ, সুষ্ঠু চিত্রয়া রুচিরয়া মুরল্যা স্ফুরৎ শোভমানং শরৎ পূর্ণচন্দ্র ইবাননং যস্য সঃ—সুন্দররূপে চিত্রিত মুরলীর দ্বারা শোভিত শরতের অমন্দ (পূর্ণ) চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার মুখখানি। মুখখানি যখন চন্দ্র, তখন মুরলীর ধ্বনি বজ্রধ্বনি, আর সেই মুরলীর ধ্বনিতে অমৃতবৃষ্টি হইতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ময়ূরদলভূষিতঃ—তিনি শিখিপুচ্ছে বিভূষিত। শ্রীকৃষ্ণকে মেঘ ধরিলে ময়ূরের পুচ্ছ রামধনু তুল্য। সুভগ-হারতারপ্রভঃ, গলদেশে মুক্তাহার, যেন তারার মালা। মেঘে চাঁদ কিম্বা তারা দেখা যায় না, সুতরাং কৃষ্ণ মেঘ হইলেও অদ্ভুত মেঘ।

এই শ্লোকটির একটি পাঠান্তর প্রচলিত আছে। তদনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের পাঠ এইরূপ—

ত্রিভঙ্গরুচিরাকৃতির্ললিতবন্যবেশোজ্জ্বলঃ।
সুধাংশু মধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ॥

ইহার অর্থ ত্রিভঙ্গ সুন্দর আকৃতি, ললিত ও বন্য উজ্জ্বল বেশ। চন্দ্রের ন্যায় মধুর আনন, চক্ষু পদ্মের কান্তিকে পরাজিত করে। শ্রীকৃষ্ণ মেঘ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিটি বিশেষণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, মেঘ আকৃতিবান, ত্রিভঙ্গললিত, মধুররম্যবেশশোভিত, আর অতিশয় আহ্লাদদায়ক চন্দ্র ও পদ্মের সহিত সংযুক্ত। ইহাতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণ মেঘ, কিন্তু অদ্ভুত মেঘ, আর শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘ হইয়া আমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছেন, তখন আমার চক্ষু চাতক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যায় এইগুলি পাওয়া যাইবে।

অনুবাদ

নবীন জলদ দ্যুতি, বসন বিজুলি ভাতি,
ত্রিভঙ্গিম বন্যবেশ তায়।
মুখপদ্ম জিনি চান্দ, নয়ন কমল ছান্দ,
মোর নেত্র সেই আকর্ষয়॥—যদুনন্দন

আস্বাদ

পূর্ব্বের শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে অবস্থায় আস্বাদন করিয়াছিলেন, প্রথমে সেই অবস্থাটি বুঝিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন সমুদ্রতীরে যাইতেছেন, হঠাৎ দেখেন একটি ফুলের বাগান। তাঁহার মনে হইল—এই ত বৃন্দাবন। তিনি সেই বাগানে প্রবেশ করিলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, রাসলীলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় গোপীগণ যেমন করিয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়াছিলেন, মহাপ্রভু ঠিক্ সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পড়িতেছেন আর প্রত্যেক তরুলতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া এখানে ওখানে ভ্রমণ করিতেছেন।

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সভে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার, ইহঁ আইলা—পাইলা দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥

হে আম্র, হে পনস, হে জম্বু, হে কোবিদার, তোমরা তীর্থবাসী, পরের উপকার করিয়া থাক। কৃষ্ণ এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? সন্ধান দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।

বৃক্ষেরা কিছুই বলে না। তাঁহার মনে হইল, এই সব বৃক্ষ পুরুষজাতি, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সখা। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিবে না। তখন ভাবিলেন এই লতা স্ত্রীজাতি, ইনি আমার সখীতুল্যা। ইনি বলিবেন, এই বলিয়া তুলসী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

তুলসী মালতী যুথি মাধবি মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার আগুকে॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ॥

উত্তর না পইয়া ভাবিতেছেন, ইহারা কৃষ্ণদাসী। এই জন্য ভয়ে কিছু বলিতেছে না।

তখন দেখিলেন মৃগীগণ আসিতেছে। আবার তখন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধও পাইতেছেন। এই অবস্থায় মৃগীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কহ মৃগি, রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমার সুখ দিতে আইলা, নাহিক অন্যথা॥
রাধার প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গ গন্ধ॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত॥

হরিণীকে খুব অনুনয় করিয়াই বলিলেন। তাহাকে বলিলেন,—সখি, মৃগি, তুমি ভাগ্যবতী। শ্রীকৃষ্ণ তোমার সুখবিধান করার জন্য শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই তোমার নিকট আসিয়াছিলেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সখি, গোপন করিও না। আমরা বহিরঙ্গ নহি। আমরা দূর হইতে তাঁহার অঙ্গের গন্ধ পাই। দেখ সখি, বাতাসে শ্রীকৃষ্ণের গলদেশের কুন্দমালার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে; আর সেই গন্ধের সহিত শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের গন্ধ মিশিয়া রহিয়াছে।

হরিণী উত্তর দেয় না। তখন ভাবিলেন, এই হরিণীও বিরহিণী,—শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। কাজেই কি উত্তর দিবে? আমার কথাই শুনিতেছে না।

তখন দেখেন—সম্মুখে অনেকগুলি বৃক্ষ। তাহারা ফুলফলভরে অবনত; শাখাগুলি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছেন। তাহা হইলে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বলিতে পারিবেন। এই ভাবিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমরা কি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বলিতে পার?

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে॥
তোমার প্রণাম কি করিয়াছে অবধান?
কিবা নাহি করে? কহ বচন-প্রমাণ॥

শ্রীকৃষ্ণ কি তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছেন? না, তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন, তোমাদের দেখিতে পান নাই? দেখিতে না পাওয়ারই কথা। প্রেয়সীকে সঙ্গে লইয়া বনপথে

যাইতেছেন। প্রেয়সীর মুখে ভৃঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে। প্রেয়সীকে রক্ষা করার জন্য লীলাপদ্ম ঘুরাইতেছেন। অন্যমনস্ক থাকারই তো কথা।

আবার ভাবিতেছেন, এই সেবক শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অতিশয় দুঃখিত; কি উত্তর দিবে? ইহার যে জ্ঞানই নাই।

এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে, তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥
কোটি মন্মথ-মোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্রমন॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ঠিক্ এই সময়েই স্বরূপ প্রভৃতি ভক্ত, খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গ সাত্ত্বিক বিকার-সমূহে পূর্ণ, ভিতরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন চলিতেছে, কিন্তু বাহিরে বিহ্বল। স্বরূপ প্রভৃতি অনেক চেষ্টা করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। চৈতন্য হইলে মহাপ্রভু উঠিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন, আর বলিতেছেন—

কাঁহা গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন।
তাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলী বদন।
তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন॥
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥

এই অবস্থায় মহাপ্রভু পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকের বাঙ্গালা আস্বাদন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্রমন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি! কি করি উপায়?

কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়।
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়েছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে মোরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল॥

এই চিত্রটি অতি উপাদেয় ও মনোহর। এই চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্যস্থানে কথিত আরও কয়েকটি কথা ইহার সহিত মিলাইয়া চিত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া আস্বাদন করিতে হইবে।

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজুরি সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥

এই জগৎ শস্যক্ষেত্র, শ্রীকৃষ্ণ মেঘ। আর সেই মেঘ, লীলার অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। মেঘ কিন্তু অদ্ভুত মেঘ। তোমাদের আকাশে যে মেঘের উদয় হয়, সেই মেঘের সঙ্গে সকল বিষয়ে মিল নাই। এই মেঘ ব্রজবাসীর ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছেন ভয় নাই, তোমাদেরও ভাগ্যাকাশে একদিন উদিত হইবেন। কবে? তোমরা যেদিন ব্রজবাসীর হইবে।

তোমাদের মেঘে বিদ্যুৎ চঞ্চল, আর কৃষ্ণমেঘে বিদ্যুৎ স্থির। কৃষ্ণমেঘের বিদ্যুৎ

পীতবসন। তোমাদের মেঘে বজ্রধ্বনি বড়ই কর্কশ, আর কৃষ্ণমেঘের বজ্রধ্বনি, মধুরাস্ফুট বংশীধ্বনি, বড়ই মিষ্ট। তোমাদের মেঘ চন্দ্রকে আচ্ছাদন করে, আর কৃষ্ণমেঘের গায়ের উপর অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র, চাঁদের হাট ঝল্ ঝল্ করে। শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে মুক্তার মালা, সর্ব্বদাই দুলিতেছে, যেন নূতন মেঘের কোলে কোলে বকশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে। কৃষ্ণমেঘে দুখানি রামধনু, উপরের খানি ছোট, আর নীচের খানি বড়। উপরের খানি ময়ূরের পাখা, আর নীচের খানি বৈজয়ন্তী হার। এই মেঘের লীলামৃতবর্ষণে চতুর্দ্দশ ভুবন সিঞ্চিত হইতেছে।

৫। তৃতীয় শ্লোক—কর্ণের আকর্ষণ

নদজ্জলদনিঃস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষর পদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনা হৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং॥

হে সখি, মদনমোহন আমার কর্ণের তৃষ্ণা বর্দ্ধিত করিতেছেন। সেই মদনমোহন কেমন? নদতো জলদস্য নিঃস্বন ইব নিঃস্বনঃ কণ্ঠধ্বনির্যস্য গম্ভীরঃ—গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় যাঁহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। আর কেমন? শ্রবণাকর্ষি সৎ সিঞ্জিতং ভূষণানাং ধ্বনির্যস্য সঃ—তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ সমুহের অত্যুত্তম ধ্বনি শ্রবণকে আকর্ষণ করে। আর কেমন? "সনর্ম্মরসসূচকাক্ষর-পদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ" সংস্কৃত ভাষা অপূর্ব্ব এই বাক্যটি পণ্ডিতেরা নানা প্রকারে আস্বাদন করিয়াছেন। যথা (ক) নর্ম্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরত এব রসসূচকৈরক্ষরৈ জাতানাং পদানাং বিভক্ত্যন্তশব্দানাং যা অর্থভঙ্গী অর্থকৌশলং সা উক্তৌ যস্য—নর্ম্ম বা পরিহাসের সহিত বর্ত্তমান বা যুক্ত বলিয়া রসসূচক অক্ষর সমূহের দ্বারা গঠিত পদ সমূহের যে অর্থভঙ্গী, সেই অর্থভঙ্গী তাঁহার কথায় রহিয়াছে। অন্য লোকের বাক্য রসসূচক হয়, আর আমার মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রত্যেক অক্ষর রসসূচক, সেই অক্ষরসমূহের দ্বারা গঠিত পদসমূহের যে ভঙ্গি বা অর্থকৌশল, তাহাই তাঁহার উক্তিতে রহিয়াছে। (খ) সনর্ম্মরসসূচকৈরক্ষরৈঃ জাতানাং পদানাং ইত্যাদি পরিহাস-

সূচকান্ (সূচিকান্) পরিহাসযুক্ত রসের ছুঁচগুলিকে ক্ষরণ করিতেছে অর্থাৎ যাহারা শুনিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে এই ছুঁচগুলি এমনভাবে বিঁধিয়া যাইতেছে যে আর বাহির হইতেছে না ; এই প্রকারের পদসমূহের অর্থভঙ্গি তাঁহার উক্তিতে রহিয়াছে। (ঘ) বা এই প্রকারের অর্থভঙ্গীই যাঁহার উক্তি।

(ঙ) রসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য রসসূচক অক্ষর পদার্থের ভঙ্গির সহিত যাঁহার উক্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমান। (চ) সনর্ম্মরসসূচকাক্ষর পদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরীমান্ সমুদ্রঃ অর্থাৎ নর্ম্মরসসমুদ্রঃ তদ্রূপোক্তির্যস্য সঃ—নর্ম্মযুক্ত রসসূচক অক্ষর পদার্থসমূহের তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র বা নর্ম্মরস সমুদ্রের ন্যায় যাঁহার উক্তি, সেই মদনমোহন।

আর মদনমোহন কেমন ? রমাদিকবরাঙ্গনা হৃদয়হারী বংশীকলঃ—রমা বা লক্ষ্মী প্রভৃতি বরাঙ্গনা, উত্তমা নারী তাঁহাদের হৃদয় হরণ করা বাঁশির ধ্বনি যাঁহার। তিনি যখন বাঁশি বাজাইয়া লক্ষ্মী প্রভৃতির হৃদয় হরণ করেন তখন আমাদের আর কথা কি ? আমরা মানুষ (তাঁহারা দেবী), আমরা যুবতী অর্ব্বাচীনা (তাঁহারা অতি প্রাচীনা), আমরা সজাতীয়া (তাঁহারা বিজাতীয়া), আমরা সম্ভোগ্যা তাঁহার বাঞ্ছনীয়া ও প্রিয়া। অতএব, তিনি যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

অনুবাদ

মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণী মণি,
মুরলী মধুর ধ্বনি তায়।
সনর্ম্ম বচন ভাতি, রমাদির মোহে মতি,
কর্ণস্পৃহা তাহাতে বাঢ়ায়॥ (যদুনন্দন)

আস্বাদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর রাত্রি দিন বিরাম নাই। সকল সময়েই উন্মাদের ন্যায় কার্য্য, সর্ব্বদাই প্রেমাবেশে বিলাপ করেন। একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথায় রাত্রির প্রথমার্দ্ধ যাপন করিলেন। মহাপ্রভুর যখন যেরূপ ভাব হয়, স্বরূপ সেই ভাবানুযায়ী গান করেন, আর রামানন্দ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের রচনা হইতে সেই ভাবানুযায়ী পদ ও শ্লোক পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভু নিজেই

শ্লোক আবৃত্তি করেন, আর বিলাপ করিয়া সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রকারে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। স্বরূপ ও রামানন্দ, মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু গম্ভীরার ভিতরে শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা নাই। গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়া আছেন। মহাপ্রভুর নিদ্রা নাই, গম্ভীরার ভিতর শুইয়া সারারাত্রি উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। এই প্রকারে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভু হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেছেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেই বেণুগান লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু ধাবিত হইলেন। গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাইতে তিন জায়গায় তিনটি কপাট বন্ধ। মহাপ্রভু তৎসত্ত্বেও বাহির হইয়া গেলেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গদেশীয় কতকগুলি গরু থাকিত। মহাপ্রভু সেই গরুর পালের ভিতর অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। গোবিন্দ একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ জাগিয়া কোন শব্দ না পাইয়া দেখিলেন মহাপ্রভু নাই। গোবিন্দ কপাট খুলিয়া বাহিরে গেলেন ও স্বরূপ দামোদরকে সংবাদ দিলেন। স্বরূপ আলো জ্বালিয়া ভক্তগণকে লইয়া অন্বেষণে বাহির হইলেন। এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে সিংহদ্বারে গেলেন, তাহার পর দেখিলেন—গরুর পালের ভিতর মহাপ্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু, একি মূর্ত্তি! হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে, দেখিতে ঠিক্ কূর্ম্মের মত; মুখে ফেন, অঙ্গে পুলক, নয়নে অশ্রু; অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন—দেখিতে একটি কুস্মাণ্ডের মত। বাহিরে জড়ভাব, কিন্তু দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, ভিতরে আনন্দের পূর্ণ জোয়ার চলিতেছে। গরুগুলি তন্ময় হইয়া মহাপ্রভুর অঙ্গের ঘ্রাণ লইতেছে। গরুগুলি এমনি হইয়া পড়িয়াছে যে তাড়াইলেও যায় না। ভক্তেরা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চৈতন্য হইল না। তখন সকলে তাঁহাকে ঐ অবস্থাতেই উঠাইয়া আনিলেন। কাণে—উচ্চৈঃস্বরে নামের ধ্বনি চলিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হইল। চৈতন্য হইতেই হাত পা বাহির হইল ও দেহ ঠিক্ পূর্ব্বের মত হইল।

মহাপ্রভু উঠিয়া বসিলেন ও এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—স্বরূপ, তুমি আমায় কোথায় লইয়া আসিলে! আমি বেণুর শব্দ শুনিয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন গোষ্ঠে বেণু বাজাইতেছেন। [illegible]

শ্রীরাধাকে লইয়া কুঞ্জে খেলা করিতে গেলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলাম, তাঁহার অঙ্গভূষণের ধ্বনিতে আমার শ্রবণ মুগ্ধ হইতেছিল। গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছিলেন, হাস্য ও পরিহাস করিতেছিলেন। এমন সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিলে। আমি অমৃতের বাণী শুনিতে পাইতেছি না, আমি সেই ভূষণের ধ্বনি ও মুরলীর ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গদ্‌গদস্বরে স্বরূপকে বলিতেছেন, স্বরূপ কাণের তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছি, আমাকে কিছু রসায়ণবাণী শ্রবণ করাও। স্বরূপ তখন শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহেন আমা আনিলে তুমি কতি॥
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তার ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্‌গদ বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে পড় রসায়ন শুনি॥

স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক পড়িলেন। মহাপ্রভু আবিষ্ট অবস্থায় সেই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই শ্লোকটি ও তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ তাহার

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত—
সম্মোহিতার্থ চরিতান্নচলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

রাসস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে লইয়া আসিয়া তাহাদের উপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই উপেক্ষাভঙ্গীময়ী বাণী শুনিয়া গোপীগণ তাহার উত্তর দিতেছেন। গোপীরা বলিতেছেন,—হে অঙ্গ, হে প্রিয়, ত্রিলোকে এমন স্ত্রী কে আছে যে তোমার কলপদায়ত বেণুগীত শুনিয়া আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ঐ রূপ ত্রিলোকের সৌভাগ্য স্বরূপ; গরু, পাখী, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিও ঐরূপ দেখিয়া পুলকিত হয়।

শ্লোকটি শুনিবামাত্র মহাপ্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

হৈল গোপী ভাবাবেশ, রাসে কৈল পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মুখে হাস্য বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন॥
নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়॥
কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধ মন্ত্রাদি যোগিনী
দূতী হঞা হরে নারীর মন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্য পথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম ছাড়াও বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকলি ছাড়াও।
এবে মোরে করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটি॥
বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে,
অমৃত সমান নূপুর-সিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণ-মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

ব্রজগোপী নিত্য। তাঁহারা এখনও ভাবরূপে লীলা করিতেছেন। শ্রীরাসলীলা নিত্য, এখনও সে লীলা চলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকে প্রত্যেক শব্দে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া কলির সংশয়ী মানবকে ইহাই প্রত্যক্ষ করাইয়া গেলেন। স্বরূপের মুখে মহাপ্রভু যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক শুনিয়াছেন, অমনি গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া রাসলীলায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে শুনিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অর্থাৎ গোপীদের উপেক্ষা করিতেছেন। উপেক্ষাবাণী শুনিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিলেন। জবাব দিতে দিতে আমাদের আলোচ্য শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন ধ্বনি জিনি,
যার গুণে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবে জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না যায়॥
কহ সখি, কি করি উপায়!
কৃষ্ণের সে শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়।

নুপুর কিঙ্কিনি ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণ-ধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥
সে শ্রীমুখ ভাষিত, অমৃত হইতে পরামৃত
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর জীবন,
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥
যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনিমূলে হয় দাসী,
বাউরি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥
যেবা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তেঁহ সে কাকলি শুনি,
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাঢ়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
তপ করে তভু নাহি পায়॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কাণ॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানাভাব হইল মিলন॥

ভাবশাবল্যে রাধা উক্তি, লীলা শুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সে অর্থ না জানে সব লোক।

এই শ্লোকটি আস্বাদনের সময় মহাপ্রভুর চিত্তে যে সমুদয় ভাবের উদয় হইল, সেই ভাবগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

(ক) উদ্বেগ—মনের চঞ্চলতার নাম 'উদ্বেগ'। উদ্বেগের অবস্থায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাগের যে দশটি দশা, তাহার মধ্যে উদ্বেগ দ্বিতীয়। পূর্ব্বরাগের দশটি দশার নাম, লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। উদ্বেগের সংজ্ঞা—

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাস চাপলে।
স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রু বৈবর্ণ্য স্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥

মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ। এই উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

(খ) বিষাদ—অনুতাপ বা পশ্চাত্তাপের নাম 'বিষাদ'। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি, অপরাধ এই সকল কারণে বিষাদ হইয়া থাকে। ইহা ব্যভিচারীর মধ্যে গণ্য।

(গ) মতি—বিচার করিয়া অর্থনির্দ্ধারণের নাম 'মতি'। মাথুর বিরহে বিশীর্ণাঙ্গী শ্রীরাধাকে পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যতদিন না আসেন ততদিন নারায়ণের পূজা কর, ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে। এই কথার উত্তরে শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন, —যাহা হয় হউক, শ্রীকৃষ্ণ-ছাড়া আমার আর কেহ নাই। 'মতি'ও ব্যভিচারীর অন্তর্গত।

(ঘ) ঔৎসুক্য—"স্পৃহয়া কালযাপনাক্ষমত্বং ঔৎসুক্যং" সুতীব্র আকাঙ্খায় সময় আর কাটে না, এই অবস্থার নাম 'ঔৎসুক্য'। ইষ্টদর্শন ও ইষ্টলাভ এই দুই প্রকারের স্পৃহা হইতে ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। ইহাও ব্যভিচারীর অন্তর্গত।

(ঙ) ত্রাস—বিদ্যুৎ, ভয়ানক জন্তু বা উগ্র শব্দ নিবন্ধন হৃদয়ের যে ক্ষোভ বা

মনের যে কম্প, তাহার নাম 'ত্রাস'। ত্রাস আকস্মিক কারণে উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া যাহা হয়, তাহার নাম শঙ্কা ; আর এই শঙ্কা খুব গভীর হইলে তাহার নাম ভয়। ত্রাসও ব্যভিচারীর অন্তর্গত।

(চ) ধৃতি—মনের অচঞ্চলতা বা স্থৈর্য্য সম্পাদনের নাম 'ধৃতি'। দুঃখের অভাব ও উত্তমের প্রাপ্তি, এই দুই কারণে ধৃতি হইয়া থাকে। ইহাও ব্যভিচারীর অন্তর্গত।

(ছ) শাবল্য—ভাবসকলের যে উত্তরোত্তর সম্মর্দ্দ, তাহার নাম 'শাবল্য'। একটি ভাবের সহিত আর একটি ভাব, তাহার পর আর একটি, এই প্রকারের যে মিশ্রণ, তাহার নাম শাবল্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ব্বের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে করিতে এক নূতন শাবল্য-অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন লীলাশুকের বা শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের একটি শ্লোক মনে পড়িয়া গেল। এখন মহাপ্রভু, সেই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়তঃ কথা মন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥

আমি এখন এখানে কি করিব ? কাহাকেই বা কি বলিব ? তাঁহার আশায় আশায় যাহা করিবার তাহাত করিয়াছি। আর প্রয়োজন নাই। এখন অন্য কিছু ভাল কথা বল। ওঃ আমার হৃদয়নাথ, মধুর হইতে মধুর হাস্যযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ আমার মনের ও নয়নের উৎসব। আমার কৃপণা (দীনা) দৃষ্টি চিরদিনের জন্য তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত হউক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা ঃ—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুঁছো কে কহে উপায়।
হা হা সখি কি করি উপায়।

কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি-ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলা বচন স্মৃতি, করাইল ভাব মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ।
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হবে মন।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥
কহিতেই হইল স্মৃতি, চিত্তে হইল কৃষ্ণ স্ফূর্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যাহে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥
রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কাম জ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগৎ মারে, সেই পশিল অন্তরে,
এই বৈরি না দেয় পাসরিতে ॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্যে, জিতি অন্যভাব সৈন্যে,
উদয় কৈল নিজ রাজা মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদন, মন নেত্র রসায়ন,
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায় ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণ ধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সগুণ-সাগর।

হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাস বিলাস নাগর ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি চলিল ধাইঞা ।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ স্থানে বসাইল লঞা ॥
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ, কিছু কর মধুর গান ।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥

৬। চতুর্থ শ্লোক—নাসিকার আকর্ষণ

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরু সুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ।

সখি, সেই মদনমোহন, আমার নাসিকার স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। সেই মদনমোহন কেমন ? কুরঙ্গমদ অর্থাৎ মৃগমদ গন্ধকে পরাজয় করে, তাঁহার বপুর অর্থাৎ দেহের পরিমল অর্থাৎ সৌরভ। সেই মৃগমদজয়ী দেহসৌরভের দ্বারা তিনি অঙ্গনা অর্থাৎ উত্তম নারীগণকে আকর্ষণ করেন। তাঁহার অঙ্গে আটটি পদ্ম ; (দুই চরণ, দুই হস্ত, দুই চক্ষু, নাভি ও মুখ)। এই অষ্টপদ্মে শশি অর্থাৎ কর্পূরযুক্ত অব্জের অর্থাৎ পদ্মের গন্ধ 'প্রথয়তি' বিস্তৃত করেন। আর কেমন ? মৃগমদ, কর্পূর, উৎকৃষ্ট চন্দন, ও কৃষ্ণ অগুরু নির্ম্মিত বিলেপন তাঁহার অঙ্গে।

অনুবাদ

কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ, মৃগমদ করে অন্ধ,
কুঙ্কুম চন্দন দিল তায় ।
অগুরু কর্পূর তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে,
মোর নাসা সেই আকর্ষয় ॥

আস্বাদন

বৈশাখ মাস, পূর্ণিমা তিথি রাত্রিকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীজয়দেবে 'ললিতলবঙ্গলতা'—এই পদটি গান করাইয়া প্রতি বৃক্ষলতার নিকটে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু অকস্মাৎ অশোকের তলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভু যেমন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাপ্রভুও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ। মহাপ্রভুর নাসায় সেই গন্ধ প্রবেশ করিতেছে। এই অবস্থায় মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা বা আস্বাদন করিতেছেন।

কস্তূরিলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারার নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণ পাশ ধরি লৈঞা যায়॥
নেত্র নাভি বদন, কর যুগ, চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূর-লিপ্ত কমল তার যেই পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে॥
হেম-কীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।
কর্পূর সঙ্গে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গ গন্ধ সঙ্গে,
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি॥
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী ছুটায় কেশ বন্ধ।
করি আগে বাউরি, নাচায় জগত নারী
কেন ঢোকাতে কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ॥

সে গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায়, কভু নাহি পায়।
পাঞা পিঞে পেট ভরে, তভু পিঞ পিঞ করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়।
মদন মোহনের নাট পশারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনিমূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ.
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥
এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায়॥
যায় লতা বৃক্ষ পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায় প্রভু নাচে সুখ পায়,
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্য স্ফূর্ত্তি কৈল॥

৭। পঞ্চম শ্লোক—জিহ্বার আকর্ষণ

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেণালবঃ
সুধাজিদহিবল্লিকা সুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদন মোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥

সখি, সেই মদনমোহন, নিজের অধরের অমৃত রসের দ্বারা আমার জিহ্বার স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। কেমন সেই মদনমোহন? ব্রজের অতুলনীয়া কুলাঙ্গনাগণের ইতর রসের যে তৃষ্ণা, অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন কিছুর জন্য যে কামনা সেই কামনা, হরণ করিতেছে, এই প্রকার তাঁহার সুমিষ্ট অধরামৃত। আর কেমন? তাঁহার ফেণালব, অর্থাৎ তাঁহার কণামাত্র অধরামৃত সুকৃতি ব্যতীত পাওয়া যায় না। আর কেমন? তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুলবীটিকা অমৃতকে পরাজয় করে।

অনুবাদ

কৃষ্ণাধরামৃতময়, যার হয় ভাগ্যোদয়,
তার সঙ্গ সেই জন পায়।
কৃষ্ণ-চর্বা পাণ-শেষ, জিনিয়া অমৃত দেশ,
জিহ্বা মোর সেই আকর্ষয় ॥

৮। ষষ্ঠ শ্লোক—বক্ষের আকর্ষণ

হরিণ্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ।
সুধাংশু হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥

সখি, সেই মদনমোহন, আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। কেমন তিনি? হরিৎ মণি কবাটিকার প্রততকে হরণ করে, অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি-বিনির্ম্মিত কবাটিকার বিস্তারকে পরাজয় করে, এমন তাঁহার বক্ষঃস্থল। আর কেমন? স্মরার্ত্ত, কন্দর্প-পীড়িত তরুণীদিগের মনঃকলুষ নাশ করিবার অর্গল-স্বরূপ। আর কেমন? চন্দ্র, চন্দন, উৎপল ও কর্পূরের ন্যায় তাঁহার দেহ সুশীতল।

অনুবাদ

বক্ষঃস্থল পরিসর, ইন্দ্র নীলমণিবর,
কপাট জিনিয়া তার শোভা।
সুবাহু অর্গল ছন্দ, কোটীন্দু শীতল অঙ্গ,
আকর্ষয়ে সেই বক্ষ লোভা ॥

আমার বার্ষিকী

অর্থাৎ

১৩৩২ সালের আশ্বিন মাস হইতে, ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কার্য্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

গত বৎসর আমার বার্ষিকী প্রথম বাহির হয়। গতবার যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহারি একটু তুলিয়া এবারের ভূমিকা করা যাউক। "আমার বার্ষিক কাজের একটা বিবরণী ছাপাইলে ভাল হয়; দুএকটি বন্ধু এই কথা বলেন। আমিও বলি মন্দ হয় না। পূজার সময় আমি সিউড়িতে থাকি—বাড়ীতে পূজা; কাজেই, পূজার পর হইতে, পরবৎসরের পূজা পর্য্যন্ত - ইহাই আমার বৎসর। এই বার্ষিক বিবরণী পূজার সময়েই লেখা দরকার।"

গতবার ১৬ই সেপ্টেম্বর সিউড়ি আসি। কিন্তু দেবীপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত ধরিয়া ৩৫০ দিনের বিবরণী ছাপাইয়াছিলাম। তাহা সুবিধাজনক নহে। যেদিন সিউড়ি পৌছিলাম, সেইদিন পর্য্যন্তই হিসাব করা ঠিক্। এবার এইভাবে হিসাব করায় ৩৮৭ দিন হইল। ১৯২৫ এর ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে, ১৯২৬ এর ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৩৩২ সালের ৩১শে ভাদ্র হইতে ১৩৩৩ সালের ২১শে আশ্বিন পর্য্যন্ত—এই ৩৮৭ দিন। ইহার মধ্যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১০৬ দিন, আর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৮১ দিন।

১৯২৫

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫, (বাঙ্গালা ৩১শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩২), রাত্রিতে সিউড়ি পৌছাই। তখন হইতে পূজার পরের দ্বাদশী পর্য্যন্ত ১৪ দিন সিউড়িতে ছিলাম। ত্রয়োদশীর দিন, ১৪ই আশ্বিন বুধবার সকালে সিউড়ি হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতা পৌছিলাম। রাত্রি ৯টায় কলিকাতা হইতে খুলনা হইয়া পরদিন বেলা ১০টায় কালিয়া। কালিয়া যশোর জেলায়, একখানি বৈদ্যপ্রধান নামজাদা গ্রাম; বহু শিক্ষিত ও পদস্থ লোকের বাস। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত ভামিনীরঞ্জন সেন মহাশয় বর্দ্ধমানের প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল; ধর্ম্মনিষ্ঠ ও আনুষ্ঠানিক হিন্দু। গ্রামের বাড়ীতে বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দির করিয়াছেন, পিতলের রথ করিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার বাড়ী যাই। তাঁহার বাড়ীতেই বক্তৃতা হইত। ১১দিন বক্তৃতা হয়। কালিয়া গ্রামে দেখিলাম, ইংরাজী শিক্ষার কৃতবিদ্য এমন অনেক লোকই আছেন, যাঁহাদের গ্রামের উপর টান

কালিয়া—যশোহর

আছে; সুতরাং বাঙ্গালার গ্রামগুলিকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব নহে। কালিয়া গ্রামে থাকার সময় শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় ঐ গ্রামে আসিয়াছিলেন।

১২ই অক্টোবর তারিখে কালিয়া হইতে খুলনা আসিয়া ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করার ব্যবস্থা ছিল। ষ্টীমার খুব দেরি করিল। মধ্যপথে নকারী অর্থাৎ মৎস্যব্যবসায়ীদের সহিত ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদের ঝগড়া ও মারামারি হইয়াছিল বলিয়া দেরি হয়। রাত্রি আটটায় খুলনা পৌঁছি-

খুলনা

লাম, সুতরাং সেদিন আর বক্তৃতা হইল না। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল— অনেকেই সভাস্থলে আসিয়া সম্ভবতঃ বক্তাকে গালাগালি করিতে করিতে ফিরিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী দুইদিন ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা হইল। শেষদিন ২৮শে আশ্বিন রাত্রিতে খুলনা ছাড়িয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতা আসিলাম। সেদিন কলিকাতায় খুব বৃষ্টি। তাহার পরদিন ৩০শে আশ্বিন সিউড়ি পৌঁছিলাম। ১৫ দিন সিউড়িতে থাকিলাম। ইহার মধ্যে, বাড়ীর শ্যামাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া গেল। ১৪ই কার্ত্তিক সকালে রওনা হইয়া কলিকাতা হইয়া পরদিন প্রাতে আবার খুলনা আসিলাম।

ভারত-সেবাশ্রমের নাম অনেকেই জানেন। মাদারিপুরের শ্রীমৎ বিনোদ ব্রহ্মচারী, এখন শ্রীমৎ প্রণবানন্দ হইয়াছেন। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। খুলনা সহরের পরপারে ভৈরব নদের তীরে ইঁহারা একটি শাখা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের বার্ষিক উৎসবে নিমন্ত্রিত

পুনঃ খুলনা

হইয়া আসিলাম। প্রথমদিন সেবাশ্রমে, আর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর খুলনা ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা হইল। দ্বিতীয় দিন, দিবসে দৌলতপুর কলেজে ছিলাম, সেখানেও বক্তৃতা হইয়াছিল। সেখান হইতে আসিবার সময় পথে রিক্স গাড়ী ভাঙ্গিয়া গেল। সুহৃদ্বর উপেন

দৌলতপুর

কর সহ পদব্রজে বিলম্বে ধর্ম্মসভায় পৌঁছিলাম। অনেক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বসিয়া ছিলেন, আসিয়াই বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

নড়াইল হইতে এক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত, নড়াইল যাইতেই হইবে, একেবারে নাছোড়বান্দা। পূর্ব্বে কখন নড়াইল যাই নাই। ষ্টীমারে নড়াইল যাত্রা করিলাম। ১৭।১৮।১৯।২০ কার্ত্তিক নড়াইলে থাকিলাম। চারিদিন বক্তৃতা করিয়া শেষ দিন রাত্রি ৯টায় নৌকা করিয়া

নড়াইল

উষাকালে সিঙ্গিয়া ষ্টেশন, সেখান হইতে কলিকাতা। কলিকাতায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা—প্রথম অধিবেশন। বীরভূমের কয়েকটি বন্ধু আমাকে উহার সভ্য করিয়াছেন, প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইতেই হইবে, তাঁহাদের অনুরোধ। সেইজন্য তাড়াতাড়ি কলিকাতা আসিলাম। আর্থিক ক্ষতি হইল অনেক। দুইদিন সভায় উপস্থিত হইলাম, অনুরোধমত ভোট দিলাম। কংগ্রেস কমিটিতে আসিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাও আলোচ্য, কিন্তু

কলিকাতা

এখন নহে—পরে; এবং দরকার হইলে। কংগ্রেস কমিটির কাজ সারিয়া

আবার খুলনা হইয়া মাদারিপুর গেলাম। গন্তব্য স্থান, মাদারিপুর মিউনিসিপ্যালিটির একটি ওয়ার্ড বা পল্লী—নাম পিয়ারপুর। সেইখানে বৎসর বৎসর একটি সভা হয়, আর বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া সেখানে যাই। এইবার লইয়া ৪ বার যাওয়া হইল। এবার সেখানে যাওয়ায় স্বরাজদলের একটি খুব বড় রকম উপকার হইল, তাঁহারা কেহ তাহা জানেন কিনা, জানি না। ২৩শে কার্ত্তিক রাত্রিতে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পরদিন ষ্টীমার দেরী হওয়ায় অনেক রাত্রিতে চরমাগুরিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রিটুকু জেটিতে কাটাইয়া ২৫শে সকালে পিয়ারপুর পৌঁছিলাম। ২৫।২৬।২৭ পিয়ারপুর, ২৮শে মাদারিপুর, ২৮শে মাদারিপুর লাইব্রেরীতে বক্তৃতা। রাত্রিতে রওনা হইয়া ৩০শে সকালে কলিকাতা, আর সন্ধ্যায় সিউড়ি। বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজা। মাদারিপুরের বক্তৃতা-সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিল, পরে হইবে। ১৩ দিন সিউড়িতে থাকিলাম।

পিয়ারপুর
মাদারিপুর

বিশ্বভারতী নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে গিয়া ২ দিন, সুরুল ১ দিন, রাইপুর ১ দিন, চন্দনপুর ১ দিন, বোলপুর ৩ দিন বক্তৃতা হইল। ইহার মধ্যে নিজেদের ২ দিন ও ১দিন বিশ্বভারতীর ব্যবস্থা। চন্দনপুর, রাইপুরের সিংহ বাবুদের গুরুগৃহ। এই গুরুমহাশয়েরা শ্রীপাঠ বোরাকুলির সিদ্ধভক্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশধর—সিংহ-বাবুরা গুরুকে জমিদারী প্রভৃতি দিয়া চন্দনপুরে বাস করাইয়াছেন। ৭ই ডিসেম্বর সিউড়ি আসিয়া ১১ দিন থাকিলাম।

বিশ্বভারতী, বোলপুর
সুরুল, রাইপুর
চন্দনপুর

তাহার পর কোদর্মা। এই স্থানটি হাজারিবাগ জেলায়; এখানে অভ্রের খনি আছে। সুহৃদ্বর রায় সাহেব নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার; কেবল দেহের চিকিৎসা করেন না, লোকের মনের ও হৃদয়ের চিকিৎসায় তাঁহার খুব উৎসাহ। হরিনাম সংকীর্ত্তন, থিয়সফি-প্রচার প্রভৃতিতে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাঁহার আহ্বানে কোদর্মা যাই। কোদর্মা, লোকাই, ডোমচাঁয, তেলাইয়া সব নিকটবর্ত্তী স্থান, অন্ততঃপক্ষে মোটার-গাড়ীতে খুবই নিকটবর্ত্তী। ডাক্তার বাবুকে লইয়া ৯ দিন খুবই আনন্দে প্রচার কার্য্য চলিল। ২৭শে ডিসেম্বর সিউড়ি আসিলাম। পরদিন বেলা তিনটায় রওনা হইয়া নৈহাটি আসিয়া ঢাকা মেল ধরিলাম, আর ২৯শে ডিসেম্বর বিক্রমপুর পরগণার বাহেরক গ্রামে পৌঁছিলাম। এইবার লইয়া ৪ বার বাহেরক আসা হইল। ২৯।৩০।৩১ ডিসেম্বর বাহেরকে হরিসভায় বক্তৃতা হইল—ইংরাজী বৎসর ফুরাইল।

কোদর্মা

বাহেরক

১৯২৬

বিক্রমপুর পরগণার বাঘিয়া গ্রামে গতবৎসর আসিয়াছিলাম, এবারও আসিলাম। বাঘিয়ায় তিনদিন বক্তৃতা হইল। ৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারী আবার বাহেরক আসিয়া বক্তৃতা হইল। ৬ই জানুয়ারী বাহেরক হইতে আড়িয়ল পৌঁছিলাম

বাঘিয়া

সঙ্গে চলিলেন চারিজন প্রাচীন ভদ্রলোক। প্রত্যেকেরই বয়স ৭০ এর উপর বা কাছাকাছি। প্রত্যেকেরি সাদা দাড়ি। কিছুদূর নৌকায় গিয়া অনেকখানি পথ মাঠে মাঠে হাটিতে হইল। সঙ্গী চারিজনের ক্লান্তি হয় নাই, আমার হইল। আমারও দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালী জাতিরও দুর্ভাগ্য। 'আরিয়ল' এ দুইদিন বক্তৃতা হইল। প্রাচীন বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীহরিমোহন গোস্বামী মহাশয়ের এই গ্রামে বাড়ী। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম ও অনেক কথা শুনিলাম। সে কথা পরে। ৮ই জানুয়ারী আরিয়ল হইতে পদব্রজে কল্‌মা। সেখানে অতিকষ্টে নৌকা ভাড়া করিয়া তারপাশা—ষ্টীমারে গোয়ালন্দ—৯ই জানুয়ারী সকালে কলিকাতা পৌঁছিলাম। ৯ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিলাম। ১২ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই বঙ্গীয় তত্ত্বসভায় বক্তৃতা। ১৬ই রাত্রিতে সিউড়ি আসিয়া, ১৭ই সিউড়িতে থাকিয়া, ১৮ই জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমী সকালে রওনা হইয়া কোন্নগর গিয়া বক্তৃতা করিলাম। ১৯শে জানুয়ারী রাত্রিতে ঢাকা মেলে রওনা হইয়া বিক্রমপুর পরগণার দিঘীরপার জাতীয় বিদ্যালয়ে যাই। সেখানে 'জাতীয় প্রদর্শনী'। জে, এম, সেন গুপ্ত গিয়াছিলেন, দেখা হয় নাই; নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়াছিলেন, দেখা হইল। এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার পরে বলিব। দুই দিন জাতীয় বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া ২৩শে জানুয়ারী সকালে কৃষ্ণনগর পৌঁছিলাম। নবদ্বীপ যাইতে হইবে। পরদিন মাতৃভবন-কমিটির এক সভা। পূর্ব্বে জানিতাম না, আসিয়া পড়িয়াছি, সুতরাং বন্ধুগণ ছাড়িলেন না। পরদিন সকালে অনুরুদ্ধ হইয়া সভায় গেলাম, যাহা হইল পরে বলিব। সভা সারিয়া নবদ্বীপ। নবদ্বীপে মাঘী মেলা—১০ই মাঘ হইতে ১৬ই মাঘ অবধি নবদ্বীপে থাকিয়া ৫ দিন বক্তৃতা করিয়া কলিকাতা আসিলাম। কলিকাতা হইতে ফরিদপুর প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ। ইহা জাতীয় প্রদর্শনী নহে, সরকারী প্রদর্শনী। ৪দিন সেখানে বক্তৃতা করিয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী সকালে কলিকাতা আসিলাম। ৭ই পানিহাটিতে বক্তৃতা। ৮ই কলিকাতায় বঙ্গীয় তত্ত্বসভায় 'জয়দেব' সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা হইল। ১০ই ঐ স্থানেই বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ধর্ম্মসমন্বয়'। ২৮শে মাঘ শিবরাত্রি, কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ। ২৯শে মাঘ ও ১লা ফাল্গুন নবদ্বীপে বক্তৃতা। ২রা নবদ্বীপ হইতে চন্দননগর আসিয়া, স্মৃতি-মন্দিরে বক্তৃতা করিলাম। পরদিনও চন্দননগরে থাকিলাম। ৩রা ফাল্গুন সকালে কলিকাতা আসিয়া সেই দিনই বাঁকিপুর রওনা হইলাম। ৫ই ফাল্গুন হইতে ৭ দিন বাঁকিপুর; ১২ই, ১৩ই দুই দিন ছাপরায় বক্তৃতা। ১৩ই তারিখে রাত্রিতে ছাপরা হইতে রওনা হইয়া, মোকামা-

পুনঃ বাহেরক

আরিয়ল

কলিকাতা, কোন্নগর

দিঘীরপার

নবদ্বীপ

ফরিদপুর

পানিহাটি, কলিকাতা

নবদ্বীপ, চন্দননগর

বাঁকিপুর, ছাপরা

ঘাট সরিয়া যাওয়ায়, সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ী পাওয়া গেল না। ফলে, পথে খুব কষ্ট পাইয়া ১৫ই ফাল্গুন দোলযাত্রার দিন, সকালে সিউড়ি পৌঁছিয়া, সেই দিন বিকালেই ঢাকা রওনা হইলাম।

ঢাকা, রামকৃষ্ণপুর

১৬ই ফাল্গুন ঢাকা পৌঁছিয়া বক্তৃতা করিয়া সেই রাত্রিতেই রওনা হইলাম—নারায়ণগঞ্জে ভৈরব লাইনের ষ্টীমারে উঠিলাম—ষ্টীমার, তাহার পর নৌকা। শেষে ত্রিপুরা জেলার এক গ্রাম রামকৃষ্ণপুরে আসিলাম। দুই দিন বক্তৃতা করিয়া আবার ঢাকা আসিলাম। ১৯শে ফাল্গুন দুর্যোগ, ঢাকায় বক্তৃতা হইল না। তাহার পর ৪ দিন ঢাকা হরিসভায়, আর একদিন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা হইল। ২৪শে

ঢাকা, শোনকান্দা

ফাল্গুন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঢাকা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে উঠিলাম। ময়মনসিং জেলার মফঃস্বলে শোনকান্দা নামক গ্রাম—সেখানে যাইতে হইবে। বড় উৎসব, অনেকেই যাইবেন। আমিও একজন। কয়েক বৎসর হইতেই তাঁহারা অনুরোধ করিয়াছেন। এবার আর অনুরোধ এড়াইতে পারি নাই, সম্মতি দিয়াছি। পিয়ারপুর নামক ষ্টেশনে নামিলাম। কথা ছিল সেখানে গাড়ী, পাল্কী, হাতি প্রভৃতি আসিবে। সঙ্গে অনেক লোক, কিন্তু কোন বন্দোবস্ত নাই। দিনমান সকলে সেখানে থাকিলাম। সন্ধ্যার ট্রেণে ময়মনসিং আসিলাম।

ময়মনসিং

পরদিন প্রাতে ঘোড়ার গাড়ীতে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। ৪ দিন সেখানে থাকিলাম। তিন দিন বক্তৃতা হইল। সেখানে থাকিতে থাকিতে, 'সল্লা' নামক গ্রামের এক অনুরোধপত্র আসিল, সেখানেও বড় উৎসব। স্থানটি ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল

সল্লা

মহকুমায়। সিরাজগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে যাইতে হয়। ৩০শে ফাল্গুন পাইকপাড়া বা ঘোষগাঁও (এসব দেশের লোক নিজের গ্রামের নাম জানে না—এক একজন এক এক নাম বলে। স্কুল, ডাকঘর, থানা, পাশাপাশি; এক একটির এক এক নাম। আসল কথা, ২।৪ খানি ঘর লইয়া এক একটা গ্রাম।) ছাড়িয়া গরুর গাড়ীতে আচোট্ ভাঙ্গিয়া দুইবার খেয়ায় ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া চড়ায় হাটিয়া প্যারপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই ট্রেণ পাইলাম। রাত্রিতে সিরাজগঞ্জ পৌঁছিয়া জেটিতে থাকিলাম। পরদিন প্রাতে ষ্টীমারে শেষে প্রায় ৩ মাইল হাঁটিয়া 'সল্লা' গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে প্রকাণ্ড উৎসব—অনেক লোক। যে ভাবে উৎসব হইল, তাহা অতিশয় আশ্চর্য। সল্লার ৭ দিন,

দৌলতপুর

ময়মন সিং

সেখান হইতে দৌলতপুরে একদিন। ৯ই চৈত্র এক ভদ্রলোক নানারূপ কৌশল করিয়া আটক করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারিলেন না। মগ্‌রা হইয়া, শেষে ডুলি ভাড়া করিয়া অতিকষ্টে ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছিলাম—সিরাজগঞ্জে ট্রেণে উঠিলাম—ঈশ্বরদি আসিলাম। লরিতে পাবনা আসিয়া শেষ রাত্রিতে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিল—একটা রেলপার্শেলের গোল হওয়ায়—তাহাকে সিরাজগঞ্জে

থাকিতে হইল। পাবনায় ভক্ত ডাক্তার বিহারী বাবুর ঠাকুরবাড়ীতে দুই দিন বক্তৃতা করিয়া একদন্তা গ্রামে গেলাম। কয়েক বৎসর এই গ্রামের লোকে খুব অনুরোধ করিতেছিল। ৩ দিন একদন্তা-গ্রামে বক্তৃতা করিয়া উকীল, সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহারা এক জমিদারি কাছারিতে গেলাম। তিনি তখন সেখানে ছিলেন। গ্রামের নাম ধনুয়াঘাটা বা মহিমাগঞ্জ। সেখানে একদিন। পরদিন এক গ্রাম, তাহার নাম গোয়ালগ্রাম বা হাঁদোল। ১৭ই চৈত্র গোয়াখাড়া ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিলাম। নবদ্বীপে একটু দরকারী কাজ ছিল, তাহা সারিয়া ১লা এপ্রিল বিকালে সিউড়ি পৌঁছিলাম। সিউড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হইল। সাহিত্য সম্মিলনের শেষ দিন বিদায়ের বক্তৃতা হইতেছে, এমন সময় কলিকাতার হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার খবর আসিল। যেমন তেমন সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গেল। শ্রীমতী সরলা দেবী আসিয়াছিলেন—সিউড়িতে এক বীরাষ্টমী সমিতি হইল। বন্ধুগণের অনুরোধে ১৪ দিন সিউড়ি রাধাবল্লভ ঠাকুরের মন্দিরে পাঠ করিলাম। এ যাত্রায় সিউড়িতে থাকিলাম ২৩ দিন। সিউড়ির একক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে পাটজোড় গ্রাম, সাঁওতাল পরগণার ভিতর। বিশেষভাবে আহূত হইয়া তথায় আসিলাম, ১৪ দিন পাটজোড়ে, আর তিন দিন নিকটবর্ত্তী এক নূতন গ্রাম চুয়ামূলে থাকিলাম। শেষ গ্রামটি বীরভূম জেলার ভিতর। খুব ভাল লাগিল। ২৯শে বৈশাখ সিউড়ি পৌঁছিয়া ৩০শে বৈশাখ রাঁচি রওনা হইলাম। এই সময়ে পুরীর মন্দির হইতে গত বৎসরের মত নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল—আমিও প্রস্তুত ছিলাম—কিন্তু শেষে যাওয়া হইল না। রাঁচিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছিলাম। তাঁহারাই নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ৩১শে বৈশাখ হইতে ১০ দিন রাঁচিতে বক্তৃতা করিয়া ১০ই জ্যৈষ্ঠ সিউড়ি আসিলাম। ১৭ দিন সিউড়িতে থাকিলাম। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৬ দিন চন্দননগরে বক্তৃতা করিয়া গুরুদাসপুর। এই গ্রাম রাজসাহী জেলার ভিতর। চাটমোহর ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ী বা মহিষের গাড়ীতে যাইতে হয়। ২রা আষাঢ় হইতে ৪ দিন গুরুদাসপুরে ছিলাম। যাতায়াতের বড় কষ্ট। দুই দিন বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া সুরেন্দ্র আচার্য্যের কীর্ত্তন শুনিলাম। বেশ লাগিল। পাঁচুপুরের জমিদার বাড়ী হইতে গুরুদাসপুরে এক লোক আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ, পূর্ব্বে একবার সেখানে গিয়াছিলাম। এবার তাঁহাদের বাড়ীতে এক উৎসব। গুরুদাসপুরও এই দ্বিতীয়বার। গুরুদাসপুর হইতে চাটমোহর হইয়া পাঁচুপুর পৌঁছিলাম। ৫ দিন

পাবনা—একদন্তা।

মহিমাগঞ্জ, হাঁদোল

সিউড়ি

পাটজোড়, চুয়ামূল

রাঁচি

চন্দননগর, গুরুদাসপুর

পাঁচুপুর

পাঁচুপুরে থাকিলাম ও বক্তৃতা করিলাম। ১২ই আষাঢ়, পাঁচুপুর হইতে কলিকাতা আসিলাম। ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই সিউড়ি। ১৮ই হইতে ৮ দিন লালবাগ, ৪ দিন বহরমপুর। ৩০শে আষাঢ় সিউড়ি আসিয়া ৩ দিন থাকিলাম। ২রা শ্রাবণ হইতে ৫ দিন জিয়াগঞ্জ। ৭ই শ্রাবণ সিউড়ি পৌঁছিয়া রাত্রিতে কলিকাতা রওনা হইলাম।

লালবাগ, বহরমপুর
জিয়াগঞ্জ

৮ই ও ৯ই শ্রাবণ বারুইপুর হরিসভায় বক্তৃতা হইল। কলিকাতায় আসা হইল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আহ্বানে। ১০ই শ্রাবণ হইতে ২রা ভাদ্র পর্য্যন্ত কলিকাতা। ইহার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে ৮টি বক্তৃতা হইল। গৌরাঙ্গ মিলন-মন্দিরে ২টি, ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারিতে ২টি, বেহালা হরিসভায় ২টি, আর বঙ্গীয় তত্ত্বসভায় ৪টি বক্তৃতা হয়। বিশ্রাম দরকার। কিন্তু মিলিল না। ৩রা ভাদ্র সিউড়ি আসিলাম। রামকৃষ্ণ সংঘের বিশেষ অনুরোধে ৫ই ভাদ্র বর্দ্ধমান আসিলাম। ৫ই ও ৬ই বর্দ্ধমান টাউনহলে বক্তৃতা হইল। ৭ই ভাদ্র বক্তৃতা হইল কাটোয়ায়। ৮ই কলিকাতা আসিলাম। খুলনা যাওয়ার কথা ছিল। তাঁহাদের প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইল। ৮।৯।১০ ভাদ্র কলিকাতায় থাকিতে হইল। প্রথম দুই দিন এলবার্ট হলে বরিশালের শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিলাম। ১১ই সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাসের বক্তৃতা শুনিয়া বাগেরহাট রওনা হইলাম। ১২।১৩।১৪ই ভাদ্র বাগেরহাট। ১৫ই ভাদ্র হইতে খুলনা। এই বৎসর তিনবার খুলনা আসিলাম। ভগবানের কৃপায় ধ্বংশপ্রায় ধর্ম্মসভাটি বোধ হয় আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। ২০শে কলিকাতা, ২১শে সিউড়ি। ১০ দিন সিউড়িতে থাকিলাম। ৩১শে কলিকাতায় থাকিয়া ১লা আশ্বিন খড়্গপুর পৌঁছিলাম। খড়্গপুরে নূতন। সেখানে তিনদিন, আর পুরাতন বন্ধুর স্থান মেদিনীপুরে ১৮ দিন থাকিয়া, ২২শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর সিউড়ি পৌঁছিলাম। এক বৎসর শেষ হইল। আমার কাজের কথাও সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু, সব কথাই বাকি থাকিল। কোথায় কি দেখিলাম, কি বলিলাম, কি করিলাম, সে বড় মজার কথা। সেসব কথা ক্রমে ক্রমে বলিব। দেরী হইলে, বন্ধুগণ তাগিদ করিবেন। ইতি, সিউড়ি—

বারুইপুর
কলিকাতা

বর্দ্ধমান-
কাটোয়া

বাগেরহাট-
খুলনা

খড়্গপুর
মেদিনীপুর

বিবিধ প্রসঙ্গ ও সংবাদ

দুইটি ঐতিহাসিক সংবাদ—১। কবি জয়দেবের অমর কাব্য গীতগোবিন্দের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পূজারি গোস্বামীর পরিচয় অনেকেরই জানা নাই। আমরা একটি সংবাদ পাইয়াছি। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার, মানিকগঞ্জ সহরের অতি নিকটে 'বেতিলা' নামে একখানি বৃহৎ গ্রাম আছে। এই গ্রামে প্রায় ৬০ ঘর বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন, ইঁহাদের উপাধি—গোস্বামী। ইঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশধর। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র। দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কৃষ্ণবল্লভ। ইনি যৌবনকালে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান। সেখানে গোবিন্দজির পূজারি হইয়া কিছুকাল ছিলেন। ইনিই পূজারি গোস্বামী।

বেতিলার গোস্বামীগণ পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। তাঁহাদের অনেক শিষ্য আছে। গোস্বামীগণ উত্তরবাড়ী ও দক্ষিণবাড়ী, এই দুই বাড়ীতে বিভক্ত। দক্ষিণবাড়ী হইতে শ্রীব্রজেশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় "কুলপ্রভা' নামে একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন। সেই গ্রন্থে এই সংবাদটি পাইলাম। 'কুল-প্রভা' গ্রন্থে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক কথা আছে। গ্রন্থখানি ভাল করিয়া ছাপাইয়া বিস্তৃততর-রূপে প্রচার করা আবশ্যক।

২। রাজা সীতারাম রায়ের সেনাপতি মেনাহাতি কে? কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়া-ছেন, তাঁহার নাম ছিল রামরূপ ঘোষ। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। আমরা সংবাদ পাইলাম, মেনাহাতির নাম—রাজা রামদাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস মহাশয় মানিকগঞ্জে ওকালতি করেন; রাজা রামদাস বা মেনাহাতি, এই রমেশবাবুর উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। রাজা রামদাস রাধানাথ দাসের পোষ্যপুত্র ছিলেন। রাধানাথ দাসের শিশুপুত্র অন্নপ্রাশনের দিন, দৈবযোগে মা কালীর খড়্গাপাতে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়—সেই হইতে এই বংশে কাহারও অন্ন-প্রাশন হয় না। পুত্রের মৃত্যুর পর রামদাস পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। ইনিই উত্তরকালে রাজা উপাধি পান ও মেনাহাতি নামে যশোলাভ করেন। আবুতারার মাথা কাটিয়া মেনাহাতি রাজা সীতারাম রায়ের নিকট 'তেলিহাটি' পরগণা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। মেনাহাতির পৌত্র রামনারায়ণ দাস মহামারীতে গতায়ু হইলে, কোম্পানির খাজনার দায়ে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। ফরিদপুর জেলার 'কাপাশিটা' গ্রামে ইঁহাদের বাস ছিল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের পিতামহ উদয়চাঁদ

দাস সেখান হইতে মাণিকগঞ্জের নিকটবর্ত্তী 'বায়েড়া' গ্রামে মাতামহবাড়ীতে উঠিয়া আসেন। পারিবারিক কিম্বদন্তী হইতে এই সংবাদ সংগৃহীত হইল। ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। 'কাপাশিটা' পরগণার প্রাচীন দলিল ও রমেশবাবুদের কুলপঞ্জী পরীক্ষা করিলেই ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একটি দাতব্য-প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা সহরে নাথেরবাগান ষ্ট্রীটের উপর ১৩।১ নম্বর ভবনে একটি বৃহৎ ও স্থায়ী দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে। উহার নাম "শশিভূষণ নিয়োগী দাতব্য ভাণ্ডার"। ইংরাজী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে৺ সরস্বতী পূজার দিন প্রাতঃকালে একটি প্রকাশ্য সভার সভাপতিরূপে সার্ নীলরতন সরকার মহাশয় এই প্রতিষ্ঠান যথারীতি উদ্ঘাটিত করেন। সভায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা-মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে আমরাও নবদ্বীপ হইতে যাইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দানবীর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয় নগদে ও সম্পত্তিতে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। যথারীতি লেখাপড়া করিয়া এই টাকা ও সম্পত্তি সরকারী-ট্রাষ্টির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই টাকার সুদ ও সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক প্রায় হাজার টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। একটি আউট্‌ডোর য়্যালোপাথিক ডিস্‌পেন্‌সারি, তাহাতে একজন য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, দুইজন কম্পাউণ্ডার, একজন কেরাণী ও আবশ্যকীয় ভৃত্যাদি আছে। অস্ত্রচিকিৎসার খুব আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে, ইন্‌জেক্‌সেনের দ্বারাও চিকিৎসা করা হয়। যে সব মূল্যবান্ ঔষধ সাধারণতঃ দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে দেওয়া হয় না, এই ঔষধালয় হইতে তাহাও আবশ্যকমত দেওয়া হইয়া থাকে। এই চিকিৎসালয়ের ব্যয় মাসিক চারিশত টাকা। কতকগুলি দরিদ্র অসহায় বিধবা, দুঃস্থ ভদ্রলোক ও নিরুপায় ছাত্রকে মাসে মাসে সাহায্য করা হয়; বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, আকস্মিক বিপৎপাত প্রভৃতিতেও সাহায্য করার ব্যবস্থা আছে।

নিয়োগী মহাশয়ের অন্যান্য দান—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয় বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশে একজন খুব বড় দাতা। ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন সহরে প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদের একটি দুর্গাবাড়ী আছে। সেই দুর্গাবাড়ী থাকায় প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই দুর্গাবাড়ীতে নিয়োগী মহাশয় দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। যে জমির উপর এই দুর্গাবাড়ী প্রতিষ্ঠিত, সেই জমি সরকারের নিকট লিজ-লওয়া জমি। এই জমিটি খরিদি নিজস্ব জমি হইলে ভাল হয়। নিয়োগী মহাশয় উক্ত [illegible]

ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণে তাহা করিতে পারিলেন না। রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণ চিন্তা করিবেন, কি কারণে তাহা হইল না।

রেঙ্গুন-সহরে প্রবাসী হিন্দুদের একটি হনুমানজির মন্দির আছে। এই মন্দিরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের দান পাঁচশত টাকা।

মালোপাড়া গ্রাম বাঙ্গালা দেশে একটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামকে গোঁসাই-মালোপাড়া বলে, ইহাকে বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থ বলিলেও চলে। এই গ্রামের প্রাচীন শ্রীমন্দির-সংস্কারের জন্য তিনি চারি হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি সভাগৃহ আছে। তাহার নাম "শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দির"। জনসাধারণের নিকট চাঁদা তুলিয়া এই গৃহটি ক্রয় করা হইয়াছে। এই কার্য্যে শশি বাবুর দান এক হাজার টাকা।

কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতি বা বর্ণ, সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের উন্নতি-সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সদ্‌গোপ জাতিরও এই প্রকারের একটি সমিতি আছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয় এই সমিতিকে ছয় বৎসর কাল মাসিক ১১০৲ একশত দশ টাকা হিসাবে সাত হাজার নয় শত কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন।

শিক্ষাবিস্তার কার্য্যেও তাঁহার দান অনেক। রেঙ্গুণে বাঙ্গালীদের একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয়ে তাঁহার দান সাত হাজার টাকা। হুগলি জেলার অন্তর্গত 'খোস্‌মোড়া' উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আড়াই হাজার টাকা, বেগ্‌ড়ি বিদ্যালয়ে এক হাজার টাকা, যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার টাকা, পল্‌তার নিকটবর্ত্তী ঠাকুরবাড়ী স্কুলে দেড় হাজার; বাঙ্গালার বাহিরে কাথিয়াবাদে মুসলমানদের এক মাদ্রাসায় ১২৫০৲, কলিকাতা তালতলা বিদ্যালয়ে ২৫০৲।

জলকষ্ট নিবারণেও তাঁহার দান অনেক। গোঁসাই মালোপাড়ার নিকটবর্ত্তী ধনিরপুর গ্রামে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের বাস ছিল। এই গ্রামে সাত শত টাকা ব্যয়ে একটি কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন। জগাচা গ্রামে একটি নলকূপ, ব্যয় ১২৫০৲। বরাহনগরে তাঁহার একটি বাগানবাড়ী আছে। সেই বাগানের পুকুরের জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুপেয়। নিকটবর্ত্তী স্থানে গ্রীষ্মকালে বড়ই জলকষ্ট হয়। অনেক লোক বাগানের ভিতরের পুকুর হইতে জল লওয়ায় উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হইত। সেই অসুবিধা নিবারণ করার জন্য এবং সকলে যাহাতে অবাধে প্রচুর পরিমাণে জল পায় তাহার সুব্যবস্থা করার জন্যে বাগানের ভিতরে বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্র বসাইয়া বাহিরে সদর রাস্তার সঙ্গমস্থলে দুইটি কল বসাইয়া জলদানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি কলে পুরুষেরা, আর একটি কলে স্ত্রীলোকেরা জল লইয়া থাকে। এই কার্য্যে দেড় হাজার টাকা প্রাথমিক ব্যয় হইয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালার গৌরব শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নামে রেঙ্গুন সহরে একটি সেবাশ্রম আছে। এই সেবাশ্রমে তিনি নগদ দশহাজার টাকা দান করেন। একটি জায়গা কিনিয়া দেন। ঐ জায়গার উপর অতিথিগণের থাকিবার জন্য একটি গৃহ আছে, তাহার নাম "শশি-নিকেতন"। এই ভবনের দ্বারা প্রবাসী ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর অশেষ উপকার হইয়াছে। রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হওয়ার পর দুই বৎসর কাল, তিনি ঐ সেবাশ্রমকে মাসিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যখন উত্তর বঙ্গের বন্যাপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করেন, সেই সময়ে নিয়োগী মহাশয় তাঁহাকে আড়াই হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

এই সব দান ছাড়া আরও অনেক দান আছে। নিজের আত্মীয় স্বজনবর্গ তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই সাহায্য পাইয়া থাকেন। তাঁহার খুল্লতাত মহাশয়কে সুদীর্ঘকাল মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার অন্যান্য দানের কথা পরে আলোচনা করিব।

দানবীর শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা—হুগলি জেলার অন্তর্গত গোঁসাই মালোপাড়ার নিকটবর্ত্তী ধনিচপুর নাম ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। জাতিতে সদ্‌গোপ, বয়ঃক্রম এখন ৬৪।৬৫ বৎসর। তিলি-জাতীয় ব্যবসায়ী ক্ষেত্রমোহন নন্দী মহাশয়েরা রেঙ্গুনে ব্যবসায় করিতেন। শশি বাবুর পিতা ও খুড়া, সেই নন্দী বাবুদের ব্যবসায়ের মধ্যে কর্ম্ম করিতেন ও রেঙ্গুনে থাকিতেন। শশি বাবু যখন তাঁহার পিতার সহিত রেঙ্গুন যান, তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর। ভালরূপ লেখা-পড়া শেখেন নাই। নন্দী বাবুদের দোকানেই কাজ করিতেন। কালে নন্দী বাবুদের দোকান নষ্ট হইয়া যায়। শশিবাবু নন্দী বাবুদের একখানি দোকান কিনিয়া লইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসার আরম্ভ করেন। তিনি যাহা করিয়াছেন এই দোকান হইতেই, নিজে খাটিয়া, সততা, পরিশ্রম ও চরিত্রের প্রভাবে শ্রীভগবানের কৃপায় করিয়াছেন। এখন রেঙ্গুণে তাঁহার বৃহৎ ময়দার কল, ১৪ খানি বাড়ী, বাগানবাড়ী ও বৃহৎ দোকান আছে। তাঁহার পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মধ্যম পুত্র সপরিবারে কলিকাতায় থাকেন। তৃতীয় পুত্র কলিকাতায় কাজ কর্ম্ম দেখেন। ছোট দুইটি নাবালক। শশি বাবু এখন কলিকাতায়। আর রেঙ্গুন যাইবেন না। তিনি তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, জামাতা, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহ সুস্থদেহে ও মানসিক শান্তিতে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ভোগ করিয়া দীর্ঘকাল নির্ব্বিঘ্নে নর-নারায়ণের সেবায় দুর্ল্লভ মানবজীবন সফল করুন, ইহাই আমাদের কামনা ও ও প্রার্থনা। দাতা শতং জীবতু।

গতি-শীল সমাজ—

শ্রীশ্রীজয়কালীমাতার মন্দিরে সমবেত হইয়া প্রকাশ্যভাবে জলপান করিয়া নিম্নলিখিত জাতি ও তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে জলাচরণীয় করিয়াছেন। পাটনি, নমঃশূদ্র, ধীবর (হালদার, মালো, রাজবংশী), স্থত্রধর, কৈবর্ত্ত ও কাপালি। পাবনা সহরের রাধানগর পল্লীতে শ্রীযুক্ত নদীয়াবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ী। ইনি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। ইঁহার অনেক শিষ্য আছে এবং স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রচারক ও সুপণ্ডিত। ইনি গত বৎসর সহস্র প্রহরব্যাপী এক মহাসঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় তিনি এই মহাসঙ্কীর্ত্তনের সময় অনেক অজলাচরণীয় জাতিকে জলাচরণীয় করিয়াছিলেন এবং সে কথা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যবন হরিদাসকে ব্রহ্ম হরিদাস আখ্যা দিয়া এবং ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধ-পাত্র তাঁহাকে দান করিয়া যে সত্যের হোমানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অযোগ্য বংশধর আমরা তাঁহারই নামের দোহাই দিয়া সমাজে গৌরব লাভ করিতেছি, কিন্তু সে হোমানল নিভাইয়া ফেলিয়াছি। সেই জন্যই বাঙ্গালা দেশের এই দুর্দ্দশা। সেই হোমানল রাখিতে পারিলে বা এখনও তাহা জ্বালাইতে পারিলে, অবনত জাতির উন্নয়নের জন্য পঞ্জাব হইতে আর্য্য সমাজকে আসিতে হইবে কেন?

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'পাষণ্ড-দলন' গ্রন্থে আছে—

শূদ্র নহে, কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেই জন ভাগবত জানিহ সংসারে॥
সর্ব্ববর্ণে সেই শূদ্র যে না ভজে হরি।
সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা কহিছে ফুকারি॥
নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে।
নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥
বিপ্র দ্বিষড়্ গুণযুত শ্রীচরণে বিমুখ।
শ্বপচ হইতে নীচ শাস্ত্র-অনুরূপ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতিবুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥
নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়।
ফুকারি ফুকারি ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দকে অবতারিত করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে মহাসত্যের আলোক চারিশত বর্ষপূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিস্তারিত করিয়াছিলেন, সেই আলোকেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি

বলিয়াছেন। হিন্দু মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণভজনায় প্রবৃত্ত হউন, অচিরেই সামাজিক সমস্যার সমাধান হইবে। বীরভূম জেলায় মাল, বাগ্‌দি, হাড়ি, ডোম, লেট, কোনাই প্রভৃতি যে সকল জাতি পড়িয়া রহিয়াছে, ইহারাও উঠিবে। কিন্তু ইহাদের ভিতর মদ্যপান যাহাতে উঠিয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে। আর যাহাতে এই সকল জাতির প্রত্যেক নর-নারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হিন্দু-সংগঠন ও আর্য্য সমাজ—হিন্দু-সংগঠন ও হিন্দুমহাসভা সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে হিন্দু-সংগঠন সমর্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আপত্তি করাও হইয়াছিল। শুদ্ধি কার্য্য চলিতেছে। যাহা হউক শুদ্ধি কার্য্য চলিতেছে, ইহা ভাল। কিন্তু আর্য্য সমাজের আদর্শানুযায়ী সমুদয় কার্য্য হইতেছে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ও তান্ত্রিক বীরাচারিগণ উদার ও উন্নতিমুখী মতাবলম্বী। তাঁহাদের সহিত আর্য্য সমাজীগণের বন্ধুভাবে কোন কোন বিষয়ে বোঝাপড়া হইলে ভাল হইত। 'সত্যার্থ-প্রকাশ' গ্রন্থের শেষাংশে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মন্তব্য আছে, তাহা লইয়া আর্য্য সমাজ কি কাজ করিতে পারিবেন? পারেন ভালই। হিন্দুসংগঠন আন্দোলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিলে ভাল হয়।

লাহোর হইতে 'ট্রিবিউন্' নামে যে সুপরিচিত ইংরাজী দৈনিকপত্র বাহির হয়, তাহার সম্পাদক একজন বাঙ্গালী। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়। ইনি পূর্ব্বে একসময়ে কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক 'বেঙ্গলীর' সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। ইনি একজন চিন্তাশীল সুলেখক। সম্প্রতি আর্য্য সমাজের ইংরাজী মাসিকপত্র 'বৈদিক ম্যাগাজিন'এ তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পঞ্জাবে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন—বাঙ্গালা দেশে আর্য্য-সমাজের প্রসার হয় না কেন? এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় কালীনাথ বাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Bengal is a firm believer in evolution, and she does not believe in 'Back to the Vedas', perhaps back to anything. Bengal is essentially rationalistic and does not believe in the infallibility of any book or any human being that has ever walked the earth. To her, the reason of the individual is the ultimate authority in all matters. She is also very largely cosmopolitan and believes far more in proving the affinity of her own faith to other faiths than in proving that it alone is right. Lastly inspite of her intellectuality...

for the emotional side of religion, a side in which she finds the Arya Samaj deficient according to her ideas."

ইচ্ছা করিয়াই উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ করিলাম না। পরে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক লোকই যে এই প্রকারের, তাহা নহে। কিন্তু এ বিষয়ে সংখ্যার কোন মূল্য নাই। যিনি নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য পড়েন, যিনি বাঙ্গালা দেশের নূতন প্রতিষ্ঠান-সমূহের খবর রাখেন, বাঙ্গালার প্রতিভাশালী ও ত্যাগী কর্ম্মীগণকে যিনি জানেন, তিনিই স্বীকার করিবেন, কালীনাথ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য।

ভোট যুদ্ধ—উত্থান একাদশী—সেদিন কার্ত্তিক মাসের ৩০শে, কার্ত্তিক পূজা; আবার উত্থান একাদশী, বিষ্ণুর জাগরণ; বীরভূম অঞ্চলে রীতি আছে, আজ জমি হইতে একগুচ্ছ ধান কাটিয়া পবিত্রভাবে গৃহে আনিতে হয়, গৃহদ্বারে এই ধান্যগুচ্ছকে ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা করিতে হয়, আর এই ধান্যগুচ্ছে মা লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়—ইহার নাম 'মুট্ আনা'—আমরা বুঝি লক্ষ্মী আনয়ন। দিনটি বেশ; একই দিনেই লক্ষ্মী আনয়ন, তারকান্তকারী দেবসেনাপতি, বীরচূড়ামণি কার্ত্তিকেয়ের পূজা—আবার বিষ্ণুর জাগরণ।

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-নির্ব্বাচন হইতেছে। চারিদিন ধরিয়া লোকের মত লওয়া হইবে, তাহার মধ্যে দুইদিন হিন্দুর, আর দুইদিন মুসলমানের। ইংরাজের ভেদনীতি এই ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানকে পৃথক্ করিয়াছে। আজ ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৩৩, ১৬ই নভেম্বর ১৯২৬—হিন্দুদের ভোট দেওয়ার প্রথম দিন। মাসাধিককাল ছুটাছুটি, অনুরোধ উপরোধ, প্রলোভন আদি অনেক চলিয়াছে, আজ এই শুভদিনে তোমরা আসিয়া ভগবান্‌কে সাক্ষ্য করিয়া গোপনে জানাইয়া যাও, কাহাকে তুমি তোমার প্রতিনিধি করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইতে চাও। কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, ভয় বা লোভের দ্বারা চালিত হইবে না, সত্য সত্যই যাহাকে উপযুক্ত মনে কর, তাহাকেই ভোট দিবে। তুমি কাহাকে ভোট দিলে, কেহই জানিবে না। 'ব্যালটে ভোট'—এ বিষয়ে তোমার স্বাধীনতা আছে—বিদেশী ইংরাজরাজও এ বিষয়ে তোমার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে চায়—তাই গোপনে ভোটের ব্যবস্থা; কে কাহাকে ভোট দিল, কেহই জানিবে না, এমন কি কোন কেন্দ্রে কোন্ প্রতিনিধি কত ভোট পাইলেন, তাহাও কেহ জানিবে না, সমগ্র জেলার কাগজ একত্র করিয়া গণনা করা হইবে।

বিষ্ণুর জাগরণ, হিন্দুজাতির একটি খুব বড় চিন্তার জিনিস। কেহ বলেন, সূর্য্যের গতি পরিবর্ত্তনই ইহার অর্থ। বেদে সূর্য্যই বিষ্ণু। কে বলিবে, তাহা নহে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিষ্ণুর ... বৎসর বৎসর ক্ষুদ্র আকারে

অভিনীত হইতেছে। মহাবিষ্ণু যোগনিদ্রায় অভিভূত, প্রলয়ের মহানিশি—সকলি একাকার। মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। ব্রহ্মা তখন শিশু ও অসহায়। নবসৃষ্টির উষা আরম্ভ হয় হয়, এমন সময় দুই দৈত্য, মধু আর কৈটভ, ইহারা বিষ্ণুরই কর্ণমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত। অসহায় ব্রহ্মা মহামোহরূপিনী যোগনিদ্রার স্তব করিতেছেন,—'মা, তুমি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ কর; মা, তুমি পরিত্যাগ করিলেই বিষ্ণু জাগিবেন, তাহা হইলেই আমি রক্ষা পাইব'। মা যোগনিদ্রা, বিষ্ণুকে ছাড়িলেন, বিষ্ণু জাগিলেন, পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ হইল, মোহান্ধ অসুর যুগল নিজেদের মোহ ও দম্ভের জন্য নিপাতিত হইল। তাহাদেরই মেদে মেদিনী গড়িয়া উঠিল। নবসৃষ্টির নবীন উষায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নবগঠনের সূত্রপাত হইল।

এই মূল সত্য। ইহার অর্থ কি, কেহই সম্পূর্ণরূপে জানে না। ইহার অর্থ অসংখ্য প্রকার—কারণ, ইহা যে সনাতন সত্য। বুঝিবার শক্তি থাকিলে মানুষ সর্ব্বত্রই এই মহাসত্যের অভিনয় দেখিতে পাইবে।

উত্থান একাদশীর দিন দেখিলাম—প্রলয়ের অন্ধকারে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন—সকলই আছে, কিন্তু কিছুই নাই। ভারতের সুবিপুল জন-সংঘের সম্মিলিত মত ও শক্তিই মহাবিষ্ণু। আমরা যাহাকে কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বলি, তাহা এখনও ঠিক্‌মত গড়িয়া উঠে নাই। এখনও গড়িয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে। সুগঠিত কংগ্রেসই এখন সেই মহাবিষ্ণু। সেই মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্মে বসিয়া ব্রহ্মা ভবিষ্যতের ভারত বা নব্যভারত গঠন করিবেন। সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু দাস স্বদেশসেবার যে আদর্শ দিয়াছেন, সেই আদর্শ লইয়া ত্যাগের পথে যাহারা মিলিত, সেই স্বরাজদল, তাহাদের ভিতর স্থানে স্থানে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলেও, তাহারাই ব্রহ্মা—নব্যভারত গড়িয়া তোলার শক্তি বা লক্ষ্য তাহাদেরই আছে, বা সেই শক্তি তাহাদেরই ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়াছেন বা হইতে পারেন, তাহা ছাড়া আর সকলই সুগভীর মোহান্ধকার।

এবার দেখা গেল, সকলেই কংগ্রেসের নাম লইয়া আসরে অবতীর্ণ। জনসাধারণের রক্ত-শোষণ যাহাদের ব্যবসায়, দস্যুর পদলেহন যাহাদের ব্রত, প্রাণের দায়ে তাহারাও কংগ্রেসের দোহাই দিয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল, জনসাধারণের জাগরণ সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখন বলুন দেখি, মধু ও কৈটভ কে? রেস্‌পন্‌সিভিষ্ট ও ন্যাশনালিষ্ট নামক দুইটি দল—ইহাদের বাঙ্গালা নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। বাঙ্গালা ভাষা দেবতার ভাষা, সুতরাং ইহাতে অসুরের নাম থাকিবে কেমন করিয়া? এই দুই দল কংগ্রেসেরই নাম লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ—সুতরাং, ইহারাই বিষ্ণুকর্ণ-মলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ। কে মধু, আর কে কৈটভ—তাহা বলিতে পারি না। মধুকৈটভ সম্পূর্ণ-রূপে নিপাতিত হইয়াছে কিনা তাহাও জানি না—তবে [illegible]

দ্বারা উপকার হইয়াছে অনেক। তাহাদের পাতিত করিবার জন্য নিরীহ জনসাধারণকে দেশের অবস্থা, তাহাদের স্বার্থ, সুবিধা ও সম্মানরক্ষার কথা. দেশের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে নির্ভীকতা, নির্লোভতা, জ্ঞান ও স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতার কথা বুঝাইতে হইয়াছিল, ইহাই ব্রহ্মার স্তব। মধু-কৈটভের পতনের উপরেই নব্যভারত গড়িয়া উঠিবে।

বীরের পূজা ও লক্ষ্মী-আনয়ন—বীরভূম হইতে কংগ্রেস-স্বরাজদলে দাঁড়াইয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে বীর, তাহা সকলেই জানে। ইহা অস্বীকার করায় যাহাদের স্বার্থ আছে, তাহারা যতদূর পারিয়াছে, বিরোধিতা করিয়াছে। প্রবল সংগ্রাম—শেষে বীরেরই জয় হইয়াছে। ৩০শে কার্ত্তিক মাঠের মধ্যে এক গান শুনিলাম—

বীরের ললাটে, দিয়ে জয়টিকা, ভারতলক্ষ্মী ফিরায়ে আন্।
পিশাচের মোহে ভুলনা ভুলনা, রেখ রেখ ভাই দেশের মান॥
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,
স্বর্গ হইতে করিছে রোদন,
এই বৃষ্টিবিন্দু তার নিদর্শন
স্বরাজের কথা ভুলনা ভাই।

সত্যই সেদিন স্থানে স্থানে অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। ভোট শেষ হইল, এখন আমাদের সর্ব্বপ্রকার বিরোধ শোধ হউক, সকলে একমত হইয়া সত্য ও ন্যায়ের পথে যেন দেশের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হইতে পারি। দেশমাতৃকার মহামন্ত্রে সকলে দীক্ষা গ্রহণ করুন, এই দীক্ষা ব্যতীত প্রাচীন কালের অন্য কোন দীক্ষামন্ত্র সফল হইবে না। দেশমাতৃকার মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণই যুগধর্ম্ম।

সাহিত্য-সেবকের তিরোভাব—১। ৺ হারাণচন্দ্র রক্ষিত—বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীদিগের সুপরিচিত রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত ১০ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, রাত্রিকালে স্বগ্রাম মজিলপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে তিনিই প্রথম 'রায় সাহেব' উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি সাহিত্য-চর্চ্চাকেই জীবনের একমাত্র কার্য্য বা ব্যবসায়-রূপে বরণ করিয়া প্রথম জীবনে নানারূপ অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। শেষ-জীবনে যখন 'রায় সাহেব' উপাধি ও সামান্য কিছু সরকারী বৃত্তি পাইলেন, তখনও তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু অনেকেরই তিনি

কাঞ্চন', 'মন্ত্রের সাধন' প্রভৃতি উপন্যাস ও 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম', 'ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গ সাহিত্য' নামক সন্দর্ভ-গ্রন্থ তাঁহার রচনা। সেক্সপিয়রের সমুদয় নাটকের গল্পাংশ, তিনি বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত ছিলেন।

২। ৺শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—"ভূগোলের শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে জানে না, এদেশে এমন লোক খুব কমই আছে। ভূগোল এবং অন্যান্য বহু পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা এবং এদেশে মানচিত্র প্রকাশের প্রথম পথ-প্রদর্শক, সেই স্বনামখ্যাত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার মধুপুরে তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। শশিভূষণের বয়স হইয়াছিল ৮৬ বৎসর। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে এদেশের প্রাচীন আদর্শের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভাব ঘটিল। এই শ্রেণীর লোক ক্রমেই এখন বিরল হইতেছে। শশিভূষণ অতি সামান্য অবস্থা হইতে কেবল নিজের উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জন যে প্রচুর পরিমাণেই করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার ভূগোল পুস্তক ও নানাদেশের মাত্রচিত্র প্রকাশের কথাই সকলে জানে। কিন্তু ইহা ছাড়া তিনি কয়েকখানি সাহিত্য-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল সংবাদপত্র পরিচালনাও করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি 'রামের রাজ্যাভিষেক' রচনা করিয়া সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হন। তাহার পর আরও কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। পূর্ব্বে এদেশে বিদেশী মাত্রচিত্র ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যাইত না। শশিভূষণ বাঙ্গালা ও ইংরাজী অক্ষরে এদেশে মানচিত্র প্রকাশের জন্য যত্নবান হন। অনেকে স্বার্থের বশে তাঁহার এই উদ্যম ব্যর্থ করিতে প্রয়াসী হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। বিলাতের রয়াল্ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, শশিভূষণের মানচিত্র নির্ভুল বলিয়া প্রশংসা করিলে, তাহা সর্ব্বত্র বেশ প্রচার লাভ করিয়াছিল। শশিভূষণ কিছুদিন 'সোমপ্রকাশ' এর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি 'সহচর' পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ডলিটনের প্রেস-আইন অনুসারে সংবাদপত্রের নিকট জামিন আদায়ের ব্যবস্থা হয়। শশিভূষণ টাকা জমা দিতে সম্মত না হইয়া 'সহচর' বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। দেখাদেখি আরও কয়েকখানি কাগজ এই পন্থা অনুসরণ করে। ইহার ফলে, টাকা জমা দেওয়ার বিধান রহিত হইয়াছিল, এবং 'সহচর' পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। শশিভূষণ নিজে কৃতী ছিলেন এবং তিনি একজন কৃতী সাহিত্যিকের সঙ্গ পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার তৎকালীন প্রবীণ সাহিত্যিক ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত মহাশয়ের সহিত শশিভূষণের মিলন ফলে, যেন মণিকাঞ্চন যোগের ফল ফলিয়াছিল"। "(বঙ্গবাসী", ২৪শে, অগ্রহায়ণ)

'নায়ক' পত্রে, সিউড়ির উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্, মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল—

"সিউড়ি সহরের ৮ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পত্র, 'অমৃত বাজার পত্রিকার' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট রেজেষ্টারী ডাকে প্রেরিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ্য ভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাহার কোন উত্তর দেন নাই। পত্রখানির একটা নকল "ফরওয়ার্ড" পত্রে প্রেরিত হইয়াছে। পত্রখানির ভাবানুবাদ পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

"গত ৬ই নভেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয়ের বীরভূম পর্য্যটন সম্বন্ধে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহার আগাগোড়া একেবারে মিথ্যা। ঐ সংবাদে আছে, সেনগুপ্ত মহাশয়কে জনসাধারণ অভিনন্দিত করে নাই। এরূপ ভয়ানক মিথ্যা কথা, কি প্রকারে যে বাহির হইল, তাহা আমাদের ধারণাতীত! সেনগুপ্ত মহাশয় বীরভূম জেলার সর্ব্বত্রই বিশেষ উল্লাস ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত হইয়াছেন। সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটী, সাঁইথিয়া ইউনিয়ন বোর্ড, কুণ্ডলার জনসাধারণ ও লাভপুরের জনসাধারণ,তাঁহাকে মুদ্রিত অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন। নানা স্থানে তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল, পথিপার্শ্বে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণঘট, আম্রশাখা ও পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। অনেক স্থানে লাজবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল।

'অমৃত বাজার' সংবাদ দিয়াছেন—সভায় লোক হয় নাই। সিউড়ির সভা সম্বন্ধে এই কথা লিখিত হইয়াছে। সিউড়ি জুবিলি বাজারে প্রকাশ্য সভায় সেদিন যেরূপ জনতা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক জনতা সিউড়িতে কখনও কোন সভায় হয় নাই। 'অমৃত বাজার' সংবাদ দিয়াছেন, কলিকাতা হইতে আগত ন্যাশানালিষ্ট দলের একজন বক্তা বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছিলেন। সেনগুপ্ত মহাশয় তাহাকে বলেন যে, ইহা একটি দলের সভা সুতরাং তাহার এ সময় কিছু বলিবার অধিকার নাই। প্রকৃত কথা, ইহার ঠিক বিপরীত। সিউড়ির যুবক সম্প্রদায় এবং অনেক ভদ্রলোক বিদেশী ও অজ্ঞাতনামা ভাড়াটিয়া বক্তাকে সিউড়ির সভার ন্যায় সম্ভ্রান্ত সভায় বক্তৃতা করিতে দিতে চাহেন নাই—সেনগুপ্ত মহাশয়ই, নিজের স্বভাব-সিদ্ধ উদারতা বশতঃ তাহাকে বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। 'অমৃত বাজার' সংবাদ দিয়াছেন—সিউড়ি সভায় নানারূপ প্রশ্ন তুলিয়া সেনগুপ্ত মহাশয়কে বিব্রত করা হইয়াছিল। ইহাও সর্ব্বৈব মিথ্যা। সিউড়ির মহতী জনসভায় দেড়ঘণ্টা ধরিয়া সেনগুপ্ত মহাশয় যে সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহা অতুলনীয়। শ্রোতৃবর্গ যেরূপ শান্তভাবে ও একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন, তাহাও অতীব প্রশংসনীয়। এই প্রকারের মিথ্যা সংবাদের দ্বারা ব্যবসায় সংবাদপত্র পরিচালকগণ, মফঃস্বলের লোকের চক্ষে যেভাবে ধূলা দিতে চাহেন, তাহা অতীব ক্ষোভের বিষয়। এ বিষয়ে একটি দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া উচিত ; এই প্রকারের নির্জ্জলা মিথ্যা সংবাদী

যাহারা প্রচার করে, তাহারাই দেশের প্রকৃত শত্রু। আমার প্রার্থনা প্রত্যেক সত্যপ্রিয় ব্যক্তি এই প্রকারের মিথ্যা ও মিথ্যা ব্যবসায়ীগণের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য একতাবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করুন"।

পত্রখানি প্রকাশিত হইতে হইতেই, 'অমৃত বাজার পত্রিকা', প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বেশ স্পষ্ট কথা নহে। দেশী ও বিদেশী নানাজনে দল বাঁধিয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেছে—এই প্রকারের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করাটা দেশীয় সংবাদপত্রের অত্যাচার ছাড়া আর কি ? এই পতিত জাতি নিত্য নব নব কত অত্যাচারের সহিত সংগ্রাম করিবে, ইহাই ভাবিবার কথা।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

১২ পদকর্ত্তা—জগদানন্দ

['অকরুণ পুনঃ বাল অরুণ' প্রভৃতির সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা জগদানন্দ, বীরভূমের অন্তর্গত জোঁফলাই গ্রামে বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহাশয়, তাঁহার পদাবলী সংগৃহীত করিয়া একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই 'জগদানন্দ পদাবলী' গ্রন্থে এবং অধুনা প্রকাশিত অপরাপর পদাবলী-সংগ্রহ গ্রন্থে জগদানন্দের যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত কয়েকটি পদ, আমরা একটি প্রাচীন জগদানন্দ-পদাবলীর বহি হইতে সংগৃহীত করিয়াছি, সেইগুলি এই স্থলে প্রকাশিত হইল। এই পুঁথিখানি জগদানন্দের বাসস্থান জোঁফলাই গ্রাম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পদগুলি অধিকাংশই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বিষয়ক—বঃ লাঃ পুঃ—নং ১১৪৯-৫১]

(১)

অথ রূপ—বসন্ত রাগ

অপরূপ সব সুলখন যুত অঙ্গ। নিরখত মুরছই কোটি অনঙ্গ॥
আদতে বিদিত সব জানি। গুপতি মুরারি গুপতি কহু আনি॥ধ্রু॥
পহিলহিঁ বেকত সপথ থলে রঙ্গ। তাপর ষট থল নিরখিয়ে তুঙ্গ॥
তিন থল বিথর খরব তিন আর। গম্ভীরতর তিল পেখি ইহার॥

গনহ বত্তিশ বর সুলছন সোই। কৈছনে ইহ দ্বিজ সম্ভব হোই॥
নদীয়া নগরপুরে দেখ বিপরীত। চলকিয়ে অচল সচল পুলকিত॥
এতদিনে দূরে গেল সব মনতাপ। কি জানি বা জগতের যাব তাপ পাপ॥

(২)

কামোদ

দিঠি পদ করতল, তালু বসন থল, রদন ছদন নখরঙ্গ।
উর থর শ্রীমুখ নাশিক কটি নখ সুললিত কান্ধ সুতুঙ্গ॥
গৌর অঙ্গ বলিহারি।
কটি সুললাট চারু উর পরিসর নিরখহ গুপত মুরারি॥ধ্রু॥
পুন তিন অঙ্গ জঙ্ঘ অরু মোহন গিরিবা খরবাকার।
গভীর নাভি শুর সরে মনোহর দীঘল পঁচ থল আর॥
নাশা জানু নয়ন হনু ভুজ পুন পঞ্চ সূক্ষ্ম সুবিচারি॥
আঁগুলি পরব রোম দ্বিজ বৈঠ কচ দাস জগত বিনিধারি॥

(৩)

কামোদ

প্রাতর অরুণ কিরণ জিনি তনুরুচি তরুণারুণ জিনি নয়না।
বাহু করভ কর গরব সরবহর বর শশধর জিনি নয়না॥
বিহরই নব যুবরাজ।
কেশরী জিনি খিনি মাঝে রণিত মণি কিঙ্কিণী অভরণ সাজ॥ধ্রু॥
নিরখিতে মুরছি চরণে পড়ি সীদতি রতিপতি মতি গতি খোই।
গৃহপতি দুরমতি নহত গতাগতি কুলবতী ইতিউতি রোই॥
রস পরিহাসে করত কত কৌতুক সনরয় সহচর মেলি।
জগদানন্দ হৃদয়- নদীয়া পুরে ঐছে করত নিতি কেলি॥

(৪)

শ্রীরাগ

নদীয়া ভূধরে নীল অম্বর গৌর দরশন দেলি।
জনু উদয় ভূভৃতে রাহু কবলিত আধ রবি উঠি গেলি॥
দশ দিশে হরি হরি বোল॥

জপত জগভরি দাম ধরি হরি নাম ভই উতরোল ॥ধ্রু॥
হরনীত দুরিত সদুরগত দিন রজনী আন না জান।
নিতি হোত গান পুরাণ দান ধেয়ান দ্বিজ সনমান ॥
সাধু বিতরণে দুঃখিত দূরগত দীনহীন পরিপুর।
প্রেম ধন সব জগত তরসাম জগত বাহির দূর ॥

(৫)

শ্রীরাগ

নিতুই নূতন নিগূঢ় নিজ রস নীর নিধি নিরমাই।
নিয়ত নিমগণ না জানেন নিশিদিন নদীয়ানন্দ সদাই ॥
নটই নব নটরাজ।
নকুল নরহরি নিতাই নিরণিত নগর নটন সুমাঝ ॥
নারী নাগরী নিভৃতে না রহু নিরখি নিরূপম কাঁতি।
নিঝর নিরবধি নয়ন নীরজ নীর নীরদ ভাঁতি ॥
নিঠুর নিজ নিজ নাহ নিন্দই নিলয়ে নাহি অভিলাষ।
নিচয়ে নিবেদই নবীন নিজ জন জগত আনন্দ দাস ॥

(৬)

শ্রীরাগ

চারু চাঁচর চিকুর চূড়হি চপল চম্পক দাম।
চঞ্চলা চিতচোর মূরতি চাহি চমকিত কাম ॥
চৈতন্য চাঁদ উজোর।
চমর চক্ষুষ চকিত চাহনি চকিত চেতন চোর ॥ধ্রু॥
চলিত চৌদিশে চূর্ণ কুণ্ডল চঞ্চরীচয় ভান।
চারু চিকন চীর চিহ্নইতে চামিকর মূরছান ॥
চতুর কুলবতী চিত্ত চত্বরে চিত্র চন্দন চন্দ।
চঢ়ল চিরদিনে চলিত নহপুন ভনই জগদানন্দ ॥

(৭)

শ্রীরাগ

মিলিত সুললিত নীর মলয় সমীর বহ অতি মন্দ।
বিপথ গামিনী তীর বিহরই ধীর পদ অরবিন্দ॥
দেখ, গৌরবর গুণধাম।
নিরখি শুভগ শরীর কম্পে অথির দামিনী দাম॥ ধ্রু॥
রুচির নাভি গভীর তুরহি হীর মণি সর দোল।
বলিত নীলিম চীর উপর মঞ্জরী মঞ্জুল দোল॥
করত রস পরিহাস কত সমবেশ বয়সহি মেলি।
জগত আনন্দ হৃদয় মন্দিরে ঐছে করু নিতি কেলি॥

(৮)

শ্রীরাগ

দমিত দামিনী দামদরপণ দেহ দীপতি উজোর।
দীন দূরগত দুখে দুখিত দেখি দেবই কোর॥
দ্বিজরাজ দীন দয়াল।
দুলহ দরশন দান দই দশদিশ কমল রসাল॥ ধ্রু॥
দুঃসহ দারুণ দুরিত দাবক দাহে দগধল দেশ।
দীগ দচ্ছিন দুস্তর দূরজন দলনে দুর করু ক্লেশ॥
দয়িত দোসর দামোদর দশদাস দলিত দিগন্ত।
দুরদৈবে দুর্ব্বল দিবস দীপতুল দাস জগদানন্দ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র।

পৌষ, ১৩৩৩

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ধর্ম্মসমন্বয়

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

বীরভূমি ৮—৩, পৌষ, ১৩৩৩।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ধর্ম্মসমন্বয়

১। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে মহাপ্রভু

দক্ষিণাপথের একটি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের নাম শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। ইহা পুণ্যনদী কাবেরীর তীরে অবস্থিত। সেখানে শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ আছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এই পুণ্যতীর্থে উপস্থিত হইয়া কাবেরীতে স্নান করিলেন, শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের স্তুতি ও প্রণতির পর মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া গান ও নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া সমবেত ব্যক্তিগণ চমৎকৃত। শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্রে বহু ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রী-সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণের নাম বেঙ্কট ভট্ট। বেঙ্কট ভট্ট মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং যথোচিত সম্মান করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টের গৃহে উপস্থিত। বেঙ্কট ভট্ট পরম ভক্ত, মহাপ্রভুকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। মহাপ্রভুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া বাড়ীর সকলে পাদোদক পান করিলেন। সে দিনের মত সেবা হইল। এইবার মহাপ্রভু স্থানান্তরে যাইবেন। বেঙ্কট ভট্ট মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ভক্তি সহকারে নিবেদন করিলেন—"প্রভু, চাতুর্ম্মাস্যের সময় উপস্থিত, সাধুরা এ সময়ে প্রায়ই ভ্রমণ করেন না। আমার ইচ্ছা, আপনি দয়া করিয়া এই চারি মাস আমার গৃহে বাস করুন—আপনার মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিয়া আমরা জীবন সফল করি।" বেঙ্কট ভট্টের প্রেমের টান—মহাপ্রভু সম্মত হইলেন। চারি মাস মহাপ্রভু, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে বাস করিলেন। এই চারিমাস বড়ই আনন্দে অতিবাহিত হইল। প্রতিদিন কাবেরীতে স্নান, প্রতিদিন শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন, আর প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রেমাবেশে নৃত্যগীত। মহাপ্রভুর সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া

সকল লোক মুগ্ধ—সকলের দুঃখ শোক বিদূরিত। মহাপ্রভুর কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল, নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু বহু লোক প্রতিদিন দর্শনার্থী হইয়া আসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে সকলেই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন ও সকলেই কৃষ্ণ-ভক্ত হইয়া পড়িলেন। রঙ্গক্ষেত্রের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, এক একদিন করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত ও মুগ্ধ। এই প্রকারে মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলেন। সর্ব্বদাই কৃষ্ণকথার আলোচনা হইত।

বেঙ্কট ভট্ট শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ; শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করেন। বেঙ্কট ভট্ট পরমভক্ত, তাঁহার ভক্তি দেখিয়া মহাপ্রভু বড়ই সন্তুষ্ট। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে মহাপ্রভুর সহিত বেঙ্কটভট্টের বেশ বন্ধুতা হইল। মহাপ্রভু তাঁহার সহিত সখ্যভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, উভয়ের মধ্যে বেশ হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল। বেঙ্কটভট্ট নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। তিনি বিবেচনা করিতেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণই পরতত্ত্ব ; অন্যান্য উপাসকেরা অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা শ্রীসীতারামের উপাসকেরা কিছু নিম্ন ধিকারী, ভিতরে ভিতরে এরূপ ধারণাও তাঁহার ছিল। বেঙ্কটভট্ট শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রবিশ্বাসী। একদিন মহাপ্রভুর সহিত বেঙ্কটভট্টের সখ্যভাবে নিম্নরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

২। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ

মহাপ্রভু বলিলেন,—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, শ্রীনারায়ণের বুকে বাস করেন। তিনি পতিব্রতাগণের শিরোমণি। আমার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ গোপ, গোচারণ করেন। আচ্ছা, বল দেখি, তোমার ঠাকুরাণী পতিব্রতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ চাহেন কেন? কেবল যে সঙ্গ চাহেন, তাহা নহে ; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়ার জন্য সর্ব্ববিধ সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রতনিয়ম করিয়া চিরকাল অপার তপস্যা করিতেছেন। ইহার কারণ কি? লক্ষ্মী দেবীর এই তপস্যার কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে আছে।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,

তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো।
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

[শ্রীকৃষ্ণ যে-সময়ে কালিয়নাগের মাথার উপর নাচিতেছেন, সেই সময়ে নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন। শ্লোকটি সেই স্তুতির অন্তর্গত। 'হে দেব, শ্রীকৃষ্ণ, আমরা জানিনা, সে মহতী তপস্যা কি, যাহার ফলে আমাদের স্বামী এই কালিয়নাগ তোমার চরণরেণু স্পর্শ করার অধিকার লাভ করিয়াছে। তোমার পদরেণু পাওয়ার বাঞ্ছায় লক্ষ্মীদেবী সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রতধারিণী হইরা সুচিরকাল তপস্যা করিয়াছেন।]

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া ভট্ট বলিলেন,—কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপে এক। শ্রীকৃষ্ণে লীলাবৈদগ্ধ্য, রূপ ও রস অধিক। কৃষ্ণ ও নারায়ণ যখন স্বরূপে এক, তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিলে, লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের হানি হইবার কোনই কারণ নাই। লক্ষ্মীঠাকুরাণী কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম চাহেন।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদে ২পি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।

এই শ্লোকটি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে আছে। সিদ্ধান্তের সাহায্যে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এক। রসদান ব্যাপার অর্থাৎ ভক্তহৃদয়ে আস্বাদিত হইবার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণের অধিক। শ্রীকৃষ্ণরূপে সকলরসের নিত্য স্থিতি।]

এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ভট্ট বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পাতিব্রত্য নাশ হইতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর লাভ এই যে, তিনি রাস বিলাসের আস্বাদন লাভ করেন। বিনোদিনী লক্ষ্মীর অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর, যখন নিজের পতিকে বিবিধ ও বিচিত্রভাবে ভোগ করিবার বা তাঁহা কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, সেই সময়ে কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অভিলাষ হয়। ইহাতে দোষ কি ? আপনি একথা লইয়া পরিহাস করিতেছেন কেন ? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাললেন—আমি জানি ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী রাস পাইলেন না। তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবে হস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং ॥ (ভা ১০।৪৭-৬০)

রাসোৎসবে ভগবানের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া মঙ্গল লাভ করত ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত অনুরক্ত শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে বাস করিয়াও সে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। স্বর্গকামিনী-গণের গন্ধ ও কান্তি পদ্মের ন্যায়, তাঁহারাও সে প্রসাদ পান নাই। তাহার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন—দেখ ভট্ট, লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিলেন। কিন্তু রাস পাইলেন না। শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া রাস পাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রমাণ আছে।

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগ যুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ (১০।৮৭।২৩)

মুণিগণ, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া সুদৃঢ় যোগ সহকারে হৃদয়ে যে তত্ত্ব ধ্যান করেন, আপনার স্মরণ-প্রভাবে আপনার শত্রুগণ সেই-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর ভুজগেন্দ্র-ভোগদীর্ঘ আপনার বাহু যুগলে মদনাবেশে নিবিষ্টচিত্ত পরিচ্ছন্নদৃষ্টি রমণীগণ এবং আপনার চরণকমল-সুধারস-পরায়ণ সমদর্শী আমরা, অর্থাৎ শ্রুতিগণ, আপনার নিকট এ উভয়ই তুল্য।

এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রুতি পাইলেন, কিন্তু, লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী পাইলেন না, ইহার কারণ কি?

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া বেঙ্কটভট্ট বলিলেন—আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা আমার নাই। এই রহস্যের ভিতরে আমার মন প্রবেশ করিতে অক্ষম। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব, আমার চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল। ঈশ্বরের লীলা কোটিসমুদ্র-গম্ভীর। আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, আপনার কর্ম্ম আপনিই জানেন। আপনি নিজগুণে দয়া করিয়া যাঁহাকে

বেঙ্কটভট্টের এই বিনয়পূর্ণ কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবের বিশেষত্ব এই, তিনি নিজের মাধুর্য্যের দ্বারা সর্ব্বদা সকলকে আকর্ষণ করেন। ব্রজবাসী-গণের ভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার চরণ লাভ করা যায়। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানেন না। ব্রজলীলায় কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞান করিয়া উদূখলে বন্ধন করেন; কেহ সখাজ্ঞানে তাঁহার সহিত খেলা করিয়া, খেলায় জিতিয়া, তাঁহার কাঁধে চড়েন। ব্রজজন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াই জানেন। সেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই। সেখানে কেবলমাত্র নিজের সম্বন্ধের মনন আছে। ব্রজবাসীর ভাব লইয়া যিনি ভজনা করিবেন, কেবলমাত্র তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাইবেন।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ভা ১০।৯-২১

ভক্তগণ গোপিকানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যত সহজে লাভ করেন, আত্মভূত জ্ঞানিগণ তত সহজে লাভ করিতে পারেন না।

শ্রুতিকন্যাগণ গোপীগণের অনুগত হইয়া, গোপীগণের ভাব লইয়া, ব্রজেশ্বরী যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। এই শ্রুতিকন্যাগণ, শ্রীভগবানের লীলার অনুরোধে ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া ব্রজে গোপীদেহ লাভ করিলেন। সেই দেহে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোপজাতি, তাঁহার প্রেয়সীগণ গোপী। দেবী বা অন্য নারী, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-দেহেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ চাহে না। লক্ষ্মীদেবী গোপীর অনুগতা হইয়া ভজনা করেন নাই, এই কারণে তিনি রাসবিলাসে বঞ্চিতা। পূর্ব্বে যে শ্লোক বলা হইল, তাহার এইরূপ অভিপ্রায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভট্টের মনে এক অভিমান ছিল। তিনি জানিতেন, শ্রীনারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, আর এই নারায়ণের ভজনাই একমাত্র সর্ব্বোত্তম ভজনা। তাঁহার ধারণা ছিল, শ্রী-সম্প্রদায়ের ভজনাই সর্ব্বোত্তম। বেঙ্কটভট্টের এই গর্ব্ব খণ্ডন করার জন্যই মহাপ্রভু পরিহাসচ্ছলে এইরূপ আলোচনা করিয়া বলিলেন,—ভট্ট, তুমি সন্দেহ করিও না, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এইরূপ স্বভাব। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। কাজেই, শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলের মন হরণ করেন।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

পূর্ব্বোক্ত অবতারগণের মধ্যে কেহ পুরুষের অংশ, কেহ বা কলা, কৃষ্ণই ভগবান্ স্বয়ং। ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ মর্ত্ত্যলোকে জন্মাইয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে, এই অবতারগণ আসিয়া জগৎ রক্ষা করেন।

নারায়ণে যে-সমুদয় গুণ আছে, শ্রীকৃষ্ণেও তাহা আছে। তাহা ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণে এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহা নারায়ণে নাই। এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণে লক্ষ্মীর অনুরাগ। ভট্ট, তুমি পূর্ব্বে যে শ্লোক বলিয়াছ, তাহাতেই এ কথা রহিয়াছে।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার দ্বারা লক্ষ্মীর মন আকর্ষণ করেন, কিন্তু নারায়ণ গোপীর মন হরণ করিতে পারেন না। নারায়ণ তো গোপীর মন হরণ করিতে পারেন না, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিয়া নারায়ণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে-মূর্ত্তি দেখিয়া গোপীগণের অনুরাগ হয় নাই।

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষোভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপিতনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্তচভুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥

গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের যে ভাব, সেই ভাব দুর্গম-পথ-সঞ্চারী। সেই ভাবের প্রক্রিয়া বুঝিতে পারে, এমন কৃতী কেহই নাই। একদিন শ্রীনন্দনন্দন চারিখানি হাত বাহির করিয়া নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে গোপীদিগের অনুরাগ সঙ্কুচিত হইয়াছিল।

বেঙ্কটভট্টের সহিত মহাপ্রভুর এইরূপ কথোপকথন হইল। এই কথোপকথন শুনিয়া একজন অনায়াসেই বলিতে পারেন, মহাপ্রভুর নিজের মত—"ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা"; কাজেই তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককে নিজের মতে আনিবার

জন্য চেষ্টা করেন। এ কথা সত্য হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি ধ্বংস করিয়া একটি নূতন মত চালাইবার জন্যই মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্যরূপ কথা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন, মহাপ্রভু ভট্টের সহিত যে এইরূপ বিচার করিলেন, তাহা ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য, অন্য কোন কারণে নহে। ভট্টের গর্ব্ব দূর হইলে, মহাপ্রভু আবার অন্য প্রকারে সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

দুঃখ না মানিহ ভট্ট! কৈল পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন—যাতে বৈষ্ণববিশ্বাস॥
কৃষ্ণনারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি—হয় একরূপ॥
গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর, ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহ করে নানাকাররূপ॥
মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥

[সংস্কৃত শ্লোকটি নারদ-পঞ্চরাত্রের; তাহার পর এই শ্লোকটি লঘু ভাগবতামৃত-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। "বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীল-পীতাদিচ্ছবি ধারণ করে, সেইরূপ ভগবান্ অচ্যুত, ধ্যানভেদে নিজের স্বরূপকে নানা আকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।]

৩। সম্প্রদায়ভেদ স্বাভাবিক

এই উপাখ্যানটি ও শেষোদ্ধৃত অংশটুকু বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রের বচন লইয়া বিচার করিবার নানারূপ পদ্ধতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বিচার করিলে মীমাংসাও নানারূপ হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, এক ছাড়া দুইরূপ বা অন্যরূপ মীমাংসা হইতে পারে না। এরূপ মনে করা অন্যায়। শাস্ত্রের বাক্য কি? ঋষিদের অনুভব বা অভিজ্ঞতাই শাস্ত্রবাক্য। "গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ" ঋষিগণই বহুপ্রকারে অনুভব করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ...

মানুষে মানুষে অনুভব করিবারও বিভিন্নতা আছে এবং আমাদিগকে উদার হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং, নিজের সাম্প্রদায়িক মত লইয়া যেমন নিষ্ঠা-সহকারে সেই মতের আচরণ ও অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সেইরূপ অন্য প্রকারের অনুভব-প্রণালীও যে সত্য এবং স্বাভাবিক, শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আলোচনা করিয়া তাহাও বুঝিতে হইবে।

শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণেরই উপাসনা কর। যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারা বলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, আর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁহাদের বিলাস-মূর্ত্তি। এই একপ্রকারের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও অনুভব। কিন্তু, ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত নহে। অন্যরূপ সিদ্ধান্তও আছে। সেই সিদ্ধান্ত বা অনুভব কি, তাহা মহাপ্রভু ভট্টকে জানাইয়া দিলেন। ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। ভট্টের এতদিনের পোষিত ধর্ম্মমত নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে অন্যমতে বা নিজের মতে দীক্ষিত করিয়া নিজের দলের পুষ্টি করার অভিপ্রায় মহাপ্রভুর ছিল না। তিনি শাস্ত্রের সাহায্যে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ও তাহার পর ভট্টকে বলিলেন—তোমাকে এই নূতন মত লইতে হইবে না, তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের মত ছাড়িতে হইবে না। তোমার মত ও তোমার সম্প্রদায়ের মত সত্য এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া।

সে সিদ্ধান্ত কি, পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ গোপী ও লক্ষ্মীতে ভেদ নাই—তাঁহারাও স্বরূপে এক।

গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর, ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহ করে নানাকার রূপ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উদারমত ভট্ট বুঝিলেন। এই প্রকারের সিদ্ধান্তভেদ পূর্ব্বে

করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন ও বলিলেন—আমি ক্ষুদ্রজীব ও নিতান্তই পামর। আপনিই সেই কৃষ্ণ, আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বরের লীলা অগাধ, আমরা তাহার কিছুই জানিনা কিছুই বুঝি না। আমি সারাজীবন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের আরাধনা করিয়াছি। তাঁহারা আমার উপর পরিপূর্ণ কৃপা করিয়াছেন। সেই কৃপায় আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানাইলেন। এখন বুঝিলাম—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই ; আরও বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই সকলের উপরে। এই বলিয়া ভট্ট মহাপ্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন ; মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। চাতুর্ম্মাস্য শেষ হইয়া গেল ; মহাপ্রভু অন্যত্র যাইবেন। ভট্ট তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না, সঙ্গে চলিলেন। কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টকে বিদায় করিলেন।

৪। নবযুগের সাধনা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই অংশ পাঠ করিয়া বর্ত্তমান যুগে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই স্বাভাবিক।

ধর্ম্ম, ভগবান্ বা পরমার্থ, কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সুতরাং, যাঁহারা অন্য পথের বা অন্য মতের লোকের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সত্যধর্ম্মের পরিচয় এখনও পান নাই। তাঁহারা ভ্রান্ত ও অনুদার মত লইয়া জগতের ও নিজের অনিষ্ট করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ও সাম্প্রদায়িক মত-সমূহের মধ্যে একটি মিলনের ভূমি নির্ণয় করা বর্ত্তমান যুগে একান্তভাবে প্রয়োজন। ইহাই প্রধান সমস্যা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও কিরূপে বন্ধুর ন্যায়, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায়, হৃদয়গত অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, বর্ত্তমান যুগে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী-সম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া একটি পৃথক্ ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মত কি, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ কি, তাহা বলা

সুতরাং সে কথার আলোচনায় প্রয়োজন নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ভারতবর্ষে শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় শাখা বলিয়া পরিচিত। এখন দেখুন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায়ী হইলেও শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত নিষ্ঠাবান্ ভক্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, চারিমাসকাল তাঁহার সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া তাঁহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। ইহার ফলে কি হইল ? শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব তাঁহার নিজের মতেই দৃঢ়তর শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার মতের অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা ছিল, নিজের মতকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন, অন্যপ্রকারের অনুভব প্রণালী বা বিচার-প্রণালীর মধ্য দিয়া দেখিলে অন্যসম্প্রদায়ের মতও যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এই মত-সহিষ্ণুতা তাঁহার ছিল না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় নবযুগের সাধনার এই বৈশিষ্ট্যটি তিনি শিখিলেন।

অতএব, আমাদিগকে সকলপ্রকার ধর্ম্মমতেরই আলোচনা করিতে হইবে। এই যুগ মানবতার যুগ, শ্রীভগবানের নরলীলা-আস্বাদন করার যুগ। বর্ত্তমান যুগের মানুষ ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছে, 'বিশ্বমানব' একটি অখণ্ড পদার্থ। আমরা এই জগদ্ব্যাপী মানব-পরিবারে যে সম্প্রদায়ের গণ্ডি স্থাপন করিয়াছি, তাহা ব্যবহারিক—পারমার্থিক নহে। এই সম্প্রদায় ও ভেদ, প্রথমাবস্থায় প্রয়োজন, কিন্তু পরিশেষে অভেদেরই প্রতিষ্ঠা হইবে। জোর করিয়া এই ভেদ ভাঙ্গিতে পারিবে না, সেজন্য চেষ্টা করিও না। কিন্তু জানিয়া রাখ, এই ভেদ মহামিলনে যাইবার পথ। সকলেই আপন আপন সম্প্রদায়ে থাকিবেন, অথচ পূর্ণাঙ্গ মত-সহিষ্ণুতা ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই সার কথা।

আমাদিগকে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে হইবে। মানব জাতির ইতিহাসে যাহা কখন স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে। মানব জাতির ইতিহাসে বিশ্বনাথের লীলা হইতেছে। এই লীলার মধ্য দিয়াই আমরা লীলাময়কে পাইব। ইহাই নরলীলা। কিন্তু, গর্ব্বসহকারে আলোচনা করিলে আমরা নিজের ধর্ম্মমতও বুঝিতে পারিব না, অপরের ধর্ম্মমতও বুঝিতে পারিব না, পদে পদে কেবল বঞ্চিত হইব। চিত্তকে উদার ও মহৎ করিতে হইবে, শ্রদ্ধান্বিত ও বিনয়ী হইতে হইবে। শিক্ষার আলোক যে দিক হইতেই আসুক না কেন, হৃদয়ের সমস্ত

বরণ করিয়া লইতে হইবে। অহঙ্কারের নাম হৃদয়গ্রন্থি, অবিদ্যা হইতে ইহার উৎপত্তি ; যে-বিদ্যায় অমৃত লাভ হয়, সেই বিদ্যার শাণিত অস্ত্রে এই হৃদয়-গ্রন্থি—এই সংকীর্ণতা ও অনুদারতার অন্ধকারময় বেষ্টনী, ছিন্ন ও চূর্ণ করিতে হইবে। প্রাণকে আকাশের ন্যায় উদার ও নির্ম্মল করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, লীলাময়ের লীলানাটকের এক একটি দৃশ্য। এই সমুদয়ের যেখানে পূর্ণ-সমন্বয়, সেইখানেই তিনি।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনেক বিরোধ ও সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। একই ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও সম্প্রদায়, নিজেদের মধ্যে কতই না মারামারি, কাটাকাটি ও রক্তারক্তি করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলিই অবিদ্যার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহারা মানুষকে কি করিয়া মুক্তি দান করিবে ? আজ প্রয়োজন এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলিকে বন্ধন-মুক্ত করা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্তের পোষক বহু বহু প্রমাণ আছে। ইহা হইতে দেখা গেল যে বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যে উদার আদর্শ জগতে আসিয়াছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেই আদর্শ পরিপূর্ণরূপেই রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও পালক। বর্ত্তমান যুগের উন্নতিমুখী ও উদার ধর্ম্মবুদ্ধির আলোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ-সমূহের মর্ম্ম অবধারণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে। আচার্য্যগণ মনোযোগী হউন, ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

৫। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে এক নবপ্রেরণা ও জাগরণ দিয়াছিলেন। সেই প্রেরণায় বিহ্বল হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের এক নবীন আদর্শ প্রবর্ত্তিত করেন। এই আদর্শ বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। বাঙ্গালা দেশের এই সাধনফল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে—অসংখ্য নরনারী ধর্ম্মসাধনার এই আদর্শ ও প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে।

প্রবর্ত্তিত হয়। এই মণ্ডলী তাঁহার প্রকটকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই চারিশত বৎসরের মধ্যে অসংখ্য শাখামণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি, সাধনার যাহা প্রাণ তাহা চাপা পড়িয়াছে—নানারূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধে সত্যের সুনির্ম্মল আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়াছে।

আজ, স্বাধীনচিত্ত, সত্যান্বেষী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে এই বিরোধ-বিতণ্ডার কুয়াশা ভেদ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত ধর্ম্মমত ও শিক্ষা কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মহাপ্রভুর নামের দোহাই দিয়া যাহারা স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জনের সুবিধা করিয়া লইয়াছে, তাহাদের কথা শুনিয়া বঞ্চিত হইলে চলিবে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। যে সমুদয় গ্রন্থে তাঁহার কথা লিখিত আছে, সেই সমুদয় গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডার অনেক কথা মিশিয়া রহিয়াছে। অতএব অতিশয় সাবধানে আত্মবিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিয়া সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

প্রথম কথা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি একটি নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত করিয়া একটি নূতন ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিয়া, পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত অন্যান্য ধর্ম্মমত ও পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত ও পরস্পর বিবদমান অন্যান্য ধর্ম্মমণ্ডলীর সহিত বিরোধ করিতে আসিয়াছিলেন? ইহার উত্তর "না, না, না"—এ কার্য্য তিনি করিতে আসেন নাই এবং ইহা তাঁহার অভিপ্রায়ও ছিল না। অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া অথবা চতুর লোকেরা মানবকে বঞ্চনা করিয়া নিজেদের সুবিধা করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছে।

যে সমুদয় গ্রন্থে সে কালের সাম্প্রদায়িক ভাবের জন্য অনেক সন্দিগ্ধ কথা প্রবেশ করিয়াছে, সেই সমুদয় গ্রন্থের দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ করা যায়।

ব্রহ্ম হরিদাস যবন—কেহ বলেন যবনকুলেই জন্ম, আবার কেহ বলেন হিন্দুকুলে জন্ম, তবে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া যবন-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি যবন। হরিনামে তাঁহার সুতীব্র অনুরাগ, তিনি বৈষ্ণবাচারে থাকেন—প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করেন। তাঁহার উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছে। শেষে তাঁহার বিচার। মুলুকের অধিপতির নিকট বিচার। বিচারক বলিতেছেন—

কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি ॥
কতভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহা বংশজাত ॥
জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার ॥
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার ॥

শ্রীহরিদাস ইহার উত্তরে বলিলেন—

শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর ॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে-যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয় ॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন ॥
সে প্রভুর নামগুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র মতে ॥
যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভার লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয় ॥
এতেকে আমারে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াছেন চিত্তে করি আমি তেন ॥
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনিই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম

মহাশয়! তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদি খণ্ডের একাদশ অধ্যায় হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। ইহার সারকথা, প্রতি নরনারীর হৃদয়ে আত্মার অন্তর্যামী গুরুরূপী ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহার নামে ধর্ম্মবিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে। ইহাই সত্য ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্মের আলোকেই ভবিষ্যতে প্রকৃত ধর্ম্ম-সমন্বয় হইবে।

৬। ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উক্তি শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইল। ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে উদ্ধৃত অংশের অর্থ কি। অর্থ বেশ স্পষ্ট, সুতরাং একটু আলোচনা করা যাউক। হিন্দুর শাস্ত্র বেদ ও পুরাণ, যবনের শাস্ত্র কোরাণ। হরিদাস বলেন এই উভয় শাস্ত্রই সত্য, কোরাণও সত্য, পুরাণও সত্য। কিন্তু যে আলোকে তাহারা সত্য হইয়াছে, সে আলোক কোথায়? সে আলোক বাহিরে নাই। তোমরা যতক্ষণ বাহিরে সে আলোকের অন্বেষণ করিবে, ততক্ষণ সত্যের সাক্ষাৎ পাইবে না, মিথ্যার অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া কেবল বিরোধ করিবে।

সে আলো কোথায়? যে আলোতে কোরাণ ও পুরাণ বুঝিতে পারা যায়? হরিদাস বলিতেছেন, সেই আলোই ঈশ্বর। কোথায় সে ঈশ্বর? মস্‌জিদে খুঁজিতেছ, মন্দিরে খুঁজিতেছ। তোমরা উভয়েই বঞ্চিত। মস্‌জিদে নাই, বলি নাই; মন্দিরে নাই, তাহাও বলি নাই। কিন্তু, মস্‌জিদ ও মন্দির সত্য হইল, যে ঈশ্বরের আলোকে সে ঈশ্বর কোথায়? হরিদাস বলিতেছেন—ঈশ্বর এক, তিনি সকলেরই ঈশ্বর।

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥

ঈশ্বর প্রতি মানবের আত্মার অন্তর্যামী। নিজের ভিতরে সেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ কর, তাঁহার কথা শুন। ইহাই মানবের মুক্তি। যতক্ষণ না তাহা শুনিবে, ততক্ষণ বাহিরের মানুষের আর বাহিরের গ্রন্থের কথা শুনিয়া কেবল গুণ্ডামি করিবে, সত্যের পরিচয় পাইবে না।

হরিদাসের মতে প্রত্যেক মানুষ স্বরূপে স্বাধীন। মানুষের উপকার করিতে চাও? খুব ভাল কথা। কি করিলে তাহার প্রকৃত উপকার হইবে? তুমি ভাবিতেছ, তাহাকে কলমা পরাইয়া মস্‌জিদে লইয়া গেলে সে উদ্ধার হইবে; আর একজন ভাবিতেছে তাহাকে গির্জ্জায় লইয়া যীশু ভজাইলে সে স্বর্গে যাইবে, অনন্ত নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে; আর একজন ভাবিতেছে তাহার 'শুদ্ধি' করাইয়া হোম করিলে আর তাহাকে গায়ত্রী পড়াইলেই সে উদ্ধার হইবে। প্রকৃত কথা কিছুতেই কিছু হইবে না। এই সব পরামর্শ সংসারের দলাদলি-প্রিয় চতুর মানুষের। হরিদাস বলিতেছেন, প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা দাও। যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচারপূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতে পারে. তাহার ব্যবস্থা কর। সেইরূপ শিক্ষা দাও, সেইরূপ অন্নসংস্থান কর, সেইরূপ সামাজিক ব্যবস্থা ও আইনকানুন কর। আজ, যে অধিকাংশ মানুষ মানুষই নহে, তাহারা দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থায় প্রবলের ও চতুরের খাদ্য হইয়া রহিয়াছে। তাহার আবার ধর্ম্ম কি? আগে তাহাকে মানুষ কর। তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে শিখাও, তাহাকে উন্নততর বিষয় চিন্তা করিতে, অনুভব করিতে, ও বিচার করিতে শিখাও, তাহার পর সে স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম্ম বাছিয়া লইবে। আজি-কার ধর্ম্মমণ্ডলী-সমূহ যদি তাহা না করিতে পারে, সব চূর্ণ হউক, সব ধ্বংস হউক। প্রতি মানবের আত্মায় যখন পরমেশ্বর পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছেন, তখন ভয়ের কারণ নাই। মানুষ ধ্বংস হইবে না, সত্য-ধর্ম্ম ধ্বংস হইবে না।

হরিদাস ববিলতেছেন, কোন ব্রাহ্মণ যদি স্বেচ্ছায় যবন হয়, হিন্দুরা তাহার কি করে? হরিদাস ইঙ্গিতেও বলেন নাই, এই ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট বা এই ধর্ম্ম অপকৃষ্ট। তিনি বলিয়াছেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট, উভয়েরই শাস্ত্র উৎকৃষ্ট। শাস্ত্র ও ধর্ম্ম প্রচার কর। গালাগালি করিও না। মানুষকে স্বাধীনতা দাও। ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় মুসলমান হইতেছে, হিন্দুরা কি করিবে? আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু হইয়াছি। তোমরা বলিতেছ, আমি নরকে গিয়াছি আমি মরিয়াছি। আমি তর্ক করিতে আসি নাই। মানিলাম তোমাদের কথাই সত্য। মানিলাম, আমি মরিয়াছি। তবে আর আমাকে লইয়া টানাটানি কেন? আমার উপর অত্যাচারের আয়োজন কেন? যে আপন দোষে

হরিদাস ঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই। কোন মানুষকে কোন একটা ধর্ম্ম মতে দীক্ষিত করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম ও ভগবদনুভূতি তাহার নিজের আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং, ছলে, বলে, কৌশলে কতকগুলি মানুষকে একটা কোনও সাম্প্রদায়িক মতে দীক্ষিত করিয়া মণ্ডলী গড়িবার চেষ্টা যখন থাকিবে না—সেই সময়েই প্রকৃত ধর্ম্ম-সমন্বয় হইবে।

৭। নবযুগ ও তাহার সাধনা

বর্ত্তমানের দোষ অনেক, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানের উপর বিশ্বাস হারাইও না—কেবল বসিয়া বসিয়া বর্ত্তমানের নিন্দা করিয়া অলসভাবে এক কল্পিত অতীতের সুখস্বপ্নে ডুবিয়া থাকিও না। চক্ষু খুলিয়া দেখিতে হইবে, আজ জগৎ জুড়িয়া কি হইতেছে! আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানবের বিজয়-গৌরবের পতাকা উড়িতেছে। জড়-বিজ্ঞানের উন্নতিতে দেশগত ব্যবধান দূরীকৃত হইয়াছে, আজ মানুষ "ছয় দণ্ডে চ'লে যায় ছমাসের পথ!" পৃথিবীর দূরদূরান্তবাসী মানবগণ আজ অতি ক্ষিপ্র আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের সুবিধা পাইয়াছে। সমগ্র মানবজাতির প্রকৃত মহামিলন জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এখনও মানব, মানবতার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই, সেই জন্যই যুদ্ধ, প্রতিযোগিতা ও অবিশ্বাস,—সমগ্র পৃথিবী কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, এই অবস্থা, এই অবিশ্রাম সংঘর্ষ ও অশান্তি, অস্বাভাবিক; ইহা মানবের গভীরতম ও চিরন্তন প্রকৃতির বিরোধী। এখন, এমন দিন আসিতেছে, যখন মানব, হৃদয়ের দ্বারা পরস্পরকে চিনিতে পারিবে, বিশ্ব সৃষ্টির গূঢ় রহস্যসমূহ বুঝিতে পারিবে।

মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ,—করুণা ও স্নেহের সম্বন্ধ,—খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ নহে—দ্বেষ, হিংসা ও ক্রোধের সম্বন্ধ নহে। সুতরাং একজনের অমঙ্গলে অন্যান্য সকলের দুঃখ বোধ করা ও সেই অমঙ্গল বা দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষের সহিত এই সম্বন্ধ আত্মার ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহা স্বাভাবিক। 'মানব মাত্রেই আমি, জগতের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল' এই প্রকারের অনুভবই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অনুভব যে হয় না, তাহার কারণ আমরা

কাজেই আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রের রণ-নির্ঘোষের মধ্যেও প্রেমের মোহন বংশী বাজিতেছে, সেই বাঁশী শুনিয়া আমাদিগকে বৃন্দাবনের অন্বেষণ করিতে হইবে। বিশ্বপ্রেমই এই বৃন্দাবন।

বর্ত্তমান যুগে জড়-বিজ্ঞানের যেমন বিপুল উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, তেমনি ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, সাহিত্যিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ মানবে-মানবে যে কালগত ব্যবধান, তাহাও দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সুদূর অতীতের চিন্তা ও সাধনা, সকল দেশের ও সকল জাতির নিতান্ত প্রাথমিক যুগেরও চিন্তার ফল-সমূহ সযত্নে সংগৃহীত ও স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন কালের মানবের মধ্যে বাহিরে অনেক প্রকারের পার্থক্য ; কিন্তু এই বাহিরের পার্থক্য-সমূহের অন্তরালে এক সনাতন ঐক্য রহিয়াছে, এই সমুদয় আলোচনারদ্বারা মানুষ তাহা বুঝিতে পারিতেছে।

ধর্ম্মমত সমূহকে বৈজ্ঞানিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়া তাহাদের ভিতরের ঐক্য নির্দ্ধারণ করা বর্ত্তমান সময়ের উন্নত সাহিত্য ও দর্শনের একটি বিশেষ লক্ষণ। মানবীয় সাধনার ইতিহাসে এই যে যুগান্তর, ইহার মূলকথা মানবজাতির একত্ব বা বিশ্বজনীনতার উপলব্ধি। এ যুগের উন্নতচিত্ত মানবমাত্রেই অনুভব করিতেছেন, বিশ্বমানব একটি অখণ্ড বস্তু। আমরা তাহার ভিতর সম্প্রদায়ের ও ভেদের যে গণ্ডী গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহা ব্যবহারিক—পারমার্থিক নহে। আজ, এই ভেদের বাহিরে আসিয়া বিশ্ব-মানবের অখণ্ডত্ব ও ঐক্য অনুভব করিতে হইবে, ইহাই নবযুগের সাধনা। এই অখণ্ড বিশ্ব-মানবের মধ্য দিয়া নিখিল-রসামৃতসিন্ধু সচ্চিদানন্দ আপনাকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করিতেছেন। ইহারই নাম শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা—ইহাই সর্ব্বোত্তম। মানুষ, তুমি মানুষ চিনিলে না, মানুষকে আপন করিতে পারিলে না, তোমার ভগবদন্বেষণ নিষ্ফল,—তোমার ধর্ম্মসাধনাও পণ্ডশ্রম !

বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে সকল ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে হইবে। বিশ্বমানবের ইতিহাসে যাহা কখন স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে ; কারণ নিখিল মানবের বা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস বিশ্বনাথের লীলা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই লীলার নামই নামই 'নরলীলা'—এই নরলীলার মধ্য দিয়াই তিনি আমাদিগকে ধরা দিবেন।

এইবার আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, সকল ধর্ম্মের অপক্ষপাতে আলোচনা কি প্রকারে হইতে পারে? হিন্দু, হিন্দুত্বের গর্ব্ব হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের আলোচনা করিলে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র ধর্ম্ম-সাহিত্যের আলোচনা,—তাহা যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ধর্ম্ম জিনিষই তেমন নহে, যে কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠ দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব সমগ্রভাবে উপলব্ধি হইবে। ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মের অতি অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ মাত্র। উপাসকের হৃদয় ও আত্মা, শ্রদ্ধাবান ভক্তের ও সাধকের অনুভূতি ও আস্বাদন, গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। যদি হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের ভাষা নীরবে গ্রহণ করিতে পারা যায়, একটি প্রাণের উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি যদি নিঃশব্দে অপর হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সাধুর সংসর্গে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রকৃত উপলব্ধি হয়। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ"।

মুসলমান বা খ্রীস্টানের ধর্ম্মসাহিত্য, মুসলমান বা খৃষ্টান-সাধক কি ভাবে বুঝিয়াছেন, শাস্ত্রে যে সব তত্ত্বকথা আছে, সেই তত্ত্বকথা সমূহের দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে সামাজিক জীবনের, পারিবারিক জীবনের ও ব্যক্তিগত জীবনের সংস্কারসমূহ যাঁহাদের গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সমুদয় ভক্তের হৃদয় ঐ শাস্ত্রোক্ত ব্যাখ্যা-সমূহ কিভাবে গ্রহণ করে; ঐ শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ঐ ভক্তগণের হৃদয়ে কি প্রকারের ভাবের উদ্দীপনা হয়, তাহা আমরা যতক্ষণ নিজ নিজ হৃদয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিব, ততক্ষণ কি মুসলমান ধর্ম্ম, কি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম, আমরা সমগ্রভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিব না এবং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-সাধনার মধ্যে বিশ্বনাথের যে মহালীলার অভিনয় হইয়াছে, ও হইতেছে, সে লীলা আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে এবং আমরা সত্যের পূর্ণ আলোকে বঞ্চিত থাকিব।

অতএব, বর্ত্তমান যুগে মানবে মানবে বাহিরে কর্ম্মজীবনে যে মিলন হইয়াছে, ভিতরে ধর্ম্মজীবনে সেই মহামিলন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভাবুক ও ধর্ম্মপ্রাণ লোকের ভিতর যাহাতে সর্ব্বদা দেখা শুনা, মেলামেশা ও ধর্ম্মালোচনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন আমাদিগকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি পারশিক, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকল সম্প্রদায় ও সকল মতের সাধক ও উপাসকগণের নিকট, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের উচ্ছ্বাস ও সমাধির

সময়, তাঁহাদের হর্ষ ও পুলকের সময়, তাঁহাদের প্রেম, ভাব ও মহাভাবের সময়, তাঁহাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম ও প্রভাব হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রাণের মধ্যে, তাহার অন্তর্নিহিত রহস্যের মধ্যে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম।

চিত্তকে উদার ও মহৎ করিতে হইবে, শ্রদ্ধান্বিত ও বিনয়ী হইতে হইবে, শিক্ষার আলোক যে দিক হইতেই আসুক না কেন, সত্য যে বেশেই আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, হৃদয়ের সমস্ত দ্বার খুলিয়া রাখিতে হইবে, জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাহাকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। অহঙ্কারের নাম হৃদয়গ্রন্থি, অবিদ্যা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। যে বিদ্যায় অমৃত লাভ হয় সেই বিদ্যার শাণিত অস্ত্রে এই হৃদয়-গ্রন্থি, এই সংকীর্ণতা ও অনুদারতার অন্ধকারময় পরিধি, ছিন্ন ও চূর্ণ করিতে হইবে। প্রাণকে আকাশের ন্যায় উদার ও নির্ম্মল করিতে হইবে। পৃথিবীর অতীতের ও বর্ত্তমানের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, সেই অনন্ত লীলাময়ের সুমহান্ লীলানাটকের এক একটি দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সমস্তের যেখানে পূর্ণ সমন্বয়, সেইখানেই তিনি। ইহাই বিশ্বরূপের উপাসনা।

মানবজাতির ইতিহাসে একদিন ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনেক বিরোধ, অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, একই ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরিত হইয়াছে। আজ সকলকেই বুঝিতে হইবে, উহা মানব জাতির শৈশবের চপলতামাত্র। এখন মানবের মন যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এখন যে উজ্জ্বল আদর্শ মানবীয় সাধনার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে,—তাহার আলোকে এই বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িতাকে বালকসুলভ চপলতা ও অজ্ঞানতার ফল বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে, বিশ্বপ্রেম বা পরাভক্তি, একই কথা, আজ তাহারই প্রয়োজন। ভগবানে অবিচলিত বিশ্বাস। এই ভগবানকে প্রথমে সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আমাদের মূলমন্ত্র হইবে—

সত্যান্নাস্তি পরোধর্ম্মঃ ।

কিন্তু সত্যকে লাভ করিব কিরূপে—অখণ্ড মানবতার বা নরলীলার উপলব্ধি না হইলে, মানবে মানবে প্রেম অসম্ভব। প্রত্যেক মানুষই আমার প্রিয়, আমার আপনার। সে যে জাতির লোক হউক, যে ধর্ম্মের লোক হউক, যে দেশের লোক হউক, সে যখন

মানুষ, তখন সে আমার ভাই, তাহাকে আমি আমার আপনার বলিয়া ভালবাসিব—এই যে বিশ্বপ্রেমের সাধন, ইহাই যুগধর্ম্মের প্রথম সোপান।

অপক্ষপাতে ও শ্রদ্ধার সহিত পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী উদার-হৃদয় সাধকগণের সহিত মেলামেশা করিতে হইবে। বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি কোন বিদ্যাকেই উপেক্ষা করিব না। সকল বিদ্যারই আলোচনা করিব কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব, এই ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা একই পরাবিদ্যার নিম্নস্তরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অতএব বিজ্ঞানে ধর্ম্মে বা ধর্ম্মে রাজনীতিতে, বা সাহিত্যে ধর্ম্মে, সত্য সত্য কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মবিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

ইহা ছাড়া আর একটি কথা জানিতে হইবে; নতুবা যুগধর্ম্মের সাধনায় আমরা সফলতালাভ করিতে পারিব না। ধর্ম্মশাস্ত্রের—বিশেষতঃ, প্রাচীনকালের ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষাসমূহ বুঝিতে হইলে সাধনা আবশ্যক। আমাদের এখনও সমুদয় শক্তি বিকশিত হয় নাই। সাধু ও মহাপুরুষগণের অন্যরূপ দর্শনশক্তি ও অনুভবশক্তি ছিল এবং এখনও আছে। আমাদের তাহা নাই, এইজন্য তাঁহাদের সব কথা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা বুঝিতে না পারিয়া যদি ঐ সমুদয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত হইব। মহাপুরুষদের যে শক্তি বিকশিত হইয়াছিল, আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর সেই সমুদয় শক্তি বীজরূপে অবিকশিত অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদিগকে সেই সমুদয় শক্তি বিকশিত করিতে হইবে। সে জন্য সাধুসঙ্গ চাই, বিদ্যা চাই, সংযম ও তপস্যা চাই। ইহাই নবযুগের আধ্যাত্মিক সাধনা বা যুগধর্ম্ম।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত মানবগণের এই মহামিলনের দিনে, সকলকেই উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্ম-সাধনার যাহা বিশ্বজনীন আদর্শ, তাঁহা একটি কোন বিশেষ জাতির বা ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিহাসে পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। তবে, প্রত্যেকের ভিতরেই তাহা অব্যক্তাবস্থায় বীজরূপে রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্ম্ম নিজের পথে অগ্রসর হইয়া সেই বীজকে বিকশিত করিবে।

বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ, গণিতশাস্ত্রের ভাষায় এই প্রকারে বলা যাইতে পারে। জগতে যত ধর্ম্ম আছে, তাহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (H.

C. F. বা G. C. M,) সমন্বয়ের ভূমি নহে, পরন্তু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকই (L. C. M.) এই সমন্বয়। অভেদের মধ্যে ভেদ চিরদিন থাকিবে, ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। ভেদ ভাঙ্গিয়া অভেদ হইবে না, ভেদগুলিকে রাখিয়াই অভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সুতরাং এক ধর্ম্মের লোককে ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিও না, প্রত্যেকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হউক এবং অপরের সহিত প্রেমে মিলিত হউক। ইহাই ধর্ম্মসমন্বয়।

৭। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥"

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ১১ শ্লোক।

—যাহারা যে যে ভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সেই ভাবে তাহাদের ভজনা করিয়া থাকি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তন করে।

"আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
আমি সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

পৃথিবীর যত দেশের ও যত জাতির ইতিহাস পাওয়া যায়, সেগুলি আগাগোড়া পড়িলে দেখা যায়, চিরকাল—অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত,—মানুষে মানুষে কেবল লড়াই চলিতেছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ যুদ্ধই ধর্ম্মের নামে হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও উপদেষ্টা-গণের,—আবার একই ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচারক ও যাজকগণের সঙ্কীর্ণচিত্ততা ও ধর্ম্মান্ধতাই পৃথিবীর অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রধান হেতু। শ্রীভগবান্ প্রেমস্বরূপ, তাঁহার বিধান এই যে, প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষকে এবং যাবতীয় প্রাণীকে ভালবাসিবে।

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

ধর্ম্মযাজকগণ এবং সাম্প্রদায়িক মতের প্রচারক ও ব্যাখ্যাতাগণ, প্রত্যেকেই সেই

প্রেমময় ভগবানের প্রেমের ও নামের দোহাই দিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদেরই কার্য্য, উপদেশ, প্রেরণা ও পরামর্শের দ্বারা মানব-জগতের এই প্রেমের বন্ধন পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত হইতেছে ; যুদ্ধ-বিগ্রহ, নরহত্যা, রক্তারক্তি, আর তাহার আনুষঙ্গিক জালিয়াতি, জুয়াচুরি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দুর্নীতি কত যে চলিতেছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না !

সাধারণ মানুষ, যিনি কোন কৃত্রিম অন্ধসংস্কারে বদ্ধ নহেন, যিনি জগতের যাবতীয় ব্যাপার খোলাখুলি ও সোজাসুজিভাবে সহজ জ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে চাহেন, তিনি বুঝিতেই পারেন না, ধর্ম্মাচার্য্যেরা প্রেমময় ভগবানের দোহাই দেন, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, জগতের অশান্তি ও ক্লেশ দূর করিয়া পূর্ণ শান্তি ও প্রেম আনিতে চাহেন,—অথচ তাঁহারাই এমন সব ব্যাপার ঘটাইয়া তোলেন, যাহাতে জগতে অশান্তি, হিংসা ও পাপ বাড়িয়া যায় এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

পৃথিবীতে একদল সরলহৃদয় ভাল লোক আছেন, তাঁহারা কোন ধর্ম্ম মানেন না। কিন্তু তাঁহারা পণ্ডিত লোক, নানা বিষয়ের চর্চ্চা করেন, খুব চিন্তা করেন। তাঁহারা অজ্ঞেয়তাবাদী, স্বাধীন-চিন্তক বা নাস্তিক। তাঁহারা পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন, আর ঐ সব শাস্ত্রের ভিতর কোথায় কোথায় ঐক্য বা অনৈক্য আছে, তাহার আলোচনা করেন। তাঁহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়া এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে,—সব ধর্ম্মই আদিমযুগের মানুষের অজ্ঞানতা হইতে জন্মাইযাছে। প্রকৃতির নিয়মে নানা রকমের ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা, যেমন ঝটিকা, বন্যা, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রাঘাত প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই সব ব্যাপার দেখিয়া, আদিমযুগের অজ্ঞান মানুষের মনে খুবই ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হইত ;—ঐ যে ভয়, ও বিস্ময়—ইহাই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের মূল, ভিত্তি বা উদ্ভব-ভূমি। এই ভয়ই নানা-প্রকারের কল্পনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পল্লবিত হইয়াছে এবং তাহাতেই যাবতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি। ইহাই একালের নাস্তিক পণ্ডিতদিগের মীমাংসা।

এই সব নাস্তিক পণ্ডিত কোন ধর্ম্মই মানেন না, তাঁহারা প্রত্যেক ধর্ম্মমতই উপেক্ষা করেন ; কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাসসমূহের যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা খুব নিরপেক্ষভাবেই করিয়াছেন। কাজেই, তাঁহারা যাহা বলেন, একজন সাধারণ

ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক তাহার বিপক্ষে কিছুই বলিতে পারেন না। নাস্তিক পণ্ডিত যে সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করেন, একজন সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক যুক্তিতে পরাস্ত হইলেও, তাঁহার হৃদয় নাস্তিক পণ্ডিতের মীমাংসা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না। নাস্তিক পণ্ডিত বহু বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখাইলেন, পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, সর্ব্ব ধর্ম্মেরই মূল-কথা এক। ইহা হইতে তিনি মীমাংসা করিলেন যে, আদিম মানবের অজ্ঞানতা ও ভয় হইতে যাবতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণ হইতে কি ঠিক্ বিপরীত সিদ্ধান্ত করা যায় না? পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই মূল কথা যখন এক, তখন আমরা কি বলিতে পারি না যে এক জ্ঞানময় পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ই আদি-গুরু? তাঁহার বাণী, এক ঋষিসংঘ বা উন্নত সাধুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া জগতে আসিয়াছে? তাঁহার মূলবাণী এক, তবে সব দেশের মানুষের অধিকার, রুচি, হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি একরূপ নহে বলিয়া, সেই মূল, এক ও অদ্বিতীয় বাণী, মানব-সমাজে প্রচারিত হইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মূল সকলেরই এক। ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের একেবারে বদ্ধ অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা নাই, ধর্ম্মে যাঁহাদের কিছু কিছু নিষ্ঠা আছে, নাস্তিক পণ্ডিতদের নির্দ্ধারণ তাঁহারা বহুল পরিমাণে স্বীকার করিতে বাধ্য, কারণ ঐ নির্দ্ধারণ বহুল পরিমাণে সত্য। কিন্তু ঐ নির্দ্ধারণ অবলম্বন করিয়া নাস্তিক পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া ঠিক্ তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করিতে পারেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যে এ প্রকারের নিরপেক্ষ ও উদারমতাবলম্বী লোক বড়ই কম। পৃথিবীতে যাহারা ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মনে করে যে, আমার ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, আর যত ধর্ম্ম সবই মিথ্যা,—সবই কাল্পনিক। কাজেই পৃথিবীতে যাবতীয় ধর্ম্মের মূলেই যে এক পরম পুরুষের প্রেরণা, এবং একই ঋষিসংঘের হস্ত রহিয়াছে, ইহা তাহারা প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে চাহে না। বড়ই পরিতাপের বিষয়! নাস্তিক পণ্ডিতেরা বরং অনেক বিষয়ে ভাল, তাঁহাদের কিছু উদারতা আছে, কিন্তু নাম-মাত্র-ধর্ম্ম লইয়া অভিমানী হইয়া, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধতা লইয়া যাহারা বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের একেবারেই উদারতা নাই।

এখন, আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, সকল ধর্ম্মেরই মূল যদি এক, তাহা

হইলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এই দ্বন্দ্ব সম্ভব হইল কি প্রকারে এবং ধর্ম্মরাজ্যে বা ধর্ম্মের নামে এত অন্ধতা বা গোঁড়ামি কেন ? তাহার পর বিচার পূর্ব্বক উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম একই মূল স্কন্ধের ভিন্ন ভিন্ন শাখারূপে যে রহিয়াছে, তাহা কিরূপ। তাহার পর, প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতর হইতে সেই সাধারণ সত্য-সমূহ আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাদের দ্বারা যাবতীয় ধর্ম্ম এক পরম ঐক্যের মহাসূত্রে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে সমুদয় ধর্ম্ম অসংখ্য নরনারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যই সেই ধর্ম্মের নিজস্ব। এই নিজস্ব বা বৈশিষ্ট্য সুবিকশিত করিয়া, সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিগণ অন্যান্য দেশের ও অন্যান্য ধর্ম্মের লোককে দান করিয়া সমগ্র মানবজাতির উপকার করিবে, ইহাই বিশ্বনাথের ব্যবস্থা। এই বৈশিষ্ট্য যে-ধর্ম্মের নিজস্ব সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছাড়া অন্য কেহ তাহা মানবজাতিতে দিতে পারিবে না। প্রত্যেক ধর্ম্মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান সমূহের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই ধর্ম্মের যেটি বিশিষ্ট লক্ষণ বা নিজস্ব, সেই ধর্ম্মের শিক্ষায়, শাস্ত্রে, আচারে ও অনুষ্ঠানে, সেই লক্ষণটির উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারে একটি লক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়ায়; ক্রমশঃ সেই লক্ষণটিকেই এত বেশী বড় করিয়া ফেলা হয় যে, সমগ্রের ভূমি হইতে দেখিলে, বা ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ আদর্শের সাহায্যে আলোচনা করিলে মনে হয়, যেন বড় বেশী রকম বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে ; এবং তাহার ফলে অন্যান্য লক্ষণগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মের যাহা প্রাণের কথা, তাহার সহিত অনেক গৌণ, অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর কথা মিশিয়া যায়। ক্রমশঃ এমন হইয়া পড়ে যে, কোন্‌টি ধর্ম্মের প্রাণের কথা, আর কোন্‌টি তাহার আবরণ মাত্র, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন ও একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় লোকে ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া, সকল কথার সকল দিক্ ঠিকমত ধরিতে পারে না এবং ধর্ম্মজীবন একেবারে সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। এই প্রকারে ধর্ম্মের যাহা বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব লক্ষণ, তাহা কার্য্যতঃ প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত ধর্ম্মের বিপরীত হইয়া যায়। মানুষের সাধারণ জ্ঞান এত কম এবং তাহার সকল দিক্ দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি এতই অবিকশিত যে, মূলশিক্ষার এই বিকৃতি ও অধঃপতন সে ধরিতে পারে না। একটি মাত্র

উদাহরণ দিলেই কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা—ঈশ্বরের বিশ্বানুগত্ব (Immanence) অর্থাৎ ঈশ্বর, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল ভূতে ও সকল প্রাণীতে রহিয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা, আর এই শিক্ষারই অনুগত দ্বিতীয় শিক্ষা—"তত্ত্বমসি" বা "অহং ব্রহ্মোঽস্মি"—মানবের ঐক্য অর্থাৎ প্রত্যেক জীবই নিত্য কৃষ্ণদাস বা ব্রহ্মকণা—অস্ফুট সচ্চিদানন্দ। এই দুইটি সত্যই হিন্দু-ধর্ম্মের মূলীভূত বিশেষ শিক্ষা—এই দুইটি উপদেশই হিন্দু ধর্ম্মের নিজস্ব। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই দুই মহাশিক্ষা সত্ত্বেও, হিন্দুগণ ধর্ম্মের নামে কি করিতেছে? একদিকে হিন্দু-সমাজে বহুসংখ্যক নরনারী অস্পৃশ্য হইয়া উপেক্ষায় ও অপমানে পড়িয়া রহিয়াছে, আর একদিকে ধর্ম্মের নামে অসংখ্য জীবকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইতেছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "তত্ত্বমসি" যাহাদের ধর্ম্মের মূল শিক্ষা ও বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহাদের চিন্তা-প্রণালী ও বিচারণা-প্রণালী কি প্রকারে বক্রপথে অগ্রসর হইতে হইতে, ধর্ম্মের নামে এই অস্পৃশ্যতা ও জীবহিংসা প্রবর্ত্তিত করিল, তাহা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন।

এইবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অবস্থা দেখা যাউক। মহাত্মা খৃষ্টের জীবনাদর্শ যদি সত্য করিয়া গ্রহণ করাই খৃষ্টান ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীতে যাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রত্যেক মানুষে যাহাতে অপর মানুষের প্রতি সর্ব্বদা প্রেম ও সদিচ্ছা পোষণ করে, সেজন্য প্রত্যেক খৃষ্টানের প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু কি হইয়াছে? খৃষ্টান-দিগের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাব, অর্থাৎ 'আমি আমার'—এই ভাব এত বেশী রকম বাড়িয়া গিয়াছে যে, ইহা ঔচিত্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে; তাহার ফলে মানব-সমাজ ঘৃণিত পাপ ও দুর্নীতিতে পূর্ণ হইয়াছে। এখন, এমন অবস্থা যে, খৃষ্টানদের আত্মপুষ্টির অমিত লালসার জন্য, সমগ্র মানবজাতি বিব্রত ও বিপন্ন,—কাহারও শান্তিতে নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। এই প্রকারে প্রত্যেক ধর্ম্মেই, সেই ধর্ম্মের যেটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা, তাহাই লোকে ভুল বুঝিয়া এবং ক্রমে ক্রমে পুণ্যকে পাপে এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্মে—রূপান্তরিত করিয়াছে। এই কারণেই এত সংগ্রাম ও সংঘর্ষ! এই সংঘর্ষ নিবারণ করিতে হইলে, সহজ বুদ্ধির আলোকে প্রত্যেক ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, কতটুকুই বা প্রকৃত ধর্ম্ম, আর কতটুকুই বা প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত কালক্রমে বিজড়িত

আনুসঙ্গিক ভ্রান্তি ও কুসংস্কার। প্রত্যেক ধর্ম্মেই, বর্ত্তমান সময়ে এই দুই প্রকারের উপাদান রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ উপাদানকে পৃথক্ করিয়া দেখা ও বুঝা, বর্ত্তমান সময়ে একান্তভাবে আবশ্যক।

পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম্মমত ও সাধনপথ রহিয়াছে, ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাসও নানারূপ। অনেকে বলেন, যতদিন এই অনেক রকমের ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মের নামে মানবে মানবে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী! কিন্তু এই সিদ্ধান্ত, সত্য ও সঙ্গত নহে। পূর্ব্বে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিভিন্ন ধর্ম্মমতের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিলে, আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, বহু ধর্ম্ম ও বহু মত যে জগতে রহিয়াছে, ইহা অসুবিধা নহে—সুবিধা; ক্ষতি নহে,—লাভ; ইহাতে প্রত্যেক ধর্ম্মের ও সমগ্র মানবজাতির উপকার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক ধর্ম্মের একটি করিয়া বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব লক্ষণ আছে। এই বৈশিষ্ট্য যে ধর্ম্মের নিজস্ব, সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছাড়া, অন্য কেহ তাহা মানবজাতিকে দিতে পারিবে না। ভগবান্ অনন্ত, তাঁহার স্বরূপ বা সমগ্র মহিমা, কোন একজন মানুষ কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না। সেইরূপ কোনও একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়, সেই অনন্ত মহিমাময় ভগবানের সম্বন্ধে সকল কথা ধারণা করিতে ও প্রচার করিতে পারে না। এই কারণেই ভাগবত বলিয়াছেন—

ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।

যদিও এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু ঋষিগণ বহুভাবে তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভগবানও অনন্ত, বিশ্বও অনন্ত—অনন্ত বিশ্ব, অনন্ত বৈচিত্র্যময়। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের দর্পণই, সেই অনন্ত মহিমাময়ের প্রতিবিম্বপাতের উপযুক্ত। বোধ হয়, ইহাও ঠিক নহে—অগণ্য অসংখ্য বিশ্বও তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত করিতে অক্ষম। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেব

শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।

সহস্রবদন আদিদেব শেষ, গুণগান করিয়া মহিমার পার পান নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে নিম্নের সিদ্ধান্তটি স্বভাবতঃই হৃদয় মধ্যে উদিত হয়।

পারসিক ধর্ম্ম বা জরাথুস্ত্রা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের শিক্ষায় প্রত্যেক নরনারী ঈশ্বরের সৈনিক। এই ধর্ম্মে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবার ব্যবস্থা নাই। ঈশ্বরের কাজ করিয়া, সংস্কারকের ব্রত লইয়া, জীবনের ও সমাজের প্রত্যেক ব্যাপার সংশোধিত করিয়া, সংসারে সংসারী সাজিয়া বাস করিতে হইবে,—ইহাই পারসিক ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান ও অতুলনীয় শিক্ষা এই যে, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানকে নিজের ভ্রাতার ন্যায় দেখিবে। বৌদ্ধধর্ম্মে ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাধীনতা যেরূপ সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে, এমন আর অপর কোন ধর্ম্মে হয় নাই। জৈনধর্ম্ম বিশেষভাবে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, মানব নিম্নস্তরের জীবজন্তুগণের রক্ষাকর্ত্তা। জৈনধর্ম্মে এই শিক্ষাটী যেমনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীর অপর কোন ধর্ম্মে তেমন হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, প্রত্যেক নরনারী শ্রীভগবানের মূর্ত্তি। এই "নরলীলা"র শিক্ষা, হিন্দুধর্ম্মে যেমন সুপরিস্ফুট, অন্য কোন ধর্ম্মেই তেমন নহে।

আর এক প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করা যায় যায়। হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট শিক্ষা—ধর্ম্ম বা বিধি। পারসিক ধর্ম্মের পবিত্রতা (Purity), বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞান (Wisdom), খৃষ্টান ধর্ম্মের ত্যাগ (Sacrifice), মুসলমান ধর্ম্মের দাস্য ও আত্ম-নিবেদন (Submission)—এই গুণগুলি অবশ্য প্রত্যেক ধর্ম্মেরই সাধনায় আবশ্যক। প্রত্যেক ধর্ম্মেই এই সমুদয় সদ্‌গুণের বা দৈবীসম্পদের অনুশীলনের উপদেশ আছে। তবে, এক এক ধর্ম্ম এক একটী গুণের উপর খুব বেশী করিয়া জোর দিয়াছে ; এত বেশী করিয়া জোর দিয়াছে যে, সেই অতিরিক্ত জোরের জন্য, ঐ গুণটী ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌গুণগুলিরও অনুশীলন যে একান্তভাবে আবশ্যক, তাহা মানুষ অনেক সময়েই ভুলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের যাবতীয় মহাসত্য প্রত্যেক ধর্ম্মেই আছে, এগুলি কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মের একচেটিয়া নিজস্ব সম্পদ নহে। মানুষ যদি এই কথাটী যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহা হইলেই, বিরোধ ও সংঘর্ষের অবসান হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনার ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহাদের বাহিরের আবরণে নানারূপ প্রভেদ থাকিলেও,

ধর্ম্মেরই সাধারণ সম্পত্তি। "ক্রুশ" চিহ্নটি কেবল মাত্র খৃষ্টানদিগেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই চিহ্নটির ব্যবহার, পূর্ব্বকালে এট্রুরিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ, চ্যালডিয়া, আসিরিয়া, মেক্সিকো, স্কাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ছিল। পঞ্চবিন্দুযুক্ত নক্ষত্র এবং একত্র-গ্রথিত যুগ্মত্রিভুজ প্রভৃতি চিহ্নও তাহাই, অর্থাৎ ইহারা একটি কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিজস্ব নহে। ঈশ্বরের একত্ব, ত্রিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের প্রকাশ, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির সাহায্যে বিশ্বের শাসন ও পরিচালন, মানব প্রকৃতির দিব্যভাব, সকল জীবের ক্রমোন্নতি প্রভৃতির কথা, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মেই আছে। ধর্ম্মের অন্তর্গত পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহও যাবতীয় ধর্ম্মে প্রায় একরূপ। এই সব সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, বিরোধ ও সংঘর্ষের কারণ কি ? রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবের যাবতীয় চিন্তা ও চেষ্টাক্ষেত্রে আজ এক নবযুগ উপস্থিত হইতেছে। যাবতীয় বৈষম্য ও স্বার্থ-সংঘর্ষ দূর করিয়া যাহাতে মিলন হয়, সেজন্য সর্ব্বত্রই চেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে। ইহাই নবযুগের সাধনা। ধর্ম্মক্ষেত্রই মানবীয় সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও মহৎ ক্ষেত্র। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, এই ধর্ম্ম-সাধনার ক্ষেত্রে কি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে না ? নিশ্চয়ই হইবে, না হইয়াই পারে না। কিন্তু ধর্ম্মে ধর্ম্মে মৈত্রী-স্থাপন, ব্যাপারটা কি, এবং কিরূপেই বা তাহা হইতে পারে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে না বুঝিলে, ইহা কি প্রকারে হইবে ?

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী হয় না কেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কেবলই বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতেছে কেন ? তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

ইহার প্রধান কারণ—আমাদের প্রায় কাহারও ধর্ম্ম ব্যক্তিগত (personal) ও মৌলিক (original) ধর্ম্ম নহে। আমাদের অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম্ম কোনও প্রতিষ্ঠান বা মণ্ডলী-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত (Institutional) ; কাজেই ইহা কর্জ্জ-করা ধর্ম্ম (second-hand)। 'আধ্যাত্মিক প্রেরণা' বলিয়া মানব-প্রকৃতিতে একটা বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি যাহাতে প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে জাগরিত ও ক্রিয়ান্বিত হয়, সেজন্য রীতিমত ব্যবস্থা দরকার। এই প্রেরণা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে ঠিক্ একইভাবে ক্রিয়া করে না ;

প্রকারে এই প্রেরণা কার্য্য করে বা প্রকাশিত হয়, তাহার আলোচনা প্রয়োজন। এই প্রকারের আলোচনা যদি মানবের সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলেই মানবের প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা হইবে।

এখন জগতে যাহা চলিতেছে, তাহা ঠিক্ তাহার বিপরীত। ধর্ম্মজগৎ কতকগুলি বড় বড় মণ্ডলীতে বিভক্ত। প্রত্যেক মণ্ডলীই প্রবল—ত্যাগে, জ্ঞানে, বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে নহে, পার্থিব বৈভবে প্রত্যেক মণ্ডলীই শক্তিশালী। প্রত্যেক মণ্ডলীই দাবী করে,—আমাদের মতই একমাত্র সত্য মত, আমরাই স্বর্গের দ্বাররক্ষক, আমাদের শরণাগত না হইলে, মানুষের পরিত্রাণের উপায় নাই। প্রত্যেক মণ্ডলীরই কতকগুলি করিয়া ভাড়াটিয়া গুণ্ডা আছে। এই গুণ্ডারা অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত, উদার অনুশীলন, (Liberal culture) বা সত্যানুসন্ধিৎসা ইহাদের নাই। সুতরাং, ইহারা সর্ব্ববিধ অপকর্ম্ম অম্লানবদনে করিতে পারে। ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানুষ নিজের ধর্ম্মমণ্ডলীর পার্থিব স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের দোহাই দিয়া নর-হত্যা, জালিয়াতি, জুয়াচুরি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পাপ অম্লানবদনে আচরণ করিয়াছে, এবং এখনও করিতেছে!

এখন ধর্ম্মকে এই সব শক্তিশালী মণ্ডলীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে হইবে। কিন্তু কে পরিত্রাণ করিবে? এখনও যে বড় বড় শক্তিশালী ধর্ম্ম-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে! এখনও নানারূপ অলৌকিক উপন্যাস রচনা করিয়া, সরলচিত্ত মানুষকে মণ্ডলীর অন্তভুক্ত করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মমণ্ডলী, নিজ নিজ পার্থিব বৈভব বাড়াইয়া চলিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মের গ্লানি।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ও বুঝিয়া, সাধুসঙ্গের প্রভাবে মানুষের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের উপর মানুষকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না, তাহাকে ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া, নানারূপ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া, এমন কি, অনেক সময়ে জোর করিয়া মানুষকে এক ধর্ম্ম হইতে অপর ধর্ম্মে গ্রহণ করা হয়, এখনও ইহা চলিতেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এখন প্রতিষ্ঠান-মূলক, বা মণ্ডলী-শাসিত, ধর্ম্ম হইয়াছে।

ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই উপাখ্যান হইতে, বুঝিতে পারা যাইবে, ভিতর হইতে স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক বিকাশের ফলে, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কেহ কোন মত না লইলে, তাহাকে সেই মত লইতে দেওয়া উচিত নহে।

দক্ষিণ প্রদেশে তীর্থ ভ্রমণের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'সিদ্ধবট' নামক একটি তীর্থ স্থানে গিয়াছিলেন। এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই রামনাম জপ করিতেন, রামনাম ভিন্ন তিনি অন্য কথা বলিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধবট তীর্থে এই ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। কিছুদিন অন্যান্য তীর্থে পর্য্যটন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার সিদ্ধবটে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম জপ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন —তোমার এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?

ব্রাহ্মণ উত্তরে বলিলেন—

"এই তোমার দর্শন প্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥"

আমি চিরকাল রামনাম করিতাম, কিন্তু দেখিয়া অবধি আমার জিহ্বায় রামনামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনাম স্ফূরিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই স্থলে, নামমহিমা-সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এখানে ইহাই বুঝিব, ঐ নিষ্ঠাবান্ রাম-উপাসক ব্রাহ্মণের মত বদ্‌লাইয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনায় দীক্ষিত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একেবারেই কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বরং, ব্রাহ্মণের রামনামে নিরতিশয় শ্রদ্ধা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া, তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণের মত, আপনা আপনি ভিতর হইতে বদ্‌লাইয়া গেল, তিনি রামনামের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণনাম' জপ করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য ও সংবাদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—ইংরাজী ১৯২৬, ২৩শে ডিসেম্বর, বাঙ্গালা ৮ই পৌষ ১৩৩৩, দিল্লী নগরে আর্য্যসমাজের সুপ্রসিদ্ধ সাধু, ভারতের সর্ব্বজনসম্মানিত জননায়ক একসপ্ততি-বর্ষ বয়স্ক শ্রীমৎ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে আব্দার রশিদ নামক একজন গুপ্তঘাতক গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। স্বামীজি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন; হত্যাকারী ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিব বলিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া এই নৃশংস কার্য্য করিয়াছে। দেশের লোক সকলেই কাঁদিতেছে, উন্নতচিত্ত মুসলমানেরাও দুঃখিত। ভারতবর্ষের ভাগ্যে এখনও যে এই প্রকারের কত দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা বিধাতাই জানেন॥ অশ্রুপাতের সময় নাই; 'কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম'—ইহাই যুগবাণী।

বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহাপুরুষের সুপবিত্র শোণিতের প্রয়োজন ছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দই উপযুক্ততম পাত্র; কাজেই তাঁহাকে ঘাতকের হস্তে দেহপাত করিতে হইয়াছে। এই মহাপুরুষ-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১। তিনি অনায়াসেই খুব বড় রাজনীতিক নেতা হইতে পারিতেন; কিন্তু গঠনমূলক-কার্য্যই বেশী প্রয়োজন বলিয়া, সেই দিকেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

২। কিন্তু তিনি কখনই উন্নতিমুখী রাজনীতিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন না; যখনই আবশ্যক হইয়াছে, এবং যখনই নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির অনুমোদিত মনে করিয়াছেন, তখনই রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন।

৩। হিন্দু-মহাসভা যখন কংগ্রেসের বিরোধী হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক ভাব-সম্পন্ন প্রতিনিধি পাঠাইতে চেষ্টিত হইলেন, তখন তিনি প্রকাশ্যভাবেই হিন্দু মহাসভা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

৪। প্রথমাবস্থায় হিন্দু মহাসভা যখন অতিরিক্ত রাজভক্তগণের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল, তখন্ত তিনি আহূত হইয়াও তাহাতে যোগদান করেন নাই। তাঁহার নিজের ভিতরে যে সত্য ছিল, তিনি সেই সত্যেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সাংসারিক সুবিধার দিকে চাহিয়া নিজের ভিতরের সেই সত্যের অবমাননা করেন নাই। নিজের Intrinsic worth বা স্বরূপগত মূল্য লইয়াই চলিয়াছিলেন, কাহারও বামে বসিয়া Local worth বা স্থানগত দাম বাড়াইবার চেষ্টা করেন নাই।

একজন দুর্বৃত্ত নরপিশাচ, মহাত্মা শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করিয়াছে, একথা বলিলে, ভুল বলা

জীর্ণ ও শক্তিহীন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ মৈত্রীর পরিবর্ত্তে হিংসার বিষানল প্রজ্বলিত; সেই অনল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আহুতি-স্বরূপে সমর্পিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—দেশবাসীর পাপের বিরুদ্ধে মহাপ্রাণের বলিদান, ইহা প্রায়শ্চিত্ত।

স্বামীজির জীবন-কথা—বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক 'শক্তি' হইতে নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত হইল—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জলন্ধর জেলায় তালবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল—লীলা মুন্সীরাম। তাঁহার পিতা, কাশীর পুলিসের ইনস্পেক্টর ছিলেন। স্বামীজী তথায়ই শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি উকীল হন এবং বহুকাল জলন্ধরে ওকালতী করেন। স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর তিনি আর্য্যসমাজে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই আর্য্য সমাজের প্রধান নেতা মনোনীত হন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় গুরুকুলের উদ্বোধন হয়।

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোর প্রতিবাদ হয়, তখন তিনি সেই প্রতিবাদে যোগ দেন। রাউলাট আইন প্রতিবাদ কল্পে ইনি দিল্লীতে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। দিল্লীতে জনসাধারণ যখন ঘোর প্রতিবাদ করিতেছিল, সেই সময় পুলিসের সহিত তাহাদের হাঙ্গামা হয়। সে সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অকুতোভয়ে পুলিসের বন্দুকের নিকট বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের পর তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত অসহযোগ আন্দোলন প্রচারে ব্রতী হন। সে সময় হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

অতঃপর তিনি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া হিন্দু-সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু অন্য ধর্ম্মের লোককে হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত করিবার রীতি না থাকায়, হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। তিনি দেখিলেন যে, যদি হিন্দু সমাজের এই ক্ষয় রোধ করা না যায়, তবে হিন্দু জাতির ধ্বংশ অনিবার্য্য। তখন তিনি শুদ্ধি-আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে আসগরী বেগম নাম্নী জনৈক বিদূষী মুসলমান মহিলা আসিয়া স্বামীজীর আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই মহিলা শান্তিদেবীর ধর্ম্মান্তর সম্পর্কে স্বামীজীর বিরুদ্ধে এক মামলা হয়। মামলায় স্বামীজী বে-কসুর খালাস পান।

তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে অসবর্ণ বিবাহ দেন। তিনি জলন্ধরে বালিকাদের জন্য কন্যা-মহাবিদ্যালয় নামে একটী কলেজ স্থাপন করেন।

স্বামীজীর দুই পুত্র এবং এক কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র—তিনি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের

সেক্রেটারী। বর্ত্তমানে তিনি কোথায় আছেন জানা নাই। দ্বিতীয় পুত্র—পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'অর্জ্জুন'-পত্রিকার সম্পাদক। কন্যাটী জীবিত নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বাংলার হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট যাহাতে কংগ্রেসে গৃহীত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের কথা—দেশবন্ধু দাস এমন একটা কাজ করিয়াছিলেন, যাহাকে লোকে বলিবে—তাঁহার ভুল অথবা তাঁহার পাপ। আরও বলিবে, এই ভুল বা এই পাপের ফলেই, আজ বাঙ্গালাদেশে কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরিণাম, এই জঘন্য দলাদলি! আমরা পাপ বলিব না। আমরা বলিব—তিনি সঙ্কটের সদুপায় বলিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বাধ্য হইয়াই করিয়াছিলেন, Emergency measures রূপে তাহা করিয়াছিলেন।

অতি সাধারণ সংসারী লোক, জীবনে কখনও কোন উচ্চনীতির ধারও ধারে না, এমন লোকও দেশবন্ধুর অনুগত হইয়াছিল, টাকা দিয়াছিল, কিছু খাটিয়াছিল, এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়া দশজনের মধ্যে এমন একজন হইয়াছিল, যাহা তাহারা কখনও কিছুতেই হইতে পারিত না। ক্রীতদাসের মনোবৃত্তির পূর্ণতম বিকাশ যাহাদের চরিত্রে দেখা গিয়াছে, তাহারাও দেশবন্ধুর দলে মিশিয়া হঠাৎ রাতারাতি বেজায় রকম বড় হইয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু থাকিলে কি হইত, ভগবান্‌ই জানেন, কিন্তু এই সব লোক দেশহিতৈষণার ত্যাগমন্ত্র-পূত পতাকাতলে মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই, আজ বাঙ্গালা দেশে কংগ্রেসে গজকচ্ছপের যুদ্ধ হইতেছে।

একদিন যাহারা বা না বুঝিয়া দেশের কল্যাণ করিবার জন্য জীবন পণ করিয়া বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, তাহারাও নাকি ধনীর দুয়ারে আজ বিক্রীত। দুরদৃষ্ট কেবল তাহাদের নহে—আমাদের সকলের।

জাতীয় শিক্ষা—কুড়ি বৎসর কাল, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে দল বাঁধিয়া আন্দোলন চলিতেছে; অনেক বদান্য ব্যক্তি টাকাও দিয়াছেন, খরচও হইয়াছে নিতান্ত কম নয়, কিন্তু আমাদের এই জাতির প্রকৃত শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা বাঙ্গালা দেশে নাই বলিলেও হয়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর মূলে একটা আদর্শ আছে, ঐ আদর্শ হয়ত জাতির পক্ষে হিতকর, অথবা হয়ত উহাই জাতীয় আদর্শ; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের সহিত পূর্ব্বোক্ত আন্দোলনের কোনরূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং জাতীয় শিক্ষা কোথায়?

জাতীয় শিক্ষার নামে সংগৃহীত টাকার ব্যয় বিধানের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া যাঁহারা পদস্থ হইয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই চেষ্টা করিবেন, যাহাতে এই প্রশ্ন না উঠে। জাতি বা দেশের সত্তাও নাই, চৈতন্যও নাই; সুতরাং সেদিক্ হইতে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না, তবে ভবিষ্যতে উঠিতে পারে। যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার জন্য বড় বড় স্থায়ী দান করিয়াছেন, তাঁহারা বা

তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা এই প্রশ্ন করেন না কেন? তাঁহাদের কি এ প্রকারের প্রশ্ন করার অধিকার নাই?

যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয়—প্রচলিত শিক্ষার সাহায্যে আমরা যে উপযুক্ততা লাভ করি, তাহা বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিককেই সাহায্য করে, তাহাতে দেশের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই হয় বেশী। এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদরূপেই জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন। যাদবপুরের পূর্ত্তবিদ্যালয়ই যদি এই আন্দোলনের একমাত্র ফল হয়, তাহা হইলে ঠিক্ কি হইল, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি, বিদেশী বণিকের জন্য কেরাণী তৈয়ারীর কারখানা বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে, কিন্তু এখন বিদেশী কলওয়ালার জন্য মিস্ত্রি তৈয়ারীর কারখানার নাম দেওয়া হইয়াছে—"জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ"। পুরাতনে যে আপত্তি ছিল, নূতনে সে আপত্তি বেশী পরিমাণেই আছে। ছেলেরা মানুষ হয় না, বাবু হয়; এই যে আপত্তি ইহার খণ্ডন হয় নাই, শিক্ষা সুলভও হয় নাই, দেশমুখীও হয় নাই।

আশার কথা—দু একজন ত্যাগশীল কর্ম্মী মফঃস্বলে থাকিয়া প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন। আমি যেগুলি দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ কুশারি মহাশয়ের সত্যাশ্রম একটি। এই আশ্রম ঢাকা বিক্রমপুরের মধ্যে বাহেরক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। আর একটির প্রবর্ত্তক ও পরিচালক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। ইনিও বিক্রমপুরের লোক—বিক্রমপুরেই আশ্রম করিয়াছিলেন। নদীর ভাঙ্গনে বিক্রমপুর ছাড়িয়া শ্রীহট্ট জেলায় আশ্রম করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও ত্যাগশীল কর্ম্মী। ইঁহারা নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াও ব্রত পরিপালন করিতেছেন—তাঁহাদের সংবাদ রাখে কে?

প্রকৃত শিক্ষক—জাতীয়বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মহাত্মা গান্ধীকে পত্র লিখিয়াছিলেন,—"আমরা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছি, কিন্তু আমাদের পরিবারবর্গ খাইতে পায় না, আমরা দেনার জ্বালায় অস্থির, কি করিয়া কাজ করি?" মহাত্মা উত্তর দিলেন—"এই অভাব ও ক্লেশ সহিতেই হইবে।" মহাত্মাজীর উত্তর খুবই সাধু, তবে আরও বিস্তারিত হইলে ভাল হইত। উত্তর এই,—শিক্ষক হইবার যোগ্যতা সকলের নাই, জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া বর্ত্তমান সময়ে খুবই কঠিন। সুবিধার রাস্তায় সস্তায় বড় হইব বলিয়া, যাহারা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহারা সেদিকে সুবিধা করিতে না পারিয়া, জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইলে তাহাদের দ্বারা জাতীয় শিক্ষা কিরূপ চলিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। জাতি কি, তাহার শিক্ষা কি, তপস্যার দ্বারা তাহা জানিতে

জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন বলিতে, কেবল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই বুঝায় না। গ্রন্থ-রচনা, সংবাদপত্র প্রচার, পাঠাগার, বক্তৃতাগার স্থাপন প্রভৃতি সকল কার্য্যই জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায়। দেশে এখনও যেটুকু জাতীয় শিক্ষা আছে, সেগুলির উপর জাতির অভিনব আকাঙ্ক্ষার প্রভাব বিস্তার আরও বড় কার্য্য ; দেশের তীর্থস্থানগুলির সংস্কার করিয়া সেগুলিকে নবযুগের উপযোগী করা আরও বড় কাজ। কিন্তু এই সব আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। যদি আরম্ভ হয়, তাহা হইলেও বাঙ্গালাদেশে কাজ হইবে না, কারণ দেশে কোন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে একদল লোক—চতুর ও বিচক্ষণ, সেই কাজের দালাল হইয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত সুবিধা করিয়া লইবে এবং হয় কাজ পণ্ড করিবে, নতুবা কর্ম্মের নামে একটা কর্ম্মাভাস বা ছলকর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া ভগবানের চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমান সময়ে লোকহিতকর যে সব কাজ চলিতেছে, তাহার ভিতর অনেকগুলিরই প্রকৃতি এইরূপ।

চান্দুরা ও যশোদলের গোস্বামী-বংশ—১৩৩৩ সালের ৭ই মাঘ তারিখের "কিশোরগঞ্জ বার্ত্তাবহ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে নিম্নের অংশটুকু পুনর্মুদ্রিত হইল—

"ময়মনসিংহের অন্তর্গত চান্দুরা ও যশোদলের গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমদ্ মাধবাচার্য্যের বংশধর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুসারে, এই মাধবাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনলীলার মাধবী সখি, বিশাখা-যূথের অন্তর্গত ; সুতরাং বাংলার বৈষ্ণব সমাজে মাধবাচার্য্য ও তাঁহার বংশধরগণের স্থান যে অতি উচ্চ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ময়মনসিংহ, মালদহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় এই গোস্বামীগণের অসংখ্য শিষ্য আছেন। স্থানীয় হিন্দু সমাজে সদাচার সম্পন্ন বলিয়া এই গোস্বামী মহোদয়গণের সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট রহিয়াছে এবং ইঁহারা সকলেই এতদঞ্চলের বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশ সমূহের সহিত কুলসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে সকল দিকেই বিপ্লব চলিতেছে ; এই বিপ্লবে অনেক সুযোগ্য ও অধিকারী ব্যক্তি অধিকারচ্যুত হইতেছেন, আর অনেক অযোগ্য অনধিকারী চতুর ব্যক্তি পদস্থ ও অধিকারী হইয়া উঠিতেছেন। শ্রীমদ্ মাধবাচার্য্যের বংশধর গোস্বামী মহাশয়গণের ঔদাসীন্যে ও অসাবধানতা বশতঃ তাঁহাদের নানা দিকেই ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে। এই মাধবাচার্য্যই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কোন কোন ঐতিহাসিক ভুলক্রমে এবং প্রমাণ সমূহ সম্যক্ না দেখিয়াই, বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারভুক্ত আর এক মাধবাচার্য্যকে 'কৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর একদল চতুর ও ব্যবসায়ী ধর্ম্মযাজক এই গোস্বামীগণের শিষ্য কাড়িয়া লইবার জন্য স্থানে স্থানে প্রচার করিয়াছে যে,

এই গোস্বামীগণ "চূড়াধারী" নামক পরিত্যক্ত পরিবার। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এই মিথ্যা কথা প্রচারিত হওয়ায় অনেকের মনে ইঁহাদের কুলজী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। বাস্তবিক 'চূড়াধারী' নামক পরিত্যক্ত বৈষ্ণব পরিবার মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর নামক স্থানে এখনও আছেন। তাঁহাদের মোহান্তগণ এখনও চূড়া ধারণ করিয়া থাকেন। চান্দুরার গোস্বামীগণের একজন পূর্ব্ব-পুরুষ শ্রীবৃন্দাবনে চূড়াধারী সম্প্রদায়ের একটি গৃহ বা কুঞ্জ ক্রয় করিয়াছিলেন। চূড়াধারী-সম্প্রদায়ের সহিত এই সম্পর্ক উল্লেখ করিয়াই এই মিথ্যা অপবাদ রাষ্ট্র করা হইয়াছে। এই ব্যাপারের জন্য গোস্বামিগণেরও দায়িত্ব আছে। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহাদের এতদিনের এত উচ্চ সম্মান, ঔদাসীন্য বশতঃ তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহারাই মুখ্যতঃ দায়ী। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত, সক্ষম ও ধনী ব্যক্তির অভাব নাই,—তাঁহারা একতাবদ্ধ হউন।

এই বিপ্লবের মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের উদার ও মহৎ ধর্ম্ম, আচার, শাস্ত্র ও সাধনা কি প্রকারে রক্ষা করিবেন, সে বিষয়ে চিন্তা করুন। নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব স্মরণ করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে প্রকৃষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হউন।

সুখের বিষয়, এই বিষয়ে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে মনোযোগী হইয়াছেন। এবৎসর চান্দুরা ও যশোদল উভয় গ্রামেই শ্রীমদ্ মাধবাচার্য্য প্রভুর তিরোভাব তিথিতে উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখাবংশীয় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুন্দপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন। চান্দুরা গ্রামে ৪দিন, যশোদলে ৩দিন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন, প্রেমধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা, লীলারহস্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ও কথোপকথন দ্বারা নানারূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ অনেক উপাধিধারী পণ্ডিত ও ধর্ম্মানুরাগী ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি, এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ মাধবাচার্য্য-বিরচিত 'প্রেমরত্নাকর' নামক সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের কোন কোন ঐতিহাসিক, এই গ্রন্থকে কাব্য-গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এবারকার সভায় স্থির হইয়াছে যে, এই গ্রন্থখানি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সুসম্পাদিত হইয়া অচিরেই প্রকাশিত হইবে। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের'ও একটি উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। 'প্রেমরত্নাকর' গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যে বদান্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আংশিক সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

চলিতেছে। নবদ্বীপ ধামেও চান্দুবার স্বর্গীয় বৃন্দাবন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত "মাধবাচার্য্য কুঞ্জ", এই গোস্বামী পরিবারের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

এই সমুদয় কার্য্য ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবন ধামে, পুরী ও নবদ্বীপ ধামে গোস্বামীগণের যাতায়াত করা, কুঞ্জ রক্ষা করা এবং বৃহত্তর বৈষ্ণব সমাজের সহিত মেলামেশা করা এবং পরিবারস্থ বালক ও যুবকগণকে বৈষ্ণব ও ভক্তি-শাস্ত্রে এবং আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। আমরা আশা করি তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়া এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।"

তারকেশ্বর ও ব্রাহ্মণ সভা তারকেশ্বরের ব্যাপারে অনেকেই ব্রাহ্মণসভার কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু ভিতরের কথা অনেকেই জানেন না। যে সব ত্যাগী দেশকর্ম্মী তারকেশ্বরের গোলযোগের সময় স্বরাজপক্ষে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেকে ইহার ভিতরের কথা জানেন না বলিয়াই মনে হয়। সত্য কথা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। ২১শে মাঘ তারিখের 'হিতবাদী'-পত্রে কয়েকটি ভিতরের কথা বাহির হইয়াছে; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল। যাঁহারা ব্রাহ্মণ-সভার কার্য্যের নিন্দা করেন, এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছু বলিবার থাকিলে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। সত্য কথা প্রচারিত হউক, মিথ্যা ও চাতুরী বিধ্বস্ত হউক, দেশের জনসাধারণের মত সত্যের আলোকে গড়িয়া উঠুক :—

'দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জন দাশ' তারকেশ্বরের মোহান্তের সহিত তারকেশ্বরের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে মিটমাট করিয়াছিলেন, তাহাতে তারকেশ্বরের সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে ৩০ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি মাত্র দেবোত্তররূপে পরিগণিত হইত এবং অন্য সমস্ত সম্পত্তিই মোহান্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-রূপে পরিণত হইত। এই বন্দোবস্তে, আরা ও বালিয়া জেলায় মোহান্তের যে সম্পত্তি থাকিত, তাহার আয় প্রায় ৪১ হাজার টাকা। তদ্ব্যতীত, ৭৷৷৹ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও ওয়ার-বণ্ড মোহান্তের নিজ সম্পত্তি রূপে পরিণত হইত। মোটের উপর, এই বন্দোবস্তে মোহান্তের বার্ষিক আয় ৩লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইত। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানীর কাগজের আয়ও মোহান্তের নিজেরই থাকিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন এই সকল ব্যাপার বিশেষরূপে জানিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ-সভা যখন এই মোকদ্দমায় বাদী হইবার জন্য দরখাস্ত করেন এবং যখন ঐ দরখাস্ত আদালত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয়, তখন অনেকেই এই ব্যাপারের আদ্যোপান্ত না জানিতে পারিয়া, ব্রাহ্মণ-সভার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং সভার কার্য্যে দোষারোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন সকল ব্যাপার বিশদরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখন তিনিও ব্রাহ্মণ-সভার কার্য্যের সমর্থন

অমূল্যচন্দ্র ভাতড়ীকে তারকেশ্বর এষ্টেটের রিসিভার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু মোহান্ত পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করায়, রিসিভার শুদ্ধ দেবোত্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন, হাইকোর্ট হইতে এইরূপ আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-সভার পক্ষ হইতে বাদিগণ ও অন্যান্য বাদিগণ বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য দরখাস্ত করেন। বলা বাহুল্য, ঐ দরখাস্ত গৃহীত হইয়া আপীল করিবার অনুমতি দান করা হইয়াছে। দরখাস্তকারিগণ তদনুসারে হাইকোর্টে জামিনের টাকা জমা দিয়াছেন ও মোকদ্দমার কাগজ পত্রাদি ছাপিবার খরচ ও দাখিল করিয়াছেন।

'গত ১৯২৬ সালের জুন মাস হইতে হুগলীর জেলা-জজের আদালতে তারকেশ্বরের মূল মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। ছয়মাসের অধিক কাল ধরিয়া মোকদ্দমা চলিয়াছে এবং বাদী-পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি শেষ হইয়াছে। বাদী পক্ষ হইতে মোট ৫৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে যে ছয়জনের জবানবন্দী কমিশনে গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক এবং চারিজন পুরুষ। কমিশনে দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও দুইজন স্ত্রীলোক আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে।

'কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোক আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্যদান কালে, কি প্রকারে মোহান্ত সতীশ গিরি কর্তৃক তাহার সতীধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে এবং পরে তাহার সহিত সতীশ গিরি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। জ্ঞানদা এবং হরিদাসী, কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে মোহান্তের মৃতা উপপত্নী ত্রিলোচনা এবং বর্ত্তমান উপপত্নী হরিমতী ও তদ্‌গর্ভে উৎপন্ন রামকৃষ্ণ ও কাশীনাথ নামক পুত্রদ্বয়ের ও নন্দরাণী নামক কন্যার সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছে। মোহান্ত কি প্রকারে বলপূর্ব্বক অন্যান্য স্ত্রীলোকের সতীধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও ইহারা সাক্ষ্য দিয়াছে। হরিমতী কাশীতে অবস্থান কালে তাহার পুত্র কাশীনাথকে ঘরভিখন নামক একব্যক্তি গৃহশিক্ষকরূপে অধ্যাপনা করাইত। কমিশনে ইহারও জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে।

'মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি আরা ও বালিয়া জেলায় তাঁহার পুত্র কাশীনাথের বেনামীতে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আদালতে বহু সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছে। মোহান্ত সতীশ গিরি তাঁহার ভগিনীপতি মহাবীর মিশ্রের বেনামীতে নশীপুরের পরলোকগত মহারাজকে এক লক্ষ টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন। এই টাকা আদায় করিবার জন্য হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে মৃত মহারাজ মহাবীর মিশ্রকে মাত্র মোহান্তের বেনামদার বলিয়া বর্ণনা পত্রে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে নশীপুরের বর্ত্তমান রাজা, তাহা দ্বারা যে কিছু সাহায্য হইতে পারে তাহা ... খরচ প্রাপ্তিসত্ত্বেও তিনি

কতকগুলি কাগজপত্র তাঁহার কোনও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা আদালতে উপস্থিত করান নাই। প্রতিবাদী মোহান্ত মহারাজ বুধগয়া হাজারিবাগ এবং মুঙ্গেরের কয়েকজন মোহান্ত সেদিককার কমিশনে জবানবন্দী করাইবার জন্য কমিশন লইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও জবানবন্দী করান নাই; কেবল কাশীধামের একজন পণ্ডিতের জবানবন্দী করাইয়াছেন।

'সতীশ গিরি দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াও যে ভাবে জীবন যাপন করেন তাহা এবং যে ভাবে তারকেশ্বরের সেবাদি পরিচালিত হইত তাহা যে অশাস্ত্রীয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সম্বন্ধে পরমানন্দ তীর্থস্বামী (পূর্ব্বাশ্রম হাইকোর্টের উকীল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য), মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত শ্রীযুত অনন্ত শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য এম, এ ন্যায়তীর্থ সাক্ষ্য প্রদান করেন। মোহান্ত মহারাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে জেরা করা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমায় বাদী পক্ষ ৩২ হাজার টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। সাধারণের নিকট হইতে ইহার সামান্যই সংগৃহীত হইয়াছে।

'মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে এখনও বিলম্ব আছে। হুগলীর জজ আদালতে মোকদ্দমা শেষ হইলেই হাইকোর্টে উহার আপীল হইবে। আবার হাইকোর্ট হইতে ঐ মোকর্দ্দমা নিশ্চই প্রিভি কাউন্সিলে যাইবে। অথচ বাঙ্গলা দেশের এমন কি ভারতবর্ষের দেবোত্তর সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিরূপণ ব্যাপারে এই মোকর্দ্দমার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। সুতরাং, যাহাতে আইন সংক্রান্ত ও ঘটনা সংক্রান্ত সকল ব্যাপার বিশেষরূপে আলোচিত হয়, তজ্জন্য আদালতে শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণকে মোকদ্দমা পরিচালন করিবার জন্য নিযুক্ত করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্যে বিস্তর অর্থব্যয় হইবে। এ সম্বন্ধে দেশবাসীর কি কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য, তদ্বিরের অভাবে, বা উপযুক্তরূপে পরিচালনের অভাবে এই মোকদ্দমায় যদি মোহান্ত পক্ষ জয় লাভ করেন, তবে বাঙ্গালা দেশের ও ভারতবর্ষের সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তিই সহজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে পরিণত হইতে পারিবে। এই মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে, ইহার দ্বারাই তীর্থক্ষেত্রের অনাচার, দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয় নিবারিত হইতে পারিবে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা এই জন্যই এ বিষয়ে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণের অবিচার—ঢাকা জেলার ভিতর 'সানড়া' নামে একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের একটি কায়স্থ পরিবার বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে গোস্বামী ও গুরু বলিয়া সুদীর্ঘকাল সম্মানিত। মহাকবি শ্রীশ্রীবিষ্ণুদাস কবীন্দ্র, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

ইনি 'মণিকুণ্ডলা সখী' ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতেই ইঁহারা গুরুগিরি করেন, পূর্ব্ববঙ্গে ইহাদের প্রতিপত্তি ও সম্মান খুবই বেশী। এই কায়স্থ গোস্বামী পরিবারের দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচারিত ও সুরক্ষিত হইয়াছে। এই বংশে এখনও যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানে, আচারে ও চরিত্রে, বংশমর্য্যাদা সর্ব্বথা রক্ষা করিতেছেন।

কিছুদিন হইতে কয়েকজন লোভী ব্রাহ্মণ সন্তান, এই কায়স্থ পরিবার সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকের ভিতর একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা রটনা করিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা বলিতেছে—এই কবীন্দ্র-পরিবার পরিত্যক্ত পরিবার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন কারণে শ্রীবিষ্ণুদাসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই প্রকারের মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া কবীন্দ্র পরিবারের শিষ্যগণকে যাঁহারা দখল করিতে চাহেন, তাহারা ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহারে বৈষ্ণব সমাজের নেতৃগণের ভিতর অকারণ দলাদলি সৃষ্টি হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি অনেক পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থের অনেক কথা মোটেই প্রামাণিক নহে। দীর্ঘকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। সুতরাং কবীন্দ্র পরিবার যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে অধিকারী পরিবার, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের সানুনয় নিবেদন, শিষ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিবেন না, গৃহ বিচ্ছেদ ঘটাইবেন না। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী, তাঁহারা সকলে মিলিত হউন, বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, কত ধর্ম্মহীন অনার্য্য জাতি পড়িয়া রহিয়াছে, একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে নাম, প্রেম ও বৈষ্ণবাচার প্রবর্ত্তিত করুন। এই কবীন্দ্র-পরিবারের গোস্বামী মহাশয়গণের দ্বারা গারোজাতির অনেক লোক বৈষ্ণব হইয়াছে। কবীন্দ্র পরিবারের গোস্বামীগণ স্বার্থপর লোকের চক্রান্তে ভয় পাইবেন না, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমের পতাকা লইয়া প্রচার-কার্য্যে অগ্রসর হউন। দীক্ষাদানের অধিকার ব্রাহ্মণ বর্ণের একচেটিয়া নহে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে ইহা অতীব সুস্পষ্টভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার পর, যে আচার চারিশত বৎসর কাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহার অন্যথা করা যায় না। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ উদার হউন, যাঁহারা মহৎ ও পুরুষানুক্রমে উচ্চাধিকার ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের অবজ্ঞা করিয়া এবং মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের নিকট অপরাধী হইবেন না। আমরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতেছি, অন্যান্য কথা পরে লিখিব।

গোবিন্দ দাসের দুইটি পদ—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল—

সিন্ধুড়া রাগ

অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল- কমল দল কল-
মঞ্জীররঞ্জিত চরণা ॥১॥
দেখ সখি, নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥ধ্রু॥
ইন্দীবর বর গর্ব্ব বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।
ভাঙু ভুজগপাশে বাঁধল কুলবতী
কুলদেবতি মন কাঁদে ॥২॥
ভ্রমর করম্বিত আজানু বিলম্বিত
কেলী কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিত নিতি বিহারত
ঐছন মুরতি রসাল ॥৩॥

মাউর ধানসি

কুবলয় নীল- রতন দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেশ- খচিত শিখিচন্দ্রক
অলকবলিত ললিতাননচান্দ ॥১॥
আওএ রে নবনাগর কান।
ভাবিনী ভাব- বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন ॥ধ্রু॥
মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর
তহি অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ।

ভাঙু বিভঙ্গিম কুটিল নেহারই
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ ॥২॥
গজপতি ভাঁতি গমন অতি মন্থর
মণি মঞ্জীর বাজত রণঝনিঞা।
হেরইতে কত মদন মুরছায়ই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া ॥৩॥

ধর্ম্ম-সভা—গত ২২শে ও ২৩শে মাঘ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন মহাশয় সহরের দুর্গাবাড়ী-প্রাঙ্গনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম একত্ব ভাব রহিয়াছে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের সাধন-পথ বিভিন্ন হইলেও, সকলেরই যে মূল এক, তাহা শাস্ত্রোক্ত যুক্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। —'ঢাকা প্রকাশ', ১লা ফাল্গুন, ১৩৩৩।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

১২ পদকর্ত্তা—জগদানন্দ

(৯)

কামোদ

পরিসর নগর নদীয়াপুর ভিতর সংকীর্ত্তন কলরোল।
মধুর ভকত কত গাওত বাওত মুরজ পথাউজ খোল ॥
প্রেমভরে চিত উৎরোল।
দ্বিজ শুভুজ নিজ ভুজ তুলি বোলত নটত নটত হরিবোল ॥
নীরদ লোচন নীর নিসিঞ্চনে ভীগেল নীলম চোল ॥
মধুরিম সিঞ্জিত নুপুর রঞ্জিত কঞ্জ চরণ গতি লোল ॥
ঘন ঘন ঝম্পই থর থর কম্পই অনিলে কদলি জনু দোল।
[illegible] ॥

(১০)

যামিনী দীপতি গগনে উদয় করু কুমুদ কমল খিতি মাঝে ।
অপযশে দহুক পরশ রস কৌতুক নিতি নিতি জগতে বিরাজে ॥
বররামা বুঝবি তুহু সে চতুর ।
আপনা পরাণ যাক সোপিয়ে সো পুন নহে কভু দূর ॥
জীবন অবধি আপনা বেচহু তহু মন এক করি তায় ।
কি যে তুয়া বনবত প্রেম পদাতিক তিল আধ না তেজয়ে মোয় ॥
কাঞ্চন বদন কমল নাগি লোচন মধুকর মরত পিয়াসে ।
লিখনক আদি অধর মেলি সমুঝরি কহে জগদানন্দ দাসে ॥

---

১৩ পদকর্ত্তা—জগদানন্দ

[এই সহজিয়া পদটি, পূর্ব্বোল্লিখিত সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা জগদানন্দ রচিত নহে । এই জন্য, এই পদটি স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল । বঃ সাঃ পুঃ—১১৫০]

হরির উপরে হরির জনম তাহার উপরে প্রেম
লহর উপর কমল বিহার যাহাতে উঠিল হেম ॥
জিন জলধর তাহার লহর বিচলিত সতীপতি ।
উর্দ্ধ মহল নবীন সরোজ পাঁচ পঁচিশে রতি ॥
চৌষট্টি দামিনী লহরে কামিনী মোর মন হরে জানি ।
বত্রিশে হরণ হরির জনম অষ্টম অক্ষরে মানি ॥
পদ্ম শতদলে রাকা হাসি মিলে জ্যোতির্ম্ময় নীরগণ ।
সহজ মানুষ জলধর রস কনক পদ্ম নাম ॥
সুলোচনা আদি সহজ সুন্দর সে পদ্মদলে সদা স্থিতি ।
চতুর্দ্দশ জিনে এক উনবিংশতি ভজিলে পাইবে কতি ॥
পঞ্চদশদিক্ কমলের নীর তাহার কদাদি ভাবে ।
শিব হলধর ব্রহ্মা আদি বর সব ভকতপতি তাহার লাভে ॥
এই জগদানন্দে মনের আনন্দে জানিয়া ভুলল জেবা ।
কি করিবে কৃষ্ণ আসিয়া বিষ্ণু দীনহীন দর সেবা ॥

১৪ পদকর্ত্তা—চণ্ডীদাস

[চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত দুইটি পদ প্রকাশিত হইল—এই পদকর্ত্তা ও নান্নুরের জগদ্বিখ্যাত চণ্ডীদাস, স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। এই পদ দুইটি শ্রীসচ্চিদানন্দ গীতারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।]

(১)

আত্মপূজা অন্তে যজ্ঞ

যাগ ভূমি ভেল রাধার যুগল চরণ। শুদ্ধা পরাকাষ্ঠা হোম-কাষ্ঠ নিয়োজন ॥
নাম-অনুরাগ বহ্নি নিয়োজিয়া তথি। মনঃশ্রুবে ভক্তি-ঘৃত যোগের আহুতি ॥
অভিমান প্রতিষ্ঠাদি কৈল ছারখার। নিষ্কাম হইয়া যপে রাধা-মন্ত্র সার ॥
যাগ সমাপন করি হইয়া প্রণতি। নাম লিখি রাধা-পদে হোম পূর্ণাহুতি ॥
বেণু নাম মৃত যোগে বসুধা শীতলে। চির আশ রাধা-দাস যজ্ঞ-ফোঁটা ভালে ॥
তঁহি পুনঃ কান্তিজলে শান্তিজল কৈল। দক্ষিণা-বিধানে নিজ আত্ম সমর্পিল ॥
তঁহি ফলিল ফল রাগময়ী তনু। মনমথ যাগে বেকত ভেল জনু ॥
এই ফলে দুয়ে মিলে হইবে সন্ন্যাসী। তাই চণ্ডীদাসের মন হইল উদাসী ॥

(২)

রাধার নিজাঙ্গের দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা

শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন। ষোড়শ উপচারে করি তোমার পূজন ॥
উরজ কনক কুম্ভ স্থাপন করিয়া। মোতিম মাল তাহে আলিপন দিয়া ॥
শ্যাম করপল্লব হৃদয়ে ধরিল। রসপরিপূর্ণ ঘটে পূজা আরম্ভিল ॥
পঞ্চদেব পূজা কৈল পঞ্চেন্দ্রিয় দানে। নব ভক্তি দিয়া পূজে নবগ্রহ সনে ॥
অষ্ট দিক্‌পালে তুষ্ট অষ্ট সখী কৈল। শুদ্ধাভক্তি যোগে সর্ব্ব দেব তুষ্ট হৈল ॥
(অষ্ট দিক্‌পাল হেন অষ্ট সখী গণ। রাধা মধ্যে হয় সর্ব্ব দেবের পূজন ॥)
সর্ব্বদেব পূজি কৈলা কৃষ্ণের পূজন। বসিতে আসন দিল হৃদ-সিংহাসন ॥
ইহ তিষ্ঠ—ইহ তিষ্ঠ—স্বাগত-বচনে। নয়নাশ্রু পাদ্য দিল পদ প্রক্ষালনে ॥
অর্ঘ দান দিল ধনি, অঙ্গের পুলকে। স্বেদ-জল দিল তহি আচমনীয়কে ॥
বদন-কমল-মধু মধুপর্ক করি। সুশীতল বাক্য দিল আচমন বারি ॥

ভাব-অলঙ্কারে কৈল সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতে। সহাস্য বদন-সুধা সুশীতল পিতে ॥
হৃদি পদতল দিল কৃষ্ণ পদতলে। কুচযুগ কস্তূরীর দিল কুতূহলে ॥

* * * * * *

১৫ পদকর্ত্তা—জ্ঞানদাস

[কোন কোন গায়ক, এই পদের অন্তে 'বিদ্যাপতি'-ভনিতাযুক্ত করিয়া গান করেন। কোন সহৃদয় পাঠক, এই গানের দ্বাদশরাশি যুক্ত হেঁয়ালীর সদুত্তর প্রদান করিলে চরিতার্থ হইব]

মীনের দেখিয়া পরাণ কান্দে। ঠেকিনু বিষম মেষের ফান্দে ॥
বৃষ হউ মোর এ সাধ মনে। পরিবাদ হউ মিথুন সনে ॥
কর্কট বিষম মদন বাণে। সিংহ প্রবেশয়ে এ দেহ সনে ॥
কন্যার বসতি নাহিক ইথে। যদি বা মিলয়ে তুলার সাথে ॥
বিছার বিবাদে কি করে মোর। ধনুরে করুণা করিব তোর ॥
মকরে ভাবুক এ সব কথা। কুম্ভ কলঙ্কিনী হইবে রাধা ॥
ভনে জ্ঞানদাস এ রস গূঢ়। বুঝয়ে পণ্ডিত না বুঝে মূঢ় ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

গ্রন্থ-সংবাদ

১। বৈদ্য—[রায় বাহাদুর শ্রীকালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ, বি, এল্ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারের ৮০ পৃষ্ঠা গ্রন্থ। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান গৌহাটি।]

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা যাঁহারা তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এখনও চাহেন, বা যাঁহারা জাতিভেদ-প্রথা মানেন না, তাঁহারা একরূপ ভাললোক, কারণ তাঁহারা স্পষ্টবাদী। তাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, এবং প্রকাশ্যভাবে সে কথা বলিবার সাহস রাখেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম যুগের লোক। বর্ত্তমান সময়ে একদল লোকের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা, হয় নিজের মনের কথা নিজেই জানেন না; অথবা যদি জানেন, তাহা হইলে সে কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলার সাহস তাঁহাদের নাই; তাঁহারা কাপট্যকেই জীবনের ব্যবসায় করিয়াছেন।

বৈদ্য জাতীয় কতকগুলি ভদ্রলোক বলিতেছেন—বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ। তাঁহারা আরও বলেন,

সমাজে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, বৈদ্যেরাই ব্রাহ্মণ। গায়ের জোরে বা কোন ঔষধের দ্বারা, যদি তাঁহারা এই কাজটি করিতে পারিতেন, আপত্তি থাকিত না। তাঁহারা পুরাতন সংস্কৃত পুঁথির বা শাস্ত্রবাক্যের অন্যায্য, ভ্রান্ত, অস্বাভাবিক এবং অনেকস্থলে হাস্যোদ্দীপক অর্থ করিয়া সেই কদর্থের সাহায্যে এই আন্দোলন চালাইয়া বৈদ্য সমাজের নেতা হইতে চাহেন। জাতীয় চরিত্রের এই অধঃপতন শোচনীয় ও ভয়াবহ। ইংরাজের আইনের ফাঁদে পড়িবার ভয় না থাকিলে, আমরা করিতে পারি না, এমন অপকর্ম্ম নাই—ইহাই প্রমাণিত হইয়েছে।

বৈদ্য-সমাজে কি শাস্ত্রজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ এমন কেহ নাই, যিনি এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন? উত্তর—অন্ততঃপক্ষে একজন আছেন। তিনিই এই আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। রায়-বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয় একজন সুপরিচিত ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বধর্ম্মরক্ষক। সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, খুব কম লোকেই তাহা করেন, বা করিতে পারেন। ধন্য তাঁহার শাস্ত্রবিশ্বাস, ধন্য তাঁহার সাহস! তিনি নিজে বৈদ্য, রাজা রাজবল্লভের বংশধর। 'হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব', 'ঈশ্বরের স্বরূপ', 'ঈশ্বরের উপাসনা', 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি অনেক সারগর্ভ ও শাস্ত্রীয় সুযুক্তিপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বৈদ্য সংস্কারকগণের ব্রাহ্মণ হইবার যে উন্মত্ত চেষ্টা, সেই চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছেন,—সক্ষম ও সফল প্রতিবাদ। সংস্কারক বৈদ্যমহাশয়গণ শাস্ত্রবাক্যের কিরূপ অস্বাভাবিক ও হাস্যোদ্দীপক অর্থ করিয়াছেন, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অনেক বৈদ্য তাঁহাকে "বিভীষণ" বলিতেছেন। কিন্তু, যাঁহারা শাস্ত্রবাক্য এবং সদাচার স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে—এই গ্রন্থে শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যার ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তস্থাপনের যে ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সত্য, কি না। সংস্কারকগণ শাস্ত্র ও সদাচারের দোহাই না দিয়া, যদি অন্য উপায়ে ব্রাহ্মণ বা আরও কিছু হইতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানিকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেন।

আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আপাততঃ ইহাই বলিতে পারি, যে শ্রদ্ধেয় কালীচরণ বাবু বৈদ্যসংস্কারক-গণের ব্যবহৃত শাস্ত্রবাক্যসমূহের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেই ব্যাখ্যানুযায়ী যে-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এতই অবিসম্বাদিত যে তাহার প্রতিবাদ করার কোনই উপায় নাই। অতএব ব্রাহ্মণত্ব-লোলুপ বৈদ্যমহোদয়গণ শাস্ত্রবাক্যের সাহায্য-প্রার্থী না হইয়া, অন্য উপায়ে অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হউন।

আমরা কালীচরণবাবুর সাহস ও শাস্ত্রনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছি। তিনি শাস্ত্রীয় বাক্যসমূহের যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া যে-মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদিত। এই বচনগুলিকে যাঁহারা শাস্ত্রীয় এবং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কালীচরণ বাবুর পক্ষই গ্রহণ করিবেন।

কালীচরণ বাবুর সিদ্ধান্ত এইরূপ ঃ—বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ, তাঁহারা মনুকথিত দ্বিজাতি এবং দ্বিজধর্ম্মী, কিন্তু তাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। ব্রাহ্মণের নিম্নেই বৈদ্যের স্থান; ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈদ্যের স্থান উচ্চ। বৈদ্যগণের সংস্কার মাতৃবৎ অর্থাৎ বৈশ্যানুরূপ। পুরুষপরম্পরাগত পঞ্চদশাহাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া অশুদ্ধ অবস্থায় একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিলে ক্রিয়া পণ্ড হয়, প্রেতত্ব মোচন হয় না। পশ্চিম প্রদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত জ্ঞাতিত্ব-স্থাপন বাঙ্গার অতি-সমুন্নত ও সম্মানিত বৈদ্যজাতির পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের নিমন্ত্রণে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া বৈদ্যজাতি-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সেই ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

২। নির্ঝরিণী—[শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ-রচিত কবিতাপুস্তক। ডবলক্রাউন ষোল পেজি আকারের ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার মানিকগঞ্জের ডাক্তার ও প্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য। গৌহাটি কটন কলেজের প্রবীণ সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ; বেদবাচস্পতি মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ।]

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে—"তৃষ্ণার্ত্ত আমি, অভিতপ্ত আমি, সম্মুখে নির্ঝরিণী পাইয়া তাহাতে অবগাহন করিয়াছি, তাহার জলপান করিয়াছি, অন্তরে বাহিরে তৃপ্ত হইয়াছি। সে তৃপ্তিই বা প্রকাশ করিব কেমন করিয়া? সে তৃপ্তি যে আমার স্বানুভবগোচরমাত্র, তাহাকে পরানুভবগোচর করিব কেমন করিয়া?" আমাদেরও ইহাই অভিমত। কবিতাগুলিতে কিছু অসাধারণত্ব আছে। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, লেখকের নিজের একটি আধ্যাত্মদৃষ্টি Spiritual Vision আছে; আদিতত্ত্ব বা মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের একটি অনুভব আছে। সেই অনুভব এই কবিতাগুলির ভিতর অভিব্যক্ত হইতেছে। যাঁহারা দরদী বা মরমী হইয়া কবিতাগুলির ভিতরে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা রস পাইবেন, আলো পাইবেন; যাঁহারা তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িবেন, তাঁহাদের মনে হইবে, অবোধ্য হেঁয়ালি পড়িতেছি।

কবিতার একটি নমুনা;—

কৌতুহলী কর্ত্তাপুরুষ, ইচ্ছা তাঁহার নারী,
বিপ্রলব্ধ প্রকৃতিতে, বিক্ষোভ উঠল ভারি।
অনন্ত সব চিৎ-কণিকা ছুটল দিকে দিকে,
ব্যষ্টি সহ সৃষ্টি কৈল মহা সমষ্টিকে।

আর একটি কবিতা। আমরা 'মা' বলিয়া আদ্যাশক্তির পূজা করি, বা তাঁহাকে 'মা' বলিয়া

ডাকি। আমরা যে ভাবে ডাকি বা স্তবস্তুতি করি, তাহার ভিতর অস্বাভাবিকতা আছে, ভাবুক তাহা ধরিতে পারেন। আলোচ্য গ্রন্থের কবি লিখিতেছেন,—

কোন্ নিঠুরে দেখিয়ে দিলে পুত্রে মায়ের বিভীষিকা।
কোন্ পাষাণে শিখিয়ে দিল গুণ গণিয়ে মাকে ডাকা।
কোন্ বা হত দৈব আমার সন্তানকে করলো পর।
স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের ভোগে ছেলের কেন লাগে ডর॥

৩। নারায়ণী-সঙ্গীত—[সিউড়ি সহরের স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের রচিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি আকারের ২৫৪ পৃষ্ঠা পুস্তক। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় এম্, এস্, সি। সিউড়ি, বীরভূম।]

স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় মহাশয় সিউড়ি কালেক্টরীর একাউন্ট্যাণ্ট ছিলেন। তিনি নিত্য পূজার পর, প্রতিদিন একটি করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিতেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে 'বীরভূমি' পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি সঙ্গীত প্রথম বাহির হইয়াছিল। তাঁহার পৌত্র হেমেন্দ্রনাথ সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া, গ্রন্থাকারে বাহির করিবার সমুদয় আয়োজন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থ-প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে। সম্প্রতি স্বর্গীয় কালীনারায়ণ বাবুর কৃতী পুত্র উকীল শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ রায় মহাশয় গ্রন্থখানি বাহির করার ব্যয়-বহন করিয়া পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। সঙ্গীতগুলি ভক্তিরসাত্মক।

৪। বৃহন্নারদীয় পুরাণ—(পদ্যানুবাদ)।

৫। মহিম্ন-স্তোত্রম্—

মাণিকগঞ্জের প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় সনাতনধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রথম বয়স হইতেই বহু পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। মাণিকগঞ্জের কালীবাড়ী একটি ভাল প্রতিষ্ঠান। প্রধানতঃ পূর্ণবাবুর চেষ্টাতেই, এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিই এই পুরাণের অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত। সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এই পুরাণের পদ্যানুবাদ ছিল না, সুতরাং বাঙ্গালা কবিতায় যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিতে চাহেন এই গ্রন্থখানির দ্বারা তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে। মূল্য বার আনা।

দ্বিতীয় গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ শিবস্তোত্রের মূল, অন্বয় ও সুললিত পদ্যানুবাদ আছে। মূল্য চারি আনা। উভয় গ্রন্থই শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেন কবিরাজ, মাণিকগঞ্জ ঢাকা, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

মাঘ, ১৩৩৩

ধর্ম্মজীবন ও ভক্তিপথ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বীরভূমি, ৮—৪, মাঘ, ১৩৩৩

ধর্ম্মজীবন ও ভক্তিপথ

১। মানবাত্মার অনশ্বরত্ব

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে, মানবাত্মার অনশ্বরত্ব। এই সত্যটি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং সকল সময়ে সুদৃঢ়রূপে ও সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিয়া জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় ব্যাপার, এই সত্যের সাহায্যে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গের পর আমাদিগকে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে হয় এবং সেই শ্লোকগুলির অর্থচিন্তা করিতে হয়। 'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'-গ্রন্থে এই শ্লোকগুলি আছে। এই শ্লোকগুলির ভিতর একটি শ্লোক—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহম্মি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

আমি দেব, অর্থাৎ আমি জ্ঞানরূপ, আমি অমর; আমি অজর। 'আমি আর কিছুই নহি—আমি এই দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি; মন প্রাণ বুদ্ধি নহি—আমি চিদানন্দরূপ, আমি অস্ফুট সচ্চিদানন্দ। আমি ব্রহ্ম, বা আমি ব্রহ্মের। যিনি সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বাশ্রয়, যিনি নিত্য ও পরমার্থ, তিনিই ব্রহ্ম। 'আমি ব্রহ্ম' বা 'আমি ব্রহ্মের'—আমি জীবরূপী সেই নিত্য বস্তু। এই সার সত্য আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই জন্যই আমার এই দুঃখ ও দুর্দ্দশা। আমি এখন স্বরূপ-ভ্রষ্টা। আমার যাহা স্বরূপ, অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি যাহা, এখন আমি আমাকে তাহা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যাহা নই, নিজেকে তাই বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাই আমার অবিদ্যা, ইহারই নাম মায়াশক্তির প্রভাব।

আমার মৃত্যু নহে, আমার দেহের মৃত্যু আছে। আমার ধ্বংশ নাই, ধ্বংশ হয় আমার দেহের। অবিদ্যার প্রভাবে আমি আমার দেহের মৃত্যুকেই আমার মৃত্যু বলিয়া মনে করিতেছি। আমার মনের শোক আছে, তাপ আছে, পাপ আছে। আমার শোক নাই তাপ নাই, পাপ নাই। আমি অ-শোক ও অ-পাপ; আমি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। কিন্তু আমি নিজেকে ভুলিয়াছি, নিজেকে হারাইয়াছি। আমি সত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মিথ্যার কারাগারে বন্দী হইয়াছি। ইহাই অবিদ্যার ফল, ইহাই মায়াশক্তির প্রভাব।

আমার অবস্থা, এখন ঠিক্ স্বপ্নদর্শনের অবস্থা। রাজার পুত্র, আরামে সোণার খাটে নিদ্রাগত। সে স্বপ্ন দেখিতেছে যে সে দুঃস্থ, পীড়িত ও অভাবগ্রস্ত। আমাদেরও অবস্থা ঠিক্ তাই। আমি অমৃতের পুত্র হইয়া মৃত্যুভয়ে ভীত, পূর্ণ হইয়াও অভাবের তাড়নায় সর্ব্বদাই ব্যথিত ও চঞ্চল। এই অবস্থা একটি আত্মবিস্মৃতির অবস্থা। সিংহ-শিশু শৈশব হইতে শৃগালের দলে লালিত পালিত। সে নিজেকে জানে না, নিজের বিক্রম জানে না, তাই সে ভীত ও দুর্ব্বল। এক ধনবান্ ব্যক্তি ঘরের মেজেতে মাটির নীচে অনেক ধন পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে শিশুপুত্রকে ধনের কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই। পুত্র জানে না, তাহার পৈতৃক ধন আছে। কাজেই সে দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও ভিক্ষাজীবি। আমাদের অবস্থাও ঠিক্ তাই।

শেষের উদাহরণটি 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ইহা বলিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে এই কথা আছে। সেখানে সমুদয় তত্ত্বই সংক্ষেপে ও অতি সুন্দরভাবে কথিত হইয়াছে। সেই কারণে সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করা হইল। কেবল পড়া নয়, শোনা নয়, 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে'র এই সব অংশ বালককালেই মুখস্থ করিয়া সারাজীবন প্রতিদিন চিন্তাপূর্ব্বক আবৃত্তি করিতে হয় ও স্মরণ করিতে হয়। মহাপ্রভু প্রথমে বলিলেন,—জীব বা এই মানুষ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। তাহার পর বলিতেছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

শাস্ত্র সাধু কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নহি স্বতঃ কৃষ্ণ জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কৈলা বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র, গুরু, আত্মরূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি, প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তের কারণ।
কৃষ্ণ সেবা করে আর কৃষ্ণ রসআস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দরিদ্র দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহি অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদপুরাণ কহে কৃষ্ণ উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূল ধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায়॥
এই স্থানে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বোরলা উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিলে তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন না পাইবে খুদিতে গিলিবে সভারে॥

তাতে পূর্ব্বদিগে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝাড় পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান তাজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি ॥

ইহার অর্থ এইরূপ। জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা শক্তি। সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছে। তাহার এই বিস্মৃতি দূর করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ বেদাদি শাস্ত্র প্রচারিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সাধুগণ জগতে এই শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তারিত করিতেছেন। সাধুমুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া মনে হইল আমি ছোট নই, আমি মহৎ, আমি বৃহৎ। কিন্তু এইটুকু মনে হইলেই কাজের শেষ হইল না, কাজের আরম্ভ হইল। এখন সাধনা করিতে হইবে। নিজের খেয়ালমত যাহা হউক একটা কিছু করিলেই হইবে না। অতীতের সাধুমহাজনগণের পরীক্ষিত উপায়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা হিতে বিপরীত হইবে, অর্থলাভের চেষ্টা অনর্থ উৎপাদন করিবে।

২। সাধনার প্রয়োজন আত্মলাভ

ধর্ম্ম কি ? মানুষ ধর্ম্মাচরণ করে কেন ? এই অবিদ্যার বা মায়ার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই মানুষ ধর্ম্মাচরণ করে। ধর্ম্মাচরণ বলিতে নানারূপ অনুষ্ঠান বুঝায়। সদাচার, ব্রতপালন, পূজা, উপবাস, তীর্থযাত্রা, শ্রাদ্ধতর্পণ, যোগ, যাগ, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার প্রভৃতি বহু বহু ব্যাপারই ধর্ম্মাচরণ বলিয়া পরিচিত। যাহাই করি না কেন, মনে রাখিতে হইবে, এগুলি উপায়। উদ্দেশ্য,—আত্মলাভ বা স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন। আমি নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছি, সত্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, আমাকে আবার সেই স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহাই আমার উদ্দেশ্য। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিলে এবং সর্ব্বদা মনে রাখিলে আমাদের ধর্ম্মাচরণ সিদ্ধ হইবে, আর এই উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া কেবল উপায় লইয়া ব্যস্ত হইয়া থাকিলে, পণ্ডশ্রম হইবে, ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে।

আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান যেন নিষ্ফল না হয়, বৃথা আড়ম্বর না হয়। এই জন্যই আত্মতত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। আত্মতত্ত্বের আলোকে আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান

হয়, "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা", তাহার পর "বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা", তাহার পর বলিতে হয়, "শিবতত্ত্বায় স্বাহা"। আত্মতত্ত্বই প্রথম।

এই আত্মতত্ত্বই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথাই প্রথম বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ—

"হে অর্জ্জুন, ইহার পূর্ব্বে আমি যে কখন ছিলাম না, তাহা নহে। তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে, এই সব রাজারাও যে ছিলেন না, তাহাও নহে। আমি, তুমি ও এই নৃপতিগণ পূর্ব্বেও ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকিব।"

ইহাই মানবাত্মার নিত্যতা বা অনশ্বরতার কথা। ইহাই ভগবদ্গীতার ও সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-সাধনার প্রথম কথা। আমি দেহ নহি, আমি দেহী। দেহের ধ্বংশ হয়, দেহীর ধ্বংশ নাই। দেহী অবিনাশী ও অব্যয়। আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, বৃদ্ধিও নাই। "তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না।"

আমাদিগকে আত্মলাভ করিতে হইবে, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য। একেবারে একদিনে হঠাৎ কোন অলৌকিক, অবোধ্য বা অজ্ঞাত উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এরূপ মনে করিতে নাই। এইরূপ মনে করা, একটা প্রকাণ্ড ভুল। বেদ ইহাকে 'প্রমাদ' বলিয়াছেন। আমাদিগকে তিলে তিলে গড়িয়া উঠিতে হইবে। ধর্ম্মাচরণ করা যাউক, আর নিজের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরভাবে হিসাব করিয়া দেখা যাউক, আমি বাড়িয়া উঠিতেছি কিনা। আমাকে বাড়িয়া উঠিতে হইবে, ইহাই ধর্ম্মাচরণের ফল। এই ফল প্রত্যক্ষ। শক্তিতে, জ্ঞানে ও প্রেমে বাড়িয়া উঠিতে হইবে। More life, more light more love. আমি বিকশিত হইতেছি কিনা, আমি বাড়িয়া উঠিতেছি কিনা, কে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিবে। তাহার প্রমাণ কি ? উত্তর—আমাকেই তাহা বুঝিতে হইবে। নিজের কাছেই নিজের কৈফিয়ৎ। "এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।" বাহিরের কোন প্রমাণের দ্বারা এই বৃদ্ধি বা বিকাশ প্রমাণিত করিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া প্রতিদিন নিজের ভিতরে ঢুকিয়া অতীব ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে, আমার হৃদয়বৃত্তিসমূহ,

করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ঠিক্ সুপথে চলিতেছে, কিম্বা আমরা 'প্রমাদ'গ্রস্ত হইয়াছি।

৩। অচিন্ত্য ভেদাভেদ

"যাহার নিজের উপর বিশ্বাস নাই, তাহার ভগবানের উপর বিশ্বাস হইতে পারে না।" ভগবানে বিশ্বাস, আর নিজের উপর বিশ্বাস, একই কথা। আমি ভগবানে, আর আমাতে ভগবান্। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ভিন্ন ও অভিন্ন একই সময়ে। One with God and different from God, both at the same time. কেহ কেহ বলেন, একথা অর্থহীন; এ কেবল কথা দিয়া ইন্দ্রজাল রচনা। কেন, বুঝি না। ইংরাজীতে বলে—quality বা গুণ, আর quantity বা পরিমাণ। ভগবানের গুণ আর আমার গুণ একই। তিনিই সচ্চিদানন্দ, আমিও সচ্চিদানন্দ। কিন্তু তিনি বিভু, আমি অনু। তিনি প্রস্ফুট, আমি অস্ফুট। তিনি জ্বলন্ত আগুণ, আমি স্ফুলিঙ্গ। তিনিই আমার উদ্ভবভূমি, তিনিই আমার লক্ষ্য বা আদর্শ; আমি অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহারই অভিমুখী, আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছি, অর্থাৎ শক্তিতে, জ্ঞানে ও প্রেমে বাড়িয়া বাড়িয়া তাঁহার কাছাকাছি হইতেছি। ভক্ত বলেন—অনন্তকাল ধরিয়া ইহাই চলিবে। It is an infinite process. আমি কখনও 'তিনি' হইব না, আমি চিরদিনই তাঁহার দাস হইয়া, তাঁহার ভক্ত ও সেবক হইয়া থাকিব। ভক্তগণের এই মতই খুব ভাল মত, এবং বর্ত্তমান যুগের সকল দেশের চিন্তাশীল সাধুগণ শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে এই মতই পোষণ করেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদের ইহার অর্থ। অতএব "আত্মানং বিদ্ধি" নিজেকে জান, know thyself, ইহাই অধ্যাত্মধর্ম্মের প্রথম কথা। নিজেকে জানিলেই ভগবানকেও জানা যাইবে, সমগ্র বিশ্বকেও জানা যাইবে। আত্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এই তিনটি তত্ত্ব একসঙ্গে গাঁথা। একটি জানিলেই অপর দুটিরও জ্ঞান হইবে।

৪। দেহ ও দেহী

আমি যাহাকে 'আমি' বলি, তাহা একটি বিমিশ্র বা জটিল জিনিস। মোটামুটি

আমার 'প্রকৃত আমি'র একটা জীবন আছে। এই তিনটি জীবন মেশামেশি করিয়া একসঙ্গে রহিয়াছে। বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে, আমার প্রকৃত জীবনটি কি? ইহাকেই বেদান্তে পঞ্চকোষ বিচার বলে,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ। ইহাকে আমাদের দেশে দেহতত্ত্ব-বিচারও বলে। নৈয়ায়িকের ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানও এই একই কথা। আমাদের দেশে দেহতত্ত্ববিষয়ক অনেক সঙ্গীত প্রচলিত আছে।

সদাচার পালন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, ধারণা ও ধ্যান অবলম্বন করিলেই, আমরা ক্রমে ক্রমে দেহতত্ত্ব বুঝিব ও আত্মলাভ করিব।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন,—

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি ॥

আত্মা অতি সূক্ষ্ম, দুর্জ্জেয়; যাহারা অল্পবুদ্ধি তাহাদিগের নিকট গুপ্ত। তিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে আছেন, সকলের বুদ্ধিরূপ গুহায় ইনি অবস্থিত। ইনি নিত্য ও প্রকাশ স্বরূপ। অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা ইঁহাকে জানিলে হর্ষ ও শোক দূরীভূত হয়।

অতএব, সুদুর্লভ এই মানবজন্ম যখন পাওয়া গিয়াছে, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে বৈদিক ঋষির বংশধররূপে জন্মলাভ করিয়া যখন এই অধ্যাত্মবিদ্যার উত্তরাধিকারী হওয়া গিয়াছে, তখন, বৃথা আর সময় নষ্ট না করিয়া—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

আর, মোহনিদ্রায় ঘুমাইও না, উত্থিত হও, জাগ্রত হও। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের উপদেশ গ্রহণ কর। কবিগণ বলিয়াছেন, আত্মলাভের পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম।

৫। নাস্তিক্যবাদ

এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। পৃথিবীর সকল দেশেই ...

একদল লোক আছেন, তাঁহারা 'আত্মা' বা ঈশ্বর মানেন না। এই মানুষের ভিতর যে কিছু অনশ্বর বা নিত্য Eternal, Immortal আছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। এই সব লোক যে বাজে লোক বা দুষ্ট লোক তাহা নহে। এই পণ্ডিতগণকে আমরা জড়বাদী ও নাস্তিক বলিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাদের মনীষা ও প্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিবার আমাদের অধিকার নাই। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে চার্ব্বাক নামক এক পণ্ডিত নাস্তিক ও ভোগবাদী ছিলেন। বর্ত্তমান কালে কোঁৎ, মিল প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সজোরে নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছেন। নাস্তিক ছাড়া আর একদল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা অজ্ঞেয়তাবাদী। তাঁহারা বলেন, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব বা বিশ্বতত্ত্ব, জানিবার শক্তি মানুষের নাই। বৌদ্ধগণকে আমরা নাস্তিক বলি, কিন্তু আমাদের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থে, বৌদ্ধমতের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধই তাহার হেতু। এখন আর সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই, অন্ততঃপক্ষে যাঁহারা উদারচিত্ত তাঁহারা আর ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ করেন না এবং বিরোধ করার আবশ্যক আছে বলিয়াও মনে করেন না। সুতরাং, এখন আমাদিগকে মূল গ্রন্থের আলোচনা করিয়া বৌদ্ধমতের বিচার করিতে হইবে।

৬। সাধকের পথ

যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের বা তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, তাঁহারা এই সব নাস্তিক মত সমালোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। সাধারণভাবে যাঁহারা ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইতে চাহেন তাঁহাদের প্রতি উপনিষদের এই বাণীই সার সত্য—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যে নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।

হে প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম, এই মতি, ব্রহ্ম বিষয় এই বুদ্ধি বা ভগবদ্ভক্তি শুষ্ক তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই, ইহার উত্তম জ্ঞান হইয়া থাকে।

ঐ কঠোপনিষদই আবার বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং ॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

বহুশাস্ত্র ব্যাখ্যার দ্বারা, ধারণাশক্তির দ্বারা, বহু শ্রবণের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাহার প্রতি স্বয়ং প্রসন্ন হন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। যিনি আর কিছু চাহেন না, একমাত্র আত্মদর্শনই যাঁহার কাম্য, তাঁহার নিকট এই আত্মা, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নিজের তনু বা স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে আমাদের কি কিছু করিবার নাই? আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, শাস্ত্রাচার বিরোধী, পাপকর্ম্মপরায়ণ, অসংযতেন্দ্রিয়, অসমাহিত-চিত্ত ও সর্ব্বদা বিষয়-লোলুপ ব্যক্তি, অর্থাৎ দুরাচারগণ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। প্রজ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। অতএব আমরা শাস্ত্র ও সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক, পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সংযম সমাধি ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই 'প্রজ্ঞান'এর অন্বেষণ করিব।

প্রাচীনতম উপনিষদের এই বাণীই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হঞা সেই বীজ করয়ে রোপন।
শ্রবণ কীর্ত্তন জল করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হয় ফলে প্রেমফল।
ইহা মালি নিত্য সিঞ্চে শ্রবণাদি জল ॥

প্রকৃত ধর্ম্মজীবন এই প্রকারে বিকশিত হয়। কিন্তু এই জীবন বিকাশের অনেক বিঘ্ন আছে। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, নতুবা এই বিঘ্নের আক্রমণে হয় ধর্ম্মজীবন

নষ্ট হইয়া যায়, অথবা অন্য প্রকারের অতি ভয়ঙ্কর অনর্থ বা অধঃপতনের হেতু জন্মাইয়া থাকে। এই কারণে বলিতেছেন—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি মাথা।
উপাড় বা ছেঁড়ে তবে শুখি যায় লতা॥
তাতে মালি যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতির যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু লতার অঙ্গে যদি উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীবহিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখার গণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হয় মূলশাখা বাঢ়িতে না পায়।

অতএব সাবধানে উপশাখাগুলি ছেদন করিতে হইবে।

৭। ধর্ম্মজীবন কি?

আমরা বলিয়াছি, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা প্রথমেই আবশ্যক; আর সেই ধারণা লইয়া নিয়মিতভাবে ধ্যান করা আবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বের ধ্যানই, ধর্ম্মজীবন গঠনের একমাত্র উপায় নহে। আত্মতত্ত্বের ধ্যান খুব সহজ কাজ নহে, উহা বেশ কঠিন। অনেকের পক্ষে আত্মতত্ত্বের ধ্যান একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। কাজেই, সঙ্গে সঙ্গে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সদাচার পালন ও নৈতিক সদ্‌গুণসমূহ অর্জ্জনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক।

ধর্ম্মজীবন বলিতে কি প্রকারের জীবন বুঝায়, এখন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে কোনও একটা সুনির্দ্ধারিত মত কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে না। প্রত্যেককে পর্য্যবেক্ষণ করিতে, চিন্তা করিতে এবং মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমার যাহা মত, দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া বুঝিয়া দীর্ঘকালে আমি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, সেই সিদ্ধান্ত কাহারও ঘাড়ে জোর করিয়া বা কৌশল করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার আমার নাই। তাহা করিলে

আমার অপরাধ হইবে, আর যাহার ঘাড়ে চাপাইব তাহার অনিষ্ট করা হইবে। সিদ্ধান্ত জিনিষটা এমনই যে, নিজে সাধনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া, অপরের সিদ্ধান্তকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিলে উপকার হয় না, অপকার হয়। অঙ্কের উত্তর মুখস্থ করিয়া কোনোরূপে গোঁজা মিল দিয়া উত্তর মিলাইয়া দিলে পরীক্ষককে ঠকাইতে পারা যায় সত্য, কিন্তু পরীক্ষক অপেক্ষা তাহাতে নিজেকে বেশী ঠকিতে হয়। চেষ্টা করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া অঙ্ক কষিতে চেষ্টা করায় লাভ আছে, তাহাতে উত্তরে ভুল হইতে পারে; কিন্তু এই প্রকারে ভুল করিতে করিতেই নির্ভুল হওয়া যায়। নির্ভুল হওয়ার আর অন্যরূপ দ্বিতীয় পন্থা নাই। এই জন্যই আমার সিদ্ধান্ত কিছুই বলিব না, কেবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতে, সেই সংবাদগুলি একত্র করিয়া তুলনা করিতে এবং যদি কোন তত্ত্বের কষ্টিপাথর থাকে, তাহা হইলে সেই কষ্টিপাথরের সাহায্যে ঐ ব্যাপারগুলির যথার্থ মুল্য অবধারণ করার জন্য আমাদিগকে, বিশেষতঃ আমাদের দেশের যুবকদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

এই আলোচনা করিতে হইলে একসঙ্গে দুইদিকে নজর রাখিতে হইবে। চোখ খুলিয়া দেখিতে হইবে, ও চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধর্ম্মজীবন বলিতে লোকে কি বুঝে। এই আলোচনা সম্যক্‌রূপে করিতে হইলে কেবল পরের কথা শুনিলে হইবে না, ছাপা বই, বিজ্ঞাপন বা নামজাদা বড়লোকের নিদর্শন-পত্র বা সার্টিফিকেট পড়িলে হইবে না। নিজ নিজ পর্য্যবেক্ষণশক্তি বাড়াইয়া, সেই শক্তির সাহায্যে যথার্থ ঘটনা (data) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং বিচার পূর্ব্বক আলোচনা করিতে হইবে। একদিকে যেমন পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারণা আবশ্যক, আর একদিকে তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক মনীষিগণ নানাশাস্ত্রেও সম্মানিত নানাগ্রন্থে এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

৮। ধর্ম্ম জীবনের উদাহরণ

দু-একটি উদাহরণ দিতেছি। 'ক' একজন সাধু বলিয়া বিশেষ সম্মান লাভ

জায়গায় অনেকগুলি বাড়ী বা মঠ হইয়াছে; তাঁহার এখন পয়সাকড়ির অভাব নাই। তিনি সাধু। জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, অনুসন্ধান করিতে হইবে,—কেন তিনি সাধু? তাঁহার সাধুতার প্রমাণ কি? প্রথম প্রমাণ অনেক লোক, অনেক ধনী ও পদস্থ লোক তাঁহাকে মানে, তাঁহার পূজা করে, তাঁহাকে অর্থ দেয়, তাঁহার নিকট মন্ত্র লয়, উপদেশ লয়। কিন্তু, লোকে পূজা করে কেন? জিজ্ঞাসা করিলে শিষ্যেরা বলিবে, এবং হয়ত বই ছাপাইয়া বড় বড় নিদর্শন-পত্রের দ্বারা জানাইতেছে, তিনি জলকে ঘি করিতে পারেন, বালিকে চিনি করিতে পারেন, কাশ্মীর হইতে ফল আনাইয়া বা কাশী হইতে মিষ্টান্ন আনাইয়া এইখানে বসিয়া খাওয়াইতে পারেন, এবং অনেককে খাওয়াইয়াছেন। এই প্রকারের আরও অনেকরূপ অলৌকিক ব্যাপার তিনি করিতে পারেন। শিষ্যেরা কেহ কেহ ইহা দেখিয়াছে, অপরে শুনিয়া শুনিয়া ইহাতে বিশ্বাস করিয়াছে এবং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, এই কথা তাঁহারা বলেন। এই সব যোগৈশ্বর্য্য বা সিদ্ধাই যখন তাঁহার আছে, তখন তিনি সিদ্ধপুরুষ বা সাধুপুরুষ। তিনি আর কিছু করেন না, আর কেনই বা করিবেন, তিনি সাধুপুরুষ, তিনি গুরুগিরি করেন। তিনি অবশ্য ধর্ম্ম-জীবনে উন্নত। অনেক বড়লোক তাঁহার শিষ্য তাঁহার অনেক টাকা আছে, শিষ্যেরা তাঁহার সিদ্ধাই দেখিয়াছে, অতএব তিনি সাধু। এই এক প্রকারের ধর্ম্মজীবন।

সাধুর মহিমা ইহাই। তাঁহার অলৌকিক শক্তি আছে। এই অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। কিন্তু পরের কথা মানিয়া লওয়াই বা যায় কেমন করিয়া? ইহাই চিন্তার বিষয়। যিনি সাধু, তাঁহাকে পরীক্ষা করা যায় না। তিনি পরীক্ষা দিবেনই বা কেন? তাহা ছাড়া, পরীক্ষা করিতে গেলে, আমারও যে অপরাধ হইবে। সুতরাং সে বিষয়ে নিরস্ত হইয়া সাধু-শিষ্যদের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাকে ভয়ঙ্কর না বলিয়া পারা যায় না। নীতিবিৎ পণ্ডিতেরা যে জীবনকে ভদ্রজীবন বলিয়াছেন, তাহাদের তাহাও নাই। তাহাদের কেহ চাকুরী করেন, কিন্তু চাকুরীর হিসাবে যত রকম নিন্দা হইতে পারে, তাহার সব রকমেরই নিন্দা পূর্ণমাত্রায় আছে। কিন্তু ধর্ম্মের একটা ভাণ, যাহাকে লোকে ভণ্ডামি বলে তাহা বেশ ভাল রকমই আছে। এই সব লোক দেশের বা সমাজের কোন হিতকর কর্ম্মে নাই, বরং অনেক

ইহারা সত্য, ন্যায় বা পরার্থপরতার ধার ধারে না, কিন্তু জপ করে, প্রাণায়াম করে, গুরুদেবকে ভালরূপ প্রণামি দেয়, গুরু-ভাইদের মাঝে মাঝে ভোজ দেয়। এই সাধুর জীবন বা তাঁহার শিষ্যের জীবন ধর্ম্ম-জীবন, কি না ? যদি ধর্ম্ম-জীবন হয়, তাহা হইলে কি প্রকারের ধর্ম্ম-জীবন ? পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি কিছু বলিব না। আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি, চিন্তা পূর্ব্বক আলোচনা করিতে বলিতেছি।

শিষ্যদের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই সব দুষ্ট লোক, যাহারা মহাপুরুষের বা সাধুর শিষ্য হইয়াছে, তাহারা একেবারে ধর্ম্মহীন হইত, সাধুর কৃপায় তাহারা 'কিছু ধর্ম্ম' পাইয়াছে। 'নাই ধর্ম্ম' অপেক্ষা 'কিছু বা কাণা খোঁড়া ধর্ম্মও ভাল'। Some religion better than no religion. কিন্তু শিষ্যেরা কি তাহা মানে ? তাঁহারা যে নিজেদেরই ব্যাস বশিষ্ঠ বলিয়া জানে। কেবল যে মনে মনে জানে তাহা নহে, সেইরূপ ঘোষণাও করে।

আর একজন বলিবেন—'ধর্ম্মের সঙ্গে তোমাদের ঐ সব সামাজিক নীতির কোনই সম্পর্ক নাই'। এই কথাটি বড়ই কঠিন কথা। এই গেল 'ক' এর কথা। অনুসন্ধান করুন, চিন্তা করুন। তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারের অনুসন্ধান, চিন্তা বা আলোচনা আমাদের দেশে বড় একটা নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কিছু কিছু ছিল। এখন কেন নাই, তাহাও বোঝা যায়। কিন্তু, সে কথা এখন থাকুক। এই প্রকারের অনুসন্ধান, চিন্তা ও আলোচনা আরম্ভ হউক, তাহাতে দেশের উপকার হইবে।

'খ' আর একজন সাধু। ইনি কেবল সাধু নহেন, অবতার। তিনি এখন নাই, তিনি দেহ রাখিয়াছেন। তাঁহার সমাধি বা কবরের উপর সুবৃহৎ মন্দির। বহু সাধু, কেহ কৌপিন বহির্বাস পরিয়া, কেহ বা গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া, কেহ মুণ্ডিত মস্তক, কেহ বা জটিল, সেই অবতারের নামে শিষ্য করিতেছে, উৎসব করিতেছে, ভিক্ষা করিতেছে, চাঁদা তুলিতেছে। সাধুর বা অবতারের জীবনী বা লীলাকথা ভাল কাগজে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছে ! সেই জীবনকথা অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ, দিনকে রাত করা, রাতকে দিন করা, মরাকে বাঁচানো, জ্যান্তকে মারা ; এই সব অলৌকিক ব্যাপার !

এই প্রকারের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বহু সাধু ও অবতার, আমাদের এই অত্যুর্ব্বর

পুস্তকেও তাহা লেখা আছে। কিন্তু দেশবন্ধু দাস, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দেশের কাজে নামিলেন, অল্পদিনেই তাঁহার অর্থাভাব হইল। মহাত্মা গান্ধীর অবস্থাও তাই। দেশের সাধারণ লোকে যাহাকে দেশহিতকর বা লোকহিতকর কার্য্য বলে, সেই সব কাজ যাঁহারা করিতেছেন, এই সব সাধু বা অবতারেরা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির দ্বারা তাহাদের সাহায্য করেন না কেন? আর যদি এই সব সাধু অবতারদের বা তাঁহাদের শিষ্যদের যদি ইহাই মত হয় যে দেশবন্ধু দাস বা মহাত্মা গান্ধী যাহা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহা ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম, ভাল নহে—মন্দ, তাহা হইলে সে কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া মূর্খ জনসাধারণকে সতর্ক করেন না কেন?

৯। ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনে বিরোধ

দেশে দেখিতেছি, এই দুই প্রকারের লোক। একদিকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেরা বা তাঁহাদের চেলারা, আর একদিকে দেশহিতৈষী বা সমাজ-সেবক নেতারা, ইঁহারা যখন একযোগে কাজ করেন না, বরং যখন অনেক স্থলে দেখা যায়, তাঁহারা পৃথক্ ভাবেই চলিতেছেন, তখন আমাদের স্বভাবতই মনে হওয়া উচিত, ধর্ম্মজীবন কি? দেশহিতসাধন, সমাজসেবা প্রভৃতির নাম দেওয়া হউক 'কর্ম্মজীবন'। পূর্ব্বোক্ত সাধু-অবতার ও তাঁহাদের শিষ্যদের জীবনের নাম দেওয়া হউক 'ধর্ম্মজীবন'। এখন দেখা যাইতেছে, এই দুইপ্রকারের জীবনের মধ্যে দারুণ বিরোধ। এই বিরোধের কিছু মীমাংসা আছে কি না, তাহাই ভাবিতে হইবে।

আপাততঃ কোন মীমাংসা পাওয়া যাইবে না। সুশিক্ষিত ও সাধুচরিত্র যুবকগণ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিতে ও যথাযথ আলোচনা করিতে অভ্যস্ত হইলে, মীমাংসা হইবে।

১০। মীমাংসা

এই মীমাংসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজীবনের একটি অসন্দিগ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এমন একটি লক্ষণ, যাহাতে মতভেদ নাই। ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য—

কথা শুনিয়াই বিচলিত হইতে নাই। ভক্তিও শক্তি; কেবল শক্তি নহে, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—'হলাদিনী শক্তিসমবেত সম্বিৎশক্তি'র নাম 'ভক্তি'। অতএব 'শক্তি' এই কথাটিকে এখন একটু ব্যাপক ও উদার অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। জ্ঞানও শক্তি, আবার ভক্তি একপ্রকার জ্ঞান। অতএব ধর্ম্মসাধনার লক্ষ্য, 'শক্তি লাভ'—ইহাতে মতভেদ নাই।

মানুষের প্রথমেই দেহ, তাহার পর ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয়। এই চারিটির শক্তি বৃদ্ধি করাই ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য। দেহ সুস্থ ও সবল না হইলে ধর্ম্মজীবন অসম্ভব। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'। যে দেশে এত রোগ, এত অকালমৃত্যু, পুষ্টিকর খাদ্যের এত অভাব, এত অনাহার, এত দুর্ভিক্ষ, সে দেশে ধর্ম্মসাধনার প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, দেশের অন্নকষ্ট ও রোগ নিবারণ করিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করা। প্রাচীন স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের দিনচর্য্যার যে বিধি জলরক্ষা প্রভৃতির যে শাসন, তাহা অতিশয় সুন্দর। সমাজ যখন তাঁহাদের আদেশে চলিত, তখন আমাদের ধর্ম্মজীবন খুব উন্নত ছিল।

দেহের পরেই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের শক্তি চাই—সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, সদাচার ও নিত্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত ইহা হয় না। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বাঙ্গালাদেশের ভদ্রসমাজে কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা ঔষধের বিজ্ঞাপন পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। এই ব্যাধির হস্তে এই জাতি যতদিন না রক্ষা পাইবে, ততদিন কোন বেদান্ত, কোন মঠ, কোন হিমালয়-পর্ব্বত, ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং ধর্ম্মজীবন সম্ভব হইবে না।

ইন্দ্রিয়ের পর মন। মনের শক্তি চাই। এজন্য একাগ্রতা-সাধন, ধারণা ও ধ্যান চাই। তাহার পর হৃদয়ের শক্তি—এজন্য সাধুসঙ্গ, ভক্তচরিত্রের অনুশীলন, ভগবৎ-বন্দনা, স্তোত্র-পাঠ সঙ্কীর্ত্তনাদি দরকার।

শক্তিপূজাই ধর্ম্ম, শক্তিলাভই ধর্ম্ম। প্রথমে শক্তি, তাহার পর ভক্তি। শক্তি ছাড়া ভক্তি হয় না। প্রথমে প্রবৃত্তিমার্গ, তাহার পর নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমে পুষ্টি, তাহার

ত্যাগের কথা বলে, সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া যদি উদরান্ন সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম নাশ হয়। অতএব মনে রাখিতে হইবে

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

যে দুর্ব্বল বা ভীরু, তাহার অধ্যাত্মধর্ম্মে অধিকার নাই। মানুষ যখন বুঝিতে পারে—আমি স্বাধীন, অর্থাৎ আমি বিশ্বনাথের একজন দায়িত্ববোধসম্পন্ন সৈনিক, বিশ্বনাথ আমার উপর তাঁহার কার্য্যের ভার দিয়াছেন, এইটি যখন মানুষ বুঝিতে পারে, সেই সময়েই সে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের অধিকারী। ইংরাজীতে বলে a free moral agent.

এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে মানুষ যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থার নাম পশুর অবস্থা। সে অবস্থায় সে পরায়ত্ত। সে অবস্থায় সে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার নিজের কিছুমাত্র ভাবিবার নাই; আর ভাবিবার শক্তিও তাহার নাই। ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র। এই অবস্থার লোক অবশ্য জগতে আছে এবং বোধ হয় অনেকদিন থাকিবে। তাহাদের সম্বন্ধে বা তাহাদের নিকট কিছুই বলিবার নাই, কারণ তাহারা জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইবে না, তাহারা ভয়ের দ্বারা বা লোভের দ্বারা চালিত হইবে। আত্মতত্ত্ব বিচার, বা অধ্যাত্মধর্ম্মের আলোচনা, সেই পশুদের জন্য নহে, ইহা বীরের জন্য। তত্ত্বালোচনার দ্বারা বীর ক্রমশঃ দিব্যভাব লাভ করিবে।

১১। ঐতিহাসিক পদ্ধতি

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে যদি ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিতে হয়, আর যদি সেই আলোচনার দ্বারা নিজের ও অপরের যথার্থ উপকার করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম উদারচিত্তে ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হইবে। ঐতিহাসিক পদ্ধতিই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ফলপ্রদ পদ্ধতি। একজন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু যদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচনা আরম্ভ করেন তাহা হইলে প্রথমেই দেখিবেন, আমাদের দেশে বা সমাজে একটি আলোচনা রহিয়াছে, তাহার নাম—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। আমরা অনেকেই সেই পুনরুত্থানের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমি যাহা ভাবি, তাহা যে ঠিক আমারই ভাবনা, তাহা নহে; আমি যে-যুগে বাস করি, সেই যুগের একটা মানসিক বায়ুমণ্ডল

আছে, সেই বায়ুমণ্ডলে নানারূপ চিন্তা, কল্পনা, কামনা ও চেষ্টার তরঙ্গ সর্ব্বদাই উত্থিত ও ধাবিত হইতেছে। সেই তরঙ্গ ও প্রবাহ আমার মানসজীবনের উপর, আমার হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাশক্তির উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে। প্রত্যেক ভাবনার ও প্রত্যেক কল্পনার একটা ইতিহাস আছে। যিনি প্রকৃত আত্মবিৎ বা তত্ত্ববিৎ, তিনি এই ইতিহাস জানেন। আমি যদি আমার মানস-জীবন জানিতে চাই, তাহা হইলে আমার যুগের মানসিক বায়ুমণ্ডলে যে যে প্রভাব ক্রিয়া করিতেছে, সেই সমুদয় প্রভাবের প্রকৃতি ও ইতিহাস আমাকে জানিতে হইবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারে অপ্রকৃত (Unreal) এবং কৃত্রিম তাহার কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমসাময়িক বা নিতান্ত আধুনিক ব্যাপার আলোচনা করিতে পারেন না। যাহা হউক আমাদের যখন সে ভয় নাই, তখন এই হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলনের ইতিহাস আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। দেশ আমাদের, আমরা এই দেশের। এই দেশের ভাগ্য-নির্ম্মাণের ভার আমাদেরই উপর, যাহারা যুবক বিশেষ করিয়া তাহাদেরই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং সমগ্র দেশকেই বুঝিতে হইবে, কিছুই উপেক্ষণীয় নহে, কিছুই অবজ্ঞেয় নহে।

১২। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মান্দোলন

এই পুনরুত্থান বুঝিতে হইলে অনেকগুলি আন্দোলনের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। নিম্নে তাহাদের নামগুলি দেওয়া হইল, এই আলোচনা ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

১। ব্রাহ্মসমাজ—ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব ও অতীব গৌরবের বস্তু। এই আন্দোলনের সুবৃহৎ সাহিত্য আছে, অনেক হিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এই সমাজে অনেক মহাত্মা ছিলেন এবং এখনও আছেন। ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার সহিতই পরিচিত হইতে হইবে। ক। আদি সমাজ খ। সাধারণ সমাজ গ। নববিধান।

২। ব্রাহ্মসমাজের পরেই আলোচনা করিতে হইবে—আর্য্যসমাজ। আর্য্য সমাজের জন্ম বাঙ্গালা দেশে হয় নাই—বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে বা হৃদয়ে ইহার জন্ম নহে। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় গুজরাট দেশের লোক। লাহোরে

ইহার প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব্ব বাঙ্গালা দেশে ইহার তেমন প্রভাব ছিল না। এখন শুদ্ধি-সংগঠন আন্দোলনের জন্য বাঙ্গালায় এই সমাজের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, এবং মনে হয় উত্তরোত্তর বাড়িবে।

৩। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি—ইহার জন্ম বিদেশে—মার্কিণের নিউইয়র্ক সহরে। এখন কিন্তু ইহার প্রধান কেন্দ্র ভারতবর্ষে,—মান্দ্রাজ নগরের সহরতলী আদিয়ার। এই আন্দোলন বিদেশীয়ের নেতৃত্বাধীন হইলেও এক সময়ে আর্য্যসমাজের সহিত একতাবদ্ধ ছিল। তাহার পর কেন বিচ্ছিন্ন হইল, সে ইতিহাস অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্ম্মের পুনরুত্থানে এই মণ্ডলী খুব বেশী রকম সাহায্য করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে অলৌকিকবাদের আতিশয্য দেখা যাইতেছে, ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিলে এই মণ্ডলীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সমিতির শাখা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু স্থানেই হইয়াছে। জনসেবার কার্য্য এই সমিতির দ্বারা সুষ্ঠুরূপে সংসাধিত হওয়ায় বাঙ্গালার যুবক-সম্প্রদায়ের উপর এই মণ্ডলীর প্রভাব খুব অধিক। ইঁহাদেরও একটা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

৫। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যখন খুব অধিক, সেই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ), পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রভৃতির চেষ্টায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ারূপে যে আন্দোলন হয়, মনীষি ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির দ্বারা উহা কিয়ৎপরিমাণে সমর্থিত হইয়াছিল, আবার কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃতও হইয়াছিল। সেই আন্দোলন বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ সভা আন্দোলনের মধ্যে এখনও সজীব আছে বলা যাইতে পারে।

৬। হিন্দুধর্ম্মের এই রক্ষণশীল আন্দোলনের সময় দুইটি ধারায় ব্যক্ত হইয়াছিল। একটি স্মার্ত্তধর্ম্মের ধারা, আর একটি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারা। বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারায় আবার ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোক যোগ দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। যেমন সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। বাঙ্গালা দেশে ঐ দুই প্রকারের

সনাতন ধর্মসভা, এই সব এক শ্রেণীর সভা। আর হরিসভা, হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা প্রভৃতি আর এক শ্রেণীর সভা। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারায় জ্ঞানানন্দের মহানির্ব্বাণ মঠ, প্রভু জগবন্ধুর দল, চরণদাস বাবাজীর দল, গৌড়ীয় মঠ, গৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দির, বিষ্ণুপ্রিয়ার দল প্রভৃতি অনেক ছোট বড় দল আছে, তাহাদের সাহিত্যও আছে। সুতরাং এগুলিরও খবর রাখা দরকার।

৭। রক্ষণ-শীল হিন্দু প্রতিক্রিয়ার সময় যোগপন্থারও পুনরুত্থান হইয়াছিল। শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয় একজন সুপ্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য। একজনের নাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, তিনি পাঁচ টাকা প্রণামী লইয়া যোগ শিক্ষা দিতেন। কলকাতার আর্য্যমিশন তাঁহাদেরই। আর একজনের নাম প্রিয়নাথ করাড়, শ্রীরামপুরে বাড়ী, বর্ত্তমান নাম শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি। গিরি মহারাজের শিষ্যেরা রাঁচিতে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় করিয়াছেন, দুইজন শিষ্য আমেরিকা গিয়াছেন, সেখানে মঠ করিয়াছেন, যোগের বিদ্যালয় করিয়াছেন, পত্রিকা পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজেরও দলের নাম 'সৎসঙ্গ'।

৮। আর এক 'সৎসঙ্গ' আছে। পাবনা সহরের নিকটবর্ত্তী হিমায়ৎপুর গ্রামে তাহার কেন্দ্র। এই দল রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের শাখা। আগরা সহরে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র। স্বর্গীয় শালিগ্রাম সিংহ মহাশয় ইহার প্রবর্ত্তক। ইনিও যোগ-পন্থী ছিলেন। এই যোগপন্থা প্রধানতঃ হঠযোগ।

৯। শ্রীমৎ নিগমানন্দ স্বামী নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার লোক। আসাম, যোরহাটের নিকট কোকিলামুখ নামক স্থানে তাঁহার মূল কেন্দ্র। স্বামিজী অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কোকিলামুখ হইতে 'আর্য দর্পণ' নামক ধর্ম্মবিষয়ক উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বাহির হয়। আশ্রমে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ও আছে।

১০। ঠাকুর দয়ানন্দ শ্রীহট্টের লোক। ইনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। পূর্ব্বে শিলচরের নিকটে কাছাড় প্রদেশে এক পাহাড়ের উপর তাঁহাদের কেন্দ্র ছিল। নাম ছিল অরুণাচল-আশ্রম। এখন দেওঘরে প্রধান কেন্দ্র। ইঁহাদেরও অনেক পুস্তক ও পত্রিকা আছে।

১১। ঠাকুর হরনাথের বাড়ী বাঁকড়া জেলায় সোণামুখী। তিনি ...

নিত্যানন্দপ্রভু বলিয়া তিনি পূজিত। বাঙ্গালার বাহিরে বোম্বাই প্রদেশেও তাঁহার অনেক ভক্ত আছে।

১২। ভোলানন্দ গিরি মহারাজ, বাবা গম্ভীরনাথ প্রভৃতিরও বাঙ্গালাদেশে অনেক শিষ্য আছে।

১৩। এই সব আন্দোলন ছাড়া আরও অনেক আন্দোলন আছে। ত্রিপুরা জেলায় শ্রীমা বা ত্রিশের বসন্ত সাধুর দল, বৈকুণ্ঠদেবের দল, দয়াময়ের দল প্রভৃতি।

এই সমুদয় আন্দোলনের প্রত্যেকটিরই ভিতরের কথা বেশ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করা দরকার। এই সব আন্দোলনের ফলে দেশে যে একটা জাগরণ আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহির হইতে দেখিলে এই সব আন্দোলনের মধ্যে বিরোধ আছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ নাই। প্রাচীন, জীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ একটা খুব বড় রকমের কিছু চাহিতেছে। কি চাহিতেছে, তাড়াতাড়ি করিয়া তাহা বলা উচিত নয়, তাহাতে দলাদলির সৃষ্টি হয়। আমরা যদি এই সমুদয় আন্দোলন বেশ মনোযোগ পূর্ব্বক অথচ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিব, কাহারও সহিত বিরোধ হইবে না, সকলেরই সহিত মৈত্রী হইবে। সেই মৈত্রীর সাধনাই, আজ প্রয়োজন। সেই মৈত্রী-সাধনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পথ দীর্ঘ, পরিশ্রম করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা চাই, নৈরাশ্যের হেতু নাই।

১৩। নীতি ও প্রাণতত্ত্ব

সমগ্রকেই যখন জানিতে হইবে তখন খুঁটিনাটি লইয়া ভাল মন্দর একটা যেমন তেমন বিচারের প্রয়োজন নাই। যাহা আছে, তাহা আছে; সকলের সঙ্গে মিলিয়াই আছে; কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া নাই। পুণ্যও আছে পাপও আছে। পুণ্য আছে বলিয়াই পাপ আছে, পাপ আছে বলিয়াই পুণ্য আছে। আজ যাহা পুণ্য, কাল তাহা পাপ, তোমার যাহা পুণ্য আমার তাহাই পাপ। আবার আজ যাহা পাপ কাল তাহা পুণ্য, তোমার যাহা পাপ, আমার তাহা পুণ্য।

সকলেরই প্রয়োজন আছে। পাপেরও প্রয়োজন আছে, পুণ্যেরও প্রয়োজন আছে, কামেরও প্রয়োজন আছে, প্রেমেরও প্রয়োজন আছে। আলোরও প্রয়োজন

আছে, আঁধারেরও প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়াই আছে, প্রয়োজন না থাকিলে থাকিবে না। অতএব সাবধান, হঠাৎ কাহারও নিন্দা করিও না, মুখ বাঁকাইও না, উপহাস করিও না। Moralityর আগে Biology।

প্রয়োজন ? কাহার প্রয়োজন। তোমার বা আমার নহে—সেই সর্ব্বের, সেই সমগ্রের। বুঝিতে পার, তাহার প্রয়োজন। না পার, চেষ্টা কর। বুঝিতেই হইবে সে প্রয়োজন। তোমাকে সেই প্রয়োজন বুঝাইবার জন্যই ভবচক্রে ঘুরানো হইতেছে। সেই প্রয়োজন বুঝাই তোমার জীবনের প্রয়োজন। যিনি সর্ব্ব, সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, তাঁহার কামনার অনুবর্ত্তন কর—পূরয় মধুরিপুকামং।

১৪। ত্যাগ ও প্রকাশ

আধ্যাত্মিকতার সুগভীর আস্বাদনে উন্মাদিত হইয়া ঋষি গাহিয়াছিলেন—আনন্দ হইতেই সকলের জন্ম, আনন্দেই সকলের স্থিতি, আর আনন্দেই সকলের পরিণাম। যিনি নিত্য ও পরম, তিনি আনন্দ। আনন্দ কি ? আত্মপ্রকাশই আনন্দ। ঐ ছবি-খানি দেখিয়া আমার আনন্দ হইতেছে। কেন ? আমার হৃদয়ের কোন গূঢ় ভাব, আকাঙ্খা বা আবেগ, ঐ ছবিতে ব্যক্ত হইতেছে, তাই এই আনন্দ। গান শুনিয়া আনন্দ হইতেছে; কেন ? আমার হৃদয়ের কোন গূঢ় ও অব্যক্ত ভাব ঐ সঙ্গীতে যেন ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে, যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। সৎকবির কাব্য ভাল লাগে, নাটক ভাল লাগে, কারণ ঐ কাব্যে, কবিতায় ও নাটকে আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত ভাবগুলিই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার নিকট যাহা আমাকেই ব্যক্ত করে তাহাই আমাকে আনন্দ দেয়। বক্তৃতা শোনায় আনন্দও তাই, বন্ধুর পত্র পাওয়ার আনন্দও তাই। অন্তরঙ্গ জনের নিকট প্রাণের কথা খুলিয়া বলার সুযোগ যদি হয়, তাহাতে যে আনন্দ তাহা বলাই যায় না। এই বিশ্ব আনন্দময়ের আত্মপ্রকাশ, আনন্দময়ের অন্তরতম বাণী বিশ্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনন্ত প্রেমময় পরম পুরুষ, নিজের অস্ফুস্ত আনন্দ রসোচ্ছ্বাস হইতে এই অনন্ত চৈতন্যবিন্দু সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন। ইহাই আনন্দময়ের রসলীলা।

১৫। ভক্তিপথ

আঁধার নাই, সংশয় নাই, দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই; সকলি পরিস্কার ও অবারিত; এমন-ধারা জ্ঞান, সুনির্ম্মল ও সর্ব্বব্যাপী; অন্তর বাহির, ক্ষুদ্র বৃহৎ, দূর ও নিকট, সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও প্লাবিত। ধ্যান করিতেছি সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথা, আর ভাবিতেছি, আমি কোথায়, কত ক্ষুদ্র আমি, কত অজ্ঞান আমি।

হিসাব করিয়া চলিতেছি, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতেছি। কিন্তু আমার এই হিসাব ও ভবিষ্যৎ-জ্ঞান, কত ভ্রান্তিপূর্ণ। সুখ আসিল না, শান্তি আসিল না, আমি পূর্ণ হইলাম কৈ, আমি ধন্য হইলাম কৈ? আমার হিসাব-জ্ঞান, আমাকে অকৃতার্থতায় আনিল, শূন্যতায় আনিল?

শক্তিই বা কৈ? কোন শক্তিরই পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, প্রতি-পদক্ষেপেই ইহা বেশ বুঝিতেছি। তবে সফলতা আসিবে কোথা হইতে?

এই ভাবে ভাবিতেছি, আর শক্তির ও জ্ঞানের পূর্ণতা ধ্যান করিতেছি। আর অহঙ্কার নাই, মাথা নত হইয়াছে, সত্য সত্যই ভিতর হইতে মাথা নত হইয়াছে।

আঁখি খুলিলাম, বাহিরে চাহিলাম। দেখিলাম সকলই পূর্ণ। যিনি পূর্ণ, তিনি পূর্ণকে দেখিতেছেন। সকলি পূর্ণানন্দময়। আকাশ বাতাস, তরুলতা, তৃণ, প্রস্তর সকলি। এখন কেবল তাঁহারই জয়গান করিতেছি।

জয়তি জয়তি দেবঃ

এখন কেবল বন্দনা করিতেছি—ভবন্তং বন্দে। এখন তো এই, তাহার পর যাহা হয় হইবে। অলস বলিবে বল, অকর্ম্মণ্য বলিবে বল, ভাবসর্ব্বস্ব বলিবে বল, কিন্তু এখন এই—বন্দনা ও জয়ধ্বনি।

মানুষ মানুষকে দাবাইয়া আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে চায়। প্রায় মানুষই মনে করে যত বেশী লোককে সে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে, ততই তাহার সুবিধা হইবে। একজন মানুষ যেমন আর দশজনকে দাবাইয়া রাখিতে চায়, তেমনি একদল লোক প্রবল হইয়া আর এক দলকে বা একাধিক দলকে দাবাইয়া রাখে। সংসারে ইহাই চলিতেছে।

ধর্ম্ম যদি সত্য হয় তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথম তাহাকে বলিতে হইবে মানুষে মানুষে

এই সম্বন্ধ অবৈধ। কোন মানুষ বা কোন দল, কোন মানুষ বা কোন দলকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। যে ধর্ম্ম একথা বলে না বা বলিতে পারে না সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে।

বেদের ঋষি মানুষকে বলিলেন, মানুষ তুমি অমৃতের পুত্র। একথা তিনি বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি লোককে বলেন নাই, সকল লোককেই বলিয়াছেন। সত্য ধর্ম্মের ইহাই প্রথম কথা, প্রত্যেক নরনারীকে সুবিধা দিতে হইবে, বুঝিতে—যে সে অমৃতের পুত্র।

মানুষের ভিতরে এই বোধ জাগিবার বাধা কি? কেন মানুষ ইহা ভাবিতে ও বুঝিতে পারে না? প্রত্যেক ধর্ম্মাচার্য্যকে তাহা চিন্তা করিতে হইবে, আর সেই বাধাগুলি কি করিলে দূর করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সেই উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে।

মানুষ প্রচণ্ড হইতে চায়, ভীষণ ও অজেয় হইতে চায়। মধুর, সুন্দর ও প্রিয় হইতে চায় না। প্রচণ্ড হইয়া ভয় দেখাইয়া সকলকে দাবাইয়া রাখা, অসুর হওয়া। হিরণ্যকশিপু তপস্যা করিয়া প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরাজয় হইল, তাহারই পুত্রের নিকট—একটি অসহায় ক্ষুদ্র বালকের নিকট। "মানুষ নিজেই পুত্র-রূপে জন্মায়"—ইহা বেদের কথা। অতএব, হিরণ্যকশিপু নিজের কাছেই নিজে পরা-জিত হইয়াছিল। রাবণের মৃত্যুশর তাহার নিজের ঘরেই ছিল।

"যে কাহাকেও ভয় করে না, কাহারও মনে ভয় জাগায় না, সেই সাধু, সেই ধার্ম্মিক"। কথাটা পুরাতন। কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের প্রথম কথা।

আমাদের প্রত্যেককে নিজের ভিতরে ঢুকিয়া নিজের হৃদয়ের ভাবগুলিকে বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। দেখিতে হইবে আমি কাহাকেও দাবাইয়া রাখিতে চাই কিনা, আমি প্রচণ্ড হইয়া ভয় দেখাইয়া কাহাকেও আয়ত্তাধীন করিতে চাই কি না, আমি কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া কোন প্রকারের অন্যায্য সুবিধা ভোগ করিতে চাই কি না? ধর্ম্মজীবনের ইহাই প্রথম কথা।

অনেক লোক নূতনকে ভয় করে, কোন রকম পরিবর্ত্তনের কথা শুনিলেই ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু গোটা পৃথিবীটাই যে সব সময়ে কেবল নূতন হইতেছে, চির-নবীনের আগমন সর্ব্বদাই হইতেছে, এই সাধারণ, অতি সাধারণ ব্যাপারটা আমরা

দেখিয়াও দেখি না। নূতনের পথ রোধ করিও না, বিপন্ন হইবে। নূতন আসিবেন—নিশ্চয়ই আসিবেন, আসিতেছেন, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সকল সময়েই আসিতেছেন। তাঁহাকে আদর করিয়া গ্রহণ কর।

পুরাতনের ভয়ের কারণ কেবলমাত্র তখন, যখন পুরাতন নূতনকে বাধা দিতে চায়। নতুবা ভয়ের কারণ নাই, নূতনের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া পুরাতন ধন্য হইবে—ইহাই ব্যবস্থা ; ইহার অন্যথা হইবে না। অতএব ঐরাবতের মত তারুণ্যামৃত-ধারার গতি রোধ করিও না। ইহাও ধর্ম্মসাধনার প্রথম কথা। *

অপরাধীর প্রতি ব্যবহার

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

-গীতা, ৯।৩০

"অতি ভয়ানক দুরাচারও যদি একাগ্রচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করিবে,—সে সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"

সমাজে তিন শ্রেণীর লোক আছে। ইহার মধ্যে যাহারা সাধারণ লোক, তাহাদের সংখ্যাই বেশী, তাহারা নিরীহ ভালমানুষ লোক। এই শ্রেণীর উপরে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ভাবুক, কর্ম্মবীর ও সংস্কারক ; তাহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী সম্প্রদায় বলে। তাহারা যাহা বলে, করে বা করিতে চায়, তাহা বর্ত্তমানের সঙ্গে সব জায়গায় খাপ্ খায় না, কিন্তু আজ তাহারা যাহা বলিতেছে, পরে সকলেই তাহা বলিবে, আজ তাহারা যাহা করিতেছে, দু'দিন পরে সকলেই তাহা করিবে। কাজেই এই অগ্রবর্ত্তী দল বর্ত্তমানে থাকিয়াও ভবিষ্যতের জীবন গঠন করে, ইহারাই সমাজের প্রকৃত পরিচালক।

---

* যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের বক্তৃতার সারাংশ।

পূর্ব্বে যে সাধারণ শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইল, সেই শ্রেণীর নীচে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে 'ধর্ম্মনীতি বহির্ভূত' (Non-moral) সম্প্রদায় বলে। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে, এই তিন শ্রেণীর লোক আছে। জীবনে ও ব্যবহারে, এই তিন শ্রেণীর মধ্যে যতই বৈষম্য থাকুক, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ নিশ্চয়ই আছে। তাহা না হইলে, তাহারা কখনই এক সমাজভুক্ত হইতে পারিত না।

এই প্রকারের ত্রিবিধ বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক, প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক সমাজে একতা-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের এই একতাবন্ধন যাহাতে স্থায়ী হয় ইহারা যাহাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া না যায়, সেই জন্যই ব্যবহার-শাস্ত্র বা আইনের দরকার। আইনের দ্বারাই সামাজিক জীবনের ও জাতীয়-জীবনের সংহতি বা ঐক্য সুরক্ষিত হয়।

পৃথিবীর সকল দেশের এবং সকল যুগের চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের মত এই যে, সমাজ জীবন রাখিতে গেলে আইন দরকার। তবে প্রত্যেক মানুষ পুরুষ এবং নারী,—ইহজীবনের শিক্ষা ও সাধনা, কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা ও সুকৃতি দ্বারা যখন আপনা আপনি পূর্ণ সংযমে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, যখন কোনরূপ রিপুর উত্তেজনা বা স্বার্থপরতা মানব-প্রকৃতিতে থাকিবে না, সে সময়ে আর আইনের দরকার হইবে না।

যাহারা 'ধর্ম্মনীতিবহির্ভূত'-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত—তাহারা প্রত্যেক দেশেই সর্ব্বদা আইন ভঙ্গ করিতেছে, তাহাদের দায়িত্ব বোধ নাই। আবার যাহারা নিরীহ ভালমানুষ লোক, তাহারাও দৈবদুর্বিপাকে সময়ে সময়ে সত্য ও ধর্ম্মের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাধ করিতেছে এবং আইন ভঙ্গ করিতেছে। কাজেই সমাজ রক্ষার জন্য আইন প্রয়োজন। আইন ভাঙ্গিলেই অপরাধীকে শাস্তি দিতে হয়। সমাজরক্ষার জন্য শাস্তিদান বা দণ্ডবিধান একান্তভাবে আবশ্যক।

অপরাধীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা প্রধানতঃ তিন প্রকারের মনোভাবের দ্বারা চালিত হইয়া দেওয়া থাকে—

১। প্রতিহিংসা-বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া অনেক সময়ে অপরাধীর শাস্তি বিধান করা হয়। ক', খ'কে মারিয়াছে, অতএব খ দেখিয়া লইবে, ক যাহাতে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পায়। ক কষ্ট পাইলে খ-এর যে কিছু লাভ আছে, তাহা নয়। কিন্তু ক'কে প্রতিফল দিতেই হইবে। এমন কি, তাহার জন্য খ'কে যদি কিছু ক্ষতি করিতে হয়, কিম্বা আরও বেশী কর্ম্মভোগ করিতে হয়, সে জন্যও খ' প্রস্তুত। ইহারই নাম প্রতিহিংসা। 'অপরাধীর শাস্তি হউক,'—এই ইচ্ছা মানুষের মনে যে জাগিয়া থাকে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই এই প্রতিহিংসার জন্য—ন্যায়ের বা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা বা সমাজ রক্ষা প্রভৃতির চিন্তা [illegible]

অপরাধীর যেটুকু শাস্তি হওয়া দরকার, অনেক ক্ষেত্রেই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শাস্তি হইয়া থাকে।

২। আমাদের সকলেরই মনে ভয় আছে। একজন লোক একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের মনে এই ভয় হয়, পাছে আর একজনও এই প্রকারের অন্যায় কাজ আবার করে, এবং তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয়। সুতরাং লোকে ভাবে, অপরাধীকে এমনভাবে দণ্ড দেওয়া দরকার, যাহাতে সেও ভয় পায় এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনও না করে, আর তাহার শাস্তি দেখিয়া অন্য লোকেও ভয় পাইয়া ঐ প্রকারের অপরাধ না করে। এই মতে দণ্ড বিধান, ভবিষ্যৎ অপরাধের নিবারক। কিন্তু ইহাতে অপরাধ কমে কি? সরকারী তালিকা পড়িলে বুঝা যায়, অনেক অপরাধী কঠিন শাস্তিভোগ করার পর আবার অপরাধ করিতেছে। একজন দুজনের কঠোর শাস্তি হওয়ার পরেও, নূতন নূতন লোক সেই অপরাধ করিতেছে। কাজেই, যে শাস্তিকে deterrent বা অপরাধ-নিবারক বলিয়া মনে করা যায়, তাহা মোটেই অপরাধ-নিবারক নহে। দণ্ডদানের ফলে, অপরাধীর অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়াই যাইতেছে। দণ্ডও যত বেশী বা কঠোর হইতেছে, অপরাধীর সংখ্যাও তত বাড়িতেছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

৩। দণ্ডবিধানের সার্থকতা ও মূল আবশ্যকতা—অপরাধীর চরিত্র সংশোধিত করা এবং তাহাকে সামাজিক জীবনের উপযুক্ত করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে সাধারণতঃ যে ভাবে দণ্ডবিধান করা হয়, তাহাতে এই উদ্দেশ্য মোটেই সাধিত হয় না। কাজেই, দণ্ডবিধান-ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম, বেত্রাঘাত, নির্জ্জন কারাবাস প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া, অন্যরূপ ব্যবস্থা করা দরকার হইয়াছে।

প্রচলিত দণ্ডবিধান সুফলপ্রদ নহে—সুতরাং নিন্দনীয়, কারণ,—

(ক) উহাতে মানবের বৈরনির্য্যাতন-বৃত্তি বা প্রতিহিংসা-বৃত্তি তৃপ্তি লাভ করে।

(খ) সমাজের শান্তি রক্ষার জন্যই দণ্ডদানের ব্যবস্থা, কিন্তু প্রচলিত দণ্ডের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ হয় না।

(গ) দণ্ডবিধানের ফলে, অপরাধ নিবারিত না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতেছে।

(ঘ) দণ্ডের ফলে অপরাধীর চরিত্র সংশোধিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু প্রচলিত দণ্ডবিধানের দ্বারা অপরাধীর চরিত্র উন্নত বা সংশোধিত হয় না, বরং আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

(ঙ) আবার এমন ঘটনা অনেক ঘটে, যেখানে যাহারা প্রকৃত অপরাধী, ও দণ্ডার্হ, তাহাদের কোনরূপ দণ্ড হয় না; কিন্তু যাঁহারা এক নবযুগের ঋষি ও প্রবর্ত্তক, যাঁহারা দেশের কল্যাণব্রতে ব্রতী,

দণ্ডধারিগণ তাঁহাদের কার্য্য ও ব্যবহার বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তাঁহাদের দণ্ডবিধানও করেন।

দুর্নীতিপরায়ণ অপরাধীকে যদি দণ্ডের দ্বারা সংশোধিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই দণ্ডবিধান সার্থক। যে দণ্ডের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, সে দণ্ডদান রহিত হওয়াই আবশ্যক। বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে শাস্তি দানের ভয় দেখাইয়া, দীর্ঘকাল শাসন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে, এই ভীতি প্রদর্শন বিদ্যালয়েও নিষ্ফল, কারাগারেও নিষ্ফল। যাহারা অপরাধ করায় দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হয়, তাহাদের বয়ঃক্রম যতই হউক, তাহারা প্রকৃতিতে বালকমাত্র। তাহারা মানবীয় ক্রমোন্নতি-সোপানের অতিশয় নিম্নস্তরে অবস্থিত। সুতরাং দেহ, মন ও হৃদয়ের পুষ্টিবিধানের জন্য, যে সমুদয় উপকরণ আবশ্যক, তাহাদিগকে সেই সমুদয় উপকরণ সরবরাহ করা আবশ্যক। তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে, তবে তাহাদের দেহের পুষ্টি হইবে; তাহাদিগকে ভাল পোষাক পরিচ্ছদ দিতে হইবে; কারণ, দৈহিক সৌন্দর্য্যসাধনও আবশ্যক, ইহা ব্যতীত মানবের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না। তাহাদিগকে অতিমাত্রায় পরিশ্রম করাইলে চলিবে না, উপযুক্ত বিশ্রাম আবশ্যক। তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য এমন কার্য্য দিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের আত্ম-সম্মান-বুদ্ধি রক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া, সঙ্গীত প্রভৃতিও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যাহারা অপরাধ করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে এবং শাস্তিভোগ করিতেছে—তাহাদের সম্বন্ধে এই সব ব্যবস্থা করিতে বলিলে, প্রাচীন মতাবলম্বী অনেক লোকই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু তাহাদের জন্য এই সমুদয় ব্যবস্থা করিতেই হইবে। অবশ্য এমনভাবে করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এমনভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সমাজের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে। দমন করা আবশ্যক, অপরাধীকে দমন করিবার জন্য যে সমুদয় ব্যবস্থা আছে, তাহার সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এমনভাবেও দমন করা যায়, যাহাতে একদিক দমন করিলে মানবের আর একদিক উত্তমরূপে বিকশিত হইয়া উঠে। এই প্রকারের দমন খুবই আবশ্যক।* কিন্তু দমন, আর পাশবিক অত্যাচার—এক জিনিষ নহে। আমরা সকলে যদি এইটুকু বুঝিতে পারি যে অপরাধীরাও আমাদেরই ভাই বোন্, আমাদের যাঁহারা প্রতিনিধি, যাঁহারা আমাদের হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণয়ন করেন, তাঁহারা যদি অনুভব করিতে পারেন যে অপরাধীরা তাঁহাদেরই ভাইবোন্, তাহা হইলে মানবজাতির উন্নতি বিধানের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে কালিয়দমন-লীলায় নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—ধ্বংসে দমং ফলমেবানুশংসন্—এমন ভাবে দমন কর, যাহাতে সুফল ফলে। ইহাই ভগবানের পদ্ধতি। মানুষ যদি ভগবান্‌কে চায়, তাহা হইলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করুক।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

দণ্ডবিধান সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষের শাস্ত্রসমূহে এমন অনেক মূল্যবান্ কথা আছে, যাহার আলোচনা করিলে আমরা বিশেষরূপে উপকৃত হইব। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায় উত্তমরূপে আলোচনা করিলে আমরা পূর্ব্বের লিখিত অনেক কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। নিম্নে নমুনা স্বরূপ আমরা কয়েকটি শ্লোক ও শ্লোকের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিলাম—

দণ্ডো হি সুমহৎ তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্॥
ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরম্।
অন্তরীক্ষগতাংশ্চৈব মুনীন্ দেবাংশ্চ পীড়য়েৎ॥
সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ॥
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা॥ ৭ ২৮-৩১

'রাজার হিতার্থেই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মস্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দণ্ডের ভয়েই চরাচর সমুদয় জগৎ স্ব-স্ব ভোগসুখে প্রতিষ্ঠিত আছে—কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না। দেশ, কাল, শক্তি ও বিদ্যা সম্যক্ আলোচনা করিয়া অন্যায়কারীর প্রতি রাজা যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিবেন। প্রকৃত পক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসনকর্ত্তা। ঋষিরা দণ্ডকেই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম-প্রতিভূ বলেন। দণ্ড সমুদয় প্রজাকে শাসন করিয়া থাকেন, দণ্ডই তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন; সকলে নিদ্রিত হইলে একমাত্র দণ্ডই জাগরিত থাকেন; পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়াছেন। এই দণ্ড যদি সম্যক্ বিবেচিত হইয়া ধৃত হয়, তবেই প্রজা সমুদয় সুখে থাকে; পরন্তু, অন্যথায় সকলকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা অনলস থাকিয়া দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে, বলবান্ জনের হস্তে শূলে মৎস্যপাকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে অতিশয় যাতনায় দগ্ধ করিত, দেবোদ্দেশে প্রদত্ত মন্ত্রপূত হবিঃ কুক্কুরে লেহন করিত, বায়সে যজ্ঞীয় চরু ভক্ষণ করিত এবং শ্রেষ্ঠ জাতীয় ব্যক্তিরা নিকৃষ্টের দ্বারা পরাভূত

দুর্লভ। এই যে চরাচর নিজ ভোগ্য ভোগে সমর্থ হয়, দণ্ডভয়ই তাহার কারণ। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নিশাচর, বিহঙ্গ এবং সর্প—কেবল ঐশিক দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া জগদুপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অন্যায় দণ্ডবিহিত হইলে বা একেবারে দণ্ডশূন্য হইলে, ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণ দোষদুষ্ট হইয়া স্বীয় মর্য্যাদাসেতু অতিক্রম করে এবং চৌর্য্যাদি দোষপ্রযুক্ত প্রজা সকলের নিতান্ত ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে স্থলে শ্যামবর্ণ রক্তলোচন দণ্ডপাপ বিনাশার্থ বিচরণ করে, এবং দণ্ড-বিধাতা সর্ব্ববিষয়ে ন্যায় দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, প্রজারা তথায় কদাচ কাতর হয় না।

মন্বাদি ঋষিগণ সত্যবাদী, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্যকরী, সম্যক বেদবিৎ এবং ধর্ম্ম-কামার্থের বিভেদজ্ঞ রাজাকেই সম্যক্ দণ্ডপ্রণেতা বলিয়া থাকেন। যদি রাজা সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়: রাজা ক্ষুদ্রচিত্ত, ভোগবিলাসী এবং ক্রোধাদির বশীভূত হইলে, নিজ দণ্ড দ্বারা স্বয়ং নিহত হন। মহাতেজা দণ্ড, শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইবার যোগ্য নহে। কারণ ইহা অযথা প্রযুক্ত হইলে, আত্মীয়-স্বজনের সহিত রাজাকে সবংশে ধ্বংশ করে।

অযথাবিহিত দণ্ড—রাজদুর্গ, স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি এবং প্রজা সহ সাম্রাজ্যকেও ক্রমে প্রপীড়িত করে এবং উপযুক্ত পাত্র সকলের বিনাশ হেতু অন্তরীক্ষগত ঋষি ও দেবতাকেও দুঃখ প্রদান করে। লোভপর শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন মন্ত্রী পুরোহিতাদি সহায়শূন্য এবং ভোগাসক্ত নরপতি, কদাচ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

পবিত্র-প্রকৃতি, বিশুদ্ধাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বেদাদি শাস্ত্রানুসারী এবং সুবুদ্ধি নরপতি, সুমন্ত্রী সহ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন।

স্বরাজ্যে শাস্ত্রানুসারে দণ্ড বিধান করা, বিদেশীয় শত্রুকে তীক্ষ্ণদণ্ডে দমন করা, সমানভাবে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সরল ব্যবহার করা, ও স্বল্পাপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার উচিৎ। ইহাতেই রাজার যশঃ—দুর্ব্বল হইলেও যশঃ হইবে ; না হইলেই রাজার দুর্নাম।

মন্তব্য ও সংবাদ

সন্ধ্যামন্ত্রে—শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ-পরিষদের শাস্ত্রানুসন্ধান-সমিতির ১৩৩০, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের অধিবেশনের এক মুদ্রিত বিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই অধিবেশনে, সন্ধ্যাবিধি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল দেখা যায়। বিবরণী হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"তর্কিত বিষয়—আজকাল অনেকে সন্ধ্যাবন্দনের মন্ত্রাদি, মুদ্রিত পুস্তক আকারে প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সকল পুস্তকে মুদ্রিত মন্ত্রের পাঠ অনেক স্থলেই পরস্পর বিরুদ্ধ। এই অবস্থায় উপাসকের পক্ষে কর্ত্তব্য কি ?

সিদ্ধান্ত—বেদের শাখাভেদে অনেক প্রকার পাঠভেদ আছে, অথচ বর্ত্তমানে অনেক শাখার নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু বংশপরম্পরায় পূর্ব্বপুরুষের অবলম্বিত মন্ত্রপাঠ চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুসন্ধান সমিতির মত এই যে—সন্ধ্যোপাসনাদি বিষয়ে গুরুমুখশ্রুত পাঠ পরিত্যাগ করিয়া কোন মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এই সকল বিষয় শিক্ষার ভার শাস্ত্রকারেরা গুরুর হস্তেই ন্যস্ত করিয়াছেন। প্রমাণ যথা—

(১) উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥ মনু ২.৬৯

(২) শ্রুতিদ্বৈধং তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥ মনু ২।১৪"

এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে—সম্যক শাস্ত্রানুসন্ধান না করিয়াই, শাস্ত্রানুসন্ধান-সমিতি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপে যে শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করা হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে প্রথমটিতে "গুরু" শব্দ দেখিয়া শাস্ত্রানুসন্ধান-সমিতি, অন্য কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই শব্দটিকে সাধারণ প্রচলিত 'গুরু'-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি মনুসংহিতা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, মনুর ২।৬৯ শ্লোকের "গুরু" শব্দে, "আচার্য্য" বুঝিতে হইবে। এই আচার্য্যের লক্ষণ—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।

সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥ মনু ২।১৪০

এই আচার্য্য, সকল্প সরহস্য বেদ শিক্ষা দিতেন, সুতরাং তিনি বেদজ্ঞ ছিলেন, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। মনু ২।৬৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বিবাহই স্ত্রীলোকের পক্ষে উপনয়ন তুল্য, এবং পতিসেবাই গুরুকুলে বাসের তুল্য ;—"পতিসেবা গুরৌ বাসঃ" ; এখানেও 'গুরু' অর্থে—আচার্য্য। ২।৭৩ শ্লোকেও 'গুরু' অর্থে—আচার্য্য। বেদজ্ঞ (মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ যিনি জানেন) আচার্য্য (গুরু) শিষ্যকে সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন—ইহাই মনু ২।৬৯ শ্লোকের তাৎপর্য্য। আমরা সাধারণতঃ গুরুমুখশ্রুত যে পাঠ পাইয়া থাকি, তাহা অনেক স্থলেই শুদ্ধ নহে ; কেননা, এই গুরু স্বয়ং বেদজ্ঞ নহেন। সুতরাং, মনুর (২।৬৯) দোহাই দিয়া—"গুরুমুখশ্রুত পাঠ পরিত্যাগ করিয়া, কোন মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে"—এই সিদ্ধান্ত প্রচার করা ভাল হয় নাই।

আবার, মনু ২ ১৪২ শ্লোকে, "গুরু"-শব্দে পিতাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই শ্লোকটি এই—

নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।

সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥

মেধাতিথি ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"পিতুরয়ং গুরুত্বোপদেশঃ"। কুল্লুক—তথা। সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ—গুরুরিতি পিতৈবোক্তঃ॥ শাস্ত্রানুসন্ধান সমিতি ইচ্ছা করিলে বলিতে পারিতেন—পিতার নিকট যে পাঠ পাওয়া গিয়াছে, "তাহা পরিত্যাগ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" পিতা, পিতামহ প্রভৃতি মন্ত্রের যে পাঠ অনুসারে সন্ধ্যা-উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন—আমরাও তাহাই করিব, তাঁহারা যদি ভুল পাঠ করিয়া নরকে গিয়া থাকেন, তবে আমরাও সেখানে যাইব—এরূপ মনোভাবের পরিচয়ও কেহ কেহ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পিতৃভক্তির আমরা প্রশংসা করি ; কিন্তু একথাও বলিতে পারি যে যথার্থ পাঠ জানিয়াও, পিতা বা পিতামহের ধৃত ভুল পাঠ করিয়া আমরা নরকে যাইলে, আমাদের পিতা বা পিতামহ সন্তোষ লাভ করিবেন না, বরং বেদনা বোধই করিবেন।

শাস্ত্রানুসন্ধান-সমিতির দ্বিতীয় প্রমাণ—"শ্রুতিদ্বৈধং তু যত্রস্যাৎ" ইত্যাদি মনুর ২ ১৪ সংখ্যক শ্লোক। কোনও অনুষ্ঠের কর্ম্ম সম্বন্ধে যদি বেদের একাধিক উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি ?—এই প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—যে স্থানে শ্রুতির একাধিক প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে শ্রুতির সকল উক্তিই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; কেন না, এই উক্তির মধ্যে যথার্থ বিরোধ নাই। মনু, পরের শ্লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা এই 'শ্রুতিদ্বৈধ' বুঝাইয়াছেন।

উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।

সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥মনু ২।১৫॥

অগ্নিহোত্র হোম করিবে—ইহাই বিধি ; কোন্ সময় হোম করিবে এসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি দেখিতে পাওয়া গেলেও—সকল শ্রুতিই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (হোম) করিতে আদেশ দিতেছেন। [ভিন্ন ভিন্ন বিধি সম্বন্ধে রামচন্দ্র কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]। হোম করিতেই হইবে—ইহাই প্রধান বিধি, সময় নির্দ্দেশ অবান্তর বিধি বা অঙ্গ বিধি মাত্র ; এ সম্বন্ধে হোমকর্ত্তার স্বাধীনতা থাকিল।

বিবরণীতে, বেদের শাখা-ভেদে পাঠ-ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে। যাঁহারা বেদ সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁহারা জানেন যে শাখাভেদে (ক) "রাত দিন" পার্থক্য হয় না, বা (খ) ভুল পাঠও চলে না। (ক) 'রাতদিন'—বলিতেছি এই জন্য যে—প্রচলিত সন্ধ্যামন্ত্রের ভিতর প্রাতঃ সন্ধ্যার আচমন মন্ত্রে "অহস্তদবলুম্পতু" এবং সায়ংসন্ধ্যার আচমন মন্ত্রে "রাত্রিস্তদবলুম্পতু" এরূপ পাঠ দেখা যায় ; যথাক্রমে হইবে—"রাত্রিস্তদবলুম্পতু" এবং "অহস্তদবলুম্পতু" ; কেন না, তাহাই বেদের পাঠ [তৈ, আ ১০।২৫, মহা, না, উপনিষৎ ১৪।৪ দ্রষ্টব্য]। অথচ, অনেকেই ভুল পাঠ করিয়া শাখা-ভেদের দোহাই দিয়া থাকেন। (খ) সূর্য্যোপস্থান সময়ে—

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং
সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ (ঋ, বে ১।১।৫।১ বাঙ্গ, সং ১৩।৪৬)

এই শুদ্ধমন্ত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় পাদে কেহ কেহ পাঠ করেন—

"চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষং"। দ্বিতীয় পাদের শেষ শব্দ "আগ্নেঃ"-র বিসর্গের সহিত, তৃতীয় পাদের প্রথম স্বর আকারের সন্ধি কোনও সূত্র অনুসারেই করা যায় না ; তৃতীয় পাদের "দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষম্" কোনও ব্যাকরণ অনুসারেই সিদ্ধ করা যায় না ; দ্যাবাপৃথিবী দ্বিবচনান্ত পদ, প্রগৃহ্যস্বরান্ত, এখানে অনুস্বার কেমন করিয়া আসিল ? এরূপ অনুস্বার ও চ-কারযুক্ত পাঠ ভুল। এই ভুল আসিয়াছে—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ (ঋ, বে ১০।১৯০.৩)

এই মন্ত্রের "পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষম্"এর অনুস্মৃতিতে ও বেদ না জানার ফলে! এ পাঠও কি "গুরুমুখশ্রুত" বলিয়া চলিয়া যাইবে!

"অনেক শাখার নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে" (অথচ শাখার অস্তিত্ব দেখা যায় না)—এরূপ বলি-বার তাৎপর্য্য যদি এই হয় যে—সাধারণতঃ মন্ত্রাদির যে পাঠ চলিয়া আসিতেছে—তাহা মুদ্রিত গ্রন্থাদি ব্যাকরণাদি অনুসারে ভুল বলিয়া বোধ হইলেও, তাহা নিশ্চয়ই কোনও না কোনও শাখায় ছিল—

তাহা হইলে আমরা নাচার! যে শাখার নামমাত্র অবশিষ্ট আছে—আমাদের অবলম্বিত ভুল পাঠটি ঠিক্ সেই শাখাটিতেই ছিল—এরূপ মনোভাব সুস্থ মনের পরিচায়ক নহে এবং চিরকাল যেরূপ পাঠ করিয়া আসিতেছি, তাহাই করিতে থাকিব—মুদ্রিত পুস্তকাদির (এমন কি, মুদ্রিত বেদ-গ্রন্থের) সাহায্যে মন্ত্রসংশোধন করিয়া লইব না'—এরূপ মনোভাব আধ্যাত্মিক-স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে।

বিবরণীর সর্ব্বশেষে মন্তব্য দেখা যাইতেছে—"গ্রন্থকারদ্বয় মধ্যে (কাশীধাম প্রবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন ও শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি) কেহ অনুরোধ করিলে এবং আবশ্যক ব্যয় বহন করিলে, তাঁহাদের গ্রন্থসংশোধনের শ্রমস্বীকার করা যাইতে পারে।" এটুকু পড়িয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

বেদ বিষয়ে বিচার বেদবিৎ করিবেন। যিনি স্বয়ং বেদজ্ঞ নহেন, তাঁহার কোনও কথা বলার অধিকার নাই।

শিক্ষা-বিস্তার—আমরা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, দেশে শিক্ষা বিস্তার আবশ্যক। দেশবাসী জনসাধারণ যদি সুশিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ-কষ্ট নিবারিত হইবে। যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী; কিন্তু হিসাব করিতে হইবে, সত্য করিয়া শিক্ষা-বিস্তার চাহেন বা কয়জন, আর শিক্ষা-বিস্তারের বিরোধীই বা কয়জন? শিক্ষা-বিস্তারের বিরোধী লোকের সংখ্যাই অধিক। যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা চতুর ও প্রতিপত্তিশালী। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যদি দেশে আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনের ফলে যদি বড়লোক শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে অর্থ সাহায্য করে, তাহা হইলে এই সব চতুর ও প্রতিপত্তিশালী লোক দল বাঁধিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিবে এবং কর্ত্তা হইয়া বসিবে। প্রকৃত সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে, একটা নাম-মাত্র শিক্ষা-বিস্তারের কাজ চলিবে; একটা প্রাণহীন কর্ম্ম খাড়া হইবে, অর্থের অপব্যয় হইবে, মিথ্যা-বিজ্ঞাপনের দ্বারা দেশের চোখে ধূলা দেওয়া হইবে; কতকগুলি চতুর লোক সহজে নিজেদের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইবে, সত্য কর্ম্ম অগ্রসর হইবে না, বাধা প্রাপ্ত হইবে।

আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য যথার্থরূপে চালাইতে গেলে প্রথম প্রয়োজন—শিক্ষক। দ্বিতীয় প্রয়োজন—জনসাধারণের সানুভূতি ও আনুকূল্য। জনসাধারণের আনুকূল্য লাভ করা যায় দুএকবার দেশে জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন হইয়াছে এবং অর্থও আসিয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই; এমন কি, কিছুই হয় নাই বলিলেও চলে। যাহা হইয়াছে, তাহা আরও সহজে, আরও ভাল করিয়া করিতে পারা যাইত। এখন দেশের লোকের বুঝিতে পারা উচিত, কলিকাতায় কেন্দ্র করিয়া কোনও দেশব্যাপী হিতকর কর্ম্ম আরম্ভ করিলে তাহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে না, অপকার হইবে। অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইহা এখন বুঝিতে পারা

উচিত। কলিকাতা সহরের ইতিহাসই বড় ভয়ানক। এই সহর কি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক।

শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে শিক্ষকের প্রয়োজন প্রথম। যাহারা শিক্ষক হইবেন, তাঁহারা দেশকে ভালবাসিবেন এবং এই ভালবাসার দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা অর্থাৎ ইংরাজী-পড়া লোকেরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, চার পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যে সংস্কারের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছি, তাহাতে দেশকে ভালবাসা খুবই কঠিন, অনেকস্থলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, স্বদেশ-প্রেমের সাধন আবশ্যক। দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করিব, শিক্ষার দ্বারা দেশের প্রত্যেক নর-নারীকে শক্তিশালী করিয়া মানুষ করিয়া তুলিব, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া যাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের কিছুরই অভাব হইবে না। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াছি, অন্যস্থানে অনুরূপ কাজকর্ম্ম মিলিল না, জাতীয়-শিক্ষার পতাকার নীচে দাঁড়াইলে দুএকবার জেল খাটিলে খবরের কাগজে একটু নাম প্রচারিত হইলে, চাঁদা তোলা যায়, তাহাতে সুবিধা আছে— এই সব ভাবিয়া যাহারা আসিবে, বা সাময়িক উত্তেজনায় অন্ধভাবে যাহারা আসিবে, তাহাদের দ্বারা ইষ্ট হইবে না, অনিষ্ট হইবে; অতএব সাধু সাবধান!

অনেক স্বাধীনদেশে এইরূপ নিয়ম আছে, প্রত্যেক যুবককে কিছুদিন সৈনিকের কার্য্য করিতে হয়। বাধ্য হইয়াই তাহাদের একার্য্য করিতে হয়, সেসব দেশের এইরূপ আইন। আমাদের দেশের যেসব কৃতবিদ্য যুবক নিতান্ত অভাবগ্রস্ত নহে, অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার পর দুই তিন বৎসর যদি তাহারা অর্থ উপার্জ্জন না করে, তাহা হইলে তাহাদের পরিবারের কষ্ট হইবে না, তাহারা যদি দল বাঁধিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে যে, তিন বৎসরকাল তাহারা প্রত্যেকে কোন দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত পল্লীতে থাকিয়া শিক্ষকের কার্য্য করিবে, তাহা হইলেই কাজ চলিবে। কিন্তু, এই প্রকারের যুবকদের সংঘবদ্ধ করিয়া কোনও কেন্দ্রে একটি প্রতিষ্ঠান করিয়া কাজ চালাইতে গেলে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সব পণ্ড হইয়া যাইবে। প্রত্যেক যুবক নিজের ভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করিবেন। শিক্ষা-বিস্তারের ইহাই প্রথম উপায়।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করিতে হইলে, প্রথমেই অবধারণ করিতে হইবে— আমাদের দেশে জনসাধারণের জীবনে প্রকৃত সমস্যা কি? অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেজন্য প্রথম দরকার, সমুন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুটীরশিল্পের প্রবর্ত্তন,—Revival of home industries in scientific form বর্ত্তমান যুগে এই কার্য্য সফল করিতে হইলে,যৌথ ধনভাণ্ডার ও শ্রমসমবায় প্রয়োজন Co-operative Banking, Co-operative production and sale.

এই কার্য্যগুলি করিতে গেলেও শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক। সে শিক্ষা কিরূপ? মানুষ যুগ্য,

অস্পৃশ্য, পদদলিত ও অত্যাচারিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে অত্যাচার যে কত ভয়ঙ্কর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্বোধিত করিতে হইবে, তাহার ভিতরে আত্মসম্মান-বুদ্ধি জাগাইতে হইবে, প্রত্যেক মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব যাহাতে বিকশিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগাইতে পারিলে ইহা হয়, কিন্তু এই ধর্ম্মবুদ্ধির জাগরণ ও অনুশীলনের সহিত, আর তিনটি বিষয়ে জ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজন। এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান না হইলে, ধর্ম্মবুদ্ধির জাগরণের দ্বারা ইষ্ট হইবে না, অনিষ্ট হইবে। এই তিনটি বিষয়—ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান।

তিনটি মৌলিক ধারণা বা ব্যাপারের দ্বারা মানবের দৈহিক ও মানসিক জীবন শাসিত ও চালিত হইতেছে। দেশ, কাল, ও নিমিত্ত, এই তিনটিই ঐ মৌলিক ব্যাপার। মানসিক জীবন বিকশিত করিতে হইলে, প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যে মানবের এই ত্রিবিধ বোধের প্রসারণ করিতে হইবে। উন্নততর সূক্ষ্মবিষয়ের চিন্তা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের বোধের যথাযথ অনুশীলন করিলে, মানুষ সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে, নতুবা পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় দেশকে আমরা উন্নত ও প্রবল বলিয়া মনে করি, যে সমুদয় জাতির সহিত জীবন-সংগ্রামে আমরা পরাজিত, সেই সমুদয় জাতির উন্নতি পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকারের বোধের অনুশীলনের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে।

ইতিহাস পড়াইতে হইবে। তাহার দ্বারা কালজ্ঞানের অনুশীলন হয়। জাতীয়তার বোধ,—জাতি-হিসাবে আমাদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, একটা নিজস্ব গৌরব আছে, এই বোধ, ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই বিকশিত ও দৃঢ়ীকৃত হয় না। ইতিহাসের চর্চ্চা না করিলে, দেশকে ও দেশের সাধনাকে (culture) কেহ সত্য করিয়া ভাল বাসিতে পারে না যদি বলে ভালবাসি, তাহা ভালবাসা নহে, প্রমাদ। কিন্তু ইতিহাসের গ্রন্থ কৈ ? এখনও তাহা লেখা হয় নাই। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যে সব স্মরণীয় ও বরণীয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের চরিত্র-কথা ও মহিমা, প্রত্যেক বালকবালিকাকে উত্তমরূপে হৃদ্গত করাইতে হইবে। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে, বিশেষ হইতে সাধারণে, মানুষের চিত্তকে উন্নীত করিতে হইবে। ইতিহাস পড়িতে হইলে নিজের বংশের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস জানিতে হইবে। গ্রামের মন্দিরের ইতিহাস, দেবতা ও উৎসবের ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। এই সব সহজ ইতিহাসের চর্চ্চা করিতে করিতে, ক্রমশঃ জটিলতর ও উন্নততর ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই প্রকারে ক্রমে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীকে পৃথিবীর ইতিহাসে লইয়া যাইতে হইবে।

দেশবোধের প্রসারণের জন্য ভূগোলের আলোচনা প্রয়োজন। ভূগোলশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে

করিতেই, ইউরোপীয় জাতীয় সমূহের চিত্তে সমুদ্রযাত্রার আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিল। এই আকাঙ্খাই ইউরোপীয় জাতিসমূহের শ্রীবৃদ্ধির মূলকারণ। বাড়ীর চারিদিকের ও গ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থার আলোচনা হইতে ভূগোল পাঠ আরম্ভ হইবে। ইতিহাস ও ভূগোল একসঙ্গে পড়াইতে হইবে। প্রত্যেক ঘটনা বা আন্দোলন, মানব-হৃদয়ে একটি ভাব জাগাইয়া দেয়, বর্ত্তমানের ভিতর সমগ্র অতীত সফল হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যত গড়িয়া উঠিতেছে, ইতিহাসের আলোচনায় এই ভাব-দৃষ্টি বিকশিত হয়। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস পড়িবার সময় শিক্ষার্থীর হৃদয় শিবাজীর স্বপ্নের দ্বারা উদ্বোধিত ও আকুলিত হওয়া চাই, নতুবা ইতিহাস পড়িয়া লাভ নাই। রাজপুতনার ইতিহাস পড়িবার সময়, চিতোর ও আরাবলি পর্ব্বতমালার নাম শ্রবণমাত্রেই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই হৃদয়, মহত্বের ও বীরত্বের প্রেরণায় উদ্দীপিত হওয়া চাই।

দেশ ও কালের কথা বলা হইল, এইবার 'নিমিত্তের' কথা। বালক বালিকা মাত্রেই সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে, ইহা কেমন করিয়া হইল, উহা কিরূপে করা যায়? মানবচিত্তের এই যে স্বাভাবিকী জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানের দ্বারা তাহারই তৃপ্তি হয়; আর এই কৌতূহল-তৃপ্তির দ্বারা মানবের কারণ-বোধের অনুশীলন হইয়া থাকে।

জড় ও শক্তির রহস্য, উত্তাপ, আলো, চৌম্বক-শক্তি, বিদ্যুৎ প্রভৃতির দ্বারা কি করা যায়, তাহা দেখাইয়া শিক্ষার্থীর কৌতূহল জাগরিত করিতে হইবে। বালক বালিকা যাহাতে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যাপার মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করে, সেই অভ্যাস তাহার গঠন করিতে হইবে। সকল বিষয়েই অনুসন্ধিৎসা থাকা চাই, অন্ধভাবে গতানুগতিকের অনুবর্ত্তন করাই অবৈজ্ঞানিকতা, নিজে না দেখিয়া ও না বুঝিয়া, পরের কথা মানিয়া লওয়াই অবৈজ্ঞানিকতা, ইহা জড়ত্ব; এই স্বাভাবিক জড়ত্ব হইতে মানবকে পরিত্রাণ করিতে হইবে।

মানুষ যত পাপ করে, তাহার অনেক পাপ শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্যই হইয়া থাকে। রীতিমত ব্যায়াম, পুষ্টিকর দ্রব্যের ভোজন প্রভৃতির দ্বারা দেহের বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা শিক্ষা-বিস্তারের প্রথম কথা। পূর্ব্বে গ্রামে যে সব ক্রীড়াকৌতুক ছিল, এখন আবার সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রাম্য উৎসবগুলি লুপ্ত হইতেছে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইভাবে গ্রাম হইতে জাতীয় শিক্ষা আরম্ভ হউক, খবরের কাগজে যেন তাহার বিজ্ঞাপন বাহির না হয়।

হিন্দু সমাজের যাহা হউক, একটা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এখন সামাজিক ব্যবস্থা বিবিধ কারণে বিপর্য্যস্ত হইতেছে। ফলে, নূতন করিয়া সমাজদেহ গড়িয়া তুলিবার জন্য নানারূপ আন্দোলন ও চেষ্টা চলিতেছে। অন্য দেশের অন্য প্রকারের সামাজিক ব্যবস্থা, সম্মুখে ও চারিদিকে বিদ্যমান; আর এই বৈদেশিক আদর্শ অনেকেরই নিকট লোভনীয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন—আমাদের সমা-

জের এই বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে, আর বর্ত্তমান সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, ঐ বৈশিষ্ট্য কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য-জাতি-সমূহের বৈজ্ঞানিকতা ও সমবায়-সামর্থ্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু মানবাত্মার স্বাধীনতা, মানবের ব্রহ্মত্ব (Inherent divinity of man), বিশ্বের একত্ব, এই মহা-সত্যগুলিও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে যে সব সুমহান্ ভাব ও আদর্শ আছে, সেগুলি বজায় রাখিতে হইবে, অথচ সমাজকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিতে হইবে। সমস্যা খুবই কঠিন। ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞানের উপর ভারতের সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমাচার অতুলনীয় ব্যবস্থা। ভারতবর্ষীয় সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য—বর্ণভেদ বা জাতিভেদ। আমি কোন একটি জাতি বা বর্ণের লোক হইয়া জন্মাইয়াছি। আমি হয়ত, আমার জন্মের দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া গিয়াছি ; আমি যে উঠিতে পারিব না, তাহা নহে। কিন্তু আমাকে উঠিতে হইলে, আমার সমগ্র জাতিকে লইয়া উঠিতে হইবে। এই এক গুরুতর পরার্থমূলক কর্ত্তব্য, আমাদের প্রত্যেকের মাথার উপর রহিয়াছে। এই প্রকারেই ভারতীয় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উন্নতি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার যেমন সংস্কৃত আদর্শ, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা বর্ণের আদর্শ—ব্রাহ্মণ। স্বধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এই তিনটি স্তম্ভ। বৌদ্ধযুগের শেষাংশে যে সমাজবিপ্লব হয়, তাহার হেতু এই স্তম্ভত্রয়ের বিপর্য্যয়। এই সব কথা, উত্তমরূপে বুঝিয়া সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে।

বৈকুণ্ঠ-সাধু—৭ই ফাল্গুন, ১৩৩২, শুক্রবার, প্রত্যূষে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর সিদ্ধাশ্রমের সাধু বৈকুণ্ঠকুমার নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৬১ বৎসর। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, প্রথম জীবনে কিছুকাল এক মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা বর্ত্তমান কালের উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত, একজন উকীল হইয়াছেন, আর একজনও হইবেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে ত্রিপুরা জেলায় দুইজন ভক্ত, সাধু নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন ও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। একজন 'ত্রিশ'এর বসন্ত সাধু বা শ্রীমা, তিনি তিন বৎসর পূর্ব্বে গত হইয়াছেন ; আর দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ সাধু, তিনিও গত হইলেন। ইঁহাদের উভয়েরই অনেক শিষ্য আছেন।

বৈকুণ্ঠ সাধু মহাশয়ের রচিত কয়েক খানি গ্রন্থও আছে। আমরা দুখানি গ্রন্থ দেখিয়াছি। এক খানির নাম 'লীলামৃত', আর একখানির নাম "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব"। ইহা ছাড়া "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিতামৃত", "শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য", "তত্ত্ব-কৌমুদী", "প্রীতিবার্ত্তা", "প্রস্থান" প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা

প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুখানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। 'লীলামৃত' গ্রন্থখানি কুমিল্লা হইতে শ্রীচারুচন্দ্র রায় বি, এল, মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আর "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব" কৃষ্ণপুর সিদ্ধাশ্রম হইতে শ্রীসুরথলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাধু বৈকুণ্ঠকুমার, শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠকুমার গোস্বামী নামে পরিচিত। 'ত্রিশ' এর সাধু বসন্তদাদার সহিত সাধু বৈকুণ্ঠকুমারের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ছিল। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। অসংখ্য নরনারী ইঁহাদের আশ্রমে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। এই বিবরণী এক বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। সময়ে বাহির হয় নাই। সাধুর কথা—কাজেই বিলম্বে বাহির হইলেও, তাহার সার্থকতা আছে।

শিশুরক্ষা-বংশরক্ষা—সমগ্র ভারতবর্ষে বৎসরে কুড়ি লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়। যত শিশু জন্মায়, তাহার শতকরা ২১টি মারা যায়। 'অদৃষ্টের ফল' বলিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে ইহা নিবারণ করা যায়। এক সময়ে ইংলণ্ডে শতকরা ১৭টি শিশু মারা যাইত। দলবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করায় মৃত্যুর হার কমিয়াছে, এখন শতকরা ৯টি মারা যায়। ভারতবর্ষে মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে ৩৭, ইংলণ্ডে ১৪। ভারতবাসীর পরমায়ু গড়ে ২২ বৎসর, ইংরাজের পরমায়ু গড়ে ৫২ বৎসর!

রোগ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা—এই তিন কারণে আমরা ধ্বংশের দিকে চলিয়াছি। দেশের শতকরা ৯৫ জন পল্লীবাসী, আর সেই পল্লীগ্রামই উপেক্ষিত। পল্লীগ্রামের অবস্থা চিরদিন এরূপ ছিল না। এখন সংঘবদ্ধ হইয়া পল্লীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, এবং শিশুরক্ষা করিয়া বংশরক্ষা করিতে হইবে।

'ঢাকা' হইতে 'পঞ্চায়েৎ' নামক সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্র হইতে নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত হইল ;—"শিশুরক্ষা-সমিতি"র বাৎসরিক সভায় বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন অল্পবয়স্ক অপরাধী সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই কারাগারের সৃষ্টি * *। * * আমাদের দেশের কারাগারসমূহের আমূল সংস্কার * * কর্ত্তব্য * *। বিশেষতঃ যে স্থলে অপরাধীর বয়স অল্প, সেখানে ত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রতিহিংসারই নামান্তর মাত্র। শিশু চিত্তই জগতে পবিত্রতার প্রতীক। শিক্ষার দোষে, কুসঙ্গে, অথবা যে কোন কারণেই হউক, এই পবিত্রতায় যদি কলঙ্ক স্পর্শ করে, তাহা হইলে প্রথমেই উহা মোচন করিবার চেষ্টা করা—সমাজের কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া, শিশুরও যদি কঠোর অপরাধীর সহিত একত্র কারাবাসের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহার নৈতিক-মৃত্যুই সংসাধিত হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১৮০০ শিশু-অপরাধী পুলিশের হস্তে পড়িয়া থাকে। গভর্ণর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ইহাদের চরিত্র সংশোধনের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নাই। * *

গভর্ণরের এই সদিচ্ছা, কেবল বক্তৃতায় পর্য্যবসিত না হইয়া যদি এই বিষয়ে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে, তবেই মঙ্গল।"—'পঞ্চায়েৎ' ২২শে চৈত্র, ১৩৩২।

শিক্ষা-সম্বন্ধে লর্ড সিংহ—শিক্ষা-সমস্যা-সম্বন্ধে লর্ড সিংহ নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯শে চৈত্র, ১৩৩২, তারিখের "হিতবাদী" হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল। "শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে বহু অভিযোগ হইতেছে, তাহা ভিত্তিহীন নহে। তবে বর্ত্তমান সময়ে যে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইতেছে, উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিদ্যালয়-গুলিরই অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য, উহার দ্বারা কোনও উপকারের আশা করা যাইতে পারে না। তবে, কি করিলে দেশে প্রকৃত সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে লর্ড সিংহ বলিতেছেন যে, প্রতি গ্রামে দেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত গুরুর প্রয়োজন। এই গুরু মহাশয়েরা স্বাস্থ্যবিধি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতশাস্ত্র ও কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইবেন। এই গুরুমহাশয়দিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না থাকিলেও চলিবে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা থাকা চাই। প্রাচীনকালে পাঠশালায় যে শুভঙ্করী শিক্ষা ছিল, লর্ড সিংহ উহার বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি শৈশবে পাঠ্যাবস্থায় যে শুভঙ্করী শিখিয়াছিলেন, তাহারই দ্বারাই তিনি উত্তরকালে অতি দুরূহ গণিতশাস্ত্রের মীমাংসা করিয়া তাঁহার উপর যে গুরু কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীনকালে রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানাবলী লইয়া যে যাত্রা কথকতা ইত্যাদি প্রচলিত ছিল, উহার দ্বারাই পল্লীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। একালেও, লর্ড সিংহ পুনরায় সে সমস্ত প্রথার প্রচলনের পক্ষপাতী। এখন কি প্রকারে পল্লীগ্রামের প্রাচীন শিক্ষাপ্রথা পুনঃ প্রচলন করা যায়, তৎসম্বন্ধেও লর্ড সিংহ সমালোচনা করিয়াছেন।

দেশে, ঐ জন্য উপযুক্ত কর্ম্মীর প্রয়োজন। ঐ কর্ম্মে নানারূপ বিপদ আছে, তাহাও লর্ড সিংহ অবগত আছেন বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন যে—এই সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়া প্রবল অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া, তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবার মত সাহসী কর্ম্মবীর যুবকের প্রয়োজন। ইহাদিগের একনিষ্ঠ দেশসেবার দ্বারাই, দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে—ইহাই লর্ড সিংহের অভিমত। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য যাঁহারা জীবনত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদের ত্যাগ ব্রতের অপেক্ষা, এই শ্রেণীর যুবকগণের নানারূপ দুঃখকষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া দেশসেবায় জীবনত্যাগ সমধিক গরীয়ান্। কিন্তু দেশে এইরূপ কর্ম্মীর অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। লর্ড সিংহ বলিয়াছেন—

It was because he could not carry out for want of proper instrument his passionate desire to uplift his countrymen that he suffered from nervous break-

down and that although he is still burning with the same passion, he cannot do anything for want of real workers.

অর্থাৎ, উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে তিনি তাঁহার দেশের উন্নতি সাধনের বলবতী ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, তিনি স্বাভাবিক অবসাদ ভোগ করিয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ বলবতী ইচ্ছা বিদ্যমান থাকিলেও, প্রকৃত কর্ম্মীর অভাবে তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না।”

লর্ড সিংহ মহোদয়ের এই মত, দেশের অধিকাংশ লোক কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, “হিতবাদী” হইতে উদ্ধৃত নিম্নের অংশ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

“আমরা সবিনয়ে লর্ড সিংহকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি গ্রামে যে প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব দেখিয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি? দেশে কর্ম্মিদল গঠন করিবার কোনও চেষ্টা করিয়াছেন কি? যুবকগণকে প্রকৃত শিক্ষা দিবার জন্য যাহাতে তাহাদিগের উদরান্নের চিন্তা না করিতে হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কি? * * * আমাদের মনে হয়, লর্ড সিংহ যদি প্রত্যক্ষ ভাবে ও পরোক্ষভাবে দেশের কোনও গঠন-মূলক কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, তবে তাঁহার দেশবাসিগণকে উপদেশ দেওয়া শোভা পাইত; নচেৎ তাঁহার উপদেশে বিশেষ সুফল ঘটিবে না, ইহা নিশ্চিত।”

শ্রীগোপরহস্য-লীলা

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস

[বৈষ্ণব-মহাজনগণ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-রহস্য খণ্ড খণ্ড ভাবে নানারূপে আস্বাদন করিয়া, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভাকারে ভক্তবৃন্দমধ্যে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। এবম্বিধ ক্ষুদ্র সন্দর্ভগুলি, সংরক্ষণ ও আস্বাদনযোগ্য। এই নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমান ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি, ভক্ত সমীপে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম। এই গ্রন্থখানি—'গোপিকা মোহন' নামেও পরিচিত।

বৃন্দাবন দাস নামধেয় কোন বৈষ্ণব-কবি, এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের রচয়িতা। ভনিতা ব্যতীত, এই সন্দর্ভ মধ্যে, রচয়িতার অন্য কোন পরিচয় নাই। তবে ইনি, ও 'চৈতন্যভাগবত'-রচয়িতা, স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান হয়। ১১৮৮ সালের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই গ্রন্থের আদর্শ গৃহীত হইল ('রতন'-লাইব্রেরী পুঁথি—২০৮, ১৬৮২, ২০৮৭) —শ্রীশিবরতন মিত্র]

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীবৃন্দাবন।
জয় ধেনু, বৃন্দ জয়, জয় শিশুগণ ॥
জয় জয় নন্দঘোষ গোয়াল-প্রধান।
ব্রজেশ্বরী যশোদা জয় কৃষ্ণজ্ঞান ॥
জয় বৃকভানু ঘোষ রাধিকার পিতা।
যাহার গৃহে রহে সদা কৃষ্ণের বণিতা ॥
কৃষ্ণের পরম ভক্ত বৃকভানু ঘোষ।
রাধাকৃষ্ণ পরিবাদ যাহাতে সন্তোষ ॥
জনম অবধি হৈতে পরম মৈত্রতা।
ভালমতে জানি তাকে সতী পতিব্রতা ॥
তার পুত্র শ্রীদাম গোয়ালা রঙ্গ-মতি।
রাধাতে শ্রীদামে বড় অন্তরে পীরিতি ॥
রাধাতে শ্রীদামে দোহে সমান নির্ম্মাণ।
কাচা স্বর্ণ জিনি বড়-উজ্জ্বল বয়ান ॥
দুই মুখ শোভা দেখি অতি অপরূপ।
শারদ পূর্ণিমা জিনি দোঁহার স্বরূপ ॥
রাধাকৃষ্ণ রস-লীলা শুন সর্ব্বজন।
কৃষ্ণ সখা শ্রীদাম সুদাম দুইজন ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদাম

নিরবধি নানা রসে থাকে দুইজন।
একত্র ভোজন দোহে একত্র শয়ন ॥
ধেনু বৎস লঞা গোঠে চলেন যখন।
হাতাহাতি গলাগলি চলে দুই জন ॥
সকল বালক মধ্যে প্রধান শ্রীদাম।
শ্রীদামের আজ্ঞা বহে প্রভু ঘনশ্যাম ॥
গোষ্ঠক্রীড়ার সার খেলা প্রধান গেড়ুয়া।
ব্রজবালকের সঙ্গে সদাই কাড়াকাড়ি ॥

সমজুটি হঞা কৃষ্ণ খেলেন যখন।
শ্রীদাম সহিত প্রভু হাসেন তখন॥
শ্রীদামের খেলাতে প্রভু হয় পরাজয়।
শ্রীদামেরে স্কন্ধে বহে প্রভু দয়াময়॥
একদিন শিশু ভোজন করাইল শ্যামরায়।
শ্রীদামের পাত্র-শেষ প্রভু তুলি খায়॥
একপাত্রে চোমকি দিয়া প্রভু পিএ পাণি।
প্রেম-কলহ করি দোহে করে হানাহানি॥
ক্রোধ করিয়া শ্রীদাম ঘরে বসি থাকে।
প্রিয়-সখা বলি কৃষ্ণ ঘন ঘন ডাকে॥
শ্রীদামের হাতে পাএ ধরিয়া তখনে।
শ্রীদামের যত বেশ করয়ে আপনে॥
শ্রীদামের সঙ্গে প্রভু তেনমতে খেলে।
মহানন্দে ব্রজবাসী দেখে কুতুহলে॥৪০

গোষ্ঠ-ক্রীড়া—রাধা-স্মৃতি

একদিন গেলা কৃষ্ণ গোষ্ঠ-ক্রীড়া রঙ্গে।
ধেনু বৎস লঞা যান ব্রজবাসী সঙ্গে॥
সিঙ্গা বেণু বাজাইয়া বৃন্দাবনে গেলা।
যমুনার তীরে কৃষ্ণ পাতিলেন খেলা॥
খেলা-রসে শিশু সব তথায় রহিলা।
শ্রীদামে লইয়া কৃষ্ণ নিকুঞ্জে চলিলা॥
হাতাহাতি দুই জন লীলা রঙ্গে চলে।
বন-শোভা দেখি গেলা বকুলের তলে॥
ছোটি বকুল নানামত বৃক্ষ চারি পাশে।
মধুলোভে ভ্রমর উড়ি চারি পাশে।
কৌতুকে কোকিল সব কুহু কুহু ডাকে॥
শুক সারী কপোত পঞ্চম রস গায়।
মদন আনন্দধ্বনি ময়ুর বোলায়॥
হংস সারস যত কলরব ডাকে।
যমুনাতে পদ্মবন শোভা করে থাকে॥
জলেস্থলে পক্ষী সব বলে নানা বোল।
মন্দ মন্দ গন্ধ লঞা পবন হিল্লোল॥
ষড় ঋতু নানারসে পূর্ণ বৃন্দাবন।
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ হইলা মোহন॥৬০
রাধিকা স্মঙরি কৃষ্ণ মদনে পীড়িত।
ভাবেতে কম্পিত হঞা পড়িল ভূমিত॥
কামবানে জর জর বুকে দিয়া হাত।
মুর্ছ মুর্ছ বলি কান্দে প্রভু ব্রজনাথ॥
হাহাকার করি কান্দে শ্রীদাম বলিয়া।
কৃষ্ণ কোলে করি শ্রীদাম কহেন ডাকিয়া॥

শ্রীদাম বাক্য

কেন কান্দ কেন কান্দ শুন প্রাণের ভাই
কোন ব্যাধি হৈল আজি কহ মোর ঠাঁই॥
তোমা বিনে আমা সভার আর কেহ নাই।
সব দুঃখ পাসরিএ তুয়া মুখ চাই॥৭০
দৈত্যগণ নাশ করি রাখিলা সবারে।
আজি কেন সেই তত্ত্ব না কহ আমারে॥
একবার রক্ষা কৈলে সর্প গড় হৈতে

কালীদহে বিষ খাঞা সবে মিলি মৈনু।
তোমার প্রসাদে সবে মরিয়া বাঁচিনু॥
দাবানলে যখন সবারে দগ্ধ কৈল।
সদয় হইয়া তখন সবারে রাখিলা॥
এমত প্রকারে কত সঙ্কটে রাখিলা।
তোমার হৃদয়ে কোন্ ব্যাধি উপজিলা॥
কোন ব্যাধি আসি তব দেহে স্থিতি কৈল।
সঙ্গে থাকি আমি তাহা লখিতে নারিল॥
আপন হৃদয়-কথা কহত আমারে।
তাহার ঔষধ করি কহিল তোমারে॥
দুই চক্ষে জলধারা মুছিয়া শ্রীদাম।
কহে মোরে তত্ত্ব কহ পূর্ণ হবে কাম॥
তোমা দুঃখ দেখি ভাই চিত্ত হৈল রোষ।
কারণ কহিতে তুমি না করিহ ক্রোধ॥

কৃষ্ণ বাক্য   রাধা-বিরহ

কহিতে সে লাজ লাগে, না কহিলে মরি।
কোন ব্যাধি নহে, রাধা মন নিল হরি॥
একদিন রাধিকা আসিয়াছিল হেথা।
এই ত নিকুঞ্জে বসি কয়েছিল কথা॥
সে সব রসের কথা না জায় কথনে।
প্রাণ স্থির নহে মোর রাধিকা বিহনে॥
রাধিকা হরিঞা নিল মোর চিত্ত মন।
রাধারে দেখাঞা মোর রাখহ জীবন॥
আপন হৃদয়-তত্ত্ব কহিলাম ভাই।
প্রাণ রক্ষা কর মোরে রাধারে দেখাই॥
না জানি কি গুণ জানে তোমার ভগিনী।
বধিল আমার প্রাণ রাধিকা ডাকিনী॥১০০
রোগ ব্যাধি কিছু নহে শুন প্রাণসখা।
রাধা দরশন পাইলে প্রাণ হয় রক্ষা॥
রাধিকা হরিলে প্রাণ সেই মহৌষধি।
রাধা দরশনে সব ঘুচিবেক ব্যাধি॥
সকল বৃত্তান্ত কহিল ঘনশ্যাম।
কৃষ্ণ কোলে করি তবে বলেন শ্রীদাম॥
বামহস্তে হস্ত দিয়া কৃষ্ণ কলেবর।
কৃষ্ণ-বক্ষে থুইল আপন দক্ষিণ কর॥
শ্রীমুখে চুম্বন করি কৈল পরিতোষ।
সরস বচনে কথা কহে শ্রীদাম ঘোষ॥

শ্রীদাম-বাক্য

শুন শুন প্রাণ ভাই শুন যদুবীর।
এখনি দেখিবা রাধা প্রাণ কর স্থির॥
তোমার দুঃখে দুঃখী তোমার সুখে সুখী।
সকলি ত শূন্য আমি তোমা বিনা দেখি॥
মনের সন্তাপ ছাড় শুন প্রাণ ভাই।
যাবত না যাই আমি রাধিকার ঠাই॥
এই মতে শ্রীদাম কৃষ্ণকে প্রবোধিয়া।
বৃকভানু পুরে তবে উত্তরিলা গিয়া॥
যে ঘরে রাধিকা করে কুলের রন্ধন।
ভাত খাইবার ছলে কৈল আগমন॥১২০

শ্রীমতী প্রতি শ্রীদাম

কি কর রাধিকা তুমি শুনহ বচন।
কৃষ্ণ-দরশনে শীঘ্র চল বৃন্দাবন॥

পূর্ব্বে যখন ক্রীড়া কৈলে কৃষ্ণকে লইয়া।
সেই ব্যাধিযুক্ত আছেন কাননে বসিয়া॥
জীএ কি না জীএ কৃষ্ণ জীবন সংশয়।
তোমারে দেখিলে তার প্রাণ রক্ষা হয়॥
চরণে ধরিঞা বলি না করিহ ব্যাজ।
কৃষ্ণ উপেক্ষিয়া আর সাধিবে কোন কাজ॥
মিনতি করিয়া বলি শুনহ বচন।
বান্ধবের প্রাণ রাখ দিয়া আলিঙ্গন॥১৩০
এতেক বলিল যদি শ্রীদাম সুন্দর।
একথা শুনিয়া রাধা হৈলা বিকল॥
লজ্জায় আকুল হৈয়া হেট কৈলা মাথা।
শ্রীদামের হাতে ধরি কহে তত্ত্ব কথা॥

শ্রীদাম প্রতি শ্রীমতী-বাক্য

শুন শুন প্রাণ ভাই, শুনহ শ্রীদাম।
কেমনে ছাড়িয়া যাব রন্ধনের কাম॥
সকল কুটুম্বে আজি খাইবেক ভাত।
রন্ধন ছাড়িয়া গেলে হইবে প্রমাদ॥
সকল গোকুলে মোরে দুষ্টা করি বলে।
লাজে হেট মাথা করি ফিরি এ গোকুলে॥
এমন দিবসে ভাই কিছু নহে ভাল।
ভোজন করিবে আজি সকল গোয়াল॥
হেন বোলে যদি আমি রন্ধন ছাড়িব।
সকল গোয়ালা মোরে দুষ্টা করি কব॥
আমি দুষ্টা হইলে তুমি পাবে বড় লাজ।
প্রাণ ভাই, কহ জাঞা এই সব কথা।
কুটুম্বে খাইবে ভাত কেমনে যাই তথা॥
রাধিকার কথা এবে হইল অবশেষ।
শ্রীদাম কহেন তবে হিত-উপদেশ॥ ১৫০

শ্রীদাম-বাক্য—বেশ পরিবর্ত্তন

শুন শুন কহি রাধা তোমাকে উচিত।
দুই তত্ত্ব রক্ষা পায় এই সে বিহিত॥
আপনার যত বেশ আমাকে পরাও।
মোর এই বেশে তুমি বৃন্দাবনে যাও॥
তোমার প্রতিমূর্ত্তি হঞা আমি পরি শাড়ী।
মাথাতে ঘোমটা দিঞা আমি ভাত বাড়ি॥
ময়ুরের পুচ্ছ দিয়া চূড়ায় কর বেশ।
ছান্দদড়ি দিয়া আমি করিব সুবেশ॥
এই বুদ্ধি নিরক্তিয়া শ্রীদাম রাধায়।
সর্ব্ব সমাধিয়া রাই করিলা বিজয়॥
এইরূপে দুই মুখ সুবর্ণ সমান।
সমান রদন-পাঁতি হাস্য নিরমান॥
সমান অধর-বিম্ব, সমান নাসিকা।
সমভাবে শোভা করে ও মুখ-চন্দ্রিকা॥
সমান সুপত্রাবলী কপাল-মণ্ডল।
কামশর জিনি ভুরু সমান-কুণ্ডল॥
দুই জনে সমান কৃষ্ণের প্রিয় সখা।
দুই জনে দুই তত্ত্ব করিলেন রক্ষা॥
দুই জনে সমান রূপ সমান আকৃতে।১৭০

চূড়া দূর করি বেশ বান্ধিলেন বেণী।
তাহাতে তুলিয়া দিলেন পাটের
থোপানি ॥
কপালে করিল সিথি, ফোটা কৈল দূর।
সিথি ভরি পরিলেন কপালে সিন্দুর ॥
দুই নেত্রে পরিলেন দিব্য সে কর্জ্জল।
দুই কর্ণে পরিলেন রাধার কুণ্ডল ॥
নাসিকাতে পরিলেন মুকুতা বেসর।
গলাতে হাঁসলি শোভে অতি মনোহর ॥
সুবর্ণের তাড় শোভে দেখ দুই হাতে।
রুপার খেড়ুয়া দুই পায়ে ভাল সাজে ॥
রাধিকার পাএ যত আছিল পাশলি।
শ্রীদামে পরাইল তাহা অতি কুতূহলী ॥
দুই দেহ দুই কুচ করিল নির্ম্মাণ।
পরম মূরতি হৈল দেখ বিদ্যমান ॥
সাক্ষাত রাধিকা হৈল গোয়াল শ্রীদাম।
ঘোমটা দিয়া করে তিহো রন্ধনের কাম ॥
শ্রীদাম হইল যদি রাধিকা সমান।
শ্রীদামের বেশ রাধা করে পরিধান ॥
পুরুষ হইয়া থাকে রাধা গুরুজনার মাঝে।
প্রতিজ্ঞা কৈলা দিনে না আস মোর
কাছে ॥
হৃদয়-উল্লাসে রাধা বোলে ধীরে ধীরে।
আগু বাড়াইয়া দেখ যমুনার তীরে ॥
আমি আগে আগে যাই রাধা পাছে পাছে।
তুমিত উঠিয়ে দেখ কদম্বের গাছে ॥

একথা শুনিয়া কৃষ্ণ হরষিত মনে।
শ্রীদামের জ্ঞানে পড়ে শ্রীমতী চরণে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাক্য

ধন্য শ্রীদাম ভাই তোমাকে নমস্কার।
আমার লাগিঞা কৈলে এতেক প্রকার ॥
বড় দুঃখ পাইলে ভাই আসিতে যাইতে।
জিতে না পারিব তব এ ঋণ শোধিতে ॥
এই বলি কৃষ্ণ আগু বাড়াইতে গেলা।
কদম্বের গাছে চড়ি দেখিতে লাগিলা ॥
২০২

শ্রীমতীর স্ববেশ ধারণ

এতেক বাহুল্য করি রাধিকা সুন্দরী।
নিকুঞ্জে বসিলা রাধা নিজ বেশ ধরি ॥
শ্রীদামের যত বেশ সকল তেজিঞা।
সাড়ী পড়িলেন রাই ভূমেতে লোটাঞা ॥
বক্ষস্থলে আচ্ছাদিল কাঁচলি বসন।
হাতে পরিলেন রাই নানা বিভূষণ ॥
জাদ দিয়া বান্ধিলেন মস্তকের কেশ।
কপালে করিলা সিথি করি নানা বেশ ॥
মণ্ডলি করিয়া দিল কপালে সিন্দুর।
যাহা দেখি মোহ পায় ব্রজের ঠাকুর ॥
চন্দনের বিন্দু দিল সিন্দুরের মাঝে।
অরুণের মাঝে যেন চন্দ্র ভাল সাজে ॥
কুঙ্কুম কস্তুরি চক্ষে কর্জ্জলের রেখা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন আসি দিল দেখা ॥২১৬

আপনার নিজ বেশ যে কিছু আছিল।
সেই বেশ স্থানে স্থানে লীলায় পরিল ॥
মাথাতে ঘোমটা দিয়া মোহিনী হইলা।
বিনোদ কুঞ্জের গীত গাহিতে লাগিলা ॥
শুনিয়া রাধার গীত হৈল চমৎকার।
গাছ হৈতে নামি আইলা নন্দের কুমার ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন

রাধিকা দেখিঞা হৈল আনন্দ বদন।
প্রেম আলিঙ্গন দিয়া করিল চুম্বন ॥
সোনার কমলে যেন পড়িল ভ্রমর।
মধুপানে মত্ত হৈলা প্রেমেতে বিভোর ॥
রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বসিলা কৌতুকে।
নিধ নিয়া ধন যেন দেখে নিজ সুখে ॥
কৃষ্ণ হইলা সুখী রাধা পরশিয়া।
যে কিছু আছিল মনে কৌতুক করিয়া ॥
রাধিকা আনিয়া দিল যত উপহার।
রাধিকা সহিতে তাহা করিল বিথার ॥
পাকা গুয়া মিঠা পান লবঙ্গ-মউরী।
সজ্জা করি যোগাইলা ব্রজের কুমারী ॥
দুই জনে বিদগধ দোহের সময়।
মণি কাঞ্চন যোগ যেন একত্রে মিলয় ॥
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন চুম্বন ঘনে ঘন।
দুই তনু পুলকিত আনন্দ বদন ॥
পরিহাস কথা দোহে কহিলা বিস্তর।
শুন শুন প্রভু তুমি ব্রজের ঈশ্বর।
আমাকে বিদায় দেহ আমি যাই ঘর ॥
তুমি গোঠে চলি যাহ শ্রীদাম গোচর।
আমি গোপতে যাই বৃকভানু পুর ॥
হেন মতে রাধিকার শুনিল মিনতি
বিদায় করিল নাগর চূড়ামণি তথি ॥

শ্রীরাধিকার প্রত্যাবর্ত্তন

শিশুগণ মধ্যে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ।
ফিরিয়া ধরিল রাধা শ্রীদামের বেশ ॥
সিন্দুর কজ্জল আদি দূরে তেয়াগিয়া।
সাড়ীখানি পরিলেন ধড়াটি করিয়া ॥
রাঙ্গা কারাই গায়ে রাঙ্গা পাগড়ী।
হাতে রাঙ্গা লাঠি গাএ উড়ন পাছড়ি ॥
হাতে রাঙ্গা বাঁশী বেণু কদম্বের মালা।
সকল হইল যেন শ্রীদাম গোয়ালা ॥
চান্দদড়ি শ্রীদামের ময়ুরের পাখা।
সাক্ষাতে দেখিল যেন কৃষ্ণ প্রিয়-সখা ॥
রুনুঝুনু করে বাজু পাএর নুপুর ॥
চরণের ধ্বনিতে কোকিল গেল দূর ॥
কপালে পরিলেন চন্দন তিলক।
পূর্ণবেশ হইল যেন শ্রীদাম নাটক ॥
হুহুঙ্কার করি যায় শিঙ্গা বাজাইয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাজে শিঙ্গা কৃষ্ণের লাগিয়া ॥

উত্তর-গোষ্ঠ

শিঙ্গার শবদ শুনি নন্দের কুমার।

আনন্দিত হইল ব্রজে যত শিশুগণ।
শিঙ্গার শবদে চলে যতেক গোধন ॥
বেলা অবশেষ হৈল অবশেষ ভানু।
চলচল বলি সব চালাইলা ধেনু ॥
যার যত ধেনু বৎস যথাতে আছিল।
শিঙ্গার শবদে সব গোকুলে চলিল ॥
লাখে লাখে ধেনু বৎস ধবল বরণে।
শোভা করি যায় যেন হংস গমনে ॥
চারিদিকে ধেনু বৎস শত শত ধায়।
হাম্বারবে ঊর্দ্ধমুখে ডাকিয়া বেড়ায় ॥
হুহুঙ্কারে ধেনুগণ লেঙ্গুড় তুলিয়া।
চারি বাঁটে স্রবে ক্ষীর বৎস না দেখিয়া ॥
সুরভিগণ সঙ্গে যতেক আঁড়িয়া।
হুড়াহুড়ি করি যুঝে তর্জ্জন করিয়া ॥
লাফাতে লাফাতে যায় যতেক গোধন।
পাছে পাছে লীলারঙ্গে যায় শিশুগণ। ২৮০
চৌদিকে বালক সব, মধ্যে শ্যামরায়।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র চলি যায় ॥
নাচিতে নাচিতে যায় যত সব ধেনু।
পাছে পাছে যায় শিশু বাজাইয়া বেণু ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাজায় ডম্ফ।
শিঙ্গা বেণুর শব্দে যেন হয় ভূমিকম্প ॥
গোধন শবদে ধূলি উঠিল গগনে।
স্বর্গে দেবগণ করে পুষ্পবরিষণে ॥
গোষ্ঠ-ক্রীড়া করিয়া চলিলা যদুরায়।
শ্রীদামের বেশে রাধা মধ্যে চলি যায় ॥

ক্ষণে ক্ষণে শিঙ্গা বেণু ক্ষণে মুরলিকা।
নানা গোপ শিশু মধ্যে চলেন রাধিকা ॥
গোকুল নিকটে আসি সকল গোয়াল।
পৃথক্ করিল সবে নিজ নিজ পাল ॥
নিজ ধেনু লঞা রাধা আইলা কৌতুকে।
শ্রীদামের বেশে রাধা আইলা বাড়ীকে ॥
নিজ ঘরে চলি যায় বাজাইয়া বেণু।
যেখানে যে গাভী থাকে যেখানে যে ধেনু ॥
তেমতি রাখিল রাধা করি ঠাই ঠাই।
যার যেই বৎস সব তাহাতে লাগাই ॥৩০০
দোহিতে লাগিল রাধা শ্রীদামের প্রাণ।
দুগ্ধ দুহিয়া ভাণ্ড থুইলা স্থানে স্থান ॥
সে সব গাভীর নাম হাঁকার ডাকিয়া।
দোহিল সকল গাভী দোহাল হইয়া ॥
স্থানে স্থানে গোপ সব দোহে সব ধেনু।
কৌতুকে গোপ সব বাজায় শিঙ্গা বেণু ॥
দোহনের ধ্বনি আর শিঙ্গার শবদ।
গোপী সব মঙ্গল গায় গোকুল উৎসব ॥
প্রতি ঘরে ধূপ দীপ প্রতি ঘরে পূজা।
কৃষ্ণরসে আনন্দিত গোকুলের প্রজা ॥
শ্রীদামের বেশে রাধা গোঠে করে খেলা।
বুঝিতে বা কার শক্তি রাধিকার লীলা ॥
ওথা ঘরে শ্রীদাম আছিলা বেশ ধরি।

ক্ষীর পিঠা ব্যঞ্জনাদি অশেষ প্রকার।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন তার নাহি পাএ পার ॥
নানা মতে কুটুম্বেরে করাইল ভোজন।
শাল্যান্ন ঘৃত আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
দধি দুগ্ধ চিনি যতেক অনুপান।
একে একে পরিবেশন করিল শ্রীদাম ॥
রাধিকা শ্রীদাম দোহে মন্ত্রনা করিএ।
রাধিকা আপন বেশ করিল লীলাএ ॥
সিন্দুর কর্জ্জল সব মুছিল শ্রীদাম।
নিজ বেশ করিল সভা বিদ্যমান।
গৃহকর্ম্ম করি রাই করিল শয়ন।
বৃন্দাবন দাস কহে 'গোপিকা মোহন' ॥৩২৬

ইতি—শ্রীগোপরহস্য লীলা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
সন ১২৮৮ সাল, তারিখ ১২ বৈশাখ।

বীরভূমি]

মাসিক পত্রিকা

ফাল্গুন, ১৩৩৩
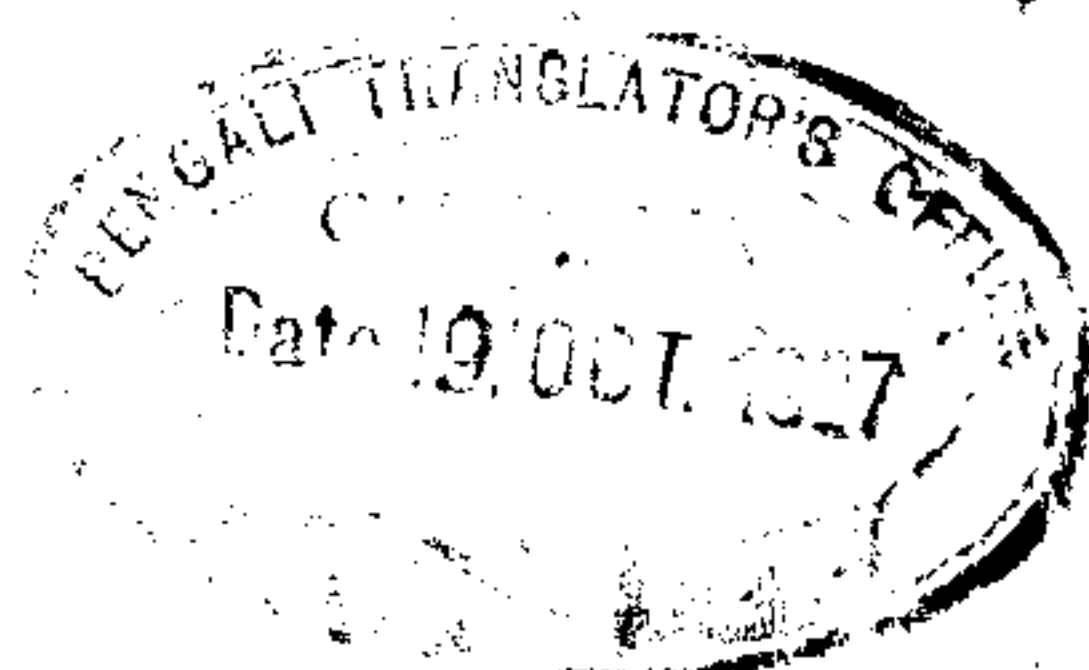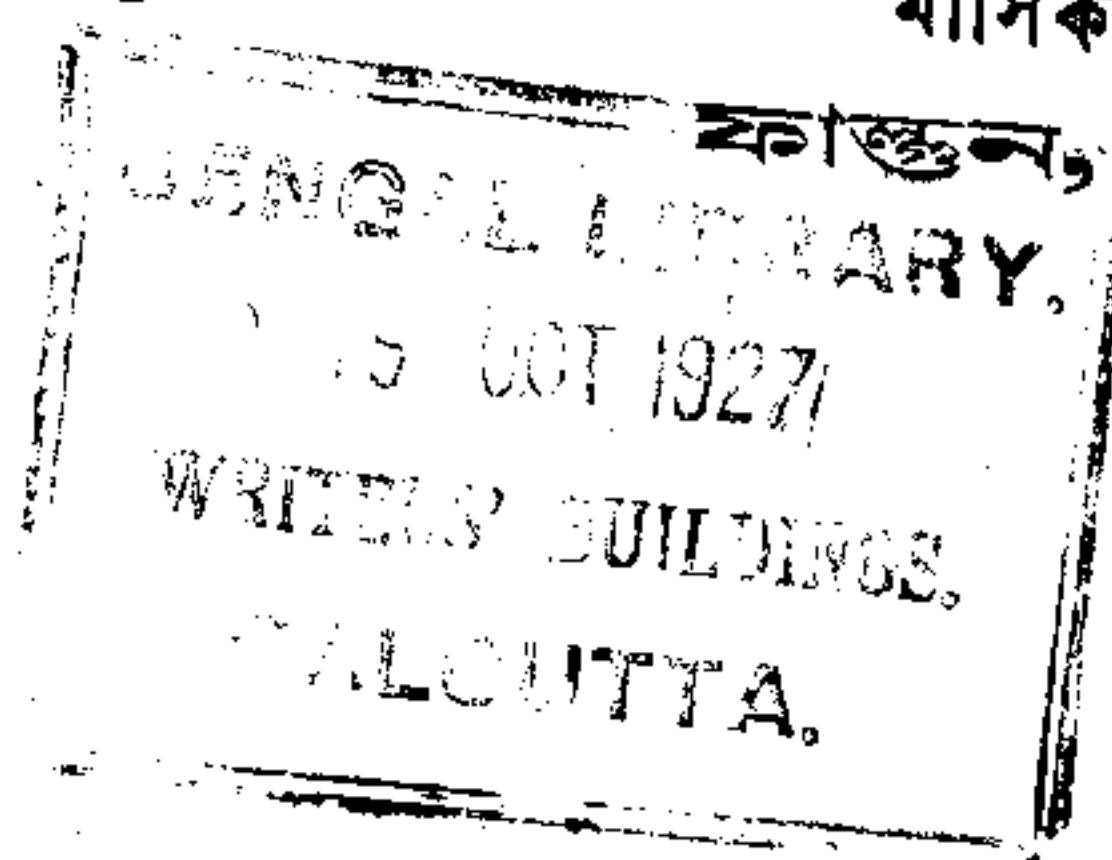
১ ধর্ম্মনীতি ও বিজ্ঞান

২ হিন্দু মুসলমান

৩ মন্তব্য ও সংবাদ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বীরভূমি ৮-৫, ফাল্গুন, ১৩৩৩

ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞান

১। বিকাশই ধর্ম্ম—বিনাশ নহে

এই প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও স্থূল জগৎ, ইহা অনিত্য বা নশ্বর হইতে পারে; মিথ্যা, মায়া ও মোহাবেশ হইতে পারে; কিন্তু, সে-কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই। এই জগৎ বা সংসার চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল,—সত্য; কিন্তু, ইহা যতক্ষণ আছে, অথবা আমরা যতক্ষণ বাধ্য হইয়া, এই দেহ লইয়া এই জগতে আছি, ততক্ষণ আমার উপর এই জগতের দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। আজ, বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্র চলিতেছে, সর্ব্বত্রই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—দারুণ সংগ্রাম! কে বাঁচে, কে মরে! এই জীবন-সংগ্রাম অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে, আসুরিক বা পৈশাচিক হইতে পারে; কিন্তু, আমরা এই সংগ্রামকে স্বীকার করিতে বাধ্য। এই যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই যুদ্ধস্থল হইতে পলাইবারও উপায় নাই, নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল দেখিয়া যাইব, আর ভাবিয়া যাইব, নিজে কিছু করিব না, তাহারও উপায় নাই। এই যুদ্ধ করিতেই হইবে। যত যোগ,—সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ভক্তিযোগ, বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, সর্ব্ববিধ যোগ ও তাহাদের সিদ্ধি লইয়া আজ আর পলায়ন করিবার পথ নাই। আজ যুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে। ইহাই যুগধর্ম্ম—ইহাই পার্থসারথীর পূজা। ব্রহ্মণ্যদেব আজ পার্থসারথীরূপে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতেছেন, তোমরা উত্থিত হও, জাগ্রত হও, হৃদয়মধ্যে পার্থসারথীর বাণী শুনিয়া, নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া, তাঁহার অনুগামী হও।

বিকাশই ধর্ম্ম, বিনাশ নহে। পূর্ণই উপাস্য, শূন্য নহে। বেদ বলিয়াছেন, এই জীবনের মূলে মধু আছে, রস আছে, আনন্দ আছে। সেই মধু, রস বা আনন্দ, নিত্যবস্তু,

মিথ্যা মরীচিকা নহে। প্রত্যেক মানব-সন্তানকে, প্রত্যেক নরনারীকে, সেই মধু অনুভব করিতে হইবে, আস্বাদন করিতে হইবে। ইহার আস্বাদন সর্ব্বকালব্যাপী। কেবলমাত্র নিজে অনুভব করিলেই হইবে না। এই মধু বা রস এমনই, ইহার অনুভব বা আস্বাদন এমনই, যে একা একা ইহার আস্বাদন হয় না। এই রসের আস্বাদনের আভাসমাত্র পাইলেই, জগতের সকলকে এই আস্বাদন দেওয়ার জন্য সুতীব্র আকাঙ্খা ও অদম্য চেষ্টা জন্মে।

জীবনের মূলে মধু আছে,—মানুষ হইয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকা একটা সুখ আছে। এই সুখ সকলকেই অনুভব করিতে হইবে। এই সুখের অনুভব স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। যদি কাহারও জীবনে সে-সুখের আস্বাদন না থাকে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা শোচনীয় ; সে বেচারা হতভাগ্য, সে করুণার পাত্র। তাহার অবস্থা স্বাভাবিক নহে, অস্বাভাবিক। তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইবে, তাহার চিকিৎসার প্রয়োজন—দেহের চিকিৎসা, মনের চিকিৎসা, হৃদয়ের চিকিৎসা। তাহার এখন উত্তম স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রয়োজন ; পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর বাসগৃহের প্রয়োজন, হাস্যমুখ ও প্রেমিক সঙ্গীর প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকার মূলে, একটা আনন্দ আছে, দুঃখভোগে আনন্দ আছে, শোকে দগ্ধ হওয়ায় আনন্দ আছে, ভাল বাসিয়া ভগ্নহৃদয়ে রোদন করায় আনন্দ আছে, বিরামবিহীন সংগ্রামে আনন্দ আছে, পরাজয়ে আনন্দ আছে, মৃত্যুতেও আনন্দ আছে। ইহা যে বোঝে না, তাহাকে কি ধর্ম্ম শিখাইবে ? বাঁচিয়া থাকার মূলে যে আনন্দ আছে, মধু আছে, রস আছে, গৌরব আছে, ইহা সব সময়ে অনুভব করিতে হইবে। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, আলো-আঁধার, জীবন-মরণ, কিছুতেই ম্রিয়মাণ হইব না, অবসন্ন হইব না ; জীবনের মূলে মধু আছে, এই মধু বা আনন্দই পরিণামে জয়যুক্ত হইবে।

বাঁচিয়া আছি, বাঁচিতে চাই, আরও ভাল করিয়া বাঁচিতে চাই। আরও জীবন দাও। More life, still more life. আমি যে জীবন ছড়াইতে চাই, জীবন বিলাইতে চাই ; যাহাদের কম আছে, তাহাদের জীবন আরও বাড়াইয়া দিতে চাই। কৃপণ হইয়া ক্ষুদ্র জীবন আঁকড়াইয়া ও আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা মরিয়া যাওয়াই ভাল, ফুরাইয়া যাওয়াই ভাল। কূপের জল কম, দু'চার কলস জল তুলিয়া লইলেই, আর জল থাকে না, কূপ শুকাইয়া যায়। কিন্তু মাটির নীচে অক্ষয় হ্রদের জলের ধারা গোপনে

বহিয়া যাইতেছে, যদি কোন কূপের সঙ্গে সেই জলধারার গোপনে যোগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে কূপের জল কখনও ফুরাইবে না। সেইরূপ, এক অনন্ত মহাজীবন আছে, ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ তাহার সন্ধান দিবেন, আমার এই ক্ষুদ্র জীবন-কূপের সহিত সেই মহাজীবনের সংযোগের সম্ভাবনা আছে, তাহারও সন্ধান শাস্ত্র বলিয়া দিবেন, সাধু দেখাইয়া দিবেন। তাহারই প্রয়োজন, অফুরন্ত জীবনেরই প্রয়োজন।

জীবন আঁধার নহে; অজ্ঞানতা, সংশয় বা অবিশ্বাস নহে। অজ্ঞানতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিজয় নিশ্চয়। মানবের জীবন, আলোকের অন্বেষণ। আলোকই জ্ঞান। আমরা আরও জ্ঞান চাই, আরও আলো চাই। More light, still more light। কোথায় সে আলোক, কোথায় সে অফুরন্ত আলোক-ভাণ্ডার? সেই আলোকের প্রয়োজন। আমরা আলো ছড়াইতে চাই, আলো বিলাইতে চাই, যেখানে যত আঁধার আছে, সকল আঁধার দূর করিতে চাই। আরও আলো চাই, আরও জ্ঞান চাই। শাস্ত্র ও ঋষি বলিয়া দিবেন, সেই অফুরন্ত জ্ঞানের সন্ধান, আর সাধুগুরু তাহা বুঝাইয়া দিবেন, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

এখন ধর্ম্মের নামে বালক ও যুবক, পুরুষ ও নারী, সকলেই ত্যাগ, সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য প্রচার করিতেছে। ভগবান্, আমাদিগকে এই অনধিকার-চর্চ্চা হইতে রক্ষা করুন। ধর্ম্মের প্রথম কথা, দেহ—'শরীরমাদ্যং'। দেহ সুস্থ হইবে, নীরোগ হইবে, দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইবে; শতবর্ষ পরমায়ু হইবে। কি করিয়া হইবে? শাস্ত্রে তাহার সন্ধান আছে। বহু বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা, সিদ্ধ-মহাপুরুষের বাণী—এই শাস্ত্র। শ্রদ্ধা-সহকারে শাস্ত্রের কথা শুনিবে, ভাবিবে; বুঝিতে না পারিলে, তাড়াতাড়ি 'যাহা হউক একটা বাজার চল্‌তি' মতবাদ আশ্রয় করিবে না। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহাদের শরণাগত হইবে। অবজ্ঞা করিও না, শাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়া সদাচার পালন কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ।

দেহের পর মন। এই মন, ইন্দ্রিয়গণের রাজা। দশ ইন্দ্রিয়—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয়। মনের অনুশীলন চাই, মনকে বুদ্ধির বশে আনিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, সংযমী হইতে হইবে; মনের চাঞ্চল্য কি করিয়া নিবারিত হয়, সেজন্য নিয়মিতভাবে প্রতিদিন কিছু কিছু

ইহার নাম অভ্যাস-যোগ। কায়, মন ও বাক্য। কায়ের জন্য, অর্থাৎ দেহের জন্য আয়ুর্ব্বেদ, মনের জন্য যোগশাস্ত্র, বাক্যের জন্য ব্যাকরণ, আর বুদ্ধি বা হৃদয়ের জন্য ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত, এক অনন্ত-দেবই জগতে শিষ্যপরম্পরায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই অনন্তদেব নিত্যানন্দ-বস্তু। তিনি জগতের প্রভু হইয়া দাসরূপে জগতের সেবা করিতেছেন। তিনি নিত্যানন্দ, তিনি অনিত্য বিষয়ানন্দের অন্ধকারময় কারাগার হইতে আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে চাহেন, আমাদিগকেও সেই নিত্যানন্দ রসের আস্বাদন দিয়া অনন্ত-জীবনে গৌরবান্বিত করিতে চাহেন। আমরা সেই নিত্যগুরুকে প্রণাম করিতেছি।

২। ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন

ধর্ম্মই নৈতিক জীবনের একমাত্র সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ভিত্তি। প্রাচীন জগতের ধর্ম্মসমূহ মানব জাতিকে যে-সকল শিক্ষা দিয়াছেন সেই শিক্ষা ও উপদেশ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমরা যাহাকে নৈতিক-জীবন বা Moral life বলি, তাহা একেবারেই দাঁড়াইতে পারে না। ধর্ম্মকে বাদ দিলে, কোন কোন লোকের পক্ষে কোন কোন অবস্থায় নৈতিক জীবন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে সকল সময়ে এবং সর্ব্বাবস্থায় প্রকৃত নৈতিক-জীবন সম্ভব হইতে পারে না। নৈতিক-জীবন না থাকিলে সমাজ থাকে না ; মানুষ পশু হইয়া যায়, এমন কি, পশুরও অধম হইয়া পড়ে।

"যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, তাহাই কর, যাহা অন্যায় তাহা করিও না"—জীবনের প্রথম হইতে প্রত্যেক বালক বালিকাকে, এই কথা এমনভাবে শিখাইতে হইবে, উপদেশ উদাহরণ ও অভ্যাস গঠনের দ্বারা এই উপদেশ প্রত্যেক বালক বালিকার কোমলচিত্তে এমন দৃঢ় করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে যেন, সারা জীবন, সকল প্রকারের কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও, তাহারা এই শিক্ষার দ্বারা শাসিত নৈতিক-জীবনের পবিত্র পথ হইতে বিচলিত না হয়। ধন, মান, ভোগ, সুখ—সকলই গৌণ ; সত্যের পথে ও ন্যায়ের পথে জীবনযাপন করাই, জীবনের পুরস্কার ও মুখ্য প্রয়োজন। সামাজিক সদ্‌গুণগুলিই প্রথম দরকার। সংসারী হইয়া পিতারূপে, মাতারূপে, বন্ধুরূপে, প্রতিবেশীরূপে ন্যায়পথে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাযথ পালন কর। মানুষ যদি তাহা না করে দেশ উৎসন্ন

হইবে, সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, মানুষে আর পশুতে প্রভেদ থাকিবে না। ধর্ম্ম বলিলে আমরা যাহা বলি, ইহাই তাহার প্রথম কথা। বেদ ইহাকে 'ঋত' বলেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রহ্মচারীকে যে উপদেশ দেওয়া হইত, সেগুলি প্রথম হইতে স্মরণ করা ও পালন করা উচিত। গোভিল গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মচারীর জন্য আঠারটি নিষেধ-বিধি আছে। বেদের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে কল্পসূত্র একটি। কল্পসূত্রে অগ্নিষ্টোম, বিবাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। গোভিলের গৃহ্যসূত্র ঋগ্বেদীয় কোথুমী শাখার অন্তর্গত। তাঁহার আঠারটি বিধি এইরূপ।

১। আচার্য্যাধীনো ভবান্যত্রা ধর্ম্মাচরণাৎ—আচার্য্য যখন যাহা বলেন, তাহাই কর; কিন্তু তিনি যদি অধর্ম্মাচরণের উপদেশ দেন, তাহা করিবে না।

২।৩। ক্রোধানৃতে বর্জ্জয়। ক্রোধ ও মিথ্যা বর্জ্জন কর।

৪। মৈথুনম্। মৈথুন পরিত্যাগ কর।

৫। উপরিশয্যাম্। গুরুর শয্যা অপেক্ষা উচ্চশয্যা পরিত্যাগ কর।

৬।৭।৮। কৌশীলবগন্ধাঞ্জনানি। নৃত্যগীত, গন্ধদ্রব্য, অঞ্জন পরিত্যাগ কর।

৯। স্নানম্ জলক্রীড়াপূর্ব্বকং বর্জ্জয়। জলক্রীড়াপূর্ব্বক স্নান করিও না।

১০।১১।১২। অবলেখন দন্ত প্রক্ষালন পাদ প্রক্ষালনাদি। মুখের শোভা বিধান, আবশ্যকের অতিরিক্ত দন্ত ও পদপ্রক্ষালন করিও না।

১৩। ক্ষুরকৃত্যম্। ক্ষুরের দ্বারা কেশ লোমাদি মুণ্ডন ত্যাগ কর।

১৪।১৫। মধুমাংসে। সর্ব্বপ্রকার মধু ও মাংস পরিত্যাগ কর।

১৬। গোযুক্তারোহণং। গোযুক্ত শকটাদি আরোহণ পরিত্যাগ কর।

১৭। অন্তর্গ্রাম উপানহোধারণং। গ্রামের মধ্যে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার পরিত্যাগ কর।

১৮। স্বয়মিন্দ্রিয়মোচনমিতি।

গৃহস্থের প্রতি ভৃগুমণি যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর ১ম অধ্যায়ে এই উপদেশগুলি আছে।

১। সত্যংবদ—সত্য কথা বল।

৩। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ—ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন হইতে বিরত হইও না।

৪। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

আচার্য্যকে তাঁহার অভীষ্ট ধন দান করিয়া, তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিয়া সংসার রক্ষা কর।

৫। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্—সত্য পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না।

৬। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্—ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না।

৭। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্—কুশল অর্থাৎ নিজের ও অপরের মঙ্গলসাধন হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না।

৮। ভুত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্—মাঙ্গলিক বা আভ্যুদয়িক কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইও না।

৯। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রাধ্যাপনা হইতে পরাঙ্মুখ হইও না।

১০। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য হইতে বিরত হইও না।

১১। মাতৃদেবোভব—মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর।

১২। পিতৃদেবোভব—পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর।

১৩। আচার্য্যদেবোভব—আচার্য্যকে দেবতা জ্ঞান কর।

১৪। অতিথি দেবোভব—অতিথিকে দেবতা জ্ঞান কর।

১৫। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি—অনিন্দিত কর্ম্মের সেবা কর।

১৬। নো ইতরাণি—নিন্দিত কার্য্য করিও না।

১৭। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি—আমাদের যাহা সুচরিত, তাহাই তোমার করণীয়।

১৮। নো ইতরাণি—তাহার অন্যরূপ করিবে না।

১৯। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনে ন প্রশ্বসিতব্যম্—যাহারা আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহাদের একাসনে নিশ্বাস ফেলিও না, অর্থাৎ বসিও না।

২০। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্—শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।

২১। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্—অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না।

২২। শ্রিয়া দেয়ম্—সঙ্গতি অনুসারে দান করিবে।

২৩। হ্রিয়া দেয়ম্—লজ্জার সহিত দান করিবে।

২৪। ভিয়া দেয়ম্—ভীতচিত্তে দান করিবে।

২৫। সংবিদা দেয়ম্—মিত্রকার্য্যার্থে দান করিবে।

২৬। অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্ত বিচিকিৎসা বা স্যাৎ, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ ; যুক্তা অযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এই সব উপদেশানুসারে চলিতে চলিতে যদি কর্ম্মে বা আচারে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে যে সব ব্রাহ্মণ বিচারক্ষম, সদাচার ও সৎকর্ম্মে যুক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত, অক্রূরমতি, এবং ধর্ম্মকাম, তাঁহারা যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে।

২৭। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্ তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্। তোমার আচারে যদি কেহ দোষোল্লেখ করেন, তাহা হইলে বিচারক্ষমযুক্ত, অনাসক্ত, অক্রূর এবং ধর্ম্মকাম ব্রাহ্মণেরা যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ করিবে। এই আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদোপনিষৎ, এই অনুশাসন, এইরূপ উপাসনা করিবে, এই উপাস্য।

জীবনের প্রারম্ভ হইতে বেশ ভালরূপ অভ্যাস না করিলে, প্রথম হইতেই জীবনকে কতকগুলি কঠোর শাসনে দৃঢ়রূপে না বাঁধিলে, মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। মানুষ কি ? মানুষ বিশুদ্ধ চৈতন্য-বস্তু। সংসারে দুইটি বস্তু আছে ; একটি জড়, আর একটি চৈতন্য। চৈতন্য জীবন, আর জড় মরণ। চৈতন্য মুক্তি, আর জড় বন্ধন। চৈতন্য আলোক, আর জড় অন্ধকার। শাস্ত্র বলেন—চৈতন্য নিত্য ও সত্য, আর জড়, অনিত্য ও মিথ্যা। মানুষ এখন, এই জড়-চৈতন্যের দ্বন্দ্বে পড়িয়া নিজেকে ভুলিয়াছে, নিজেকে হারাইয়াছে। সে যে চৈতন্যবিন্দু, সে যে পরম চৈতন্যের বা চৈতন্য-সমুদ্রের একটি তরঙ্গ, ইহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। ক্রমে ক্রমে সাধনার দ্বারা তাহাকে ইহা বুঝিতে হইবে। একদিনে তাহা হইবে না, এক জীবনেও হয়ত তাহা হইবে না, কিন্তু এখনই

তাহার সাধনা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। এই ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি ও কর্ম্মভূমি। দেবতারা বিশেষ যত্ন করিয়া, বিশেষ প্রকারের একটা উদ্দেশ্য লইয়া এই ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই দেশকে দেব-নির্ম্মিত ভূমি বলে। এই দেশে মানব জন্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের জন্ম। এই ভারতবর্ষ ঋষিদের তপস্যার দেশ। ভারতের ঋষি মানবজাতির আদি গুরু। আমরা সেই ঋষিদের কুলে জন্মলাভ করিয়াছি। আমরা সেই ঋষিদের অধ্যাত্ম-সম্পদের উত্তরাধিকারী। কত বড় সৌভাগ্যের কথা। এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। অতএব, সেই পরম-চৈতন্যের অন্বেষণে আমরা যেন সংযম ও তপস্যার পথ আশ্রয় করি।

৩। আত্মপ্রত্যয়বাদ ও হিতবাদ

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে এমন অনেক পণ্ডিত লোক আছেন, যাঁহারা নীতির বা নৈতিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন—ধর্ম্মের দোহাই কেন? ধর্ম্ম কথা বাদ দিয়া কি নীতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। ধর্ম্ম কথা যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে নৈতিক জীবনের ভিত্তি হইবে কি, তাহাও বিচারিত হইয়াছে।

একজন মানুষকে বলা হইল, তুমি সৎ হও, নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ হও, কাহাকেও ঠকাইও না, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহাই কর, কোনরূপ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিও না, অবৈধ উপায়ে কাহাকেও পরাজিত করিও না। যুদ্ধ করিতে হইলে, সন্নীতি-পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ কর। ইহার উত্তরে যদি বলা যায়, কেন, আমার বুদ্ধি বেশী, আমার এই বুদ্ধির দ্বারা নির্বুদ্ধি ও অসতর্ক লোককে ঠকাইয়া, আমি যদি আমার সাংসারিক সুবিধা করিতে পারি, আর যদি রাজার আইনের ফাঁদে না পড়ি, তাহা হইলে আমি তাহা কেন করিব না? অনেকেই এইরূপ ভাবেন, এবং প্রকাশ্যভাবে জনসমাজে যাহাই বলুন না কেন, এই নীতি অনুসারেই চলেন। কেন মানুষ সুনীতি-সম্পন্ন হইবে? প্রাচীন উত্তর—ধর্ম্ম সত্য, আত্মা সত্য ও অবিনাশী, পরলোক সত্য, ঈশ্বর সত্য ও তিনি কর্ম্মফল-দাতা, কর্ম্মফল সত্য, অতএব বর্ত্তমানে সুবিধাই হউক, আর অসুবিধাই হউক, বর্ত্তমানে লাভই হউক, আর ক্ষতিই হউক, সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে ন্যায়ের পথে চলিতে হইবে।

যাঁহারা ধর্ম্ম না মানেন, তাঁহারা এই প্রাচীনকালের উত্তরে সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহারা বলিবেন—এগুলি সবই প্রাচীন জগতের কুসংস্কার। তাঁহারা সাধারণতঃ দুই প্রকার উত্তর দিবেন। ইংরাজী ভাষায় এই দুইটি মতবাদের নাম Intuition আর Utility—আধুনিক বাঙ্গালাভাষায় 'আত্মপ্রত্যয়বাদ' ও 'হিতবাদ'।

আত্মপ্রত্যয়বাদী বলিবেন, প্রত্যেক মানুষই নিজের অন্তর মধ্যে বুঝিতে পারে, কি সঙ্গত, কি অসঙ্গত, কোন কর্ম্ম ন্যায়সঙ্গত, আর কোন কর্ম্ম ন্যায়-বহির্ভূত বা অন্যায়। প্রত্যেক মানুষ নিজের অন্তর মধ্যে আরও বুঝিতে পারে, যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহাই করা উচিত, আর যাহা ন্যায়-বহির্ভূত তাহা করা উচিত নহে বা অনুচিত। প্রত্যেক মানুষের অন্তর মধ্যে এই যে 'স্বাভাবিক বোধ' আছে, এই 'বোধ'কে Conscience বলে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিবেক' বা ধর্ম্মবুদ্ধি। প্রত্যেক মানুষেরই এই ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। প্রত্যেক মানুষ বোঝেন, কি ন্যায্য আর কি অন্যায্য। সুতরাং, আর চিন্তা কি? প্রত্যেক মানুষ এই 'বিবেক' বা ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশে চলুক, এই আদেশই ভগবদ্বাণী। এই আদেশ অনুসারে চলিলেই হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। যাঁহারা ধর্ম্ম মানেন, ও ঈশ্বর মানেন, তাঁহারা এই মতের সহিত নিজেদের মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন,—এই বিবেকই ঈশ্বর, এই বিবেকই ধর্ম্ম।

কিন্তু, এই বিবেকবাদ বড়ই বিপজ্জনক মত। বর্ত্তমান সময়ে, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অশান্তি ও সংঘর্ষের কিয়দংশ যে এই বিপজ্জনক মতবাদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। চোর বলিবে, আমার বিবেক বলে চুরি করিতে, তাই চুরি করি। নরঘাতক বলিবে, আমার বিবেক বলে, তাই নরহত্যা করি। এমন ব্যাপার দেখা গিয়াছে। বিবেকবাদের প্রকৃত অর্থ, নিজের আত্মায় ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া, তদনুসারে সর্ব্বাবস্থায় নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ। আমাদের শাস্ত্রানুসারে আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহা মানবজীবনের চরম আধ্যাত্মিক উন্নতির অবস্থার কথা। বহু বহু জন্মের সুখদুঃখময় বহু বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া মানবাত্মার ক্রমবিকাশ হইতেছে এই বিকাশ বা ক্রমোন্নতি যাহাতে অব্যাহতভাবে চলে, বর্ত্তমান জীবনে যাহার যতখানি বিকাশ সম্ভব, ঠিক্ ততখানি বিকাশ যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই ধর্ম্মের, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বা শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যের কার্য্য। জীবচৈতন্য বা মানবাত্মা যে-পরিমাণে বিকশিত

হইবে, অন্তর্যামী ভগবানের বা চৈত্য-গুরুর বাণীও সে, সেই পরিমাণে শুনিতে পাইবে। ইহা সাধন-সাপেক্ষ। কাজেই, যাহাদের হৃদয় উপযুক্তরূপে বিকশিত হয় নাই, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিকল্পাত্মক মনের বা কামের দোষ এখনও যাহাদের প্রকৃতিতে বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে বিবেকের দোহাই দেওয়া, অনেক সময়েই যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথ। ভারতের মনস্তত্ত্ববিৎগণ বলেন, মানুষের মনের পাঁচটি অবস্থা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। বর্ত্তমান জগতে অধিকাংশ লোকই প্রথম দুইটি অবস্থায় আছে। যাঁহারা তৃতীয় ভূমির লোক, তাঁহারা সমাজে বড় লোক, তাঁহারাই সাহিত্যিক কবি ও দার্শনিক। চতুর্থ ভূমির লোক খুবই বিরল, তাঁহারা পরম পূজনীয় সাধু ব্যক্তি। যাঁহারা পঞ্চম অবস্থায় বা নিরুদ্ধ অবস্থায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিবেকবাদ সত্য।

তবে এই বিবেকবাদের স্বপক্ষে দুইটি কথা বলিতে পারা যায়। প্রথম কথা এই যে, যে-সমাজে মানুষ একেবারে তমোগুণে ডুবিয়া পরায়ত্ত পশুর ন্যায় অতিশয় অধম জীবন যাপন করিতেছে, সেই সমাজে মধ্যে মধ্যে এই বিবেকবাদের বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয়ডঙ্কা বাজিলে সমাজে একটা জাগরণ আসে, কতকগুলি লোকের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খলতাও আসে, কিন্তু আলো জ্বলিলেই একটা ছায়াপাত হইবে। দ্বিতীয় কথা, সুদূর ভবিষ্যতে মানব সমাজের এমন অবস্থা হয়ত হইতে পারে, যখন প্রত্যেক মানুষ নিজের অন্তরে ভগবদ্বাণী শুনিতে পাইবে। কিন্তু সে কবেকার কথা।

এই গেল 'বিবেকবাদ' বা 'আত্মপ্রত্যয়বাদ'। এইবার 'হিতবাদ'-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। 'হিতবাদী' বলেন যে, কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-পরিমাণ হিত হয়, তাহাই ন্যায়সঙ্গত; আর অন্যায় তাহার বিপরীত। অনেকে বলেন, এই মতবাদই নৈতিক জীবনের সুনিশ্চিত ভিত্তি। হিতবাদীগণের মতবাদে অনেক ভাল কথা আছে, তাহা স্বীকার্য্য। উইলিয়ম্ কিংডন্ ক্লিফোর্ড (William Kingdon Cifford) বলেন, বর্ত্তমান সময়ে আমরা প্রত্যেকেই যত কিছু সুবিধা পাইয়াছি, তাহা অতীতের দান। আমরা অতীত কালের নিকট বহু প্রকারেই ঋণী। আমরা বর্ত্তমানকে ও ভবিষ্যতকে যদি কিছু দান করিতে পারি তাহা হইলেই অতীতের

ঋণ পরিশোধ হইবে। অতীতের নিকট আমরা কত প্রকারে ঋণী, তাহা বিবেচনা-পূর্ব্বক দেখিতে হইবে। আমাদের এই মস্তিষ্ক এখন যে-আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই আকার লাভ একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত সুদীর্ঘযুগব্যাপী সাধনা ও অনুশীলন পুরুষানুক্রমে হইয়া গিয়াছে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, আইন কানুন, সঞ্চিত ধন, ভোগের উপকরণ, ঔষধ প্রভৃতি সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন, অতীত যুগের সাধনার দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সেই অতীতের নিকট, আমাদের এই মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট, আমাদের কত ঋণ। এই ঋণ স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের মানবজাতির কল্যাণকল্পে আমরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমবেতভাবে যদি কিছু না করি, তাহা হইলে আমরা অতিশয় ঘৃণ্য ও পতিত জীব। স্বনামধন্য জনহিতৈষী চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল ঠিক্ এইভাবের ভাবুক ছিলেন। ভারতবর্ষে যাঁহারা ধর্ম্মশীল লোক, তাঁহারা প্রত্যেকেই চিরকাল এই মতাবলম্বী, তাহা পরে বলা হইবে। চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল যদিও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন সত্য, কিন্তু অন্যদিকে তিনি প্রত্যক্ষবাদী ও নাস্তিক ছিলেন। মৃত্যুর পর যে মানুষ থাকে, ইহা তিনি একেবারেই মানিতেন না। পরকালের দোহাই দিয়া মানুষকে নীতি-শিক্ষা দেওয়ারও তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন ও বিশ্বাস করিতেন, পরকালের দোহাই দিয়া মানুষকে নীতিশিক্ষা দিলে তাহাকে আরও বেশী স্বার্থপর করা হয়। তিনি বলিতেন—যে-সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সংগ্রাম করিতেছি, আমার জীবিতকালে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। না হউক, আমি সংগ্রাম করিতে করিতে মরিয়া যাইব। সেজন্য আমি মোটেই চিন্তিত বা দুঃখিত নহি। আমার এই জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও প্রাণপাতের দ্বারা এই সত্য যদি মানবজাতির অধিকারের অভিমুখে একতিলও আগাইয়া আসে, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত দেহে আমি মরিয়া যাইব। আমার মৃতদেহ যদি একটি সেতু নির্ম্মাণে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করে, আর সেই সেতু অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের মানবজাতি যদি কোনও একটি বিশিষ্ট সত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক। চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল'র তুল্য নিঃস্বার্থ ও মহামনা লোক জগতে দুর্ল্লভ। হিন্দু বলিবেন, এই সব লোকহিতৈষী মহাপুরুষ বর্ত্তমান জীবনে পরকাল প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপদেশ সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করুন, ইঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা [illegible]

তপস্যার ফলেই বর্ত্তমান জন্মে তাঁহারা স্বভাবতঃ লোকহিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই প্রকারের স্বভাব-সম্পন্ন লোক পৃথিবীতে নিতান্তই দুর্ল্লভ! মহাত্মা ব্র্যাড্‌ল'র পক্ষে যাহা সম্ভব, প্রাকৃত জনসাধারণের পক্ষে তাহা মোটেই সম্ভব নহে। তবে কলিযুগ চিরকাল থাকিবে না আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে, তখন হয়ত অধিকাংশ লোকের মনোবৃত্তি ও জীবনাদর্শ ঐরূপই হইবে। কিন্তু সত্যযুগ তো আপনা হইতে আসিবে না; আজিকার অর্থাৎ এই ঘোর কলিযুগের সাধকগণের সাধনার বলে, কলিযুগের অবসান ও সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। সুতরাং আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কিপ্রকারের শিক্ষা ও সাধনার কি প্রকারের অনুষ্ঠানের সাহায্যে বর্ত্তমান জীবনে না হউক, পর পর জীবনেও এই মানুষ নিজের আত্মায় অন্তর্যামী ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পায় ও স্বভাবতঃই সংযমী ও পরার্থপর হয়।

পূর্ব্বে যে ঋণের কথা বলা হইল, সেই ঋণ ও তাহা পরিশোধ করার কথা, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে খুব ভাল করিয়াই বলা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে, আমরা দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের নিকট ঋণী। সংসারে সক্ষম সংসারী হইয়া যাগযজ্ঞাদির দ্বারা দেবঋণ, দানকর্ম্মের দ্বারা ঋষিঋণ এবং উপযুক্ত সন্তান সন্ততির দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল কথাগুলিকে বাদ দিয়া ঋণ পরিশোধের কথা বলিলে, সেই কথা কয়জন লোকের হৃদয় স্পর্শ করিবে, কয়জনই বা সেই উপদেশ পালন করিবে? দুই একজন সুদুর্ল্লভ সাধু-প্রকৃতির লোকছাড়া, এই উপদেশ কাহারও জীবনে কার্য্যকরী হইবে না।

'আত্মপ্রত্যয়' বা 'বিবেকবাদ' নৈতিক-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি নহে। মানবাত্মার অনশ্বরত্ব, ও কর্ম্মফলের বিধানানুসারে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া মানবাত্মার ক্রমবিকাশ স্বীকার করে না, এই প্রকারের 'হিতবাদ'ও নৈতিক-জীবনের ভিত্তি হইতে পারে না। ধর্ম্মই একমাত্র সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ভিত্তি।

আমাদের এই সনাতন-ধর্ম্ম কি প্রণালীতে নীতিশিক্ষা দেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই মহাপুরুষের প্রসঙ্গ আছে। ঋষি ও অবতার লইয়া হিন্দু ধর্ম্ম। পয়গম্বর ও পীর লইয়া মুসলমান ধর্ম্ম। যীশু ও সন্ত লইয়া খৃষ্টান

অর্থ কি ? বর্ত্তমান কালের জড়বাদী পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, একথা সত্য যে, এই সব মহাপুরুষেরা তত্ত্বদর্শী ও ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। অন্তর্জগতের ব্যাপার সমূহ ইঁহারা প্রজ্ঞানেত্রে দেখিতে পাইতেন। মানুষ কি, মানুষের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কি, কি বিধানে লোকলোকান্তরে মানবের ক্রমবিকাশ হইতেছে, এই সব ব্যাপার তাঁহারা জানিতেন। এই কারণে তাঁহারা 'অধিকারভেদ'-এর কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অধিকারভেদ মানিতেন বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-সম্পন্ন মানুষের জন্য একই কথা কিছু ভিন্ন ভিন্ন আকারে বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম শিক্ষকেরাও এই ভাবে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা নীতিবিজ্ঞান গড়িতে চাহেন, তাঁহারা অধিকারভেদ বিচার করেন না, কাজেই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে জগতের অবস্থা বড়ই ভয়াবহ। ধর্ম্মের শাসন কেহই মানিতে চাহে না। ধর্ম্মের ভিত্তি যেন আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ কেন মানিব ? প্রাচীন জগতের শাস্ত্র-সমূহকে একালের একদল মানুষ ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে ; কেন মানিব ? তোমরা যে বলিতেছ, মানিতে হইবে, তাহার হেতু কি ? মানুষের সংশয় ও সমালোচনা-বৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার বলে একটি সুনিশ্চিত ভিত্তি দেখাইয়া দাও, যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দাও। না মানিয়া উপায় নাই, একেবারে অস্বীকার করা যায় না, এমন ব্যাপার কিছু দেখাইয়া দাও, নতুবা মানিব না। একালের ধর্ম্ম শিক্ষকগণকে চিন্তা করিতে হইবে, এমন কিছু কি আছে, যাহা যুক্তিযুক্ত, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র যাহা অস্বীকার করিতে পারে না। সনাতন ধর্ম্মের এমন কি শিক্ষা আছে ?

উত্তর। একজন বৈদেশিক পণ্ডিত ডাক্তার মিলার সনাতন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—The great gifts of Hinduism to the world are the teachings of the immanence of God and the solidarity of mankind. একদিকে এই শিক্ষা, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের শিক্ষা. তাহার পর ইহা যুক্তিশাস্ত্রের অর্থাৎ বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুমোদিত, সুতরাং কে অস্বীকার করিবে ? ইহার অর্থ—একই চৈতন্য, একই

ঐক্যসূত্রে বদ্ধ। একমেবাদ্বিতীয়ম্‌—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অল্পবিস্তর পরিমাণে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এই শিক্ষা দিয়াছে; কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম্ম যত জোরে, যত স্পষ্ট করিয়া এবং যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এই মহাশিক্ষা জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, তেমন আর কোন ধর্ম্মেই হয় নাই।

এক আত্মা, পরমাত্মা,—"তজ্জলানিতি—তাহাতেই সকলের জন্ম, স্থিতি ও লয়। এই মহাসত্য বা মৌলিক সত্যই নৈতিক-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। এই ভিত্তি সনাতন। ইহা ভাঙ্গিবারও নহে, কাঁপিবারও নহে, বদ্‌লাইবারও নহে, কোন তার্কিকের সাধ্য নাই, ইহার খণ্ডন করে। জীবনে যতই নবনব অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত বা সঞ্চিত হইবে, এই মহাসত্য ততই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। একই জীবন, (The unity of life) সকলেই সেই জীবনে সঞ্জীবিত, অপৌরুষেয় বেদ ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। দার্শনিক পণ্ডিতগণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিলে, জীবনের ও জগতের কোন রহস্যেরই মীমাংসা করা যায় না। বস্তুবিজ্ঞানও যতই উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে, এই মহাসত্য ততই অসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সত্য সনাতন সত্য, সকল সত্যের সার সত্য; ইহার উপর আর কথা নাই। মানুষের বিশুদ্ধ হৃদয় প্রজ্ঞানের আলোকে এই মহাসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হয়; প্রাচীন ঋষিগণ তপস্যা-প্রভাবে নিজ নিজ হৃদয়মধ্যে এই মহাসত্য প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছিলেন ও হর্ষশোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানও প্রকৃতির গুপ্তকক্ষ একটির পর আর একটি উদ্‌ঘাটন করিয়া এই মহাসত্যের অভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে এই মৌলিক মহাসত্যের উপর আমাদের নৈতিক-জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এই ঐক্য জ্ঞানরূপ, জড়রূপ নহে। এই ঐক্যকে মানুষ নানা নামে ডাকিয়াছে, নানাভাবে ভাবিয়াছে, নানারূপে পূজা করিয়াছে, ইঁহার সহিত নানারূপ সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই পরমাত্মা, ইনিই মাতা, ইনিই পিতা, ইনিই গুরু, ইনিই সখা; ইনিই পরমপুরুষ, ইনিই পরমা প্রকৃতি, একাধারে পুরুষ ও নারী, অর্দ্ধনারীশ্বর। একই প্রাণ বিশ্বজনীন মহাপ্রাণ, আমরা সকলেই সেই প্রাণে বাঁচিয়া আছি। একই শক্তি,—একাধারে

কিছু নাই। আমি ও তুমি এক, প্রাণে এক, জ্ঞানে এক, সকল বিষয়েই এক। কেবল আকারে ভিন্ন। কাজেই আমি যদি তোমার অনিষ্ট করি, তাহা হইলে আমি আমার নিজেরই অনিষ্ট করি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলিয়া তোমাকে ঠকাই, তাহা হইলে আমি নিজেকেই ঠকাই। আমি কিছুতেই আমাকে তোমার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারি না, আমি কিছুতেই আমাকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিনা। আমরা দেখিতে পৃথক্, কিন্তু একই প্রাণে গাঁথা হইয়া আছি। তোমাকে আঘাত করিলে সে আঘাতে আমিই ব্যথিত হই। এই মহাসত্য অস্বীকার করার উপায় নাই। এই সত্য এমনই ভীষণ যে যদি অস্বীকার কর, যন্ত্রণারূপে উহা ফিরিয়া আসিবে, আর যদি গ্রহণ কর, আনন্দ-রূপে তোমাকে ধন্য করিবে। এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া বড় বড় পরাক্রমশালী ও সুসভ্য জাতি ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমাজ এই সত্যের অপলাপ করিবে, তাহা ধ্বংশ হইয়া যাইবে। এই সত্যই নৈতিক-জীবনের সুনিশ্চিত ভিত্তি।

৪। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

যাঁহারা বিজ্ঞানের ছাত্র, কিছু বিজ্ঞান ও সেই বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কিছু কার্য্যকরী শিক্ষা পাইয়া যাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হইবে, আধুনিক বিজ্ঞান কি ধর্ম্মের বিরোধী? ইহার উত্তর—আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃত ধর্ম্মের বিরোধী নহে। বিজ্ঞান, ধর্ম্মের ভৃত্য ও পোষক। বিজ্ঞানও সত্য, ধর্ম্মও সত্য। তাহাদের ক্ষেত্র পৃথক্, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

বলা হইল, ধর্ম্ম সত্য; তাই বলিয়া ধর্ম্মের নামে যাহা কিছু চলিতেছে, তাহাই যে সত্য, তাহা নহে। ধর্ম্ম সত্য বলিয়া যে, তীর্থস্থানে মোহান্ত ও পাণ্ডার অত্যাচার, গুরুগিরি ও অবতারগিরির ব্যবসায়, সবই যে সত্য, তাহা নহে। আবার বিজ্ঞান সত্য বলিয়া বিজ্ঞানের নামে বা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া যতরকম সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহার সবগুলিই যে সত্য ও গ্রহণীয়, তাহা নহে।

খৃষ্টান শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে, যাহা আধুনিক বিজ্ঞান কিছুতেই মানিতে

ছয় হাজার বৎসরে বর্ত্তমান পৃথিবীর সমগ্র মানুষের উৎপত্তি প্রভৃতি। খৃষ্টীয় শাস্ত্রের এই সব কথার হয়ত অন্যরূপ গূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু তাহা আমাদের এখন আলোচ্য নহে। আমাদের বক্তব্য, সত্য-ধর্ম্মের সহিত সত্য-বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই, উহারা মিত্র।

বর্ত্তমান যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের উন্নতির সীমা নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের শেষ কথাগুলির যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে আমাদের এই প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের অনেক কথাই, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই জড়বাদী ছিলেন। এখন আর সেদিন নাই। টিণ্ডাল ও ক্রুক্‌স্, উভয়েই খুব বড় বৈজ্ঞানিক; ইঁহাদের মতের তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। টিণ্ডাল জড়ের মধ্যে প্রাণের বা চৈতন্যের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, আর ক্রুক্‌স্ তাহার ঠিক্ বিপরীত দেখিলেন। ক্রুক্‌স্ প্রাণ বা চৈতন্যের মধ্যেই জড়ের সম্ভাবনা দেখিলেন।

যাঁহারা বিজ্ঞান পড়েন ও মনে করেন, বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মের যুগ চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের দেখা উচিত, বর্ত্তমান বিজ্ঞান অনেক বিষয়েই বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে প্রচারিত অনেক কথারই সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নব্য ইউরোপে বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ কি প্রকারে হইল, তাহার ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস কৌতুকপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকেরাই এই বিরোধের জন্য মূলতঃ দায়ী। মুসলমানেরাই বর্ত্তমান ইউরোপে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় করেন ও নব-বিজ্ঞানের আলোক প্রজ্বালিত করেন। বিজ্ঞানের যখন শৈশব অবস্থা, তখন গ্যালিলিও, গাইয়ারডুনো ব্রুনো, রোজার বেকন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করার জন্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের হস্তে নৃশংসভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন। ধর্ম্মাচার্য্যগণ তখন অতিশয় প্রবল ও সমাজে সর্ব্বময় কর্ত্তা। ধর্ম্মাচার্য্যগণ ভাবিয়াছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সব কথা নাই, সে সব কথা সয়তানের সৃষ্টি, সে সব কথা জনসমাজে প্রচারিত হইলে ধর্ম্মহানি হইবে। এই জন্যই তাঁহারা জড় বিজ্ঞানের প্রথম যুগের আচার্য্যগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিজ্ঞান পড়েন, তাঁহাদের এই ইতিহাস জানা উচিত।

কার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে ? উৎপীড়ন ও অত্যাচার সত্বেও প্রতিদিন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল, মানুষ দলে দলে বৈজ্ঞানিকী-চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে লাগিল।

এইবার বিজ্ঞানের পালা। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতে লাগিল, ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ততই যেন ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। বিজ্ঞানের আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেরেই ধারণা হইল যে, ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে না পারিলে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইবে না, জগতের কল্যাণ হইবে না। বিজ্ঞানের আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকে দেখাইয়া দিলেন, ধর্ম্মের প্রধান প্রধান কথাগুলির কোন ভিত্তি নাই, ঐগুলি প্রাচীন কালের কুসংস্কারমাত্র। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধর্ম্মের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। এই আলোচনায় স্থিরীকৃত হইল, অজ্ঞানতাই ধর্ম্মের উদ্ভবভূমি। এই যুগকে প্রতিক্রিয়ার যুগ বলা যায়। এ যুগে বিজ্ঞান প্রবল, আর বিজ্ঞানের নিকট ধর্ম্মের পরাজয়।

আমরা ভারতবর্ষের লোক। একদিন আমরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলাম। আমরা অতি প্রাচীনকালে মানবজাতির গুরুস্থানীয় ছিলাম এবং সমুদায় বিদ্যাই আমরা পৃথিবীবাসীকে শিখাইয়াছি। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের সঙ্গে উন্নতিপথে চলিয়া উঠিতে পারি নাই, আমরা সকল বিষয়েই পিছাইয়া পড়িয়াছি। আজ আমরা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত। প্রতীচ্য শিক্ষার ফলে এবং অনেকস্থলে প্রতীচ্যের অনুকরণ করিয়া আমরাও একদিন ধর্ম্মদ্বেষী হইলাম। পর-লোকগত কটন্ সাহেব, তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' (নব্যভারত) নামক ইংরাজী পুস্তকে বলিয়াছেন—শিক্ষিত ভারতবাসিগণ প্রায়ই অজ্ঞেয়তাবাদী, (Agnostic) অর্থাৎ ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা প্রভৃতি বিষয় বা ব্যাপার-সম্বন্ধে ভাবে না, বা ভাবিবার প্রয়োজন দেখে না।

কটন সাহেবের একথা সত্য হইলে, বড় দুঃখের কথা। কারণ, ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। আজ যদি শিক্ষা, সংসর্গ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে ভারতবর্ষ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের আর হইল কি ? এই সর্ব্বনাশের মুখ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য, এই নবযুগে অনেক শক্তিশালী পুরুষই চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী,

প্রভৃতি সকলকেই আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক। ধর্ম্মনাশ, পরধর্ম্মগ্রহণ, ধর্ম্মসংস্কার, ধর্ম্ম সংরক্ষণ, এই চারি প্রকারের চেষ্টা গত একশত বৎসর ধরিয়া নব্যভারতে প্রবলভাবে চলিতেছে। এখন এমন একটা দিন আসিয়াছে, যখন এই বিভিন্নমুখী আন্দোলন-সমূহের সমগ্র সাহিত্য একত্র করিয়া ধীরভাবে ও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এ কার্য্য কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ, তবে জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি হইতেছে, তাঁহারা উপযুক্ত লোকের দ্বারা এই কার্য্য করাইতে পারেন।

আমাদের ভারতবর্ষের এই সনাতন ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্যগণ বিবেচনা করেন—বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইবে, সনাতন-ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি লোকে ততই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, ইহাদের মধ্যে সত্য করিয়া কোন বিরোধ নাই। বৈজ্ঞানিকের আলোচনা-পদ্ধতি ও সেই পদ্ধতির দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত সমূহের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন জগতের অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-সমূহ যে-সমুদয় মহাসত্য বা সারসত্য মানবজাতিকে শিখাইতেছেন, বিজ্ঞান-সমূহও ক্রমে ক্রমে সেই সমুদয় মহাসত্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। উভয়ের পদ্ধতির মধ্যে একটা বড় রকমের প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ কি, বেশ ভাল করিয়া জানিয়া রাখা দরকার।

এক আর বহু, এই লইয়া জগৎ। যাঁহারা ঋষি ও শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা সাধনবলে সেই এককে দেখিয়াছিলেন, সেই একে বা পরম ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গীতায় এই অবস্থার নাম 'ব্রাহ্মী-স্থিতি'। সেই একের সাহায্যে তাঁহারা এই বহুকে বুঝিয়াছিলেন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মানব-জাতিকে এই পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন এবং এখনও শিখাইতেছেন। এই পদ্ধতিতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। এই জন্য আমরা বলি—আর্ষবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, এই চারিটি দোষ নাই। এই এক পদ্ধতি। From the one to the many, অথবা from within outwards.

বিজ্ঞানের পদ্ধতি অন্যরূপ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, যন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়াইয়া সঠিকভাবে এই বহুকে প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ করা হইল (observation)। পরিদৃষ্ট ব্যাপারের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিবার জন্য পরীক্ষার পর পরীক্ষা

সিদ্ধান্ত (deductions) করা হইতে লাগিল। নিম্ন হইতে উপরের দিকে বিহার, হইতে ভিতরের দিকে, দেহ হইতে প্রাণ ও চৈতন্যের দিকে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে, বহু হইতে একের দিকে, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত বৈজ্ঞানিক অগ্রসর হইতেছেন। পদার্থবিদ্যার (Sciences of the Physical Group) ছাড়াইয়া, রসায়নের রাজ্য (Sciences of the Chemical Group) ; রসায়ন ছাড়াইয়া প্রাণের রাজ্য (Sciences of the Biological Group) উদ্ভিদ্, পশু, মানব প্রভৃতি ; তাহার পর মনস্তত্ত্বের রাজ্য (Sciences of the Psychological Group). বৈজ্ঞানিক ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। একটির পর একটি করিয়া অনন্তরহস্যময়ী প্রকৃতির গুপ্তদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, নব নব জগৎ ও সেই সেই জগতের রহস্য সমূহ, বৈজ্ঞানিকের পুরোদেশে প্রকাশিত হইতেছে। বিজ্ঞান সমূহের শেষ সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মিলন অবশ্যম্ভাবী. অনেকেই সেই মিলনভূমি দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত ও উল্লসিত হইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকের গবেষণা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। জড় আর শক্তি (Matter and Energy) এই দুইটি তত্ত্ব (Principles) যাবতীয় ব্যাপারের (Phenomena) মূলে বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক আলোচনার ইহাই প্রথম কথা। জড়-ছাড়া শক্তি নাই, শক্তি ছাড়া জড় নাই। উভয়েই অনশ্বর (Indestructible)। তাহা-দের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ধ্বংস নাই। জড়ের ও শক্তির এই অনশ্বরতা ও রূপান্তর, নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়া থাকে।

জড়ের ও শক্তির এই অনশ্বরতা আশ্রয় করিয়া বৈজ্ঞানিকগণের কল্পনা স্বভাবতঃই অনুভব করিতেছে—এমন কোন এক তত্ত্ব আছে, যাহা জড় ও শক্তি এই উভয়েরই উদ্ভব-ভূমি, অর্থাৎ জড়ে ও শক্তিতে সত্য করিয়া মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। আর এই তত্ত্ব কিরূপ সে সম্বন্ধেও স্বভাবতঃই নানারূপ কল্পনা চলিতেছে। সে কল্পনা এইরূপ। এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে, সকল প্রকারের শক্তিই এক। প্রত্যেক শক্তিই গতির বা স্পন্দনের প্রকারভেদমাত্র—Modes of motion. কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ উই-লিয়ম্ ক্রুক্‌স্ একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। প্রত্যেক সেকেণ্ডে স্পন্দন সংখ্যা ৩২,

আরম্ভ করিয়া ৩২,৭৬৮ পর্য্যন্ত শব্দের রাজ্য। পরবর্ত্তী সময়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেকেণ্ডে ২৪ হইতে চল্লিশ হাজার পর্য্যন্ত কম্পনের যে শব্দ, তাহা কান শুনিতে পায়। সাধারণ হার্মোনিয়াম্ যন্ত্রের প্রথম সপ্তকের অর্থাৎ উদারার প্রথম পর্দ্দা যে 'সা', তাহাতে বাতাসের আণবিক কম্পনের সংখ্যা—২৫৬। রে—২৮৮, গা—৩২০, ইত্যাদি। মুদারার 'সা' এর স্পন্দন—৫১২। 'তারা' 'সা' এর স্পন্দন—১০২৪। বাতাসের অণুর কম্পন যতই বাড়িবে, শব্দের উচ্চতা বা তীব্রতা (Pitch) ততই বাড়িবে। কিন্তু ২৪ এর নীচে আর ৪০ হাজারের উপরে, আর শোনা যায় না। বিজ্ঞানের ছাত্রগণের এই সব বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

'সঙ্গীত-মকরন্দ' বলিয়া একখানি খুব প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে শব্দের সহিত আলোকের এক সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিলে বেগুনিয়া, নীল, আস্‌মানি, সবুজ, হল্‌দে, গোলাপি, লাল—এই যে সাত রকম রং হয়, ইহাদের সম্বন্ধের কথাও আছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা এমন অনেক বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানিতেন, যাহা এখনও খুব নূতন, সুতরাং ধীরভাবে আলোচনা করা দরকার।

পূর্ব্ব অপেক্ষা প্রত্যেক সেকেণ্ডে স্পন্দন যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহা আর বায়ুমণ্ডলে সংক্রমিত হইবে না, উহা ঈথারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে। ৭৩৮,৩৬৮ পর্য্যন্ত বিদ্যুতের বিবিধ প্রকারের প্রকাশ। তাহার পরে, অর্থাৎ স্পন্দনের সংখ্যা আরও বাড়িলে এমন কতকগুলি ক্রিয়া হয়, যাহার তত্ত্ব অজ্ঞাত। তাহার পর—উত্তাপ ও আলোক। তাহার পরের কতকগুলি অজ্ঞাত। তাহার পর—রঞ্জেন্ রশ্মি বা এক্‌স্-রে। তাহার পর কি হয়, আমরা জানি না। ইংরাজী ৮৯৭ অব্দের জানুয়ারী মাসের ২৯শে তারিখে Pshychic Research Society বা অন্তর্জগৎ-গবেষণা সমিতির সভায় বক্তৃতায় সার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

পূর্ব্বের কথা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে—ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আর কিছুই নহে, আণবিক স্পন্দনের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। স্পন্দনের মাত্রার বিভিন্নতা অনুসারে কেবল যে বিভিন্ন প্রকারের শক্তির প্রকাশ হইতেছে তাহা নহে ; ঐ শক্তি যে উপাদানের সাহায্যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহাও বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, কখন ঈথার, কখন বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি।

ঠিক্ একরূপ নহে, তাহা তিনি বলিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলিতেছেন—স্পন্দনের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেলে চিন্তা, কামনা প্রভৃতি শক্তি, যাহাদের আমরা মনোবৃত্তি বলি, তাহাদের প্রকাশ আরম্ভ হইবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এই প্রকার অনুমান করিলে আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম? কোন্ মহাসত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল? আমরা বুঝিলাম—এক 'অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বই' বিশ্বের কারণ ও মূলাধার। অন্ধ জড়ের বা জড় শক্তির যথেচ্ছ মিলনের দ্বারা বিশ্ব প্রসূত হয় নাই। আরও বুঝিলাম—একই মহাশক্তি, তিনিই আলোক, উত্তাপ, বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, আণবিক আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপে, আবার তিনিই উদ্ভিদাদির মধ্যে প্রাণশক্তি রূপে, আবার তিনিই পশুর ভিতর ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে, আবার মানবে এই সকল ব্যতীত দয়া, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া ক্রিয়া করিতেছেন। তিনি এক—পরম চৈতন্য-স্বরূপিনী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ঋষি যে মহাসত্যের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন আমরা ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের আলোচনায় অনুমানের দ্বারা সেই মহাসত্যেরই আভাস পাইতেছি। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, ঋষির বা ভক্তের দর্শন, আর বৈজ্ঞানিকের অনুমান, এক নহে।

জড়বস্তু বা পরমাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তও আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে জানা ছিল, প্রায় সত্তরটি মূল পদার্থ (Elements)। কাজেই পরমাণু সত্তর প্রকারের। কিন্তু এখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ইহা ঠিক্ নহে, মূলে কেবল এক রকমেরই পরমাণু আছে। ইহার নাম প্রোটাইল্ (Protyle)। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কাগজ Nature-এ, প্রেস্টনের এক বক্তৃতা বাহির হয়। তিনিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি মূল পরমাণুর নাম দিয়াছেন 'আয়ন'। তিনি আলোক রশ্মি বিশ্লেষণ (Spectrum Analysis) করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। একটি ধাতব পদার্থকে অন্য প্রকারের ধাতব পদার্থে পরিণত করা যায়, এই প্রকারের ধারণা প্রাচীন জগতে ছিল। নবযুগের বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রাচীন ধারণা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু এখন আর তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্ত্তন উৎপাদন করে। পদার্থের অণুগুলির সংস্থান বা সন্নিবেশ পরিবর্ত্তিত হয়, আবার যে পরমাণুর দ্বারা অণুগুলি নির্ম্মিত, সেই পরমাণুগুলিরও সন্নিবেশ পরিবর্ত্তিত হয়। উত্তাপ একটি শক্তি, বরফে উত্তাপ দিলে উহা জল হইয়া যায়। অণুগুলির গতির পরিবর্ত্তনই ইহার হেতু। কঠিন পদার্থ বরফে অণুগুলি সংহতভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল, এখন উত্তাপ পাইয়া অণুগুলির সংহতি কমিয়া গেল। আরও উত্তাপ দিলে আণুবিক সংহতি (Molecular Co-hesion) আরও কমিয়া যাইবে। জল বাষ্প হইবে। এই ত্রিবিধ অবস্থায়, বরফ, জলে ও জলীয় বাষ্পে, অণুগুলি যেমন তেমনই আছে। এইবার উত্তাপের পরিবর্ত্তে যদি অন্য প্রকারের শক্তি বিদ্যুৎ—জলের উপর প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অণুগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবে, জলের অণুর পরিবর্ত্তে আমরা অম্লজান ও জলজান নামক দুই প্রকারের বাষ্প-পরমাণু পাইব। আবার অম্লজানের পরমাণুতে যদি বিদ্যুৎ বা তড়িত চালান যায়, তাহা হইলে অম্লজান, 'ওজোন' নামক বাষ্পে পরিণত হইবে। ওজোনের সহিত অম্লজানের অনেক পার্থক্য। ওজোনের গন্ধ আছে, অম্লজানের নাই, ওজোনের রাসয়নিক ক্রিয়া অনেক বেশী। পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে—অম্লজানের অণু দুইটি পরমাণুদ্বারা গঠিত, আর ওজোনের অণু তিনটি পরমাণুর দ্বারা গঠিত। কাজেই অম্লজান ও ওজোনের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা পরমাণুগুলির সন্নিবেশের পার্থক্য নিবন্ধন হইয়া থাকে। সুতরাং, একই প্রকারের পরমাণু বা মূল উপাদানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে।

জড় ও শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে অনেকগুলি সুসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিকার—ঘটনাবলী (facts and phenomena) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্যকরী উপপত্তির নির্দ্ধারণ। চরমতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিজ্ঞান কিছুই বলেন না। বিজ্ঞানের উপপত্তি সমূহের সাহায্যে দর্শনশাস্ত্র চরমতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। জড় কি, শক্তি কি, চৈতন্য কি? এগুলি দার্শনিকের প্রশ্ন। কেহ বলেন, জড়ই সর্ব্বস্ব ; শক্তি বল, প্রাণ বল, চৈতন্য বল, জড় হইতেই সকলের উদ্ভব। কেহ বলেন, শক্তিই সর্ব্বস্ব। যাহাকে জড় বলি, তাহা কিছুই নহে ; জড় পরমাণু শক্তি কেন্দ্র (centre of force) ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ বলেন—মনই সকলের মূল,

এই দুই, এক অজ্ঞেয় পরমার্থ সত্তার দুই প্রকারের প্রকাশ মাত্র। হার্বার্ট স্পেন্সারের সিদ্ধান্ত, বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক।

I have repeatedly and emphatically asserted that our conceptions of matter and motion are but symbols of an unknowable Reality; that this Reality cannot be that which we symbolise it to be and that as manifested beyond consciousness, under the forms of matter and motion, it is the same as that which, in consciousness, is manifested as Feeling and Thought * * * I recognise no forces within the organism or without the organism, but the variously conditioned modes of the universal immanent force, and the whole process of organic evolution is everywhere attributed by me to the co-operation of its variously conditioned modes, internal and external. (Appendix to the 'Principles of Biology').

আমি পুনঃ পুনঃ সজোরে এই কথা বলিয়াছি, আমরা যাহাকে জড় ও শক্তি বলি, তাহারা উভয়েই এক অজ্ঞেয় তত্ত্বের প্রতীক মাত্র। প্রতীক আর তত্ত্ব কিছুতেই এক হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের বাহিরে যাহা জড় ও শক্তিরূপে প্রকাশিত, তাহাই আমাদের জ্ঞানের বা চৈতন্যের ভিতরে ভাব ও চিন্তারূপে প্রকাশিত। সমগ্র বিশ্বে এক অন্তর্নিহিত মহাশক্তি আছে, জীবদেহের ভিতরে বা বাহিরে ক্রিয়ান্বিত যাবতীয় শক্তিই সেই মহাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রকাশ মাত্র। জীবদেহের বা প্রাণময় সত্তার ক্রমবিকাশের সমগ্র ব্যাপারই, ভিতরে ও বাহিরে ক্রিয়ারত; এই সব ভিন্ন শক্তির মিলন হইতেই ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই সার সিদ্ধান্তগুলি বুঝিয়া আমরা যদি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ-সমূহের আলোচনা করি, তাহা হইলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইব। একালের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ দর্শন, যে-সব কথা অনুমান করিয়া বলিতেছেন, প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ সেই সব কথাই সজোরে ও নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, এমনভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই মনে হয়, তাঁহারা যেন প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া এবং আত্মস্থ

সমুদয় ব্যাপার সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া মানবকে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় কোনরূপ দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, সংশয় নাই।

ব্রহ্ম প্রকৃতি ও সৃষ্টি-সম্বন্ধে উপনিষদে ও পুরাণে যে সমুদয় বর্ণনা আছে, শ্রদ্ধান্বিত-হৃদয়ে, ধৈর্য্যের সহিত আলোচনা করিলে আমরা এমন অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিব, যাহা বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণ এখনও ধরিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানের প্রতিও বিশেষ-ভাবে শ্রদ্ধান্বিত হইতে হইবে।

অতি প্রাচীনকালে মানবীয় সভ্যতার প্রথম উষায়, বেদের ঋষি প্রজ্ঞানেত্রে যাহা দেখিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিকের সাধনাও ক্রমে ক্রমে ঠিক্ সেই সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

একই পরম দেবতা, তিনি চৈতন্যময়, তিনি নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার সেই নৃত্যের কম্পনেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে।

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
> যো ওষধীষু যো বনস্পতীষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

৫। পাশ্চাত্য প্রেত-বিদ্যা

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য-জগতে প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও অনেকে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিতে পারি। এই সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে—মৃত্যুর পরেও মানুষ থাকে, তাহার জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি থাকে। জীবিতকালে পৃথিবীতে যাহাদের সহিত সম্বন্ধ থাকে, মৃত্যুর পরেই তাহাদের সহিত সে-সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় না। অনেক সময়ে তাহারা এই পৃথিবীর কথা চিন্তা করে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবাত্মা অমর। প্রেত-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই কথা সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং কখনও তাহা করিতেও পারিবে না। তবে, এই আলোচনার দ্বারা বর্ত্তমান যুগের জড়বাদী ও সংশয়বাদী

কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্য গুলি পিতৃকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি ক্রিয়া এই জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান কালের শিক্ষায় শিক্ষিত কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি, আর এগুলিকে নিস্প্রয়োজন বলিতে পারিবেন না।

ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা, যাহা সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে, বিবিধ পুরাণে ও তন্ত্রে প্রচারিত হইয়াছে, এখনও এমন অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন, যঁহারা সেই অধ্যাত্ম-বিদ্যায় পারদর্শী। সেই অধ্যাত্মবিদ্যার সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা বেশ সহজেই বুঝিতে পারেন, এই বিলাতী প্রেততত্ত্বের সীমা ও অধিকার কতদূর এবং ইহার মর্ম্মকথাই বা কি? সুতরাং, তাঁহারা এই তরঙ্গে বাহিত হইবেন না। বিলাতে যাহাই হউক না কেন, জিনিসটা বিলাতী বলিয়া আমাদের দেশে তাহা চালাইবার জন্য একদল দালালশ্রেণীর লোক আছে। বিলাতী প্রেততত্ত্বেরও দালাল আছে; তাহারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নহে। নিজেদের শাস্ত্র বুঝিবার জন্য ও জানিবার জন্য তাহারা কখনও কোনরূপ আন্তরিক চেষ্টা করে নাই, অনুষ্ঠান ও আচরণের দ্বারা নিজের ধর্ম্ম জীবনে সফল করিবার জন্য কখনও কিছু করে নাই, হয়ত দুই তিন পুরুষ সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই আমাদের দেশে বিলাতী প্রেততত্ত্ববিদ্যা চালাইবার জন্য বিবিধ উপায়ে দালালের কার্য্য করিতেছে। এই চেষ্টা সাধুও নহে, দেশের পক্ষে নিরাপদও নহে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও স্বাধীনভাবে দেশীয় উপকরণের সাহায্যে যদি এ বিষয়ে চেষ্টা হইত, তাহা হইলে খুব বেশী আপত্তি করিতাম না।

যাহা হউক, পাশ্চাত্য দেশের প্রেততত্ত্ববিদ্যা বা Spiritualism-এর বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতে আরও কতকগুলি উত্তম সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

১। ইহার সাহায্যে মানবের চিত্ত, জড়বাদীর চিন্তার গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়ে।

২। চিন্তাশীল মানুষ বুঝিতে পারে যে, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানসমূহ প্রকৃতির যে সকল শক্তি লইয়া আলোচনা করিতেছে, তৎসমুদয় ব্যতীত আরও সূক্ষ্মতর ও প্রবলতর শক্তি আছে।

৩। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান-সমূহ যে সমুদয় পদার্থ লইয়া আলোচনা করিতেছে, সেই সমুদয় পদার্থ ব্যতীত অন্য প্রকারেরও পদার্থ (substance) আছে। তাহাদের গুণ ও ধর্ম্ম (properties) বিজ্ঞানের পরিচিত পদার্থ-সমূহের গুণ ও ধর্ম্ম হইতে পৃথক।

৪। খুব সম্ভব, চিন্তা (thought) একটি শক্তি (force)। অন্যান্য শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যেমন সুনির্দ্দিষ্ট বিধান আছে, চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করারও সেইরূপ সুনির্দ্দিস্ট বিধান আছে।

৫। এমন বিশেষ প্রকারের অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানবের চৈতন্য Consciousness স্থূলদেহের মস্তিস্কের সাহায্য ব্যতীত কাজ করিতে পারে।

ইহা ছাড়া, প্রেততত্ত্বের আলোচনায় আর কিছু পাওয়া যায় না। এই জড়বাদের যুগে ইহাকে মন্দের ভাল বলিতে হইবে। আমরা বুঝিলাম—প্রকৃতিতে এমন অনেক শক্তি আছে, যাহার রহস্য আমরা জানিনা। আমাদের ভিতরে এমন শক্তি ও সামর্থ্য (faculties) আছে, যাহা এখনও বিকশিত ও ক্রিয়াম্বিত হয় নাই, তবে কাহারও কাহারও ভিতর যেন কিছু কিছু জাগিয়া উঠিতেছে। এই সব শক্তি ও সামর্থ্য-সম্বন্ধে ধীরভাবে ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আলোচনা করা দরকার। নিজেদের ভিতরে সেই শক্তি বা বৃত্তিগুলি জাগরিত ও ক্রিয়াম্বিত না হইলে, প্রকৃতির সূক্ষ্মশক্তিগুলি আমরা বুঝিতে পারিব না, এবং ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে, তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিব না। কাজেই সদাচার, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি প্রয়োজন। তপস্যার দ্বারা যাহারা সত্বশুদ্ধির চেষ্টা করে না, নিত্যকর্ম্ম ও সদাচারের দ্বারা যাহারা দম ও শম অভ্যাস করে না, মন্ত্রের দ্বারা ও ক্রিয়ার দ্বারা যাহাদের স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি দেহগুলি এবং মন ও প্রাণ নিয়মিতভাবে মার্জ্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় না, দেব-লোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোকের সহিত যাহারা পঞ্চযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সামঞ্জস্যে (In harmonious relation) প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহারা, অর্থাৎ স্বৈরাচারী ব্যক্তিগণ, উপযুক্ত গুরুর সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতির সূক্ষ্মশক্তিতে হস্তার্পণ করিলে তাহারা বিপন্ন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও অধঃপাতিত হইয়া থাকে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রের সাহায্যে ইহা উত্তমরূপেই জানিতে পারা যায়। অতএব সাবধান হওয়া আবশ্যক।

৬। যুগধর্ম্মের লক্ষণ

ধর্ম্মনীতি ও বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমারা যাহা বলিয়াছি, তাহা স্বীকার করিলে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই ভারতবর্ষে যুগধর্ম্মের অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত যে-ধর্ম্ম, তাহার

কি কি লক্ষণ থাকা আবশ্যক, এইবার তাহারই আলোচনা করিব। সেই আলোচনার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় কি, সে সম্বন্ধেও দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা দেশে একটি দেশব্যাপী অসন্তোষ, আন্দোলন ও নিপীড়ন অশ্রয় করিয়া যখন এই শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমাদের নিজেদের একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলার সঙ্কল্প ছিল। সে-সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ এখন একটি পূর্ত্তবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে হিন্দুছাত্রগণকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার একটি ব্যবস্থা আছে। আমি ইহার ভিতরের কথা কিছুই জানি না। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের ভিতর দুই একজন, এই কাজের যৎকিঞ্চিৎ ভার লইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা বুঝি, প্রচার করি,—বই লিখি, বক্তৃতা করি। এই পরিষদে কি ধর্ম্ম, কি প্রকারে শিখাইতে হইবে, তাহার কোন নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা নাই। কাজেই, কি প্রকারের ধর্ম্ম, কিভাবে শিখাইতে হইবে, সে-সম্বন্ধে প্রারম্ভেই আলোচনা প্রয়োজন। ইহা ছাত্রদেরও শোনা দরকার, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণেরও শোনা এবং আলোচনা করা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়-বিশেষের নহে; উহা সকলের। সকল প্রকারের বিপরীত ও বিরোধী মত লইয়া ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত যেখানে আলোচনা হইতে পারে, এখনকার দিনে তাহাকেই প্রকৃতই বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম-শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটী বিরোধী মত আছে, ইহা মানিয়া লইতে হইবে। একালে বলেন, ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষরূপে প্রয়োজন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, সকলের অগ্রে প্রয়োজন, ধর্ম্মহীন শিক্ষা শিক্ষাই নহে। আর এক দল বলেন—ধর্ম্মই জগতের ও মানবজাতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ধর্ম্মকে একেবারে তাড়াইয়া দাও আমি নিজে প্রথম প্রকারের মতই পোষণ করি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে ও তাহাদের গ্রন্থাদি বহুল পরিমাণে আলোচনা করিয়াছি।

দুই মতের একটা সমন্বয়ও আছে। ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, তবে উদার ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, সদযুক্তিগত ধর্ম্ম শিখাও। কিন্তু কোন ধর্ম্ম বা কোন ধর্ম্মমত যে উদার, যুক্তিযুক্ত

ও সার্ব্বজনীন্ সে সম্বন্ধে মতভেদ ও দলাদলির সীমা নাই। সুতরাং মীমাংসা কোথায় ?

যাঁহারা সরল প্রাণে বিশ্বাস করেন, ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেই হইবে, ধর্ম্মহীন শিক্ষা শিক্ষাই নহে, তাঁহাদের চেষ্টা করিয়া ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অধিকার আছে। যাঁহারা দ্বিতীয় প্রকারের মত পোষণ করেন, তাঁহাদের বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার কোনরূপ সঙ্গত কারণ নাই। তবে দ্বিতীয় মতের লোকেরা সজাগভাবে দেখিয়া যাইবেন, এই ধর্ম্ম শিক্ষা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য ও মূলনীতির প্রতিকূলতা না করে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, অতএব বুঝিতে হইবে, এই জাতি বা এই দেশ, বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকতা চাহে। অতএব ধর্ম্ম শিক্ষা এমন ভাবে হওয়া চাই, যেন ঐ শিক্ষার দ্বারা অনুশীলিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকতার প্রতিকূলতা না করে। এমন ধর্ম্ম হওয়া চাই, যাহা বিজ্ঞান-মার্জ্জিত বুদ্ধির অনুমোদিত।

বিভিন্ন প্রকারের মতবিশিষ্ট লোক সরলচিত্তে নিজ নিজ পথে কার্য্য করুন, অসহিষ্ণু হইবে না ; প্রত্যেকে শ্রদ্ধার সহিত অপরকে বুঝিতে চেষ্টা করুন, সময়ে সকল বিষয়েরই মীমাংসা হইবে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। আমারা কেহই যেন মনে না করি যে, একমাত্র আমি (বা আমার দলের লোকেরা) পূর্ণাঙ্গ সত্য পাইয়াছি। এরূপ মনে করিলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

আমরা এখন বিশাল ধ্বংশস্তূপের মধ্যে পড়িয়া নবগঠনের জন্য চেষ্টা করিতেছি। কিভাবে এই গঠন হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন। সে সম্বন্ধে আমাদের কাহারও একটী সুসম্পূর্ণ আদর্শ নাই। প্রত্যেক কর্ম্মীকে নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে, আর অন্যান্য কর্ম্মীগণের সহিত বন্ধুভাবে আলোচনা করিতে হইবে। নিজের আদর্শ ও অভিজ্ঞতা, অপর সকলের আদর্শ ও অভিজ্ঞতার সহিত পুনঃ পুনঃ মিল করিয়া দেখিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, পূর্ণাঙ্গ সত্য আমরা কেহই পাই নাই, পাইয়াছি বলিয়া অভিমান করা কেবল বিফল নহে, বিপজ্জনক। এই অভিমানই যাবতীয় সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের হেতু। পূর্ণাঙ্গ সত্য পাই নাই, আসুন সকলে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া সাধনা করি। প্রত্যেকে যদি এই প্রকারের বিনয়নম্র ভাব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ নিজ পথে অগ্রসর হই, তাহা

এইবার আলোচনা করা যাউক, ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে। ইহার একটি সহজ উত্তর আছে ; হিন্দুর জন্য হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানের জন্য মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টানের জন্য খৃষ্টানধর্ম্ম, শিক্ষা দেওয়া হউক। যদি জৈন, বৌদ্ধ, শিখ বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্র থাকে, আর সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা সঙ্গত ও সুন্দর। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিজের বা নিজেদের মত ব্যাখা করিবেন, সেই সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা তাহা শুনিবে, শিখিবে ও আচরণ করিবে।

কিন্তু এক সম্প্রদায়ের উপদেস্টা, জানিয়া বা না জানিয়া যদি অপর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের বা মতের নিন্দা করেন তাহা হইলেই বিপদ্। এই বিপদ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা এইরূপ। প্রত্যেক শিক্ষক নিজের মত এমনভাবে বলিবেন, নিজে বুঝিয়া এমনভাবে বুঝাইবেন, যেন তাহা অন্য সম্প্রাদায়ের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষপূর্ণ ভাব জাগাইয়া না তোলে, পরন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি উদ্রিক্ত করে। এইভাবে চলিলে ভারতবর্ষে এমন দিন আসিবে, যেদিন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গুলি থাকিবে কিন্তু, তাহাদের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর ঐ মৈত্রী উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবে। এই পর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহার পর কি হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সম্প্রাদায়ের লোক ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করুন না, তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের উচ্চতম চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে, অথচ নিজের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে, নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে। নিজের ধর্ম্মে ও নিজের শাস্ত্রে উত্তমরূপে শ্রদ্ধাবান হইয়াও, উদার হৃদয়ে তুলনা-মুলক পদ্ধতিতে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের আলোচনা করা একান্তভাবে আবশ্যক। আবার ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের, সাহিত্যের, নীতিবিজ্ঞানের, মনস্তত্ত্বের এবং সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনাও আবশ্যক।

অতএব হিন্দু, হিন্দুর ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, পূর্ব্বে যে প্রণালী বলা হইল সেই প্রণালী অনুসারে করিবেন। অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্প্রাদায়ের সহিত বিরোধ বাধাইবেন না। বিভিন্ন প্রকারের সাম্প্রদায়িক মতের ভিতর ঐক্যের একটি দিক আছে, সেই দিকটী

সর্ব্বদা উজ্জ্বল ও সুন্দর করিয়া দেখিবেন ও দেখাইবেন। একাল পর্যান্ত জ্ঞানরাজ্যে ভাব- ও কর্ম্মরাজ্যে, সমগ্র মানবজাতি উন্নত ও মঙ্গলকর যত কিছু সত্য ও সিদ্ধান্ত পাইয়াছে সেগুলিকে উপেক্ষা না করিয়া, সেগুলিকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন ও সেগুলির আলোকে ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবেন। আমি মনে করি, আমাদের শাস্ত্র চিরদিনই এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং সনাতন ধর্ম্ম যুগে যুগে প্রয়োজন, রুচি ও অধিকার অনুসারে, নব নব যুগধর্ম্ম রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এখনও মীমাংসা হয় নাই হিন্দু সমাজের উপর এবম্বিধ নানারূপ বিরোধী মত রহিয়াছে। হিন্দু সংগঠন-আন্দোলন হিন্দুত্বের একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। সেই অনুসারে ব্রাহ্ম, আর্য্য সমাজী, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, সকলেই হিন্দু। এই সংজ্ঞা সকলে গ্রহণ করিতে না পারেন, কিন্তু আমাদিগকে এ সম্বন্ধে ধীরভাবে ভাবিতে হইবে। হিন্দু নামে পরিচিত ব্যাক্তিগণের মধ্যে অনেক প্রকারের মতভেদ আছে। কেবল শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নহে, উহা পুরাতন ; কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিরোধ নহে, উহাও পুরাতন। বেদের নিত্যতা লইয়া মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের বিরোধও পুরাতন। এই সব পুরাতন বিরোধ ছাড়া আরও কঠিন রকমের ও নূতন রকমের বিরোধ আছে। এই সব বিরোধ বা মতভেদ উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বিরোধ আছে, তাহার মীমাংসাও আছে ; মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অবজ্ঞা করা বা উপেক্ষা করা, মীমাংসা করা নহে। ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার নান রূপ প্রণালী বর্ত্তমান সময়ে উদ্ভাবিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাসের দিক্ দিয়া প্রাণী-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দিক্ ধরিয়া ধর্ম্মমত আলোচিত হইতেছে। এগুলিও দরকার।

উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের বয়ঃক্রম ১৬।১৮ বৎসর হইলে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা গ্রহণ করাইতে পারা যাইবে না তাহারা ধর্ম্মমত শিখিবার জন্য আসে নাই। তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে ; ইচ্ছা করে আসিবে, ইচ্ছা না করে আসিবে না। যদি কেহই না আসে, ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না।

হিন্দুধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মানুমোদিত নীতি শিক্ষা দিতে হইবে ; এমন ভাবে উহা দিতে হইবে, যেন উহা বর্ত্তমান কালের উপযোগী হয়, বর্ত্তমান কালের শিক্ষার

(liberal) ও অসাম্প্রদায়িক হইবে যে, সনাতন ধর্ম্মের কোন শাখার তাহাতে কোনরূপ আপত্তি থাকিবে না, অন্য সম্প্রদায়ের যাহারা উদারহৃদয় লোক, তাঁহাদেরও আপত্তি থাকিবে না, অথচ এই শিক্ষা যথার্থরূপে (definitely and distinctively) সনাতন ধর্ম্মেরই শিক্ষা হইবে, অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্র ও সদাচার অনুমোদিত হইবে। নতুবা, সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইবে। It must be inclusive enough to unite the most divergent forms of Hindu thought, but exclusive enough to leave outside it, forms of thought which are non-Hindu.

যে সমুদয় নৈষ্ঠিক (orthodox) সম্প্রদায়, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ আছে, সে সব বিষয়ের কোন মতের সমর্থন করা চলিবে না ; তবে মতভেদ কোথায় তাহা জানিয়া রাখা ভাল, আর অধিকার-ভেদে উহা যে স্বাভাবিক এবং মারাত্মক নহে, তাহা বুঝিয়া রাখা ভাল।

যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা সকলে একতাবদ্ধ হউন। ধর্ম্ম কেবল মুখের কথায় বা বাহিরের আচরণে পর্য্যবসিত না হইয়া আমাদের চরিত্র গঠন করুক, আমরা যেন ধার্ম্মিক (pious), কর্ত্তব্যপরায়ণ, দৃঢ়চিত্ত, স্বাবলম্বনশীল, ঋজু, সৎ, নম্র ও সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টিসম্পন্ন হই। ধর্ম্ম কেবলমাত্র একটা পারলৌকিক ব্যাপার নহে ; ইহলোকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, গার্হস্থ্য জীবনে, সামাজিক জীবনে, এমন কি ব্যবসায় বাণিজ্যেও এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক। মানুষ মাত্রেই সংযত ও পবিত্র হইয়া নর নারায়ণের সেবা করুক, ইহাই ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনুসারে এই শিক্ষাদান কার্য্য চলিবে।*

---

* যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম। উপনিষৎ, গীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে যে শ্লোকগুলি বক্তৃতাকালে বলা হইয়াছিল, সেগুলি ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যক্ত হইল।

হিন্দু-মুসলমান

হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ, ভারতে এই তিনটি দল। এখন হিন্দু ও মুসলমানে সংঘর্ষ চলিতেছে; সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষানল সমগ্র ভারতবর্ষে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সংঘর্ষে হিন্দুরও লাভ নাই, মুসলমানেরও লাভ নাই; শেষ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে, ইংরাজেরও লাভ নাই। কিন্তু প্রত্যেক দলেরই কতকগুলি প্রবল ও কর্ম্মঠ লোক ভাবিতেছেন, লাভ আছে। আপাততঃ দেখা যাইতেছে, হিন্দুও নিপীড়িত, মুসলমানও নিপীড়িত, এবং উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত। অনেকে বলিতেছেন, এই শোচনীয় ও অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারে, ইংরাজ বা তৃতীয় দলই দায়ী; কিন্তু আমাদের সে কথা বলিবার অধিকার নাই। ইংরাজের ইহা বাহাদুরি যে, সে চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাদিগকে ও জগৎকে দেখাইয়া দিতে পারে, ভারতের ভিতরের অবস্থা কি, আর ইংরাজ তাহার কামান, বন্দুক ও কড়া আইন লইয়া পাহারা না দিলে, এই নাবালক ভারতবাসীরা নিজে নিজে কেমন করিয়া কাটাকাটি ও মারামারি করে।

অনেকে বলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল কারণ Communal Representation— ভারতের শাসন-সংস্কার আইনের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-বিধান। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতির উচ্ছেদ ব্যতীত, এই সংঘর্ষের অবসান হইবে না। সার্ শঙ্করণ নায়ার, কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেটের সভায় ১৬ই মার্চ্চ বলিয়াছেন—হিন্দু ও মুসলমানেরা এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের নিয়ম পরিত্যাগ করিতে যতদিন না সম্মত হইবে, ততদিন ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে না, ব্যবস্থাপক সভা-সমূহের অধিকার-বৃদ্ধি হইবে না, দায়িত্বসম্পন্ন শাসনাধিকার প্রসারের জন্যও কিছু করা হইবে না। সার্ শঙ্করণ নায়ার বিচক্ষণ লোক, কিন্তু তিনি যাহা বলেন, তাহাতে সেই পুরাতন ইংরাজী কথা—'গাড়ীর আগে ঘোড়া' মনে পড়িয়া যায়।

মুসলমান-সমাজে যাঁহারা এখন রাজনীতিক নেতা, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন নীতি পরিত্যাগ করার ব্যাপারে হিন্দুদের সহিত একটু দোকানদারি (Bargaining) করিতে চাহেন। তাঁহারা কতকগুলি সর্ত্ত দিয়াছেন, সেই সর্ত্তগুলি পূরণ হইলে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা তুলিয়া দিতে পারেন। যাহা হউক, এই ব্যবস্থা রক্ষা করিবার মালিক যখন আমরা নাই, তখন এ বিষয়ে আন্দোলন হউক, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কিছু হইবে না। মুসলমান নেতারা যখন সর্ত্ত চাহেন, তখন বুঝিতে হইবে, মনের ভিতর অবিশ্বাস রহিয়াছে।

তৃতীয় দলের উপরেই দোষ চাপাইলে হইবে না ; যদি একটা মীমাংসা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে নিজের দিকে চাহিয়া, নিজের ভিতরের কথাটাও বুঝিতে হইবে। দেশে, যাহা হউক একটা জমকাল-রকমের গোলমাল না হইলে, পেটই চলে না, এমন একটা দল আছে। এই দলের লোকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সহরে থাকিয়া সভা কর, চাঁদা তোল, কাগজ চালাও—এই তিনটি কাজ ছাড়া জীবিকার অন্য উপায় নাই, এ প্রকারের লোকের সংখ্যা কত ? ইহাদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষে তাহাদের উপকার হইতেছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। দেশবন্ধু দাস হিন্দু-মুসলমানে সন্ধি বা 'প্যাক্ট' করিয়াছিলেন, এবং তিনি দেশের নেতা হইয়াছিলেন। তিনি যে প্যাক্ট করিয়াই নেতা হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তিনি নেতা হইয়া প্যাক্ট করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর এই নেতৃত্বে যাঁহারা ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন, এবং এই নেতৃত্ব কাড়িয়া লওয়ার জন্য বা ধ্বংশ করার জন্য যাঁহারা ছিদ্র খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা এখনও বলিয়া বেড়াইতেছেন, এই সন্ধিই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের হেতু। এই কথা বলিয়া অনেকে নিজের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং একথা এখনও অনেকে বলিবে। কিন্তু, সে-কথা বলিয়া সমাজের বা দেশের কোন লাভ নাই। হিন্দু-মুসলমানে সন্ধিবন্ধন করিয়া যাঁহারা নেতা হইয়াছিলেন বা যাঁহারা নেতা হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই নেতৃত্ব এবং সেই নেতৃত্বজাত প্রতিপত্তি ও সুবিধা কাড়িয়া লওয়ার জন্য, এই হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষকে কতকগুলি লোক চেষ্টা করিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছিল কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

এই অসদ্ভাব ও দ্বন্দ্ব চলায়, উভয় সম্প্রদায়ের কতগুলি চতুর লোকের জীবিকার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার কি একটা তালিকা করা যায় না ? এ কথা কি সত্য নহে, যে ইংরাজশাসনে মুসলমান হিন্দুর দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছে ? ইংরাজ-শাসনে বা ইংরাজ আইনের সুবিধা লইয়া যাঁহারা মুসলমানদের উপর অবিচার বা অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন না কেন, যে আজ মুসলমান যাহা করিতেছে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। কেবল ভাবিলেই হইবে না ; পূর্ব্বে যাহা করা গিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করা দরকার।

ভারতে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠিত হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, হিন্দুমুসলমান মিলিত হইবে, তাহারা বুঝিবে—আমরা প্রথমতঃ ভারতবাসী মানুষ, তাহার পর হিন্দু বা মুসলমান। এই একটা সুখস্বপ্ন আমরা অনেকেই অনেকদিন হইতে দেখিতেছি। কিন্তু, এই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কোনরূপ বিধিবদ্ধ সাধনা কি হইয়াছে ?

হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সমাজকেই যাঁহারা [illegible]

চরিত্রে সংগ্রাম করিবার ও আক্রমণ করিবার একটা প্রবৃত্তি কি নাই ? ম্লেচ্ছ ও কাফের বলিলে হিন্দু ও মুসলমানের মনে যে-ভাব ও ধারণা জাগে, সেই ভাব ও ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দরকার। সে-জন্ম দেশে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। চেষ্টা করিব বলিয়া অনেকে চাঁদা তুলিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নাই। Cultural unityঅর্থাৎ হিন্দুমুসলমানের সাধনা বা অনুশী॰নগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিব, প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিব বলিয়া কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা চাঁদা তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই এখন মুসলমানকে বিধ্বস্ত করিব বলিয়া চাঁদা তুলিতেছেন। একথা যে অতিশয় সত্য ! কিন্তু, সে-কথা বলেই বা কে, আর বলিলে শোনেই বা কে ? জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি সর্ব্বত্রই কম, আমাদের দেশে একেবারেই নাই !

যাহা হউক, এই সংঘর্ষ সাময়িক। ইহা স্থায়ী হইবে না, স্থায়ী হইতে পারে না। হিন্দুদের দিক্ হইতেও আশা আছে, মুসলমানদের দিক্ হইতেও আশা আছে। উদারতা, বিশ্বজনীনতা ও আধুনিকতা, খুব ক্ষিপ্রবেগে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিতেছে। তাহার ফল ভারতে ফলিবে। যাঁহারা ভাবিতেছেন, মুসলমান কখনই শান্ত ও মিত্রভাবাপন্ন হইবে না, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন ; নৈরাশ্যের কারণ নাই। উদারতার কয়েকটি প্রমাণ—

ক—বাহাই আন্দোলন

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতি ও ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘবদ্ধ জাতির ভিতর (Inter-religious, Inter-racial, Inter-national) মৈত্রী ও শান্তির ভিত্তিস্বরূপে এক বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা বাহাই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ইংরাজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য দেশে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। একজন গুরু, তাঁহার নাম বাব্। তিনি ঘোষণা করিলেন, খুব বড় একজন উপদেষ্টা আসিতেছেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং তাহার ফলে, মানবে মানবে মৈত্রী ও বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাব্ ও তাঁহার অসঙ্খ্য শিষ্য, অনেক অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ তাঁহাদের এই ঘোষণা নীরবে সহ্য করে নাই। অত্যাচারিত হইয়া বাবের মৃত্যু হয় বাব্ যে শিক্ষকের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, বাহাউল্লা সেই শিক্ষক। 'বাব্'এর মৃত্যুর পর, বাহাউল্লা প্রচার আরম্ভ করিলেন। ৪০ বৎসর কাল তিনি প্রচার করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে কারাগারে বন্দি-অবস্থায় বহুদিন যাপন করিতে হইয়াছে। মুসলমান জগতে তিনি প্রচার করিতেন। এক রাজা তাহার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিলে, তিনি অপর রাজ্যে যাইতেন ও প্রচার আরম্ভ করিতেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে, মানুষ স্বাধীন ও উদার

কাজেই, তিনি কোন রাজ্যেই তিষ্ঠিতে পারেন নাই। সর্ব্বশেষে, তুরস্কের দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের উপনিবেশ (penal colony) সিরিয়ার অন্তর্গত আক্কা নামক স্থানে তাঁহাকে যাবজ্জীবন বন্দি করিয়া রাখা হয়। তিনি সেখানেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিজের মত প্রচার করিতেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাহাউল্লার পুত্রের নাম আব্দুল বাহা। বাহাউল্লা জীবিতকালে নির্দ্ধারণ করিয়া যান—তাঁহার পুত্র আব্দুল বাহা এই উদার ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। আব্দুল বাহা, তাঁহার পিতা জীবিত থাকিবার সময় হইতেই প্রচার আরম্ভ করেন। ইনিও তুরস্কের সুলতানের আদেশে ৪০ বৎসর কাল আক্কার দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। তুরস্কের পুরাতন যথেচ্ছাচার তন্ত্রের পতন হইল, প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, আব্দুল বাহা উদ্ধার লাভ করিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে তিনি কারামুক্ত হন। ১৯১১-১২-১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। বহুলোক তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীতে যত প্রকারের ধর্ম্মমত ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে যে সমুদয় সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার ভিত্তির উপর বাহাউল্লা এমন একটী কার্য্যকরী ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহাতে বর্ত্তমান যুগের মানুষের অধ্যাত্মিক আকাঙ্খা পরিপূরিত হয়। পুরাতন কোন মত ধ্বংশ করা বাহাউল্লার অভিপ্রেত নহে। ইংরাজী ১৯২১ সালে ২৯শে নভেম্বর তারিখে, আব্দুল বাহার মৃত্যু হয়। ইঁহার অপর নাম ছিল আব্বাস এফেন্‌ছি। এই মত এখনও সজোরে প্রচারিত হইতেছে। মুসলমান-জগতে একটি নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় না পাইলেও, অনেকেই বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, তুরস্কের রাজনীতিক পরিবর্ত্তন, এই নবভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাহাউল্লার ধর্ম্ম প্রচারের সহিত এই নবভাবের সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে, বাহাই আন্দোলনের ন্যায় উদার ধর্ম্মমত বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

খ—তুরস্কে গণতন্ত্র

বা প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর, সমগ্র মোস্‌লেম জগতে এক যুগান্তর আরম্ভ হইয়াছে। ঐ যুগান্তরের তরঙ্গ অচিরে ভারতবর্ষেও উপস্থিত হইবে। গত নভেম্বর মাসে কাগজে খবর বাহির হইল, এখন হইতে তুরস্ক দেশে আরবীয় বর্ণমালা চলিবে না, লাতিন অক্ষরে অর্থাৎ ইংরাজী অক্ষর তুরস্কের সার্ব্বজনীন বর্ণমালা হইবে। তাহার পূর্ব্বেই, সার্ব্বজনীনরূপে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ গৃহীত

ঠিক্ এই প্রকারে রুশিয়া দেশে আধুনিকতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আরবীয় বর্ণমালা লুপ্ত হইলেই যে মুসলমান ধর্ম্ম লুপ্ত হইবে, তাহা নহে। খৃষ্টান ধর্ম্মও পূর্ব্বদেশের ধর্ম্ম এবং হিব্রুজাতির ভিতরেই ইহার জন্ম। এখন এই খৃষ্টান ধর্ম্ম যাহাদের ধর্ম্ম, তাহারা সকলেই লাতিন বর্ণমালা ব্যবহার করে। মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কারমূলক প্রতিবাদ মাত্র Protestant reform of Christianity. সুতরাং, অচিরে ভবিষ্যতে অন্যান্য উদার ও সংস্কারমূলক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তুরস্ক সমগ্র ইউরোপের সহিত সাধনা ও সংস্কারগত ঐক্য Cultural unity লাভ করিবে।

নব্য তুরস্কের বর্ত্তমান অবস্থা কি, সে-সম্বন্ধে আমাদের দেশে খুব ভালরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। The moslem world নামক কাগজে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার দুএকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

There have been severe criticisms of the external rites and ceremonies of Islam and requests have been made for essential modifications.

মুসলমান ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান সম্বন্ধে খুব তীব্র সমালোচনা চলিতেছে, এবং ধর্ম্মের যাহা প্রাণ, তাহা অবলম্বন করিয়া সংস্কার সাধনের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

If science and religious belief contradict each other, thoughtful people will abandon faith and accept science.

বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মমতের বিরোধ হইলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানকেই গ্রহণ করিবে।

একটি প্রস্তাব

বাঙ্গালা ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসের 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় আমরা একটী প্রস্তাব করিয়াছিলাম। ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি বা Theosophical society এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। সেই প্রস্তাবটী নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল—

"ব্রহ্মবিদ্যাসমিতির গত বার্ষিক মহাধিবেশনে একটী অতিশয় প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতে পারি নাই। তাহার কারণ আমাদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্ম, মুসলমান সাহিত্য ও মুসলমান সভ্যতা সম্বন্ধে ভালরূপ আলোচনা করিবার ব্যবস্থা

পরিণত হয়, সে জন্য আমরা প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। পূর্ব্বে অনেক সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অপ্রীতি দেখা যাইত।

কিন্তু এখন হাওয়া বদলাইতেছে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যাহাতে প্রীতি স্থাপিত হয়, সেজন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু "তোমরা মিলিত হও" বলিলেই মিলন হয় না। প্রেম এত সুলভ নহে। ইংরাজকে গালাগালি করিবার জন্য, বা ইংরাজের অনিষ্ট করিবার জন্য, কিছুদিনের মত একটা সাময়িক বাহ্য মিলন হইতে পারে, কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। কর্ম্মের বিধান এই যে, কোনরূপ নিম্ন স্বার্থের অনুরোধে আজ যাহারা মিলিত হইবে, কিছুদিন পরেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার তাহারা দ্বন্দ্ব করিবে। সুতরাং, লোক দেখাইবার বা কোনরূপ সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কৃত্রিম মিলন, তাহাতে কোন ফল নাই। প্রকৃতভাবে যদি হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত হইতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতি আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের যে আদর্শ জগতে প্রচার করিতেছেন, সেই আদর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক, হিন্দুকে শ্রদ্ধার সহিত তুলনামূলক পদ্ধতির অনুবর্ত্তনে মুসলমানের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার আলোচনা করিতে হইবে, আবার মুসলমানকেও হিন্দু-সম্বন্ধে সেইরূপ অনুশীলন করিতে হইবে। প্রত্যেকে অপরের যাহা ভাল, তাহা হৃদয় দিয়া অনুভব করিবে—তাহা হইলেই মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা যাহা করিতে চাই, তাহা বলিতেছি—সকলে আমাদের সাহায্য করুন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট মহম্মদীয় গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। কয়েকখানি পত্রিকাও চলিতেছে। আমরা এই সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির গৃহে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-কার্য্যালয়ে রক্ষা করিতে চাই—যাঁহারা এই সমুদয় গ্রন্থের ও পত্রিকার আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা অনায়াসেই উহা পাইবেন। 'ব্রহ্মবিদ্যা'-পত্রিকাতেও আমরা মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক। মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁহারা আমাদের সাহায্য করুন।"

ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি বা Theosophical society ভারতবর্ষের অনেক উপকার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়া যদি তাঁহারা কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত।

সমন্বয় মন্দির

বাঙ্গালা ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' হিন্দু-মহাসভা ও হিন্দু-সংগঠন লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছিল। অল্পদিন পরে ঐ আলোচনা কমিয়া গেল। কেন কমিয়া গেল?

বুঝিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মহাসভা, বা তাহার বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক শাখা, 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' স্থান ভাড়া করিয়া কি আন্দোলন চালাইতেছিলেন? তাঁহাদের অর্থের অসচ্ছলতা হওয়ায় কি ঐ আন্দোলন খবরের কাগজের পৃষ্ঠা হইতে কমিয়া গেল, যাঁহারা হিন্দু মহাসভার সভ্য, ইহা জানিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। কোন সংবাদপত্রের স্তম্ভে এই প্রকারের আন্দোলন চালাইতে হইলে, কাগজের যে জায়গায় ঐ আন্দোলনের কথা থাকে, তাহার উপরে 'Rented column' লিখিয়া দিলে খুব ভাল হয়। অন্ততঃপক্ষে ইহাই সততার পথ। হিন্দু সংগঠনের আন্দোলন এই ভাবেই করা উচিত।

যে-সময়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' এই আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে আমরা একটি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটী এই যে, হিন্দু-সংগঠন আন্দোলনকে সত্যোপেত ও নিরাপদ করিতে হইলে, অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক বড় সহরে একটী করিয়া সমন্বয়-মন্দির (Hall of all Religions) স্থাপন করা উচিত। হিন্দু সংগঠন আন্দোলনের উপর মুসলমানগণের ভিতর অনেক ভাল লোকেরও শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস নাই। ইহা সুখের কথা নহে। সমন্বয়-মন্দিরে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, আর্য্য সমাজী, ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের লোককেই গ্রহণ করিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের উদার গ্রন্থগুলি সংগৃহীত হইবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচার্য্য, সেই মন্দিরে নিজের ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু কেহ অপর কোন সম্প্রদায়কে ইঙ্গিতেও আক্রমণ করিতে পারিবেন না। যে যে সহরে প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, সেই সেই সহরে এই প্রকারের মন্দির স্থাপনা বিশেষ কঠিন নহে।

এই প্রস্তাবটী কাগজে বাহির হইয়াছিল। অনেকে অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সমন্বয়-মন্দিরের প্রস্তাব, কার্য্যে পরিণত করিবার একটী সুন্দর উপায় আছে। মুর্শিদাবাদ, বহরমপুরের একজন জমিদার স্বর্গীয় নফরদাস রায়, এই উদ্দেশ্যের জন্য মৃত্যুকালে উইল করিয়া কিছু দিয়া গিয়াছেন। সমন্বয়-মন্দির সম্বন্ধীয় প্রস্তাব শুনিয়া তিনি এই দান করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, আমরা এই প্রস্তাব জনসাধারণের নিকট ভাল করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। দেশে কর্ম্মী থাকিলে, অন্ততঃপক্ষে একটী সমন্বয়-মন্দির অনায়াসেই নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

সমন্বয়-মন্দিরের কার্য্য-প্রণালী

ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রণালীতে কি ভাবে কার্য্য করিলে সমন্বয় মন্দির চালাইতে পারা যায়, সে জন্য চিন্তা ও সাধনা আবশ্যক। হিন্দু-সংগঠনের কার্য্য লইয়া

করিবার উপযুক্ত পাত্র কিনা। যিনি যে কাজের উপযুক্ত নহেন, তিনি সে কাজে হাত দিলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। কিন্তু কে কাহার পরীক্ষা করিবে? বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে প্রত্যেকেই মনে করে—আমি সকল রকমের কাজই করিতে পারি।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যাহারা নিষ্ঠাবান বা গোঁড়া, তাহাদের চরিত্রে একটা সংগ্রাম করিবার ও আক্রমণ করিবার ভাব আছে। এই ভাবটী, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই প্রথম কথা। অন্ন, জল, অস্পৃশ্যতা—এই সকল বিষয়ে যাহারা গোঁড়া, তাহাদের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্বন্ধে যে ধারণা আছে এবং ম্লেচ্ছ ও কাফের বলিলে হিন্দু ও মুসলমানের মনে যে ভাব ও ধারণা জাগে, সেই ভাব ও ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক।

হিন্দুধর্ম্মের যাহা পারমার্থিক ও সনাতন শিক্ষা, তাহার সাহায্যে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আনুষ্ঠানিক বিধি-ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিলে হিন্দুত্বের কোনরূপ ঐকান্তিক হানি হয় না। আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির উপদেশ, বিশ্বধর্ম্ম, সদ্ধর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্ম প্রভৃতি আদর্শ সমূহ, মধ্যযুগের কবির-পন্থা, দাদুপন্থা প্রভৃতি সমন্বয়-মূলক পন্থাসমূহ, হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে নূতন কথা নহে। আরও প্রাচীনতর কালে সর্ব্বাগমপ্রামাণ্যবাদ এবং বিশ্বজনীন পরধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন যুগের বিবিধ প্রকারের চেষ্টা, তাহার পর সন্ন্যাস ও মুক্তিবাদ, এইগুলিকে একত্র মিলাইতে পারিলে, হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের এক অভিনব পুনরুত্থান নিশ্চয়ই সম্ভবপর। আজ হিন্দু ম্লেচ্ছকে ঘৃণা করে, পঞ্চম জাতিকে ঘৃণা করে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে প্রীতি নাই। হিন্দুসমাজের এই দুর্দ্দশা, পূর্ব্ব-কথিত পুনরুত্থানের দ্বারাই অনায়াসেই দূরীভূত হইতে পারে।

মুসলমান-ধর্ম্মের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়—ধর্ম্মরাজ্যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, সামাজিক ব্যবস্থায় চিরদিনই এমন সব শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, যাহাতে মুসলমান ধর্ম্ম এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং শাস্ত্রের ব্যবস্থা সমূহকে, নূতন নূতন দেশের ও ঐতিহাসিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপযোগী করিয়া লইতেছে। সিরিয়া দেশে মুসলমান আইনের এই প্রসারণ আরম্ভ হয়। সিরিয়াদেশের চুক্তির আইন ও ভূমিরাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থা কিছু নূতন রকমের। কাজেই, সে দেশের উপযোগী করিবার জন্য মুসলমান-আইন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কাজেই, আইন ব্যাখ্যার একটা শাস্ত্র, যাহাকে মীমাংসাশাস্ত্র বলে, তাহাও গড়িয়া উঠিল। রোমক জাতির আইন-বিজ্ঞানের (Jurisprudence) কতকগুলি বিধি যেমন পূর্ব্বস্বীকৃতি (Presumption), আত্মগত মত (Subjective opinion), লোকসংগ্রহ (Public utility) প্রভৃতি বিধান, আইনের ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হইতে লাগিল। এই সকল শক্তি, ধীরে ধীরে ক্রিয়া করিয়া দীর্ঘকালে অনেক নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল। এমন হইল যে, ব্যবহারিক জগতে জনসাধারণের মত বা লোকাচার—শাস্ত্র অপেক্ষা

কম শক্তিমান নহে। মিসর ও তুরস্ক মুসলমানের দেশ। সেখানে আইন, মুসলমান আইন। কিন্তু সেই আইন এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে উহা সামাজিক ক্রমোন্নতি ও ব্যক্তি মাত্রেরই রাজনীতিক স্বাধীনতার (Civic freedom) যে বর্ত্তমান আদর্শ তাহার অনুকূল। বর্ত্তমান সময়ে জাতীয়তা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মুসলমান-সংঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুযায়ী মহম্মদীয় ব্যবহার শাস্ত্র প্রসারিত হইতেছে। এই দুই প্রণালীর মধ্যে তুরস্কে প্রথমটী, আর মিসরে দ্বিতীয়টী প্রবল। বাহাই মতাবলম্বী মুসলমানগণ, সাধনায় ও সামাজাকি ব্যবস্থায়, বিশ্বজনীন আদর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্র ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান প্রয়োজনের উপযোগী হইবে, রাজা রামমোহন রায় তাহা বুঝিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় দেখাইয়াছিলেন—এক বিশ্বজনীন ইসলাম-ধর্ম্ম আছে। এই বিশ্বজনীন মুসলমান-ধর্ম্ম কোন জাতীয় ধর্ম্মের বিরোধী নহে। রাজা রামমোহন রায় ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ইহা অবধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহাই-মতের অবধারণ, ঐতিহাসিক নহে। মুসলমান-ধর্ম্ম অমুসলমান বিজেতার অধীনেও থাকিতে প্রস্তুত, যদি শুক্রবারের নমাজে বাধা না হয় এবং কোনরূপ অত্যাচার না হয়। তাহা হইলে দেখাইতেছে যে, 'জেহাদ' এর অর্থই বদলাইয়া গিয়াছে। মুসলমান যে সকল সময়েই অমুসলমানকে আক্রমণ করিবে, তাহা নহে। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে ও নিজের ধর্ম্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিলে, অমুসলমানের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে মুসলমানের আপত্তি নাই। রাজনীতিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য লাভের সামর্থ্য, মুসলমান সমাজের আছে। পাঠান ও মোগল যুগে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাধনা ও সাহিত্যগত অনেক আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে-সমুদয় ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে অনেক বিষয়েই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছিল। শিল্প ও সাহিত্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজ্যশাসন ও আইনকানুনেও হিন্দু-মুসলমানে সমন্বয় হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় মুসলমান একটী নূতন ও পরিবর্ত্তিত সামগ্রী। আবার, হিন্দুদের অনেক ভক্ত-সম্প্রদায়, প্রাচীন ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই প্রকারে মিশিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ এই মিশ্রণ ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হইল এবং প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। এখন যদি আবার মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে এই উভয় ধর্ম্মের যেটী বিশ্বজনীন মূর্ত্তি, তাহাই সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবে। মানুষকে মানুষ বলিয়াই ভালবাসিতে হইবে। এই ভাবে মানুষ ভালবাসিতে না পারিলে, ঈশ্বরকে ভালবাসা যায় না। মুসলমান-ধর্ম্ম এখন প্রতিশোধ-গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছে। অমুসলমানের দেশে লোককে মুসলমান করিবার আকাঙ্খা যাহাতে একটা সীমার ভিতর বদ্ধ থাকে, মুসলমানগণকে তাহা করিতে হইবে। মুসলমানেরা প্রথম যুগে আরবের পৌত্তলিক ও মুসলমানধর্ম্মত্যাগী লোকের প্রতি

যে ব্যবহার করিয়াছে, বর্ত্তমান ভারতে তাহা করা চলিবে না। কোরাণে এমন অনেক বচন আছে, যাহা উপদেশ দেয় যে—অন্য মতাবলম্বী লোকের প্রতি অসহিষ্ণু হইও না। ইহুদি, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাও একই ঈশ্বরের শাসনাধীন ; কাজেই জোর করিয়া কাহারও ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করা উচিত নহে। অন্য মতে ও অন্য ধর্ম্মের সারতত্ত্ব যাহা আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া অপরের সহিত মিলিত হওয়া উচিত।

মন্তব্য ও সংবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ—"যে দিন বাঙ্গালার কোলে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেদিন—ফাল্গুনী পূর্ণিমার চন্দ্র রাহুগ্রস্থ। গঙ্গাগর্ভ, গঙ্গাতীর, আম্রকুঞ্জ, সারা নবদ্বীপ 'হরি হরি' শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে ! রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের ম্লান হাসি বক্ষে লইয়া জাহ্নবী-তরঙ্গ ব্যাকুল হইয়াই যেন ছুটিয়া চলিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের ভাগ্যদেব তখন বিরূপ—বাঙ্গালার সৌভাগ্যচন্দ্রমাও তখন রাহুগ্রস্থ। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনও তখন বড় বিপন্ন। সেই মহাসমস্যার দিনে, বাঙ্গালার কোলে নবীন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সে হাসিতে ক্রমে সারা দেশ হাসিয়া উঠিয়াছিল—গৌরপ্রেমে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। আজিকার জাতীয় জীবনের মহাসমস্যার দিনে—দুর্গতিগ্রস্থ আমরা বুঝিতেছি—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি, সে প্রেম-ধর্ম্ম যদি আমরা পালন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ দুর্গতি আমাদের হইত না।

মহাপ্রভু বিশ্বকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তাই আচণ্ডালকে কোল দিয়া, প্রেম দিয়া এক অভিনব প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সে প্রেমের নিকট নবাবের শক্তি মাথা নত করিয়াছিল—অধর্ম্ম পক্ষ পরাজিত হইয়াছিল—মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল। সে প্রেম আনিয়াছিল—ভারতব্যাপী শান্তি এবং মিলন।

এমন করিয়া নিজেকে বিলাইয়া ধরণীর ধূলায় লুটাইয়া দিয়া বিশ্বকে ভাল না বাসিলে, শান্তি স্থাপন করা যায় না। মহাপ্রভুর প্রেম, বঙ্গজননীর তথা ভারতমাতার গৌরব—ভারতবাসীর গৌরব। কিন্তু আমরা সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি নাই। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, আমরা আজ হাসিয়া হাসিয়া অধর্ম্মকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছি, প্রেমের অর্থকে বিকৃত করিয়া আজ আমরা যে অশান্তি ভোগ করিতেছি, তাহা অপরিমেয়।

জগতের বুকে শান্তি স্থাপনা করিতে পারে, এমন কোন শক্তি যদি থাকে, তাহা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম। এই প্রেমধর্ম্মই জগৎব্যাপী শান্তি ও মিলনের একমাত্র উপায়। যে প্রেমের নিকট বিশ্বের সমস্ত শক্তিই অবনত, মূর্খ আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিলাম না।

আজ অন্তর্বিপ্লবে আমরা শক্তিহীন—কেন? কিসের অন্তর্বিপ্লব? আমরা ভালবাসিতে জানিনা ব'লয়াই আজ এই আগুণ জ্ব'লয়া উঠিয়াছে। আমরা যদি আপনার মত সকলকে ভাল বাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভারতের দুর্গতির অন্ধকার কোনদিন কাটিয়া যাইত।

আজ আবার সেই গ্রহণ—ভারতের ভাগ্যাকাশ তিমিরাচ্ছন্ন। প্রেম-প্রবাহ আজ রুদ্ধ। দলাদলির ঘুর্ণিপাকে—পাশ্চাত্য সভ্যতার বাত্যায় আজ ভারতবাসী জীবন-মরণ সমস্যায় উপনীত।

গ্রহণ কর ভারতবাসি, তোমরা আজ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ কর। আর এমন করিয়া হিংসাদ্বেষের বন্যায় দেবভূমিকে প্লাবিত করিওনা। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমের বাণী আজ নূতন করিয়া মহাত্মার কণ্ঠে বাজিয়া উঠিয়াছে—এ সঙ্গীতকে প্রত্যাখ্যান করিওনা। ভাই ভাই গলাগলি করিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া, প্রেমের আবেগে ভগবানকে ডাক—ভারতের এই নিবিড় আঁধার কাটিয়া যাইবে, শান্তি ও মিলনের পবিত্র ধারায়—ভারতের বক্ষ স্নিগ্ধ হইবে। আত্মায় আত্মায় যুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে ভাল বাসিলে তোমরা স্বরাট্ হইবে—স্বরাজ তোমাদের করতল গত হইবে। হে ভারত, ভুলিওনা, তোমরা অমৃতের পুত্র—তোমরা মৃত্যুজয়ী বীর—এমন করিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিও না। তোমরা উঠ—জাগ। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম পালন করিয়া কৃতার্থ হও।"

বাঙ্গালার নব্য-অবতারবাদ—শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এ-সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম এবং সাদরে উদ্ধৃত করিলাম। আনন্দ ও বিস্ময়ের হেতু, পরে বলা হইবে। আমাদের এখন কিছুই বলিবার নাই—মহাপুরুষের নিকট অপরাধী হইবার ইচ্ছা নাই দেশে কত প্রকারের বিভিন্নমুখী চিন্তা ও চেষ্টা চলিতেছে, তাহা জানা দরকার, প্রত্যেকের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করাও দরকার।

"বাঙ্গলার চারিদিকে আজ অবতারের ছড়াছড়ি। এক একজনের শিষ্য ও শিষ্যা সংখ্যাও কম নহে; বোধ হয় হিসাব করিলে বাঙ্গলার ১৫ আনা লোকই এইসব "স্বয়ং ভগবান প্রভুদের" শিষ্য বা প্রশিষ্যের দলে পড়ে। বাঙ্গলার জনসাধারণের মনের উপর তো ইহারা অবাধ রাজত্ব করিতেছেই, তাহা ছাড়া অধিকাংশ তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাও এইসব গুরু ও অবতারের অন্ধ ভক্ত। আমরা বাহিরে র‍্যাসানেলিজম্ বা র‍্যাসানেলিজমের যত বড়াই করি না কেন, আসলে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে অশিক্ষিত অজ্ঞ জনসাধারণ এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। ইহারা এমনভাবে এই সব অবতার বা গুরুর নিকট মাথা বিক্রয় করে, তাহাদের ইঙ্গিতে অবিচারিত চিত্তে এমন সব অকার্য্য কুকার্য্য করে, দুর্নীতির পঙ্কে ডুবিয়া থাকে যে, সে সব কথা চিন্তা করিলে [illegible] জাতির উদ্ধারের যে কোন আশা আছে, তাহা কল্পনা করাই যায় না।

আমরা আধুনিক বাঙ্গলার বহু অবতার ও গুরুর আচরণ, কার্য্যকলাপ, তাহাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শিষ্যদের মনোবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, জাতির এই দুর্গতির প্রধান কারণ, তাহাদের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও মজ্জাগত দাস-মনোভাব। এ বিষয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিতে কোন প্রভেদ নাই। গঞ্জিকাসেবী বটতলার সাধুর ভক্ত গ্রাম্য চাষাভূষা, কর্ত্তাভজা ও সহজিয়া আখড়ার নেড়ানেড়ী বা বৈষ্ণবের দল, অথবা কাশীর 'বিভূতি মঠে'র স্বামী ধূর্ত্তানন্দ, কিম্বা আসাম পাহাড়ের ছত্রপুর আশ্রমের মৌনীবাবার চেলা—বি, এ, এম, এ উপাধিধারী, মুন্সেফ, ডেপুটী, প্রফেসার প্রভৃতি 'শিক্ষিত' লোকদের অবস্থা একই প্রকার; ইহারা নিজেরা কিছু চিন্তা করিতে শিখে নাই, করিবার ক্ষমতাও নাই,—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দাসত্বের বীজ ইহাদের মস্তিষ্ককে আক্রমণ করিয়া চিন্তা ও চরিত্রে যে 'পরবশতা' আনিয়া ফেলিয়াছে, গুরুবাদ ও অবতারবাদের বিকৃতি তাহারই ফল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" করিতে আমরা শিখিয়াছি,—দুনিয়াকে স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কোন কিছু 'বিভূতি' দেখিলেই, আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি, কোন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলেই আমাদের নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলি। তাই এত সহজে বাঙ্গালার সহরে ও গ্রামে অলিতে, গলিতে, ঘাটে-মাঠে গুরু, সন্ন্যাসী ও অবতারের এত প্রাদুর্ভাব,—মঠ, মন্দির, আশ্রমের এত ছড়াছড়ি! যত রাজ্যের ধাপ্পাবাজ, জুয়া-চোর, শঠ, প্রবঞ্চক, ভবঘুরে, পরমানন্দে বাঙ্গালীর মনের উপরে রাজত্ব করিতেছে।

অন্য কারণটি আরও গুরুতর; অপ্রিয় হইলেও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, স্বজাতির চোখ ফুটাইবার জন্য, আমরা তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। বাঙ্গালা দেশে কর্ত্তাভজা ও সহজিয়া ভাব সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। অন্তঃস্রোতের ন্যায় ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও দুর্নীতিতে সমাজকে, জাতির চরিত্রকে ইহা কলুষিত ও ধ্বংস করিতেছে। এই সহজিয়া ও কর্ত্তাভজা-ভাব অতি প্রাচীন জিনিষ, অষ্টম শতাব্দীরও পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে ইহার বেশ প্রভাব ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'দোঁহাপদের' মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের যুগে এই ভাব, গুহ্যসাধনের নামে সমাজে খুবই বিস্তৃত হইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনার একটা মুখ্য অঙ্গই—এই সহজিয়া সাধন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ 'রাগমার্গে'র মধ্য দিয়া সহজিয়া রসকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহার আক্রমণ হইতে ভালরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। তাই বাউল, কর্ত্তাভজা, কিশোরীভজন, সহজ-সাধন প্রভৃতি অপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে এবং 'নেড়ানেড়ী'র দলে মিলিয়া ধর্ম্মের নামে, কামের পূজাকেই বাঙ্গলাদেশে বিস্তার করিতেছে। বস্তুতঃ এই সহজিয়াবাদ একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত। যুগে যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিকধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে ইহার রূপান্তর হইলেও ইহার মূলভাব ঠিক আছে। [illegible]

উৎপত্তি এবং এইখানেই ইহার ব্যাপ্তি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইহার অনুরূপ অপধর্ম্ম আছে, ইহা আমরা জানি ; কিন্তু বাঙ্গলার সহজিয়াবাদের একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে।

অপ্রিয় হইলেও আমরা আজ নির্ভীকভাবে বলিব যে, মানুষের প্রকৃতি-নিহিত দুর্ব্বলতা, তাহার যৌনলিপ্সা এবং কামভাবের উপরেই এই অপধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মের নামে মানুষ জগতে অনেক কু-কার্য্যই করে, কিন্তু তাহা যখন নর-নারীর যৌন-লিপ্সা বা কামকে ছদ্মবেশে মোহনী মূর্ত্তিতে সাজাইয়া উপস্থিত করে, তখন দুর্ব্বল মানুষ কতক ইচ্ছায়, কতক বা অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে সহজেই প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হয় ; আর কূটবুদ্ধি প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন লম্পটের দল মানুষের এই দুর্ব্বলতায় সুযোগ লইয়া তাহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, সরলচিত্ত নরনারীর সর্ব্বনাশ সাধন করে! একদিকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিচারে বাঙ্গালী প্রভৃতির দৌর্ব্বল্য, অন্যদিকে তাহাদের মধ্যে কামুকতার ও যৌনলিপ্সার বৃদ্ধি,—বর্ত্তমান জাতীয় দুর্গতির মূল কারণ ইহাই।

বাঙ্গলাদেশে, কি সহরে কি গ্রামে সর্ব্বত্র এখন নানা আকারে—নানা ভাবে এই সহজিয়া সাধনার রাজত্ব চলিতেছে। প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে সহজিয়া নেড়ানেড়ী ও কিশোরীভজনের আড্ডা আছে এবং সেখানে কেবল নিরক্ষর অশিক্ষিত নরনারী নহে—অনেক শিক্ষিত লোকেরাও পরকীয়া রস চর্চ্চার জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে যোগ দেয়। তা ছাড়া বাঙ্গলা ও আসামের সর্ব্বত্র এক শ্রেণীর গুরু ও অবতার দেখা দিয়াছেন—যাঁহারা ভিতরে ভিতরে এই সহজিয়া ও পরকীয়া রসের সাধক। এই সব লীলানন্দ, কিশোরানন্দ বা রাগানন্দ নামধারীদের প্রত্যেকের এক একটি আশ্রম আছে, বহু শিক্ষিত নর-নারী ইঁহাদের শিষ্য। অনেক শিষ্য শিষ্যা গুরুর আশ্রমে বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সপরিবারে বাস করেন। 'স্বয়ং ভগবান অবতার প্রভুবর' যেভাবে যুবতী শিষ্যাদের 'সেবা' গ্রহণ করেন, অতি বড় শিক্ষিত পণ্ডিত শিষ্যেরাও যেরূপ নির্ব্বিকারভাবে গুরুর চরণে নিজের 'সর্ব্বস্ব' এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত সমর্পণ করেন, শিষ্য-শিষ্যাদের যেমন অবাধে পরকীয়া রসের চর্চ্চা চলে,—তাহা লোক-সমাজে অকথ্য, অশ্রাব্য,—তাহা মনে করিতেও লজ্জায় মাথা হেট হয়। এই সব স্বয়ং ভগবান নব্য অবতার ও তাঁহাদের আশ্রমের মধ্য দিয়া বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে যে ঘোর দুর্নীতি ও ব্যভিচার বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, সহস্র সহস্র গৃহের শত শত নারী-জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে, পারিবারিক সুখ শান্তি ধ্বংস হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

আমাদের জনৈক পরিচিত বন্ধুর ধর্ম্মভাব খুবই প্রবল। তিনি এই শ্রেণীর অনেক আশ্রমে সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজে ফিরিয়াছেন,—অনেক গুহ্য ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি

বিস্তৃত বিবরণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"ডিব্রুগড়ে অবতার"—আজকাল ভারতে অবতারের অভাব নাই,—বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও আসাম উভয় প্রদেশেই, 'আনন্দা'ন্ত বাঙ্গালী অবতারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের নির্ব্বাণ মুক্তির প্রলোভনে পড়িয়া কতশত শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া ও কেন এইরূপ প্রবঞ্চকদের কবলে পতিত হয়, তাহার মনস্তত্ত্ব ও কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বহু অপ্রিয় কথা বলিতে হয়। স্থূল কথা, তথাকথিত শিক্ষিত ও ধনীদের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বিজৃম্ভিত ভ্রমের দরুণ এই শ্রেণীর লম্পট ধর্ম্মশঠেরা প্রভূত প্রশ্রয় পাইতেছে ও দেশের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। ডিব্রুগড়ের অবতারটি সাধারণ্যে সুপরিচিত না হইলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবতারটির নাম পরমহংস স্বামী———আনন্দ। ফাউল, কারি, চপ, কাটলেট, পুডিং প্রভৃতিতেই স্বামীজীর অভিরুচি। উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত অন্দরের মধ্যেই তাঁহার লীলানন্দ আবদ্ধ। বহুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, বিক্রমপুরের জনৈক ডাক্তারের বাটীতে কল্কী অবতার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অবতারটির ক্রিয়াকলাপ ও তৎফলভোগী ভক্ত-ডাক্তারের পরিবারবর্গের পরিণাম অনেকেই অবগত আছেন। আমাদের আলোচ্য অবতারটিও ডিব্রুগড়ের ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি নিজকে শরীরী ভগবান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও উক্ত ডাক্তারের বাড়িটী আশ্রম নামে অভিহিত করিয়া, কিয়দংশ স্থান অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাঁহার নিত্যলীলার জন্ত একটি অদ্ভুত অন্দর সৃষ্টি করিয়াছেন। সপ্তবর্ষ হইতে তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকদের প্রবেশ নিষেধ। এই অন্দরের অভ্যন্তরেই পতিজী শৌচ-স্নান, আহার-বিহার, শয়নাদি যাবতীয় নিত্য- নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। যুবতী শিষ্যারাই শৌচের জল বহিয়া লইয়া ঢালিয়া দেয়, দেবদেহে সাবান ঘর্ষণ করিয়া দেয়, পদসেবা করিতে করিতে চামর ব্যজন দ্বারা ভগবানকে নিদ্রাভিভূত করে। প্রভুর প্রাতরাশ —এগপোচ ৪টী, পলাণ্ডু মিশ্রিত ঘৃতপক্ক খিচুরী কিম্বা পলান্ন, মাখন টোষ্ট ৪ খানি, ও ১ পেয়ালা দার্জ্জিলিং অরেঞ্জ পিকো চা। ছোট হাজিরার অর্দ্ধঘণ্টা পরে ঔষধভোগ চ্যবনপ্রাশ ও অর্দ্ধসের উত্তপ্ত গোদুগ্ধ। বেলা ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে ভগবানের ফলভোগ, ঘৃত-শর্করা, পক্ক বাদাম পেস্তা, আখরোট ও বেদানার সরবৎ। ফলভোগের অর্দ্ধঘণ্টা পরে ১ আউন্স নার্ভভিগার। বেলা ২টা হইতে ২॥০টার মধ্যে ভগবানের অন্নভোগ। জোহা আতপ তণ্ডুলের অন্ন, মাখনদাগা ঘৃত ১ ছটাক, মাংসের কারী, ঘনাবর্ত্তিত গব্যদুগ্ধ ও নানারূপ ব্যঞ্জন। অন্নভোগের অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনরায় ১ আউন্স নার্ভভিগার। [illegible]

ভগবানকে শয়ন করাইয়া 'মাসাদ' করিতে করিতে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। বেলা ৫৷৷০টা হইতে ৬টার মধ্যে প্রভু গাত্রোত্থান করিয়া ঔষধভোগ ব্রাণ্ডি ও ড্যামিয়ানা পিল গ্রহণ করিয়া বহির্বাটিতেই আগমন করেন। সান্ধ্য চা-ভোগ বহির্বাটিতেই হইয়া থাকে। বিস্কুট কেকসহ দার্জ্জিলিং রোজ পিকো চা ১ পেয়ালা। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে সুরু করেন। পেটেণ্ট ঔষধের নিয়মাবলীর ন্যায় প্রভুর উপদেশাবলী। পেটেণ্ট ঔষধ সেবনে যেরূপ অম্ল, মিষ্ট ইত্যাদি কুপথ্যে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন নাই, সেইরূপ এই ব্রহ্মদৈত্য গুরুটির উপদেশ হইতেছে মিথ্যা কথায়, জাল-জুয়াচুরীতে, শঠতায় প্রবঞ্চনায়, লাম্পট্যে, শুক্রক্ষয়ে কিছুতেই দোষ কিম্বা পাপ স্পর্শ করে না এবং ইহার কোনটিই মুক্তির পথে বাধা উৎপাদন করে না। তৎপর গীতার ব্যাখ্যা। ভক্তদের মধ্যে যে-কোন একজন গীতা হইতে একটি শ্লোক পাঠ করিল, অমনি, গুরুদেব শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর স্বামী, আনন্দগিরি ইত্যাদি ভাষ্যকার ও টীকাকারদের মস্তকে পাদুকাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর দেশের স্বর্গগত ও জীবিত মহাত্মাগণের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ৺ঈশ্বরচন্দ্র, ৺বঙ্কিমচন্দ্র, ৺রামমোহন রায়, ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৺লোকমান্য তিলক, দেশপ্রেমিক ৺গোখলে, ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জগন্মান্য জগদীশ ও রবীন্দ্র, ৺আশুতোষ ও প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি ভারত ও জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিদের পিণ্ড চটকাইতে আরম্ভ করিলেন। পিণ্ড চটকাইতে চটকাইতে কাফি কিম্বা কোকো ভোগের ফরমাইস হইল। বয়স্কা কুমারী শিষ্যারা চকোলেটসহ কোকো কিম্বা কাফি অন্দর হইতে লইয়া আসিল। রাত্রি ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে ঔষধভোগ—কামেশ্বর মোদক—রসগোল্লার পরিমাণ গৃহপ্রস্তুত গঞ্জিকার হালুয়া। রাত্রি ১টা হইতে ১৷৷০টার মধ্যে অন্দর মধ্যে অন্নভোগ—অন্ন, লুচি, ফাউল এগের কারী, চপ, কাটলেট, পুডিং ইত্যাদি। অর্দ্ধঘণ্টাপর পূর্ব্ববৎ নার্ভভিগার সেবন, শয়নাদি কার্য্য। মুক্তাগাছা নিবাসী জমিদার—আচার্য্যের ও তদ্দৌহিত্র অন্যতম যুবক জমীদার—লাহিড়ীর অনায়াসলব্ধ প্রজার শোণিতের অর্থে, প্রভুর বিলাস-বিভ্রমের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

পত্রলেখক বন্ধু আরও লিখিয়াছেন,—"আমি যাহা প্রকাশ করিতেছি, তাহা অতিরঞ্জিত নহে, অক্ষরে অক্ষরে সত্য, বরং ভাষায় প্রকাশ করিতে লেখনী সঙ্কোচ বোধ করে বলিয়া প্রকৃত অবস্থার কম লেখা হইতেছে।—এই অবতারটীর জন্য ময়মনসিংহের দুইটী জমীদার সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। একজন জমীদারের পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, দৌহিত্র-বধূ সব ডিব্রুগড়ে—স্বামীর আশ্রমে বাস করে—ইত্যাদি।

দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতির জীবনে, সমস্যার অন্ত নাই; কিন্তু আজ আমরা যে সমস্যার কথা লিখিলাম, তাহার গুরুত্ব কাহারও অপেক্ষা কম নহে। এমনকি, এক হিসাবে তাহার চেয়ে গুরুতর

জাতির নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করিতেছে। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের চিন্তাশীল দূরদর্শী ব্যক্তিগণ, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমিকগণ, এই সমস্যার কথা চিন্তা করুন এবং সম্মিলিতভাবে ইহার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করুন, নতুবা জাতির ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়”।

ঈশ্বরগঞ্জে পাগল হরনাথ ঠাকুর—আমাদের আর একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু ময়মনসিং জেলার তালুকদার দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ এম, আর, এ, এস, মহাশয়ের একখানি পত্র, ১৩৩৩ সালের ১৪ই চৈত্রে ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'পঞ্চায়েৎ'এ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পত্রখানিও উদ্ধৃত হইল—

“পাগল হরনাথ ঠাকুর ঈশ্বরগঞ্জ আসিয়াছিলেন ; তাহাতে অসংখ্য লোক সমাগম হইতে শুনিয়া আমি তথায় হিন্দুসভা করিতে যাই, কিন্তু স্থানীয় লোক আমাকে সভা করিতে দিলেন না। স্থানীয় মুন্সেফ বাবু এরূপ সভা হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি জানি, তাহারা এরূপ সভা করিতে দেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে পঞ্জাবের কাহনচন্দ্র বর্ম্মাকে লইয়া ঈশ্বরগঞ্জে গিয়া কাহারো বাসায় স্থান পাই নাই। তারপর আমার ভাগিনেয়ের বাসায় উঠি। সভা করা ত দূরের কথা, বিদেশী অতিথির এইরূপ সম্মান তাহারা করিলেন! তাহাকে নিয়া পরদিন কিশোরগঞ্জ চলিয়া যাই। কাহনচন্দ্র হিন্দুসভা করেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ। বাঈ নাচ বা অপর কোনো আমোদ হইলে তারা মাতিয়া যান। আমি এ-যাত্রা সভা করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন ছাপিয়া নিয়াছিলাম ; কিন্তু ঈশ্বরগঞ্জবাসীদের ঘাড়ে যে আর এক ভূত চাপিয়াছে।

পাগল হরনাথ আসিলেন, তাই ঈশ্বরগঞ্জবাসী পাগল। তাহার শুভাগমনে ঈশ্বরগঞ্জে বাজী পোড়ান, যাত্রাগান, কীর্ত্তনাদি, অন্নছত্র খোলা হইয়াছে। আমি তিন দিন ঈশ্বরগঞ্জ থাকিয়া দেখিলাম এরা সব সত্যই পাগল হইয়াছে। অনেকেরই বাহ্যজ্ঞান নাই। আমার বহু তপস্যার ফলে অনেক চেষ্টায় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। আমি ঠাকুরকে প্রশ্ন করি—তিনি ভারতের জন্য, ধর্ম্ম ও সমাজের জন্য, লোক সেবায় কি করিয়াছেন ? তাহাতে তিনি রাগত হইয়া উত্তর করিয়াছেন—“ভারত গোল্লায় যাউক, ধর্ম্ম ও সমাজ রসাতলে যাউক, লোক মরুক তাহাতে আমার কি ?” তারপর অনেক কথা। অবশেষে তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম—“তবে আপনি দেশদ্রোহী, দেশদ্রোহীকে অপদস্ত করিবার এখনো লোকাভাব হয় নাই। অতএব সাবধান! বাঁচিয়া থাকিতে চান ত, এরূপ কথা মুখে আনিবেন না। তিনি চান—“তিনি আর তার বিলাসিতা থাকিলেই হইল।”

অনেকেই মাতিয়াছে, কেন মাতিয়াছে, সে কথা কেহ কহিতে পারে না, যারা মাতিয়াছে তারাও না। দেশের এই দুর্দ্দিনে, অন্নাভাবের দিনে, দেশের টাকাগুলি দিয়া এরূপ ছিনিমিনি খেলা ভাল নয়,

বিশেষের গুরু তিনি, তাই বলিয়া দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করা ত উচিত নয়। অসংখ্য লোকের দীয়তাং ভোজ্যতাং আছেই, তারপর বাজী পোড়ান, যাত্রাগান। এই সকল টাকা দিয়া কি ঈশ্বরগঞ্জে স্থায়ী জনহিতকর কার্য্য হইতে পারিত না? জনসাধারণের নিকট হইতে কিরূপ অত্যাচারে টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কি সরকার বাহাদুর করিবেন না? এই কয়দিন ব্যাপী সমভাবে উক্ত উৎসব চালান, ঈশ্বরগঞ্জের মত ক্ষুদ্র স্থানের পক্ষে সম্ভবপর কি?

হে উদ্যোক্তাগণ, তোমাদের চৌদ্দ পুরুষের গুরু আসিয়া ভিক্ষা পান না, আর ক্ষণিক উত্তেজনার বশে ভেলকী বাজীর মত যে গুরু পাইয়াছ, তাহার জন্য তুমিই সর্ব্বস্বান্ত হও, অপরকে জড়াও কেন? পাগল হরনাথকে আমি জানি, আমি তাহার বাড়ীতে গিয়াছি। আমি সবই জানি। ইহার এমন শক্তি দেখি না। তবে সম্মোহন-বিদ্যা প্রভাবে লোক বাধ্য করিতে শিখিয়াছেন। আমি তাহার বাসস্থান বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে তাহার প্রাসাদতুল্য বিলাস-ভবন, বিলাস-উদ্যান দেখিয়াছি; তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসীর ভান করেন। বিলাস বৈভবে তিনি অতুলনীয়। আমি তাহার নিন্দা করি না। যে মাতে মাতুক, তাহার ফলে অপরকে জড়ান কেন? তিনি যে বৎসর যেখানে যান, সে স্থানকে উজাড় ও নিরন্ন করিয়া আসেন, তাহার ভক্তেরা তাতে উৎসাহ দেয়। ইনি জীবনে কোন হিতকর কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া কেহ বলিতে পারিবে না। দেশ এখন আর এরূপ ভক্ত সাধুকে চায় না। যারা দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের হিত করেন, তাহাদিগকেই দেশের লোক চায়। এই সকল লোকের স্থান আর হবে না। ইনি ত্যাগী নহেন, ঘোরতর বিলাসী; ইহা দেখিয়াও কি হতভাগ্য দেশের মানুষ গুলির চৈতন্য হইল না? তাহার সঙ্গে সর্ব্বদাই নিজের স্ত্রী ব্যতীত কতিপয় সধবা, বিধবা যুবতী স্ত্রীলোক তাহার পার্শ্বচর থাকেন কেন?

আমি পাগল হরনাথকে কতিপয় লিখিত প্রশ্ন করিয়াছি ও তাহার উত্তর ময়মনসিংহ আসিয়া দিতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ময়মনসিংহ আসিয়া চলিয়া গেলেন, প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন না। ইহার আগমনে অর্থব্যয় করা মহাপাপ মনে করি। তাহার কাছে কেহ কোন উপদেশ পায় নাই। আত্মম্ভরিতার গল্প ব্যতীত, আর কোন গল্প তাহার মুখে নাই। ভক্তেরা সদর দ্বারে লিখিয়াছে—"হরকুসুম নামৈব কেবলম্, কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথাঃ।" ইহা পাগলামীর চরম। কুসুম তাহার স্ত্রী নাম। একটা লোক হঠাৎ এসে একটা ম্যাজিক খেলিয়া গেল, যেমন ডাকাত আসিয়া দেশ লুণ্ঠন করে, তেমন নয় কি? আবারও বলি, গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করুন, কিরূপ অত্যাচারে এই টাকাটা সংগ্রহ হইয়াছে। কয় সহস্র টাকা না কি তাহাকে প্রণামী দেওয়ার কথা—সেটা কি এবং কত"?

বীরভূমি]

মাসিক পত্রিকা

[৮—৬

চৈত্র, ১৩৩৩
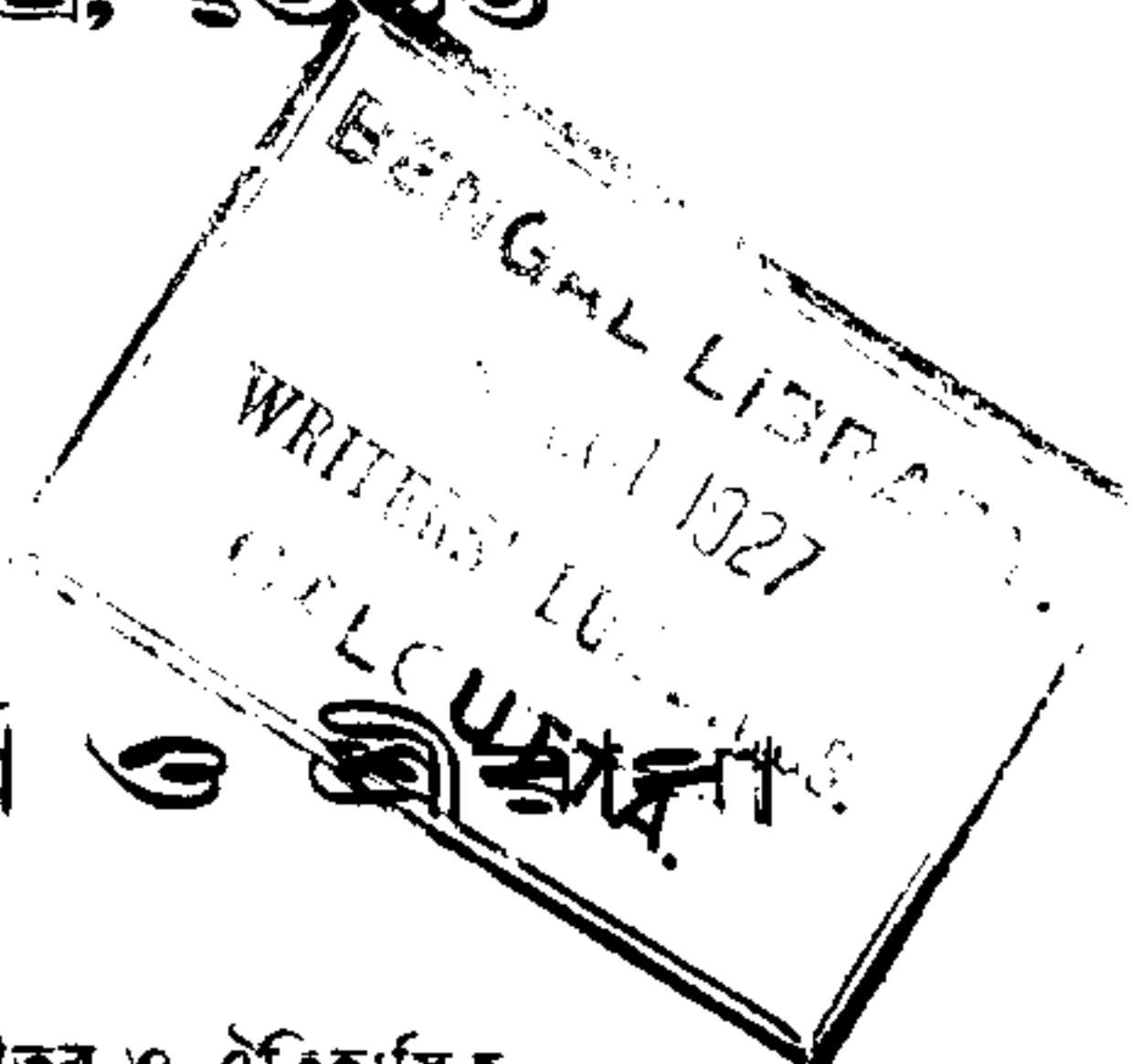
শ্রীদুর্গা ও শ্রীশ্যামা

২ ধর্ম্ম,—সনাতন ও ঐতিহাসিক

৩ মন্তব্য ও সংবাদ

৪ বঙ্গসাহিত্য

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বীরভূমি ৮-৬, চৈত্র ১৩৩৩
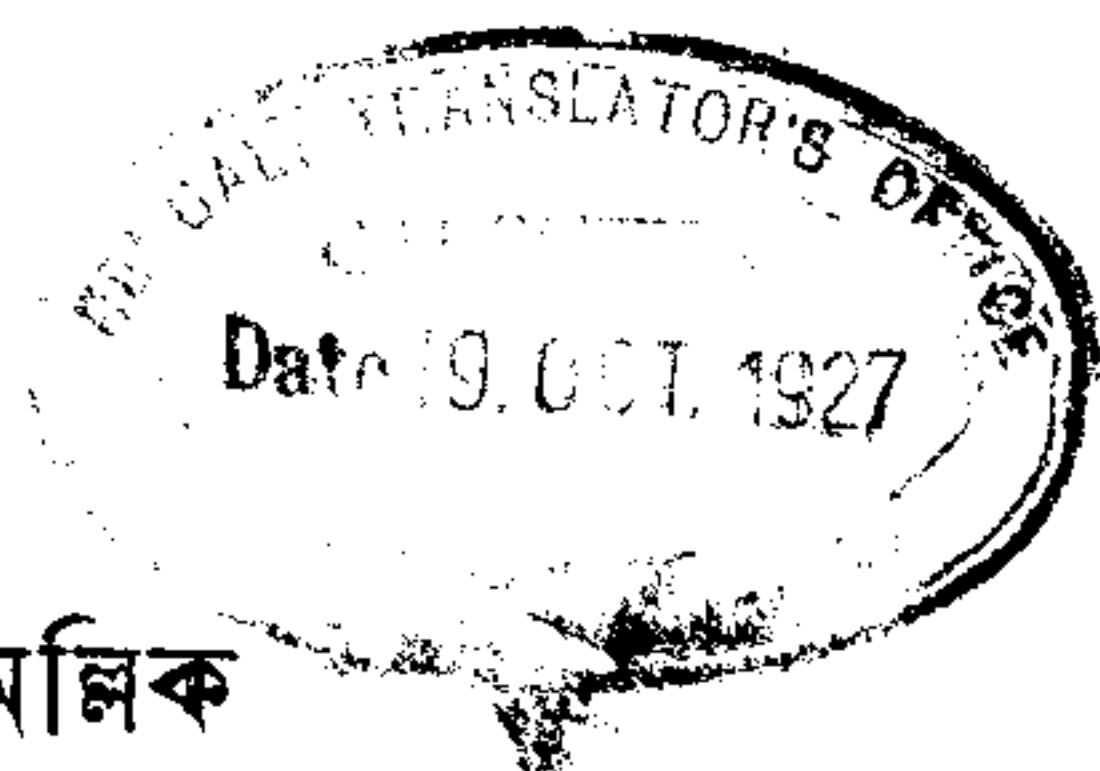
শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধা

সংসারে দুঃখ আছে, সংগ্রাম আছে,—সংগ্রামে পরাজয় আছে। সংগ্রাম পরিহার করিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। কর্ম্ম সত্য, কর্ম্মের বিধান অলঙ্ঘনীয়। কর্ম্ম করিয়াছ, এখন তাহার ফলভোগ কর। কিন্তু, অবসন্ন হইও না; কর্ম্মের ফল মাথা পাতিয়া মানিয়া লইয়া তাহারই মধ্যে সংগ্রাম কর। এই সংগ্রামই প্রকৃত তপস্যা।

তুমি সংসারের। তোমার কর্ম্মই তোমাকে দেহধারী করিয়া সংসারে আনিয়াছে। এই সংসারের দুঃখ সংগ্রাম তোমারই; তোমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে যোগ দিতে হইবে। পরিত্রাণ চাহিও না, পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিও না, কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। পরিত্রাণের কামনা ও চেষ্টা দুঃখের বৃদ্ধি মাত্র। তুমি কে, যে পরিত্রাণ পাইবে? আর, কেনই বা পরিত্রাণ চাহিবে? তোমার যিনি পিতা, তিনি সংগ্রাম করিতেছেন—কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে। তোমার যিনি মাতা, তিনিও সংগ্রাম করিতেছেন। কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এখনও কত যুদ্ধ হইবে। পরিত্রাণ কোথায়? পরিত্রাণ চাহিও না, পরিত্রাণ খুঁজিও না। যদি পরিত্রাণ থাকে, তাহা আপনা হইতেই আসিবে। কিন্তু পরিত্রাণ আছে কিনা সন্দেহ। যদি থাকে, তাহা হইলে ঐ পরিত্রাণ না-চাওয়াই, উহা পাওয়ার সর্ব্বোত্তম উপায়।

এই একপ্রকারের মত বা সিদ্ধান্ত—One type of the philosophy of life এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া যাহারা চলিতেছে বা চলিতে চায়, তাহারাই প্রকৃত কর্ম্মী।

আর একপ্রকারের মত আছে এবং সেই মতের অনেক লোকও আছেন। তাঁহাদের নাম ভাবুক। তাঁহারা বলেন সংসারে দুঃখ আছে, সংগ্রাম আছে, থাকুক। যাহা সংসারের, তাহা সংসারেই থাকুক। আমি সংসারে আসিয়াছি, কিছুদিনের জন্য আসি-

সংসারের জন্য মাত্র ততটুকু করিব, তাহার অধিক নয়। আমি প্রবাসে আসিয়াছি, কিন্তু আমার ভিতর আমার স্বদেশের স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতি একটা রস, একটা আস্বাদন; তাহা চিন্ময় ও অপ্রাকৃত। সেই রসের আস্বাদনের একটা মত্ততা আছে। সেই মত্ততা একটা জাগরণ—দিব্য জাগরণ। আমি সেই জাগরণে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে চাই। তোমাদের এই সুবিপুল সংসারের কর্ম্মকোলাহল, তোমাদের এই প্রপঞ্চের সুখের দুঃখের হলাহল, আমার কাছে স্বপ্নের মতই মনে হয়। গোল করিও না, তোমাদের হাজার রকমের কর্ম্মঝঞ্ঝাটের নিত্য নূতন তালিকা লইয়া আমার কাছে আসিও না, আমাকে ভাবিতে দাও, কাঁদিতে দাও। এই শ্রেণীর লোকেরা ভাবুক।

কেহ কর্ম্মী, কেহ ভাবুক। ইহাদের মধ্যে বিরোধ হইয়াছে অনেক। অনেকে ভাবিতেছে এ-বিরোধ চিরবিরোধ, ইহার আর নিষ্পত্তি নাই, সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু, তাহা নহে; বিরোধের অবসানে মৈত্রী হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী এই সুতুমুল বিরোধের সমাপ্তির যুগে মানবের গুরুরূপে—পথপ্রদর্শকরূপে যাহারা আসিলেন, তাঁহারা একাধারেই কর্ম্মী ও ভাবুক,—কর্ম্মীভাবুক বা ভাবুককর্ম্মী। ইঁহারা কবি ও যোদ্ধা। ইঁহারা বৃন্দাবনে বসিয়া কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করেন, আবার কুরুক্ষেত্রে বসিয়া বৃন্দাবনের স্বপ্ন দেখেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম বা **ভাগবত-ধর্ম্ম**। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। ইহাই যুগধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই শিক্ষাই দিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যে সমবেত শৌণকাদি ঋষিগণ কোন্ শ্রেণীর লোক? কর্ম্মী না ভাবুক? তাঁহারা কর্ম্মী ও ভাবুক। তাঁহারা সমগ্র জীবকুলের হিতসাধনার্থ ব্যাকুল হইয়াই যজ্ঞ করিতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। ভারতবর্ষে বড় দুঃসময় আসিয়াছে, কলি-যুগ আসিয়াছে। মানুষের পরমায়ু কমিতেছে, স্বাস্থ্যনাশ হইতেছে, মানুষ স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রচিত্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের জীবনে কোন উচ্চলক্ষ্য নাই, কোন উচ্চলক্ষ্য সাধনের জন্য তাহাদের ঐক্য নাই, তাহারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া সাধুসঙ্গের অভাবে সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছে—তাহারা রক্ষা পাইবে কিরূপে? নৈমিষারণ্যে সমবেত হইয়া ঋষিগণ, এই সমাজ ও এই ধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভা-গবতের বক্তা সূত—রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত—একজন প্রচারক ঋষিগণের

তিনি সেই সুবিমল জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া জগতের অজ্ঞান অক্ষম মানবের সেবা করিবার ব্রত লইয়াছেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম কথা।

এইবার ব্যাসদেব। কি তপস্যা, কি জ্ঞান! এই শাস্ত্র, এই ধর্ম্ম, এই সমাজ, এই বেদ, এই পুরাণ, এই কর্ম্ম, এই যোগ এই জ্ঞান, এই ভক্তি, ভারতের আর্য্যনরনারীর জীবনের চিরন্তন সুমহান্ আদর্শ, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্যা কি করিয়া রক্ষিত হইবে, পরাশরনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সেজন্য সর্ব্বদাই অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। এত কাজ করিয়াছেন, বেদ উদ্ধার করিয়া বিভাগ করিয়াছেন, উপযুক্ত শিষ্যের দ্বারা সেই বেদ প্রচার করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনসাধারণ বেদ বুঝিবে না, তাহাদের জন্য মহাভারত রচনা করিয়া, ঐ বৈদিক-শিক্ষা জনসাধারণের সুবোধ্য করিয়াছেন। এত পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি মনে হইতেছে—কাজ যেন সবই বাকি, এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। ব্যাসদেব কি? কর্ম্মী না ভাবুক? তিনি ভাবুককর্ম্মী। তিনি সেবক, বিশ্বের সেবক—বিশ্বনাথের সেবক।

বেদব্যাসের পরেই আসিলেন নারদ, দেবর্ষি নারদ; শুদ্ধাভক্তির প্রবর্ত্তক নারদ। তিনি কি? ভাবুক? কিন্তু, তাহার তুল্য কর্ম্মীই বা কে, সেবকই বা কে? ক্লান্তি নাই, নৈরাশ্য নাই। অবিদ্যার গভীরান্ধকারে নিমজ্জিত এই ত্রিলোকের সর্ব্বত্রই তাঁহার অবাধগতি; দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে নিখিল জীবের দুশ্চিন্তা-পীড়িত হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদাই সদ্ভাবের প্রেরণা জাগাইতেছেন। শ্রীভগবানের লীলাপ্রাকট্যের প্রধান-সহায়ক দেবর্ষি নারদ; তিনিই যোগমায়া পৌর্ণমাসীর গুরু। নারদ নাই কোথায়? যেখানে সংগ্রাম, যেখানেই ভগবৎশক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রয়োজন, সেইখানেই নারদ। ব্রহ্মার মানস-পুত্র, ভাবুকের শিরোমণি প্রেমরসবিভোর দেবর্ষি নারদ; কিন্তু তাঁহার তুল্য কর্ম্মী নাই। নারদের প্রেরণাতেই বেদব্যাসের শ্রীমদ্ভাগবত-রচনা ও যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবতে পর পর এই সব ভক্তের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কুন্তী দেবীর তুল্য সংসারের দুঃখক্লেশ আর কে সহ্য করিয়াছে? নিত্য নব নব বিপৎ-পাতের বজ্রানলে দগ্ধ হইয়াও কুন্তীদেবী, এই জ্বালাময় অতি ভীষণ জীবন-সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ চাহেন নাই। কুন্তীর পর ভীষ্ম, ভীষ্মের পর পঞ্চপাণ্ডব, তাহার পর পরীক্ষিত, কে পরিত্রাণ পাইয়াছে? ভগবানেরই পরিত্রাণ নাই, মানুষ কেমন করিয়া

পরিত্রাণ পাইবে। নারদের শিষ্য মহারাজ প্রিয়ব্রত, তাঁহার হৃদয় সদ্‌গুরুর কৃপায় দিব্য-জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, তাঁহারও পরিত্রাণ নাই, তাঁহারও মাথায় ভবের বোঝা, কোথায় পরিত্রাণ! কে পরিত্রাণ চাহে? মহারাজ রন্তিদেব চাহেন, নিখিলজীবের দুঃখ আমার হউক, জগতের সকল পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দিয়া চিরদিন আমায় নিষ্পেষিত কর। মানুষ বাঁচুক, মানুষ জাগুক, মানুষ মানুষ হউক, নিজেকে চিনুক, ঈশ্বরকে চিনুক। ইহাই রন্তিদেবের একমাত্র কামনা। ভক্ত রন্তিদেব নিজে অনন্তকাল নরকানলে দগ্ধ হইতে প্রস্তুত, ভগবান্ যদি তাঁহার এই কামনা পূর্ণ করেন। ইহাই লীলাবাদ, ইহাই যুগধর্ম্ম, ইহাই ভাগবত।

বাঙ্গালা দেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আসিয়াছিলেন এই ভাবুক-কর্ম্মী বা কর্ম্মী ভাবুকের দল গঠন করিতে. এই যুগধর্ম্ম প্রচার করিতেই তাঁহাদের আগমন। তাঁহাদের কার্য্য শেষ হয় নাই, আরম্ভ হইয়াছে, বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া চলিতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাঁদিতেছেন, চোখের জলে ভাসিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহী হইলেন, আবার গৃহী হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। তিনি হুঙ্কার বর্জ্জন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া জগৎকে নাচাইতেছেন, দস্যু তস্কর ও মদ্যপকে কোলে টানিয়া আত্মসাৎ করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত শাস্ত্র ও সমাজ রক্ষা করিতেছেন। তিনে এক, একে তিন। "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।" ইহাই এ যুগের পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম—কর্ম্মী-ভাবুক বা ভাবুককর্ম্মীর যুগ।

২। সংগ্রাম—দেবতা ও অসুর

প্রথমে পূজা কর শ্রীদুর্গার। বঞ্চিত হইও না, বঞ্চনা করিও না। সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে যোগদান করিয়া এই সংগ্রামকে স্বীকার কর। নতুবা বঞ্চিত হইবে, না বুঝিয়া অপরকে বঞ্চনা করিবে। অবিশ্রাম সংগ্রাম চলিতেছে—দেবতায় ও অসুরে সংগ্রাম! ভীষণ, অতি ভীষণ সংগ্রাম! ভাবুক বলিতেছে, দেবতায় ও অসুরে সংগ্রাম করুক; কিন্তু তাহারা ভাই, তাহারা একই পিতার পুত্র। ভাবুক বলিতেছে—অসুর অসুর নহে, দৈত্য নহে, রাক্ষস নহে,

কিন্তু, এ যে অনধিকার চর্চ্চা! কুরুক্ষেত্রে বসিয়া অলসভাবে বৃন্দাবনের কথা বলিও না। এখন বল, দেবতা দেবতা, অসুর অসুর, যুদ্ধ যুদ্ধ। এখানে—এই রণস্থলে, এই 'ত্রিসত্য' স্বীকার কর। দেবতা, অসুর, আর যুদ্ধ। কি ভয়ানক যুদ্ধই চলিতেছে! পূর্ণ একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ। কোন্ মন্বন্তরের কথা জানি না। কেহ বলে, স্বারোচিষ মন্বন্তরের কথা, কেহ বলে বৈবস্বত মন্বন্তরের কথা। সময় লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ, পুরাণে পুরাণে মতভেদ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বলিলেন—পূর্ণ একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিতেছে। দেবতায় ও অসুরে যুদ্ধ। দেবতাদের রাজা পুরন্দর, আর অসুরদের রাজা মহিষ। পণ্ডিতেরা পুরাণ খুলিয়া বিচার করিতে বসিলেন, এই যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহা কোন্ মন্বন্তরের কথা! পুরাণ হইতে বচন তুলিয়া একজন দেখাইলেন—স্বারোচিষ মন্বন্তরে এই যুদ্ধ হইয়াছিল; আর একজন দেখাইলেন—এই যুদ্ধ বৈবস্বত মন্বন্তরের। উভয়েই পুরাণ হইতে বচন তুলিয়া প্রমাণ দিলেন। সত্য কি? কূর্ম্ম-পুরাণের বচনের সাহায্যে জানা গেল, উভয়ই সত্য। কল্পভেদে,—কখন স্বারোচিষ মন্বন্তরে, কখন বা বৈবস্বত মন্বন্তরে এই যুদ্ধ হয়। উভয়ই সত্য। যাঁহারা নিত্যলীলা-বাদী বা লীলার নিত্যতাবাদী, তাঁহারা বলিলেন, গোলমাল কর কেন, প্রজ্ঞানেত্রে চাহিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ এখনও চলিতেছে; সর্ব্বত্রই যুদ্ধ। ভিতরেও যুদ্ধ, বাহিরেও যুদ্ধ। তুমি মানুষ, তোমার পরমায়ু একশত বৎসর মাত্র। এই পূর্ণ একশত বৎসর কেবলই যুদ্ধ, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, বিরাম নাই, নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই, যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ! দেবতায় অসুরে যুদ্ধ! ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, সত্যের সহিত অসত্যের, প্রেমের সহিত কামের, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের; যুদ্ধ যুদ্ধ, যুদ্ধ, দিনরাত্রি বিরামবিহীন যুদ্ধ!

দেবতার পরাজয় হইল, অসুরের জয় হইল। সত্য, ত্যাগ ও প্রেম, ন্যায়, ধর্ম্ম ও জ্ঞান—ইহাদিগকে সম্বল করিয়া যাহারা সরলপথে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, মধ্যপথে আসিয়া তাহারা বুঝিল, মিথ্যা,—সকলই মিথ্যা! পরাভূত হইয়া নৈরাশ্য ও অবসাদের সুগভীর অন্ধকারের মধ্যে তাহারা বসিয়া পড়িল। গেল, গেল, সব গেল! উৎসাহ ও আশা গেল। অসুরের জয়, দেবতার পরাজয়। মহিষাসুর স্বর্গে রাজা হইলেন।

অধিকার হারাইয়া বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে দুঃখে ও দুর্দ্দশায় নিমজ্জিত। অসুরেরা স্বর্গে রাজা হইয়াছে। ইহাও নিত্যলীলা। তবে প্রবাহরূপে নিত্য।

এই কি শেষ? চিরদিনই কি এইরূপ চলিবে?

শ্রীদুর্গার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, শ্রীদুর্গার শরণাগত হইয়া অসুর-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, এই কথাগুলি অন্তর্মুখী হইয়া চিন্তা করিয়া উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের ইহাই প্রথম কথা।

দেবাসুরমভূদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষে হসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥
তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্দেবানিন্দ্রো হভূন্মহিষাসুরঃ॥

অসুরের রাজা তখন মহিষ, আর দেবতার রাজা পুরন্দর। দেবতার ও অসুরে পূর্ণ শত বর্ষকাল যুদ্ধ চলিল। সেই মহাযুদ্ধে মহাবীর্য্যশালী অসুরগণ-কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইল, দেবগণকে পরাস্ত করিয়া মহিষাসুর ইন্দ্র হইলেন, স্বর্গের রাজা হইলেন।

দেবতাও আপনাকে ভুলিয়া যায়। আপনাকে যখন ভুলিয়া যায়, তখন আপনার জনকেও ভুলিয়া যায়; নিজেদের উৎপত্তি ভুলিয়া যায়, নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া যায়। সেই সময়েই দেবতার পরাজয়। দেবতার দেবত্বও মধ্যে মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে, সেই সুপ্ত দেবত্ব জাগে না, তাই পরাজয়!

পরাজয় প্রয়োজন। বিজয়ের দিন যাহা হয় না, পরাজয়ে তাহা হয়; আজ, তাহা হইল। দেবতারা মিলিত হইলেন। দেবতাদের মধ্যে প্রধান তিনজন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তাঁহাদের পরাজয় নাই, তাঁহারা নিজ নিজ ধামে স্বগৌরবে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মা থাকেন ব্রহ্মলোকে, কখন বা সত্যলোকে। শিব থাকেন কৈলাসে, বিষ্ণু থাকেন ক্ষীরোদ সাগরে। দেবতাদের মধ্যে প্রধান এই তিনজন। এই তিনজনের পরাজয় নাই। দেহের পরাজয় আছে, কিন্তু বুকের পরাজয় নাই, ভ্রূ-মধ্যের পরাজয় নাই, মাথার পরাজয় নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—এই তিন মূল দেবতার শক্তিতেই নিখিল দেবতা—তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি। সৌভাগ্যের ইহাই দোষ, সৌভাগ্যের গর্ব্বে দেবতাও মোহাচ্ছন্ন

এই দেবত্বের প্রতিষ্ঠা তাহাও ভুলিয়া যান। এই আত্মজ্ঞান বিহীনতা,—ইহারই নাম মোহ। এই মোহই যুগে যুগে দেবতার পরাজয়ের কারণ।

পরাজিত দেবতাগণ আবার একতাবদ্ধ হইলেন, ব্রহ্মাকে নেতা করিয়া, তাঁহার অধীনে শিব ও বিষ্ণুর নিকট গেলেন। নিখিল দেবতার মহাসভা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কেন্দ্রস্থানে বসিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ নিজেদের দুঃখের কথা, মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা, দেবতাদের অধিকার লোপের কথা, সেই সভায় বলিতেছেন।

এই সব কথা শুনিতে শুনিতে মধুসূদন কুপিত হইলেন। মধুসূদন শান্তিরক্ষক। তিনি সত্বগুণের মূর্ত্তি। অসুরের স্থান পাতালে, আর দেবতার স্থান স্বর্গে। বিশ্ব-ব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেকেই যদি সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ স্থানে থাকে, নিজ নিজ মর্য্যাদা পালন করে, বিশৃঙ্খলা হয় না। বিষ্ণু শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন, সর্ব্বদাই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন, বিশ্বকে পালন করিতেছেন। সৃষ্টির প্রথম উষায় যখন মধু ও কৈটভ, ব্রহ্মাকে বধ করিয়া সৃষ্টি প্রবাহের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন বিষ্ণুই সেই দৈত্যযুগলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি মধুসূদন। মধুসূদন কুপিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুও কুপিত হইলেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের মুখ হইতে, আর ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার শরীর হইতে, এক সুমহৎ জ্যোতিঃ বাহির হইল। সেই জ্যোতিঃ একত্র মিলিত হইলে দেখা গেল—যেন এক জ্বলন্ত পর্ব্বত, দিগ্ দিগন্ত তাহার ছটায় উজ্বলিত, তাহার উত্তাপে প্রপীড়িত। ক্রমে ক্রমে সেই জ্যোতিঃ এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মহাদেবের তেজে সেই নারীর মুখ, যমের তেজে মাথার চুল, বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু সমূহ, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরুদেশ, পৃথিবীর তেজের দ্বারা নিতম্বদেশ নির্ম্মিত হইল। ব্রহ্মার তেজে চরণযুগল, সূর্য্যের তেজে পদের অঙ্গুলি, অষ্টবসুর তেজে হস্তের অঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের তেজে দন্ত সমূহ, আর অগ্নির তেজে সেই দেবীর ত্রিনয়ন গঠিত হইল। সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয়, অন্যান্য দেবতার তেজে অন্যান্য অঙ্গ।

দেবতাদের শরীর হইতে বহির্গত তেজঃ একত্র হইল, সেই তেজঃ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া এই দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত করিলে, দেবতারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা

বুঝিলেন, আর ভয় নাই. মহিষাসুর পরাজিত হইবে, আমরা জয়ী হইব। দেবতারা, প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ বস্তু—অস্ত্র এবং ভূষণ, পরম ভক্তি সহকারে দেবীকে দিতে লাগিলেন। মহাদেব নিজের শূল হইতে আর একটি শূল বাহির করিয়া দেবীকে দিলেন, বিষ্ণু তাঁহার চক্র হইতে আর একটি চক্র বাহির করিয়া দেবীকে উপহার দিলেন। বরুণ দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি, বায়ু দিলেন চাপ, আর বাণপূর্ণ তূণীর। ইন্দ্র নিজের বজ্র হইতে আর একখানি বজ্র উৎপাদন করিলেন, ঐরাবতের গলার ঘণ্টা হইতে আর একটি ঘণ্টা বাহির করিলেন এবং সেই বজ্র ও ঘণ্টা দেবীকে উপহার দিলেন। যম নিজের কালদণ্ড হইতে দণ্ড বাহির করিয়া দিলেন, সমুদ্র দিলেন পাশ, প্রজাপতি দিলেন অক্ষমালা, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু। সূর্য্যদেব দেবীর রোমকূপ সমূহে আপনার রশ্মি দিলেন, কাল দিলেন খড়্গ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত বর্ম্ম। ক্ষীরোদ সাগর দিলেন বিমল হার, অবিনশ্বর অম্বর, দিব্য মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, প্রত্যেক বাহুতে কেয়ূর, নির্ম্মল নূপুর, উৎকৃষ্ট কণ্ঠভূষণ, আর প্রত্যেক অঙ্গুলিতে একটি করিয়া রত্নের অঙ্গুরীয়ক। বিশ্বকর্ম্মা একখানি অতি—নির্ম্মল কুঠার, অন্য প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ও অভেদ্য কবচ দিলেন। জলনিধি সমুদ্র মাথার জন্য ও গলদেশের জন্য কমলের ও শতদলের মালা দিলেন। দেবীর বাহনের প্রয়োজন, হিমালয় পর্ব্বত সিংহ দিলেন, নানারূপ ধনরত্নও দিলেন। কুবের দিলেন একটি সুরাপূর্ণ পানপাত্র। পৃথিবীর ধারণকর্ত্তা সর্ব্বনাগেশ্বর অনন্তদেব নাগহার উপহার দিলেন।

দেবতারা এই প্রকারে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ সম্পৎ দেবীকে সসম্মানে দান করিলেন। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও নানাবিধ অলঙ্কারে দেবী সুশোভিত হইলেন এবং মুহুর্মুহুঃ উচ্চনাদে অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে মহিষাসুরনাশিনী সিংহবাহিনী শ্রীদুর্গার উৎপত্তি বা প্রাকট্য, এই প্রকারে কথিত হইয়াছে।

কেহ ভাবিবেন না—দেবী ছিলেন না, তাঁহার উৎপত্তি হইল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রারম্ভেই মেধস ঋষি দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—দেবী মহামায়ার জন্ম নাই; তিনি নিত্যা, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, সমুদয় বিশ্ব তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে এবং তিনিই সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছেন। সত্য করিয়া তাঁহার জন্ম নাই। তিলের মধ্যে যেমন গূঢ়ভাবে তৈল থাকে, কাঁঠের মধ্যে যেমন গূঢ়ভাবে অগ্নি থাকে, তিনিও ঠিক

সেইরূপে অব্যক্ত অবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি কখন কখন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে যখন তাঁহার প্রকাশ হয়, লোকে সেই সময়ে বলিয়া থাকে—তাঁহার উৎপত্তি হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উৎপত্তি বা ধ্বংশ নাই।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্য সিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

এই দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের ভারতীয় আর্য্যজাতির পুরাশ্রুতি।

মহিষাসুর নিহত হওয়ার পর দেবতারা স্বর্গরাজ্য লাভ করিলেন; জগতে বহুদিন পরে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ।
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥

দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং স্তবস্তুতি পাঠ করিয়া দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বাদ্য ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে দেবীর যে স্তব আছে, তাহার একটি কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। দেবতারা মহামায়া সিংহবাহিনী শ্রীদুর্গাকে বলিলেন, "মা, তুমি নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহ মূর্ত্তি।" তুমি যে আমাদের বাহিরের একজন, তাহা নহে। তুমি যে আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রাখিয়া আমাদের হইয়া অথচ আমাদের বাহিরে থাকিয়া সংগ্রাম করিবে এবং সংগ্রামে জয়ী হইয়া স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইবে ও আমাদিগকে দান করিবে, আর আমরা শক্তিহীন ভিক্ষুকের মত তোমার দান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব, তাহা নহে। তুমি আমাদেরই, মহাশক্তিস্বরূপিনি ব্রহ্মাণ্ডের, সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণি, দানবদলনি, তুমি মা আমাদের আত্মার আত্মারূপে আমাদেরই ভিতরে রহিয়াছ, আমরা

তোমার তত্ত্ব জানি না, তোমায় উদ্বোধিত করিতে পারি না, তাই আমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা ও পরাজয়। আমরা বাহিরে মঠে মন্দিরে ও তীর্থে, পেশাদার যাজকের তোষামোদ করিয়া তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চেষ্টা করি, তোমায় প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাহা হইবার নহে; কিছুতেই তাহা হইবে না, কোন কালেই তাহা হইবে না। এই প্রকারে আমরা বঞ্চিত হইয়া পড়িয়া আছি। মা, মহামায়ে, আজ তুমি আমাদের জাগাইয়া দাও, আজ আমাদের শুভবুদ্ধি দাও আমাদের এই জাগরণ ও শুভবুদ্ধিরই মিলনই তুমি—"নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তিসমূহ মূর্ত্তি।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই মূল্যবান্ ও গভীরার্থপূর্ণ কথাটির চারি প্রকার অর্থ করিয়াছেন। আমাদিগকে এই চারি প্রকারের অর্থই ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ক। প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন, জগতের উৎপত্তি-ব্যাপারে মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি বহু তত্ত্বের বা দেবতার সাধনত্ব রহিয়াছে, অর্থাৎ এই সব তত্ত্ব বা দেবতার কর্ত্তৃত্বের দ্বারাই জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে বা এখনও গড়িয়া উঠিতেছে। তাহা হইলে, এই বহু দেবতাই কি জগতের হেতু? উত্তরে বলিলেন, না। একই মহাশক্তি সত্য সকলের মূল, তিনিই সর্ব্বকারণ কারণ। এই সব দেবতাকে দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বুঝি পৃথক; কিন্তু তাহা নহে। ইহারা সকলেই এক মহাশক্তির পরিণাম মাত্র।

২। মহদাদি যাবতীয় দেবতার যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা কার্য্যোৎপাদনের সামর্থ্য, সেই সামর্থ্যই মায়ের রূপ—

৩। অথবা, সেই সামর্থ্যের মধ্যেই তাঁহার রূপ প্রকাশিত হয়।

৪। সমূহতি=প্রেরয়তি। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন পথে কার্য্য করিতেছে, সত্য; কিন্তু এক মহাশক্তিই সকলকে প্রেরণা দিতেছেন।

৩। শক্তি ও শক্তিমান্

বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই উত্তমরূপে জানিয়া রাখা উচিত যে তাঁহারাও শক্তি-উপাসক। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর সকলেরই জানা দরকার যে শক্তি ছাড়া কাহারও উপাসনা হয় না।

'শক্তি' কথার প্রকৃত অর্থ কি? যাহার সাহায্যে অব্যক্তের ব্যক্তি বা প্রকাশ বা প্রাকট্য হয়, তাহারই নাম 'শক্তি'। শক্তিকে বাদ দিয়া কেহ কখনও কিছুতেই শক্তিমানকে ধরিতে পারে না। যাহার প্রকাশ নাই, তাহার তুমি পরিচয় পাইবে কি প্রকারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নির্ব্বিকল্প সমাধির সময় তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ কেবল একটা কথামাত্র, এ কেবল একটা তর্ক করা মাত্র। শক্তিমানের পরিচয় পাই শক্তির দ্বারা, শক্তিমানের সহিত সম্পর্ক পাতাই শক্তির সাহায্যে। সুতরাং, শক্তি ছাড়া উপায় নাই। যাঁহারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবী শক্তিরই আরাধনা করেন। মানুষ পিতার পরিচয় পায় মায়ের দ্বারা। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষে একটি আরাধনার বচন আছে—"মাকে ভজ, বাপকে পাবে, ঘুচ্‌বে মনের ধন্দ"—ইত্যাদি।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

তুমি বৈষ্ণবী শক্তি, অনন্তবীর্য্যবতী, বিশ্বের বীজ, পরমা মায়া। তুমিই মহামায়ারূপে জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তোমার প্রসন্নতাই সকলের মুক্তির হেতু।

এই শ্লোকে একটি কথা আছে, 'পরমা'। টিকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"পরং ঈশ্বরং মাতি কর্ত্তৃভোক্তৃভাবেন বশয়তি" যিনি পরমেশ্বরকেও কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজাইয়া বশীভূত করিয়া রাখেন, তিনিই 'পরমা'। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা মোরে নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

বাঙ্গালা দেশে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরাধারই উপাসনা। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে চাহেন না, তাঁহারা চাহেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম। তাঁহারা জানেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের

ভিখারী, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত। এই প্রেম কি? শ্রীরাধার কৃপাদৃষ্টিই ভক্তহৃদয়ে প্রেম। শ্রীরাধাই প্রেমের মহা সিন্ধু।

বিষ্ণু-উপাসনা মাত্রেই বৈষ্ণবী শক্তিরই উপাসনা।

শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মা, তুমি বৈষ্ণবীরূপে শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়া থাক, মা নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি।

যেমন বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণবী-শক্তির উপাসনা করেন, তেমনি যিনি বলেন আমি ব্রহ্মার উপাসনা করি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মাণী-শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মা, তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাক, কুশের দ্বারা অভিমন্ত্রিত বারি সিঞ্চন করিয়া থাক, তোমায় প্রণাম করি।

যিনি মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, বরাহ, নৃসিংহ বা ইন্দ্রের পূজা করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সব শক্তিরই উপাসনা করেন।

ত্রিশূল চন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তি ধরেঽনঘে।
কৌমারী-রূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
গৃহীতোগ্র মহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমঽস্তুতে॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণ সহিতে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
কিরিটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

বিচরণ করিয়া থাক, মা নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি মা, কৌমারীরূপে মহাশক্তি ধারণপূর্ব্বক কুক্কুটগণে পরিবেষ্টিত শিখিবর-আসনে বিচরণ করিয়া থাক, মা, নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। মা, তুমি বারাহীশক্তিরূপে অতি উগ্র মহাচক্র ধারণ করিয়া, দন্তের দ্বারা জলমগ্না ধরণীকে উদ্ধার কর; মা, নারায়ণি, তোমায় প্রণাম। মা, তুমি উগ্র নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধরিয়া দৈত্যগণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছ; মা, তুমি ত্রৈলোক্যতারিণী নারায়ণি, তোমায় প্রণাম। মা, তুমি উজ্জ্বল সহস্র নয়নে ইন্দ্রাণীরূপে শিরোদেশে কিরীট ধারণ এবং হস্তে মহাবজ্র গ্রহণ-পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছে, মা, নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলেন, সেই ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরাধার উপাসনা। প্রাচীন ভক্তিসূত্রে আছে, প্রেম শ্রীভগবানকে বশীভূত করে, আর সেই প্রেমই শ্রীরাধা। অতএব আমরা যদি শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিতে পারি; শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী, আমরা যদি সেই মহাভাবের পথে দাঁড়াইতে পারি, তাহা হইলে আর 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিয়া কাঁদিতে হইবে না। 'কৃষ্ণ' আপনিই আসিবেন।

সো কঁহা যাওব, আপহি আওব,
পুনহি লুটাওব চরণে।

শ্রীদুর্গা সম্বন্ধে দেবতারা বলিয়াছেন, তিনি নিখিল-দেবগণ শক্তিসমূহমূর্ত্তি। শ্রীরাধা সম্বন্ধে আচার্য্যগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মকথা আশ্রয় করিয়া আমরাও অনায়াসেই বলিতে পারি—শ্রীরাধা "ভক্তগণভাবসমূহমূর্ত্তি"—ইনিই মহাভাব।

ভিতরে ও বাহিরে, স্থূল সূক্ষ্ম কারণে, চেতনে অচেতনে যত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সমুদয় শক্তিই একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ মাত্র। ইহাই প্রথম কথা। মানুষ এই শক্তিকে দুই প্রকারের বিভিন্ন অধিষ্ঠান ভূমি হইতে দেখিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের চিন্তাপ্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়া বলিতে পারা যায়, একজন নৈতিক-জীবনের দ্বন্দ্বের ভূমি হইতে শক্তি-তত্ত্বের ঐক্যের অনুসন্ধান করেন, আর একজন ভাবুকের তুরীয় চৈতন্যের ভূমি হইতে এই ঐক্যের অনুসন্ধান করেন। ইংরাজীতে বলা যায়—একটি Moral Standpoint, আর একটি Transcendental Standpoint.

বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত মহাশক্তি উপাসনার এই দুইটি প্রণালী শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধা।

এই দুইয়ের মর্ম্ম কি এবং ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি, যাঁহারা যথাযথ বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই দুইটি অধিষ্ঠান-ভূমি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যাঁহারা সত্য সত্য তত্ত্ব চিন্তা করেন, তাঁহারা অল্পকাল ধারণা ও ধ্যান করিলে বুঝিবেন, এই দুইটি তত্ত্ব বা মহাশক্তির এই দুই প্রকারের প্রকাশ বিরোধী নহে; একটি আর একটিকে পূর্ণ করিতেছে। ইহারা Complementary। শ্রীদুর্গাকে বাদ দিয়া যাহারা শ্রীরাধাকে ধরিতে গিয়াছে, তাহারাও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম পায় নাই; আবার শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া যাহারা শ্রীদুর্গাকে ধরিয়াছে, তাহারাও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম পায় নাই।

শক্তি ও ভক্তি। শক্তি ছাড়া ভক্তি হয় না। যে দুর্ব্বল, যে শক্তিহীন সে যদি ত্যাগ, ভক্তি বা প্রেমের কথা বলে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে, সে তমোগুণে ডুবিয়া পশুত্বে বা জড়ত্বে অবনমিত হইবে। আবার, যে কেবল শক্তিই খুঁজিতেছে, ত্যাগ, ভক্তি, বৈরাগ্য বা প্রেমসেবার আদর্শ যাহার সম্মুখে নাই, এই আদর্শের দ্বারা যাহার শক্তি সংযত বা নিয়ন্ত্রিত নহে, সে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অসুর হইবে বা রাবণের ন্যায় রাক্ষস হইবে। এই দুই প্রকারের পথই বর্জ্জনীয়।

বেদ বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। অতএব বল চাই, শক্তি চাই। দেহের বল, ইন্দ্রিয়ের বল, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির বল প্রয়োজন। বুদ্ধির বলই ভক্তি। আমরা বর্ত্তমান সময়ে 'বুদ্ধি' এই কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করি, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে তাহা সে-অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতায় যে বুদ্ধিযোগের কথা বলা হইয়াছে, সেই বুদ্ধিযোগ, ভক্তিযোগেরই নামান্তর মাত্র।

বেদে আর এক কথা আছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। ভোগ করিলে ভোগ হয় না—ত্যাগই প্রকৃত ভোগ। এই দুইটি বেদবচন একত্র করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। 'দুর্গা'-নামের অর্থ

নৈতিক-জীবনের দ্বন্দ্ব বা কুরুক্ষেত্র, ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বদাই চলিতেছি। এই

লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীদুর্গার উপাসক। 'দুর্গা' নামের অর্থ চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে;

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥

'দুর্গ' বলিতে ১। দৈত্য, ২। মহাবিঘ্ন, ৩। ভববন্ধ, ৪। কুকর্ম্ম, ৫। শোক, ৬। দুঃখ, ৭। নরক, ৮। যমদণ্ড, ৯। জন্ম, ১০। মহাভয়, ১১। অতিরোগ, এতগুলি বস্তু বা অবস্থা বুঝায়। 'আ' এই পদটি হন্তৃবাচক। যে দেবী এগুলিকে বিনাশ করেন, তিনিই দুর্গা।

প্রাচীনগ্রন্থে 'দুর্গা' নামের অন্যরূপ অর্থও পাওয়া যায়।

দ = দৈত্যনাশ, উ = বিঘ্ননাশ, রেফ্ = রোগনাশ,
গ = পাপনাশ, আ = ভয় ও শত্রুনাশ।

যাঁহারা দুর্গার আরাধনা করেন, তাঁহারা সংসারের প্রতি চাহিয়া সর্ব্বদা দেখেন ও অনুভব করেন যে জগতে রোগ, শোক, পাপ, দুঃখ প্রভৃতি অশেষ প্রকারের বন্ধন রহিয়াছে। এই বন্ধন হইতে পরিত্রাণ চাই। কাহার পরিত্রাণ? ভাবিবেন না, কেবলমাত্র নিজের পরিত্রাণ! জগতের সকলের পরিত্রাণ আবশ্যক। ইহাই শ্রীদুর্গার উপাসনা—ইহাই প্রকৃত কুরুক্ষেত্র। ধর্ম্মক্ষেত্রে ইহার অভিনয় হইতেছে, পার্থসারথি নারায়ণ রথের অশ্বচালনা করিতেছেন। এই কুরুক্ষেত্রই শ্রীদুর্গার উপাসনা। ইহার ফল, ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি নহে, ইহা মোক্ষাভিসন্ধি নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বের বন্ধন মোচন বা পরিত্রাণ।

*রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বং॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেনিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসীনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

মা, রাক্ষস, উগ্রবিষ নাগ, শত্রু, দস্যু, দাবানল ও সমুদ্রের জলমধ্য হইতে সকলকে রক্ষা কর। তুমি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বরক্ষাকারিণী, তুমি বিশ্বব্যাপিণী, বিশ্বধারিণী, তুমি সমুদয় বিশ্বের বন্দনীয়া। যাঁহারা ভক্তিসহকারে তোমার চরণে সর্ব্বদা অবনত, তাঁহারাই বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ। আমরা শত্রু ভয়ভীত, মা, প্রসন্না হও, আমাদিগকে পরিপালন কর। অদ্য যেমন অসুরগণকে বধ করিয়া জগতের সমস্ত পাপ দূরীভূত করিয়াছে, তেমনি উল্কাপাতাদিজনিত মহা উপসর্গ— দুর্ভিক্ষ মারিভয় প্রভৃতি দুঃখরাশিও বিনষ্ট কর। মা, তুমি প্রণতজনের প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি বিশ্বের দুর্গতিনাশিনী। তুমি ত্রিলোকের পূজনীয়া, অতএব সকলকে আশীর্ব্বাদ কর।

৫। আদর্শ ও বাস্তব—

চিন্তাশীল মানব-সমাজে চিরদিনই দুই প্রকারের দুইটি বিরোধী মতবাদ রহিয়াছে। ইহার একটি মতের নাম ভাব-সত্যবাদ, আর একটি মতের নাম বস্তু-সত্যবাদ। এই দুইটি মতই শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের বাহিরে চারিদিকে সকল সময়েই কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু রহিয়াছে। কেবল যে রহিয়াছে তাহা নহে, তাহারা সকল সময়েই আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির উপর ক্রিয়া করিতেছে। আবার আমি মানুষ, আমি বিবেচনা করিয়া বিচার করিয়া কোনও একটা বিশেষ প্রকারের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমার ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা এই পারিপার্শ্বিক প্রপঞ্চ বা বস্তু সমূহের উপর প্রতিক্রিয়া করিতেছি। The objects are acting on me and I am reacting on them. এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, আত্ম ও অনাত্মের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এই যে সম্বন্ধ, ইহাই জীবন—ইহাই সম্বন্ধ। আমার বাহিরে যাহারা রহিয়াছে, তাহার নাম বস্তু ; আর আমার ভিতরে যে কল্পনা ও চিন্তা জাগিতেছে,

রহিয়াছে। অনেকে বলিবেন বস্তুই প্রকৃতি, আর ভাবই পুরুষ—Object and Subject, The known and the knower. Matter and motion—আর সংসার বা জীবন, একটি যুগল মিলন বা মিথুন। ইহাই প্রথম কথা, কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় ইহাই শেষ কথা নহে।

একজন বলিলেন, বস্তুই সত্য, বস্তুই মুখ্য। ভাবকে যদি মিথ্যাও না বল, তাহা হইলে বল যে ভাব গৌণ। বস্তুর জন্যই ভাব। আর একজন বলিলেন—ভাবই সত্য ভাবই মুখ্য। বস্তু মিথ্যা না হউক, নশ্বর বা ক্ষণস্থায়ী, ভাবের জন্যই বস্তু। এই দুই প্রকারের মত। ভাবুকেরা ভাবের চিন্তা করিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মধ্যে ঐক্য দেখিলেন। সেই ঐক্যের নাম দিলেন—মহাভাব। আরও ভিতরে ঢুকিলেন। মানুষের চেতনার রসই সত্য। ভাব যখন আস্বাদিত হয়, তখন তাহার নাম হয় রস—ইহা আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ বেশ বিচার করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন। ভাবের আস্বাদন যখন রস, তখন মহাভাবের আস্বাদন হইলেন রসরাজ। বেদে আছে—তিনি রসস্বরূপ; ইহাই হইল তাহার তাৎপর্য্য। রসরাজ হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীরাধা হইলেন—মহাভাব। আর কিছু নাই, এই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা—ইঁহারাই একমাত্র নিত্য ও পরমার্থ বস্তু বৈষ্ণব ভক্তের অন্তরে আর কোন কামনা নাই, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্খা।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর কেহ নাহি মোর॥
কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর 'পরে বসাব দুজন॥
শ্যাম অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতি মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে এই অভিলাষ॥

সুপ্রসিদ্ধ ভক্তকবি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের এই প্রার্থনা। এই প্রার্থনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা সত্য সত্য কি করেন এবং কি চাহেন, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখা যায়, সেবা দুই প্রকার—এক মানস-সেবা আর দৈহিক-সেবা বা বাহ্য-সেবা। যাহারা মানস-সেবা করেন, তাঁহাদের সত্য সত্য চুয়া চন্দন বা চামর প্রভৃতি কোন বাহ্য উপকরণের চিন্তা নাই। সংসারের এই সব বস্তু মনে মনে চিন্তা করেন মাত্র। এই প্রকারের সাধক যাঁহারা, তাঁহাদের বাড়ীঘরও নাই, মঠ মন্দিরও নাই, ঠাকুরের মূর্ত্তিও নাই, কোন সাজ সরঞ্জামও নাই। তবে সাধকের যখন দেহ আছে, তখন দেহ ধারণের জন্য যাহা না হইলেই নয় তাহা অবশ্য আছে। সে কেমন, তাহাও ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায় আছে।

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি, হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দ করিয়া
বাহু পর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধনধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব॥
মাধবী কুঞ্জের 'পরি, সুখে বসি শুক সারী

তরুতলে বসি' তাহা, শুনি পাসরিব দেহ
কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করে এই অভিলাষ,
এমতি হইবে কত দিনে ॥

এই দেহ যতদিন আছে, ভক্তসাধক ততদিন এইরূপ কামনা করেন। এই যে কামনা, ইহা ঠিক্ বস্তু বা অনাত্মের সহিত সম্বন্ধ-পরিত্যাগ নহে। সংসারে মানুষ কতক-গুলি কৃত্রিম আড়ম্বরে নিজেকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই বিকৃত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া মানুষ ভাবিতেছে—আমার বা আমাদের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু উন্নতি হয় নাই, মানুষের অধঃপতন হইয়াছে। এখন মানুষকে ফিরিতে হইবে Back to nature। নদীতীর, কুঞ্জবন, পাখীর গান—এই সকলের মধ্যে ভোগলালসা-পরিশূন্য মানব হৃদয়, সেই নিত্যপ্রেমের পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া এক শূন্যের মধ্যে চলিয়া যান তাহা নহে, তাঁহারা সামাজিক জীবনের কৃত্রিম আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া জীবনকে সরল করিতে চাহেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া নিত্যপ্রেমের আস্বাদন লাভ করিতে চাহেন।

যতদিন এই দেহ আছে, ততদিন এইভাবে চলিবে। তাহার পর, মৃত্যুর পর যখন এই স্থূলদেহ খসিয়া যাইবে, তখন আমি এক নিত্যরূপ বা নিত্যদেহ লাভ করিব এবং সেই দেহে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিব। তখন আমি কি দেখিব বা কি পাইব? এখানে যাহা ভাবিয়াছি ও কামনা করিয়াছি, সেখানে ঠিক্ সেই সব জিনিসই পাইব, চিরকালের মত পাইব, তাহাদের আর ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই; তাহারা অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময়। ইহাই ভক্তের আশা।

সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায়।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।

এখন যাহা পাইতেছে,তাহা অপক্ক বা নিত্য ভাব-বস্তুর একটা আংশিক প্রতিবিম্ব—A fragmentary Reflection of the Real, the Eternal. বেশ, এখন ইহাই ধরিয়া দৃঢ়রূপে চিন্তা করি। চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত একাগ্র হইয়া যাইবে, অন্য অভিলাষ থাকিবে না, তাহার পর সেই নিত্যকেই পাইব।

যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস তাঁহারা বস্তুকে বস্তুরূপে অনিত্য বলেন, কিন্তু ভাবরূপে নিত্য বলেন। সুতরাং তাঁহারা যে এই জগৎ বা এই জীবন চাহেন না তাহা নহে; এই জগৎ ও জীবন যে আকারে বা যে অবস্থায় রহিয়াছে, সেই আকার বা অবস্থা তাঁহারা চাহেন না। কিন্তু তাঁহারা বলেন—এই জগতের বা জীবনের একটি নিত্য ও পূর্ণ অবস্থা আছে এবং তাঁহারা সেই নিত্য বা পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে চাহেন।

তাঁহাদের ধারণা এইরূপ। আনন্দ হইতেই বিশ্বের উদ্ভব। আমরাও আনন্দ-কণা। এই বিশ্বেও আনন্দ আছে, কিন্তু যে কারণেই হউক, সেই আনন্দ বিশুদ্ধ অবস্থায় আমাদের নিকট আসিতেছে না। আমাদের নিকট আনন্দের একটা আভাসমাত্র আসিতেছে। আমরা বস্তু বলিয়া যাহা পাইতেছি বা গ্রহণ করিতেছি, তাহা ঠিক্ বস্তু নহে। তাহার যেন সামান্যমাত্র অগ্রভাগের একটা স্পর্শমাত্র পাইতেছি। যদি ডুবিতে পারিতাম, আমার এই ভোক্তৃত্বজ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বজ্ঞান হারাইয়া, যদি "জয় রাধেগোবিন্দ" বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ডুবিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই বিশ্বের যাহা মূল তাহা ধরিতে পারিতাম। সেই মূল উজ্জ্বল, সুন্দর ও নিত্য, তাহা অমৃতরূপ। তাহাই ভাব।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাগুলি ঠিক্ এই প্রকারে না বুঝিয়া, অনেকে বুঝেন যে, একটি খুব ভাল মন্দির করিতে হইবে, শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং শিষ্য করিয়া পুরুষানুক্রমে ধনার্জ্জন করিতে করিতে হইবে। এই প্রার্থনাগুলিকে যাঁহারা এইভাবে বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে, ইহাতে ধর্ম্মচিন্তার গন্ধমাত্র নাই। ইহা বৈষয়িক, ইহা সাংসারিক এবং ইহা স্থূল।

আমরা আমাদের সাধারণ জাগরিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-সমুদয় বিষয়ের ও সুখদুঃখের পরিচয় পাই, তাহাদের একটি নিত্যরূপ আছে, ইহাই যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সংসার বা বিষয় যে পরিত্যাগ করেন, তাহা মোটেই সত্য নহে। তাঁহারা

পতিতোদ্ধারণ-মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহারা এই সংসারের প্রত্যেক মানবকে এবং প্রত্যেক বিষয়-ব্যাপারকে সংশোধিত ও সংস্কৃত করিয়া, তাহাদের মৌলিক ও সুবিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাদিগকে উন্নীত করিতে চাহেন।

শ্রীভগবান্ নিজে সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার অবতার-লীলা। তিনি অসুর সংহার করিতেছেন, সাধুদের অভয় দান করিতেছেন, পতিতকে উদ্ধার করিতেছেন। শ্রীভগবানের এই পরিশ্রম কি ভয়ঙ্কর! How tremendous are His labours. বাঙ্গালার বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলিতেছেন—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভূভার হরণ।

*   *   *   *

বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।

স্বয়ং ভগবানের এই সর্ব্বাতীতত্ব (Transcendence) এবং স্বস্বরূপের মাধুর্য্যাস্বাদন-মত্ততা চিন্তা করিয়া যদি কেহ বলেন যে, সংসারের এই দুঃখজ্বালা ও বিপদ বিষাদ বেদনা হইতে আমাদের নির্লিপ্তভাবে দূরে থাকা আবশ্যক। আরামপ্রিয় বা স্বার্থপর অনেক দুষ্টবুদ্ধি-লোক, এই প্রকারের অশাস্ত্রীয় মতের অনুবর্ত্তন করে; এই মত ঠিক্ নহে।

শ্রীবৃন্দাবনের লীলাই স্বয়ং ভগবানের লীলা। এই লীলা নিত্য ও অপ্রাকৃত। কিন্তু, এই অপ্রাকৃত নিত্যলীলার সহিত দেহধারী আমাদের যে-সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক একটি আদর্শের অনুধ্যানমাত্র, একটি আদর্শ অবস্থা লাভ করিবার জন্য একটি সংগ্রাম বা চেষ্টা মাত্র—A struggle to attain an ideal condition. শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আলোচনা করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। প্রকট-লীলায় কেবলই সংগ্রাম।

অতএব, সংসার-সংগ্রামে পরিহার করিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। সংসারের দুঃখসংগ্রাম স্বীকার করিতে হইবে—সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে। পরিত্রাণ চাহিও না। পরিত্রাণ পাইবে না। ইহাই যুগধর্ম্ম। শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধা উভয়কেই স্বীকার কর। একই মহাশক্তির দুইদিক্—একসঙ্গে উভয়কেই স্বীকার করাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম—ইহাই যুগধর্ম্ম—ইহাই কর্ম্মী-ভাবুকের ধর্ম্ম, বা ভাবুক-কর্ম্মীর ধর্ম্ম।

উপসংহার

ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া প্রকৃত সুমীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচনের ব্যাখ্যা করিলেই হইবে না। আমাদের শাস্ত্র অসীম মহাসমুদ্রের মত। বেদকে কল্পতরু বলা হইয়াছে, পুরাণও কল্পতরু; যে-যাহা চাহিবে, সে তাহাই পাইবে যুগধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিস আছে; শাস্ত্রব্যবসায়ীগণকে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—সংসারে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভিতরেও পরিবর্ত্তন বাহিরেও পরিবর্ত্তন। ধর্ম্ম সনাতন, কিন্তু তিনি—সেই সনাতন ধর্ম্মযুগের পরিবর্ত্তন অনুসারে নব নব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন। সনাতনধর্ম্মকে এই পরিবর্ত্তিত ও যুগোপযোগী নবমূর্ত্তিতে যিনি চিনিতে পারেন ও গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি ভাগ্যবান্। তাঁহার ধর্ম্মই সত্য, প্রাণবান্ ও মৌলিক, অর্থাৎ নিজস্ব। আর যাহারা এই নবমূর্ত্তিতে সনাতনধর্ম্মকে চিনিতে ও গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদের ধর্ম্ম মৃত ও গতানুগতিক।

যুগধর্ম্মের সহিত পরিচিত হইতে হইলে কিছু সাধনা আবশ্যক, কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আবশ্যক। বিদেশ হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, এই উদাহরণটি মনে রাখিয়া বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিলে আমাদের বিশেষ উপকার হইয়া।

যীশুখৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, বর্ত্তমান পৃথিবীর বহু কোটি নরনারী সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কি ঠিক্ করিয়া বলিতে পারেন, তিনি কি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? সেই মহাত্মার প্রকৃত উপদেশ কি? এ-সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। খৃষ্টানেরা নানা শাখায় বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে একটা দল আছে, তাহাদের নাম 'এভানজেলিষ্ট 'Evangelist'. তাহারা বলে—মানুষ একেবারে পতিত এবং মহাপাপে নিমজ্জিত। মানুষের এমন কোন শক্তি নাই, যাহার দ্বারা সে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। একমাত্র বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস, যীশুখৃষ্টে এবং বাইবেলে বিশ্বাস ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই হইল তাহাদের মত। বর্ত্তমান যুগের অনেক সাধু খৃষ্টান এই মতের বিরোধী। তাঁহারা বলেন—এই মত ভ্রান্ত এবং সর্ব্বনাশকর। তাঁহারা এই

সম্মোহনবিদ্যার (Hypnotism) দ্বারা যেমন মানুষকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই ভাবানো যায় ও করানো যায়, ঠিক সেইরূপ, এই মতের দ্বারা মানুষের মনে একটা বিশ্বাস গড়িয়া তোলা হইয়াছে যে মানুষ একেবারে দুর্ব্বল ও অসহায়। এই মত—মানুষের কোন শক্তি নাই, মানুষ দুর্ব্বল ও অসহায়, বুঝিতে পার বা না পার, ভাল লাগে বা না লাগে, একটা ঐতিহাসিক ঘটনায় (যীশুখৃষ্টের আগমনে), একখানা গ্রন্থে (বাইবেলে) তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, নতুবা কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই—এই অপমানজনক মত, এই মত মানবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিল কি করিয়া, তাহাও উত্তমরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগের অনেক চিন্তাশীল সাধু ব্যক্তি এ-সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—পূর্ব্বে পৃথিবীতে বা ইউরোপে মানুষের জীবনে খুব বেশী রকম দুঃখ কষ্ট ছিল। জনসাধারণের জীবনে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ছিল, তাহারা প্রবলের হস্তে অতি মাত্রায় নিপীড়িত হইত, পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না, নানাপ্রকারে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণে তাহারা জর্জ্জরিত ছিল। ইউরোপের ভূম্যধিকারিগণ পশু বা রাক্ষসের মত দুর্বৃত্ত ছিল। জনসাধারণের জীবনে শান্তি ছিল না, সুখ ছিল না। মধ্যযুগে ইউরোপের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে বড় বড় ধর্ম্মমন্দির, মঠ বা Monastery নির্ম্মিত হইতে লাগিল। সমাজে নিপীড়িত মানুষ, ইহলোকে কিছুতেই দুঃখ ও অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইত না, তাহারা সংসার ছাড়িয়া কোন মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার সুখ ও শান্তি হইত। সামাজিক জীবনের এই অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ সহজেই বিশ্বাস করিত—"ভগবান ক্রোধপরায়ণ" God is wrathful. সংসার ও সমাজ পাপে পরিপূর্ণ, এই দেহ লইয়া এই সমাজে ও সংসারে সুখ বা শান্তি পাওয়ার মোটেই কোন আশা নাই। দেহটাই পাপ, ইন্দ্রিয়গুলাও পাপ। দেহ ও ইন্দ্রিয়, আত্মার বা পরমার্থের শত্রু। এই দেহ ও ইন্দ্রিয়কে তাপিত ও ক্লিষ্ট করিয়া (By mortification—by Crucifixion of Body) মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে হইবে।

এই যে খৃষ্টান মত, এই মতে আর কেহ বড় একটা বিশ্বাস করে না। মুখের কথায় যাহারা মানে,

না। এখন কেবল ইউরোপে নহে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানব মাত্রেই ক্রমোন্নতিবাদে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস না করিয়া পারে না। দরিদ্র আজ আর নিশ্চেষ্টভাবে অত্যাচারিত হইয়া, কি করিব 'অদৃষ্টের ফল' কিম্বা ভগবানের ক্রোধ'—এই বলিয়া নীরবে ঐ অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। আজ তাহারা বুঝিয়াছে—দেবতা ও ভগবানে, বাহিরে বড়লোকের বাড়ীতে বসিয়া সোণার থালায় নৈবেদ্য খাইতেছেন না, দেবতা ও ভগবান্ আমার ভিতরে, তোমার ভিতরে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে। আমার এবং তোমার নিজের উপর বিশ্বাস নাই, আমাদের কে বা কাহারা যেন বহু পুরুষ ধরিয়া, বহু শতাব্দী ধরিয়া সম্মোহিত (Hypnotized) করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সেই মোহাবিষ্ট অবস্থায় ভাবিতেছি, যিনি জগতের ঈশ্বর তিনি বাহিরে মন্দিরে বা তীর্থে বসিয়া আছেন ; যে প্রণামী ভেট বা ঘুঁস দিতে পারিবে, সেই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিবে। আজ জগতে মোহ পরিহারের যুগ আসিরাছে। এই যুগ নাস্তিকতার যুগ নহে, অবিশ্বাসের যুগ নহে, উচ্ছৃঙ্খলতা বা যথেচ্ছাচারের যুগ নহে। মানুষ আজ নিজের ভিতরে দেবতা বা ভগবানকে দেখিয়াছে, আজ মানুষ সমবেতভাবে সেই দেবশক্তিকে উদ্বোধিত ও সম্মিলিত করিয়া, মহিষাসুরমর্দ্দিনী মহামায়া সিংহবাহিনীকে অবতারিত করিতে চাহে। এই বর্ত্তমান যুগ। এই যুগ যে কেবল ইউরোপে আসিয়াছে তাহা নহে, সমগ্র জগতেই আসিয়াছি। ইহাই বর্ত্তমান যুগ। মানুষ আজ বুঝিয়াছে অকালমৃত্যু, রোগ, অত্যাচার, অনাহার প্রভৃতি যত কিছু অনর্থ, তাহা নিবারণ করা যায়।

আত্মশক্তিতে এই বিশ্বাস এবং আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি—ইহাই প্রথম স্তর। কিন্তু ইহাই শেষ নহে, আত্মপুষ্টির পরে— আত্মত্যাগ ও সেবা। ইহারই নাম শক্তিভক্তিবাদ। এই ধর্ম্ম আমাদের ভারতের বেদে ও পুরাণে, তন্ত্রে ও দর্শনে, গীতায় ও ভাগবতে সুস্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। তোমরা বঞ্চিত হইও না, অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বনাশের অভিমুখী হইও না ; এই সত্য ধর্ম্ম, এই যুগধর্ম্ম,—এই ভাগবত-ধর্ম্ম, তোমরা গ্রহণ কর !

বর্ত্তমান যুগের প্রকৃত লীলাবাদী অনুভব করেন, প্রকৃতি আর পুরুষে (Between Nature and God) কোনরূপ চিরন্তন বিরোধ নাই, শক্তির যেমন একটি বহিরঙ্গা

আছে। এই অন্তরঙ্গা মূর্ত্তি বা শক্তিই শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি। তটস্থা বা জীব-শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীভগবান তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহিত পূর্ণ মিলন অনুসন্ধান করিতেছেন, স্বরূপ-শক্তি ও জীবশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া নিত্যপুরুষের সহিত নিত্য মিলন খুঁজিতেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ধর্ম্মতত্ত্ব জগতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মর্ম্মকথা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে খুঁজিতেছেন, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতেছেন। তাঁহারা দুই এক হইয়াও পৃথক হইয়াছেন, আবার এক হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। কোথায় তাঁহারা এক হইবেন—ভক্তচৈতন্যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে :—এখানে 'শ্রী' কথার অর্থই 'শ্রীরাধা'। এই মিলন হয় ভক্তচৈতন্যে In the consciousness of the Devotee। ভক্তের চৈতন্য বা অনুভব, বিশ্লেষণ (Analyse) করিলে, তাহাতে যুগপৎ দুইটি জিনিস Double verge দেখা যাইবে—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতেছেন—বসন্তে সৌন্দর্য্যের মধ্যে—In the splendour, the beauty, the joy in the natural world. শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে খুঁজিতেছেন—ব্রজগোপীগণ সঙ্গে বিহার করিতে করিতে —In the fulness of His Bliss and Love.

শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে এই সত্য প্রকট, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সাধনা অবলম্বন করিয়া এই সত্য বা এই যুগধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—বর্ত্তমান পৃথিবী এই সত্য গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অতএব—

জয় রাধা, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।

—o—

ধর্ম্ম—সনাতন ও ঐতিহাসিক

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদিত ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ও অনুষ্ঠেয় বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম। চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে আবির্ভূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদিত এই ধর্ম্ম, নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন। পরম পূজনীয় গোস্বামীপাদগণ এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রাচীন ও প্রামাণিক শাস্ত্র সমূহের ব্যাখ্যা করিয়া এই ধর্ম্ম বুঝাইয়া গিয়াছেন।

এই ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। প্রথমতঃ, এই ভারতবর্ষে বা হিন্দুস্থানে ইহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এবং কালে, এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন হইবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকটলীলার পর, গত চারিশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে যত প্রকারের ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির প্রতিই শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব পোষণ করা উচিত। তাঁহাদের কার্য্যে ও উপদেশে যাহা কিছু মহৎ, উদার ও উন্নতিমুখী, তাহা গ্রহণ করা উচিত। এই প্রকারে প্রত্যেক ধর্ম্মান্দোলন শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পর অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালাদেশে যে-সমুদয় ধর্ম্মান্দোলন ও সামাজিক আন্দোলন হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই বুঝিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য এবং তাঁহার মত ও অভিপ্রায়কে জয়যুক্ত করিবার জন্য। সকলে ইহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাহাতে ক্ষতি নাই, ক্রমশঃ চিন্তাশীল ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই ইহা বুঝিবেন। মহাপ্রভুর পর যে-সব মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য। তাঁহারা সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বা আকাঙ্খাকেই, নিজ নিজ অধিকার ও প্রয়োজনানুসারে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। একদল একটি দিকের উপর জোর দিতে গিয়া, আর একটি দিক্‌কে বা অন্যান্য দিক্‌গুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। এজন্য অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নহে। মহাপ্রভুকে বুঝিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে এই কথার সার্থকতা ও সত্যতা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে। যিনি সত্য করিয়া মহাপ্রভুকে বুঝিতে ও সমগ্র জীবনের দ্বারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কোনও বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে বা কোন বিশেষ মতবাদ খণ্ডিত করিতে, তাঁহার কোনরূপ ব্যস্ততা নাই।

ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছে, কেবলমাত্র সেইগুলিই যে মহাপ্রভুকে বুঝিবার, বুঝাইবার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টামাত্র, তাহা নহে ; গত চারিশত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যত ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছে, সেগুলিও ঐ একই উদ্দেশ্যে হইয়াছে। *

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত উদার ও বিশ্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মকে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত বিবদমান একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। কোনও ধর্ম্মমতকে ধ্বংশ করিবার জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের ভিতরেই বিশ্বজনীন চরম ও পরম আদর্শ বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে ; সেই বীজে সাধনবারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে অঙ্কুরিত ও বিকশিত করিতে হইবে। এই মহাসত্য বা সারসত্যই মহাপ্রভু প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। "সর্ব্বধর্ম্মময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম।"

আমাদের দেশে যাঁহারা শক্তি-উপাসক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এখনও মনে করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মহৎ হইলেও তিনি আমাদের নহেন। এই ভুল ধারণা একেবারেই মারাত্মক। মহাপ্রভু মুখ্যতঃ বা মূলতঃ, এমন কিছু দিয়া গিয়াছেন যাহা শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গাণপত্য, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, বা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, আর্য্যসমাজী—কাহারও নিজস্ব বা একচেটিয়া নহে, অথচ তাহা সকলেরই।

বিশুদ্ধগণিত বা Pure Mathematics বলিয়া একটা জিনিস বা বিদ্যা আছে। অন্যান্য প্রত্যেক বিজ্ঞান, এই 'বিশুদ্ধ গণিত' নামক বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, কোন বিদ্যাই বিজ্ঞান-পদ-বাচ্য হইতে পারে না। সেইরূপ পৃথিবীতে যত প্রকারের ধর্ম্ম আছে বা হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের মূলীভূত একটি বিশুদ্ধ বিদ্যা আছে। ইংরাজী ভাষায় তাহাকে Pure Mathematics of all Religions বলা যায়। ভারতবর্ষে এই বিদ্যার নামই ব্রহ্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা, রাজবিদ্যা বা বেদান্ত। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি এই বিদ্যার অধিকারী। যিনি এই বিদ্যার অধিকারী, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মবিৎ বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন না। কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিলে, অতিশয় লজ্জা ও কুণ্ঠা বোধ করেন।

---

* বহুদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে 'বীরভূমি'তে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে সুইডেন্‌বর্গিয়ান্ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, কোয়েকার, মেথডিষ্ট্‌ প্রভৃতি সম্প্রদায়, রোসিক্রুসিয়ান্, ভাববাদী বা মিষ্টিক্ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আলোচনা করিয়া সংক্ষেপে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকেরা এই পথে অনুসন্ধান করিলে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

এই যে বিদ্যা ইহা সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক। ইহাকে সমুদয় ধর্ম্মের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বলিতে পারেন। The G. C. M. and L. C. M. of all Religions. সমুদয় ধর্ম্মের ইহা মূলীভূত সারস্বরূপ এবং এই বিদ্যাই সমুদয় ধর্ম্মের শেষ পরিণতি। At once the possibility and fulfilment of all Religions.

বর্ত্তমান যুগ মানবের স্বাধীনতার যুগ, মানবের মহামিলনের যুগ। পৃথিবীতে যত প্রকারের ধর্ম্ম আছে, সকল প্রকারের ধর্ম্মের আচার্য্যগণই কেবল নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নিকট নহে, সাধারণ সভা বা জনসাধারণের সভা করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মের মত প্রচার করিবেন। এই অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু না বুঝিয়া, না জানিয়া, অথবা কেবল একাংশমাত্র জানিয়া অন্য ধর্ম্মকে গালাগালি করিবার অধিকার,—অন্ততঃপক্ষে প্রকাশ্যভাবে গালাগালি করিবার অধিকার কাহারও নাই। যে ধর্ম্মের বা যে মতের, যে শিক্ষার বা যে অনুষ্ঠানের কোনরূপ যুক্তিযুক্ত ও বিশ্বজনীন তাৎপর্য্য নাই, তাহা সাধারণ সভায় সকল প্রকারের মতাবলম্বী লোকের নিকট বলিতে পারা যায় না এবং বলাও উচিত নহে। সুতরাং, কোনও হিন্দুসভার বিজ্ঞাপনে যদি লেখা থাকে The public are cordially invited to come—অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণকে সসম্মানে আহ্বান করা হইতেছে, তাহা হইলে সেই সভায় যাহা কিছু বলা হইবে, তাহা যেন সার্ব্বজনীন হয়। যাহা কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ রকমের লোকের জন্য বা কেবল মাত্র একটি সম্প্রদায়ের জন্য, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে,—তাহা সেই সভায় আলোচিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের এই লক্ষণটি যদি প্রত্যেক ধর্ম্মাচার্য্য মনে রাখেন, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলীভূত পরাবিদ্যার অনুশীলন মানব-সমাজে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ধর্ম্মের মুখ্য ও গৌণ অংশের তত্ত্ব ও মর্ম্ম (Essential and Non-essential) বুঝিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মকে আমরা সেই বিশুদ্ধ পরাবিদ্যা বলিয়াছি। এখন চিন্তা করিতে হইবে—এই বিশুদ্ধ পরাবিদ্যাকে ব্যক্ত করা যায় কি প্রকারে? এই পরাবিদ্যার একটি নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু আমরা কেহই সে-ভাষা ঠিকমত জানি না। সে-ভাষা নিশ্চয়ই বিশ্বজনীন হইবে। আমরা যখন সে-ভাষা জানি না, তখন আমরা বুঝিতে পারি বা পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এমন একটা ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। এই যে ভাষার কথা বলিতেছি, ইহা ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, গ্রীক্, লাতিন প্রভৃতি ভাষা নহে। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটি ভাষা। পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা তত্ত্বজগতের বা ভাবজগতের কথা বলেন। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের রাজ্যে সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বা ভাবকে ব্যক্ত করিতে হইবে। এই স্থান হইতেই ভাষা সংগ্রহ করিতে হইবে। এক এক সম্প্রদায় এক একটি ভাষা। একই তত্ত্বকে

(Eternal Idea or Principle) যজ্ঞের ভাষায়, যোগের ভাষায়, জ্ঞানের ভাষায়, আবার প্রেমের ভাষায় ব্যক্ত করা যায়। একই তত্ত্ব বা একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ শক্তিশাস্ত্র, তন্ত্র, চণ্ডী বা ষট্‌চক্র প্রভৃতির ভাষায় বলা যায়; আবার ঐ কথাই বৈষ্ণবের ভাষায় অর্থাৎ ভাগবত, লীলা, পদাবলী, বৃন্দাবন, মান, মাথুর প্রভৃতির সাহায্যেও ব্যক্ত করা যায়। যোগের ভাষাতেও তাহা ব্যক্ত হইতে পারে। খৃষ্টানের ভাষায় কি ঐ সব ভাব ব্যক্ত হয় না? কেন হইবে না? Baptism, Holy Ghost, Eucharist, Atonement প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারাও ঐ সব তত্ত্বই ব্যক্ত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ভাগবতসম্প্রদায়ের সাধনা ও ভাষা অবলম্বন করিয়া সেই নিত্য ও পারমার্থিক সত্যসমূহ জগৎকে শিখাইয়াছিলেন। ভারতের এই বেদপন্থী সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে, এই ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবোধ্য। অন্যদেশের লোক অন্যপ্রকারের সাধনা ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে, এই সব পারমার্থিক সত্য বুঝিতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই যুগধর্ম্মের প্রামাণ্য-গ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার এই শ্রীমদ্ভাগবতকে যখন 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবত কেবলমাত্র সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য নহে। উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন সার্ব্বজনীন, শ্রীমদ্ভাগবতও ঠিক তেমনই সার্ব্বজনীন। 'শ্রীমদ্ভাগবত সার্ব্বজনীন' এই কথার অর্থ—'শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য যে ধর্ম্ম, তাহাও সার্ব্বজনীন।'

আমরা আমাদের ধর্ম্মকে চিরকাল "সনাতন" এই আখ্যা দিয়া আসিতেছি। আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত নামই 'সনাতন ধর্ম্ম।' 'সনাতন' কথার অর্থ,—সকল দেশের, সকল কালের ও সকল মানুষের। সনাতন ধর্ম্ম যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে তাহাতে 'স্বগত' ভেদ আছে। যেমন একটি গাছে, কুড়িটি শাখা, দুইশত প্রশাখা, পাঁচ হাজার পাতা, চারি হাজার ফুল ও এক হাজার ফল। এতগুলি শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল থাকিলেও গাছ একটি-মাত্র। শাখাপ্রশাখা প্রভৃতির বহুত্বের দ্বারা গাছের ঐক্যের হানি হয় নাই। গাছ একই—'একমেব' এবং 'অদ্বিতীয়', কিন্তু তাহাতে অর্থাৎ সেই ঐক্যের মধ্যে, বহু শাখা প্রশাখা প্রভৃতির স্থান আছে। এই এক প্রকারের একত্ব—Unity;—বহুকে লইয়া (Comprehending the many) এই একত্বের প্রতিষ্ঠা। এই একত্বকে Unity in diversity বলে। 'সনাতন ধর্ম্ম' এই প্রকারে এক ও অদ্বিতীয়।

খৃষ্টান ধর্ম্মকে ঠিক্ এই অর্থে 'ধর্ম্ম' এই নাম দেওয়া যায় না, মুসলমান ধর্ম্মকেও ঠিক্ এই অর্থে 'ধর্ম্ম' এই নাম দেওয়া যায় না। ইহারা প্রত্যেকে একটি মত বা একটি পথ;—একজন আচার্য্য, মহাপুরুষ বা অবতারকে আশ্রয় করিয়া এই সব

একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, মহম্মদও একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি; যীশুখৃষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া, ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার বলিয়া যদি স্বীকার কর, তাহা হইলেই তুমি খৃষ্টান, নতুবা তোমার খৃষ্টান হইবারও কোন উপায় নাই, আর খৃষ্টিয়মতে তোমার পরিত্রাণেরও কোন উপায় নাই। সেইরূপ মহম্মদই শেষ ও সর্ব্বোত্তম 'প্রেরিত-পুরুষ' তাঁহাকে না মানিলে তুমি মুসলমান হইতে পারিবে না এবং মুসলমান মতে তোমার পরিত্রাণেরও উপায় নাই।

কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম, কোন একজন অবতার বা মহাপুরুষকে একমাত্র অবতার বা পরিত্রাতা বলিয়া প্রচার করেন নাই। অবতার-বাদে বিশ্বাস না করিলেও সনাতন ধর্ম্মী হওয়া যায়। ভারতবর্ষে তান্ত্রিক-যোগীদের মধ্যে এমন অনেক ভাল লোক আছেন, যাঁহারা অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, এই মানুষই সাধনার দ্বারা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র, বা নৃসিংহ, বামন বা বুদ্ধদেব হইয়াছেন। ইঁহারা 'উত্তারবাদী'। "কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ"---এখানে 'নারায়ণ' বলিতে নারায়ণ ঋষিকে বুঝিতে হইবে। নারায়ণ ঋষি সুকঠোর তপস্যার দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চাবস্থায় (At a very high stage of His spiritual evolution) তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন। এই মত এখনও অনেক তান্ত্রিকযোগী-সমাজে প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মতকেও উপেক্ষা করেন নাই, আংশিকরূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের বুকের উপর অনেক ঐতিহাসিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা যাঁহাদের 'অবতার' বলি, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি—Historical person। নৃসিংহ, বামন, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহারা সকলেই একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হইয়া লীলা করিয়াছেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেককে অবলম্বন করিয়া এক একটি উপাসকমণ্ডলী, ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, এই ঐতিহাসিক ধর্ম্ম (Historical Religion) সনাতন ধর্ম্মকে নষ্ট করে নাই, ধ্বংস করে নাই (has not destroyed)—পরন্তু এই সনাতন ধর্ম্মকে সফল করিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের অনন্ত বিভাব (aspect) বা বৈচিত্র্য (variety) আছে---সেই অনন্ত বিভাব বা বৈচিত্র্যের মধ্যে কতকগুলিকে খুব উজ্জ্বল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া সনাতন ধর্ম্মেরই একটি যুগোপযোগী মূর্ত্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবতার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'। এই উক্তির দ্বারাই সনাতন ধর্ম্ম ও ঐতিহাসিক ধর্ম্মের (Religion—Eternal and Historical) বিরোধের যাবতীয় ক্ষেত্রের সমাধান করা হইয়াছে ;: রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা চৈতন্য---ঐতিহাসিক হইলেও, কেবলমাত্র

ঐতিহাসিক নহেন (not merely historical), তাঁহারা তত্ত্ব বা সনাতন সত্যের মূর্ত্তি—Each is an Incarnation of some Eternal Principle। গীতা বলিলেন, সেই তত্ত্বটিকে নিজের ভিতরে উত্তমরূপে বুঝিয়া, সেই তত্ত্বের আলোকে বা সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রকাশ বা Manifestation রূপে ঐতিহাসিক অবতারটিকে বুঝিবেন। প্রথমে ভিতরে তাহার পর বাহিরে। From within outwards—ইহাই পদ্ধতি। শ্রীধর স্বামী এই পদ্ধতি বুঝাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'অন্তর্দৃষ্ট্যা শ্রোতব্যম্'।

খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশিষ্ট মতবাদের ধর্ম্মের সহিত সনাতন ধর্ম্মের এইখানেই প্রকৃতিগত প্রভেদ। বিশিষ্ট মতবাদের ধর্ম্মকে ইংরাজীতে বলে—Credal Religion। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন, এবং নিজেরাও অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্যটুকু তাঁহারা জানিতেন না, খৃষ্টানধর্ম্মের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মকেও একটি বিশিষ্ট মতবাদের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ ও কেদারনাথ দত্ত, ইঁহারা উভয়েই এই শ্রেণীর লোক। শিশিরবাবু ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন; কেদারবাবু কিছু কিছু দর্শনশাস্ত্রও পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় মীমাংসার সহিত কোনরূপ পরিচয় ছিল না, সেজন্য তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত ঐতিহাসিক ধর্ম্ম ও ইহুদি জাতির ঐতিহাসিক ধর্ম্ম, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, তাহা ধরিতে পারেন নাই। এক কথায় The Brahminical genius for Synthesis কি রকমের ব্যাপার—হয়, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই, অথবা অন্যরূপ উদ্দেশ্য থাকার জন্য সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে এ বিষয়ে কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলাম—একজন বন্ধু বক্তৃতাগুলির কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, সংস্কৃত বা বিস্তারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে ভদ্রসমাজে গত চারিশত বৎসর কাল যে আকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার আলোচনা করার পর, যদি খৃষ্টিয় ধর্ম্মের সহিত উহার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে একটি খুব বড় রকমের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। খৃষ্টিয় ধর্ম্ম ইহুদি-সমাজে যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন যাহারা খৃষ্টান হইয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল—ইহুদি ছাড়া আর কাহারও খৃষ্টান হওয়ার অধিকার নাই। ইহুদি ধর্ম্ম কৌলিক ধর্ম্ম (Ethnic Religion)। ইহুদিরা জানিত এবং এখনও জানে—তাহারা ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র (Chosen People)। হিন্দুদের দশসংস্কারের ন্যায় উহাদেরও সংস্কার (Sacraments) আছে। হিন্দুরা যেমন অহিন্দুকে ম্লেচ্ছ বা যবন বলিত, উহারাও তেমনি ইহুদি ছাড়া অন্য লোককে

"খৃষ্টানধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর সাধারণ ইহুদিরা জানিত—যে ব্যক্তি ইহুদিবংশে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহুদি-সংস্কার যাহার হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই খৃষ্টান হইবার অধিকারী। সেণ্টপল সর্ব্বপ্রথম ইহুদি ছাড়া অন্য লোককে খৃষ্টান-মতে দীক্ষিত করিলেন। ইহুদি-খৃষ্টানেরা ইহাতে আপত্তি করিলে সেণ্টপল্ বলিলেন—আমার প্রভুর আদেশ, তাঁহার বার্ত্তা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইবে। ইহার পর হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম, সেণ্টপলের খৃষ্টান ধর্ম্ম (Pauline Christianity) হইয়া পড়িল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মূলে মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায়, সেমিটিক অর্থাৎ আরব ও ইহুদি সাধনা হইতে উদ্ভূত। ক্রমশঃ প্রাচীন গ্রীসের সাধনা, নবা প্লেতনীয় ভাবুকতা (Neo platonic Mysticism) প্রভৃতির দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ হওয়ায় আর্য্যজাতির উপযুক্ত হইয়াছে।

"সেণ্টপলের পর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যেমন একদিকে বিশ্বজনীন Universal হইয়াছে, তেমনি আর একদিকে একটি বিশিষ্ট মতবাদে পরিণত হওয়ায় আক্রমণশীল হইয়া উঠিল। সুপ্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আসিরিয়া, ব্যাবিলন্ মিশর, গ্রীস, প্রভৃতি দেশে নানা দেবদেবীর পূজা, নানা প্রকারের তত্ত্বসাধনা ও রহস্যবিদ্যা প্রচলিত ছিল, নানা প্রকারের মন্ত্র, যন্ত্র, ক্রিয়াযোগ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার প্রচলিত ছিল. খৃষ্টানদের অত্যাচারে তাহা ধ্বংস হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্ম বিশ্বব্যাপী হইয়াছে সত্য, প্রেম, করুণা ও পরার্থপরতার বাণী প্রচার করিয়াছে, ইহাও সত্য ; নানা দেশের নানা জাতির এবং সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত জনমণ্ডলীকে অধিকারের বিচার না করিয়া একই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে, ইহাও হয়ত কিয়ৎপরিমাণে সত্য ; কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনেক রহস্য ও বিবিধ প্রকারের সাধন-প্রণালী ধ্বংস করিয়া মানব জাতির অশেষ প্রকারের ক্ষতিও করিয়াছে।

"বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্মের ন্যায় Credal অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট মতবাদের আক্রমণকারী ধ্বংসশীল ও সর্ব্বগ্রাসী ধর্ম্ম কি না, তাহাই বিবেচ্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হয় নাই, কি প্রকারে এই ইতিহাস লিখিত হইবে, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাও হয় নাই, ইতিহাস লিখিবার প্রকৃত উপকরণেরও অভাব, ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিহাস লিখিতে হইলে যে নির্ভীকতা, নিরপেক্ষতা ও সংস্কার-মুক্ততা আবশ্যক, তাহারও অভাব। কিন্তু ইতিহাস জানিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে সমস্যা এই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে দীক্ষা লইবেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুসমাজের সংস্কার-সমূহ মানিবেন কিনা ? শিব, দুর্গা, কালী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী ও তাঁহাদের পূজার বিধান মানিবেন কিনা ? প্রাচীন সমাজ ও তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহকে বৈষ্ণবেরা রাখিবেন, কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন ?

"এখন, অনেকেই বৈষ্ণব, অনেক ইংরাজী-পড়া লোক এই ধর্ম্মের প্রচারক, গ্রন্থলেখক ও গুরুগিরি-ব্যবসায়ীও হইয়াছেন। এই সব নব্য বৈষ্ণবের মধ্যে কেহ

কেহ দেবতা মানেন না, মূর্ত্তিপুজা বা পৌত্তলিকতা ধ্বংস করার জন্য কেহ বদ্ধপরিকর, কেহ জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চাহেন, কেহ তন্ত্র-শাস্ত্র মানেন না। নানারূপ বিভ্রাট !

"প্রাচীন খৃষ্টানের আদিগুরু রোমের পোপ দাবী করেন—স্বর্গের একটিমাত্র চাবি, আর সেই চাবিটি তাঁহার হাতেই আছে। তিনি ছাড়া আর কেহ স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া দিতে পারে না। মানবজাতির আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিবার অধিকার তাঁহার একচেটিয়া। এই অভিমানের বা ভ্রান্ত-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মগুরু পোপ করেন নাই, এমন অপকর্ম্ম নাই। যাহারা স্বাধীনভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছে, বা প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছে, তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে। সেদিনও পোপ ঘোষণা করিলেন—"ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর গ্রন্থ যেন কেহ না পড়ে"। ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজের যতই দোষ থাকুক, ধর্ম্ম কখনও কাহারও একচেটিয়া ছিল না। যাহারা চিন্তাশীল, সনাতন ধর্ম্ম কখনও তাঁহাদের স্বাধীন-চিন্তায় হস্তক্ষেপ করে নাই। এই জন্যই এত সম্প্রদায় এবং একই শাস্ত্রের এত প্রকারের ব্যাখ্যা। প্রতিষ্ঠান-শাসিত ধর্ম্ম (Institutional Religion) আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ নহে। শঙ্করাচার্য্য মঠ করিয়াছিলেন, প্রয়োজনের তাড়নায় (as an emergency measure)। তিনি সন্ন্যাসীর দল বাড়াইতে চাহেন নাই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করা, বা গার্হস্থ্য জীবনে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। **অবিবাহিত সন্ন্যাসীরা পেশাদারী গুরুগিরি করিবে, ইহা সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত ব্যবস্থা নহে।** হিন্দুর দেশে নগর যেমন সভ্যতার কেন্দ্র নহে, প্রত্যেক গ্রাম স্বাধীন (Antonomous)—ধর্ম্মজীবনও ঠিক্ তেমনি। প্রত্যেক দরিদ্র ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনশীল হইয়া স্বাধীনভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী। তিনি নিজের শিষ্য ও যজমানদিগের ধর্ম্মজীবন পরিচালিত করিবেন। কেন্দ্রস্থ ও প্রবল মঠাধ্যক্ষের মত, কেহই মানিতে বাধ্য নহে। ইহাই আমাদের স্বরাজ।

"এখন অনেক নব্য-বৈষ্ণব, খৃষ্টান ধর্ম্মের ছাঁচে বৈষ্ণব-সমাজ বা হিন্দুসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। একদল বলিতেছেন—আমরা ছাড়া অন্য কাহারও দীক্ষা দেওয়ার অধিকার নাই, নিত্য-বৃন্দাবনের একটি চাবি, তাহার মালিক আমরা। খোলাখুলিভাবে কথা বলিবে না, মানুষের চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবে না, কেবল অলৌকিকের দোহাই! হিন্দু জন্মান্তরবাদী, হিন্দু কর্ম্মবাদী, হঠাৎ কিছু হইবে না, সাধনার পথে ক্রমে ক্রমে সোপানের পর সোপান বাহিয়া জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া, লোক লোকান্তর অতিক্রম করিতে হইবে। দীর্ঘপথ, কঠিন পথ। ইহাই হিন্দু চিরকাল জানে। এখন পেটেণ্ট ধর্ম্মের কোম্পানি হইয়াছে, গরিবকে খাওয়াইব বলিয়া ছলেবলে কৌশলে টাকা ভিক্ষা করিয়া

গ্যারাণ্টি করা ধর্ম্ম, ছয়মাসে ব্রহ্মদর্শন! টাট্‌কা বীজমন্ত্র আমেরিকা হইতে আমদানী— সাধনভজনের প্রয়োজন নাই, চরিত্র বা সদাচারের দরকার নাই, নগদমূল্যে মন্ত্র লইলেই, বিনা-সাধনায় সিদ্ধি!

"ধার্ম্মিক লোকের ভিতর এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বলিবেন, সমাজে কি হইতেছে, কে কি করিতেছে, তাহা দেখিয়া কি হইবে? আমি ধ্যান করিয়া, জপ করিয়া, তত্ত্বচিন্তা করিয়া মুক্তিলাভ করিব—দেশের কথা, সমাজের কথা ভাবিয়া কি হইবে?

"সনাতনধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন—সমাজ একটি কৃত্রিম বস্তু নহে, একটা হাতে-গড়া চুক্তিবন্ধন নহে। সমাজ ভগবানের দেহ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই, এই দেহের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত, এই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ভগ্নদশায় পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু আদর্শ আছে। আমাদিগকে এই বর্ণাশ্রম আবার গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রথমে ভারতবর্ষ, তাহার পর ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সেই সামাজিক ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত হইবে। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের বিধান উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে, বালকবালিকাগণের শিক্ষাব্যবস্থা এই বিধি অনুসারে নির্দ্ধারিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। দেবলোক, পিতৃলোক, ঋষিলোক সত্য—কল্পনা নহে, রূপক নহে। মন্ত্রযোগ, ক্রিয়াযোগ সত্য—প্রাচীন জগতের ভ্রান্ত বিশ্বাস বা কুসংস্কার নহে। দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকের সহিত আমাদের যে মধুময় সম্বন্ধ ছিল, তাহা বহুল পরিমাণে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা। সেই সম্বন্ধ যাহাতে আবার সুপ্রতিষ্ঠ হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম একটা ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। সনাতন ধর্ম্মের এই সব প্রাথমিক কথা, তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

"বেদপন্থী সমাজ, এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে একটি সুমহৎ লক্ষ্য লইয়া, সেই লক্ষ্য-সাধনের জন্য বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কত দেশের, কত জাতির, কত মহাজাতির, কত সাম্রাজ্যের ও কত সভ্যতার উদ্ভব ও বিলয় হইয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মণ্যদেব এই সমাজ, এই শাস্ত্র ও এই সাধনাকে রক্ষা করিয়াছেন। প্রয়োজন আছে এই শাস্ত্রের, এই সাধনার ও এই সমাজের। এই প্রয়োজন, তোমার আমার প্রয়োজন নহে, সেই বিশ্বনাথ বেদপুরুষ ব্রহ্মণ্যদেবেরই প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সনাতন ধর্ম্ম ও সেই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা রক্ষা করিতেই আসিয়াছিলেন। সুতরাং, আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে কে কি করিতেছে, তাহার খবর লওয়া ও নিরপেক্ষভাবে তাহার আলোচনা করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। আমরা নিজেদের দেশের ও সমাজের কথা জানি না। আমরা দেশের লোককে উন্নীত করিতে চাহি না এবং তাহা করিবার তেমন শক্তিও আমাদের নাই। আমরা আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া কর্ত্তা হইতে চাই। আমেরিকাকে হিন্দু

করিবার চেষ্টার পরিণাম কি ? আমেরিকা Hinduised হইবে, না হিন্দু Americanised হইবে, —ইহাও তো ভাবা দরকার।"*

সনাতন ধর্ম্মের বুকের উপর, কালের প্রয়োজনে যুগে যুগে অসংখ্য ঐতিহাসিক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে ; কিন্তু কোন কালেই একজন অবতার, অন্যান্য অবতারকে গ্রাস করিয়া ফেলেন নাই। সনাতন ধর্ম্মের একটি সম্প্রদায়ের নাম হইল—'বৈষ্ণব'। 'বিষ্ণু' বৈদিক দেবতা—সুতরাং 'বৈষ্ণব', সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীকেই বুঝায়। তাহার পর শ্রীরামচন্দ্রের, নৃসিংহদেবের বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ আসিলেন,—তাঁহারাও বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীনৃসিংহদেবকে উপেক্ষা করিলেন না. নিজের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের অভিন্ন-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য বৈদিক দেবতাও উপেক্ষিত হইলেন না, তাঁহারাও পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অঙ্গ-দেবতা রূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চ উপাসকের উপাসনার ভাব দেখিলেই ব্যাপারটি বুঝিতে পারা যাইবে। গাণপত্য, সৌর, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চ সম্প্রদায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজের উপাস্যকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন। "তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ; তুমিই সগুণ, তুমিই নির্গুণ ; তুমিই প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ"—এই কথাগুলি গাণপত্য বলেন গণেশকে, সৌর বলেন সূর্য্যকে, শৈব বলেন শিবকে, শাক্ত বলেন শক্তিকে, আর বৈষ্ণব বলেন বিষ্ণুকে। সুতরাং গণেশ, সূর্য্য, শিব, শক্তি বা বিষ্ণু, নিজ নিজ উপাসক বা সম্প্রদায়ের কাছে ইঁহারা প্রত্যেকেই পরব্রহ্ম, বা পরমেশ্বর। গণেশ, সূর্য্য, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি একদিকে (According to one conception) যেমন পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, তেমনি আর একদিকে, এক একটি দেবতা অর্থাৎ পরব্রহ্মের এক একটি বিভূতি বা শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডের লীলায় এক একটি বিশেষ কার্য্যের অধিকারী বা কর্ত্তা। আবার, বেদে সূর্য্য ও বিষ্ণু অনেক স্থলে অভিন্ন।

সনাতন ধর্ম্ম, একটি মাত্র সম্প্রদায় বা একজন মাত্র অবতারপুরুষের উপাসনা নহে। বহু সম্প্রদায়, বহু অবতার, বহু মত, বহু পথ—এই সকলের মিত্রমণ্ডলী। It is not one Faith, but a Federation of many Faiths.

Federation কথাটি রাজনীতিশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত কথা। আমরা আমাদের ভাষায় ইহার অনুবাদ করিলাম—"মিত্রমণ্ডলী"। কথাটার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া অবধারণ করিতে হইবে। অনেকগুলি রাজ্য সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও স্ব-সম্পূর্ণতা

* ইং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ও ২০শে জ্যৈষ্ঠ, কতকগুলি বিশেষ কারণে উত্তরপাড়ায় দুইটি বক্তৃতা দিই। বক্তৃতার পর বন্ধুগণ সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়।

(Freedom and Integrity) অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইলে, সেই মিলনকে 'মিত্রমণ্ডলী' বা Federation বলে।

সনাতন ধর্ম্ম এই প্রকারের মিত্র-মণ্ডলী। ঐতিহাসিক ধর্ম্ম—যেমন জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বা রামায়েৎ ধর্ম্ম বা, গৌরাঙ্গ ধর্ম্ম ইহার বুকের উপর উদ্ভূত হইয়াছে। এই সব ঐতিহাসিক সম্প্রদায় যদি পূর্ব্বকথিত মিত্রমণ্ডলীর ব্যবস্থা অনুসারে চলেন, তাহা হইলে তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের শাখারূপে অন্যান্য শাখার সহিত মিত্রভাবে মিলিত হইয়া চলিতে পারিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহা না পারেন, যদি কোন সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্মের যাহা মৌলিক নীতি তাহা উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ অধিকারী ভেদ, রুচিভেদ, বৈচিত্র্যের ও পার্থক্যের স্বভাবিকতা, বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও মৌলিক একত্ব প্রভৃতি উদার ও সার্ব্বজনীন নীতি পরিত্যাগ করেন, যদি কোন সম্প্রদায় বলেন—আমিই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা, তাহা হইলে সেই সামরিক ও আক্রমণ-পরায়ণ সম্প্রদায় (That aggressive and militant creed) সনাতন ধর্ম্মের মিত্রমণ্ডলীতে বা হিন্দুসমাজে স্থান পাইবে না। বৌদ্ধধর্ম্ম এই প্রকারে স্থানচ্যুত হইয়াছে, জৈনধর্ম্মের একাংশও এই কারণে নিন্দিত হইয়াছে।

হিন্দু-সংগঠনের ধূয়া উঠিয়াছে, খুবই ভাল ; কিন্তু আক্রমণকারী আর্য্যসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। আর শিশিরবাবু, কেদারবাবুর ন্যায় অল্প-স্বল্প ইংরাজী পড়া বিষয়ী অথচ বুদ্ধিমান লোকেরা, বাঙ্গালা দেশে অদ্বৈতবংশে, নিত্যানন্দবংশে বা আচার্য্য মহাশয়ের বংশে ও পরিবারে, বংশপরম্পরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কিভাবে চলিতেছে তাহা না জানার জন্য, ইহুদি জাতির সামরিক ধর্ম্মের (The Judaic credal and militant religion) অনুকরণে এবং বাবাজী-পন্থার অনুসরণে যে সংকীর্ণ ও অনুদার বৈষ্ণব মত চালাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণও সতর্ক হইবেন।

লীলা বলিলে, প্রথমতঃ একটি পাপঞ্চিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা বুঝায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত যে ধর্ম্ম, তাহাও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ন্যায় একটি অসহিষ্ণু ধর্ম্মমত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'নিত্যলীলাবাদ' প্রচার করিয়া দেখাইলেন, বৃন্দাবনচন্দ্রের উপাসনা সার্ব্বজনীন। তিনি এই ধর্ম্মমতকে Universalize করিয়া দেখাইলেন, বিশুদ্ধ বেদান্ত বা ব্রহ্মবিদ্যার সহিত ইহা অভিন্ন। ঐতিহাসিকতা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই ঐতিহাসিকতাই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ভিত্তি নহে। Historicity is not the basis of Krishna-worship. ভক্ত যে-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ; ভক্তের হৃদয়ে তাঁহার নিত্য বাস ; ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ, সেই নিত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ মাত্র —Manifestation of the Eternal in time and space.

"এই রূপ রতন, ভক্তজনের গূঢ় ধন,

যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের অন্তরতম অনুভব ও অভিজ্ঞতা (The transcendental experiences of the Mystics) প্রপঞ্চের ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে (has been expressed in terms of the ordinary human consciousness)। অতএব আমরা অন্তর্মুখী হইয়া বাহিরের ব্যাপারকে ভিতরের ব্যাপার বলিয়া বুঝিব। যাঁহারা রসিক ও ভাবুক, তাঁহারা ইহা পারেন ; তাঁহারাই ইহার অধিকারী। অনধিকারীর হাতে পড়িলেই সর্ব্বনাশ।

মন্তব্য ও সংবাদ

সাপ্তাহিক পত্রিকা—শক্তি—প্রায় দেড় বৎসর হইল বর্দ্ধমান হইতে এই সাপ্তাহিকখানি বাহির হইতেছে। মফঃস্বল হইতে প্রকৃত সাপ্তাহিক বাহির করা প্রায় অসম্ভব। তাহার কারণ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট নিলাম-ইস্তাহারী কাগজ। এই ব্যবস্থা একটি কৌশল ; ইহার ফলে, কোন যোগ্য-ব্যক্তির পক্ষে মফঃস্বল হইতে নিরপেক্ষ সংবাদপত্র পরিচালনা করা খুব কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় 'শক্তির'র ন্যায় নির্ভীক স্পষ্টবাদী অথচ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আন্তরিক মমতা-সম্পন্ন সংবাদপত্রের প্রচার যে কত বড় কার্য্য, তাহা দেশের মফঃস্বলের অবস্থা যাহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুলেখক বলাই দেবশর্ম্মা মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের ভয় হইয়াছিল, বাঙ্গালাদেশের মফঃস্বলের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিকখানি বা নিস্তেজ হইয়া যায়। কিন্তু দেখিতেছি, 'শক্তি'র শক্তি কমে নাই, লেখার জোর ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতেছে। সকলে সাহায্য করিয়া এই কাগজখানিকে স্থায়ী ও সমৃদ্ধ করুন—মফঃস্বলে এমন কাগজ আর নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ গোষ্ঠী—বরিশালের ভক্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় সম্পাদকরূপে এই আবেদন-পত্র বাহির করিয়াছেন।

"একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়েই বাংলার বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি পুনরায় কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। যাঁহারা এই অপূর্ব্ব চরিত্রটীকে মনুষ্য-জীবনের একদেশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা কেবল মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতিই অবিচার করেন নাই, বাংলার চিন্তা এবং কর্ম্মধারাকেও বন্ধ্যা করিয়া ফেলিয়াছেন। আজ যে বঙ্গদেশের সুধী সমাজেও রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং অর্থনীতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাহা একটী পূর্ণ ও অখণ্ড জীবনের সহিত সম্যক্ ও প্রকৃত

পরিচয়ের অভাবেই সম্ভব হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম যে এক বিরাট সংহতি-শক্তির নামান্তর—বহুল এবং বিশদ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে আপনা হইতেই এমন এক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে, যাহাতে প্রেম, বীর্য্য ও জ্ঞানের একত্র সমাবেশ দ্বারা জাতীয় উন্নতির সকল কার্য্যই সুসাধ্য হইবে। বর্ত্তমানে জাতি সংগঠনের জন্য যে সমস্ত কার্য্য প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইতেছে, কোন মূর্ত্ত-আদর্শের সহিত যুক্ত না থাকায়, কোনটিই জনসাধারণের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। বাংলার শ্রীগৌরাঙ্গ এই সকল সমীকরণের প্রথম পথ-প্রদর্শক। আজ যে চিত্তের সজীবতা এবং সরসতার অভাবে সকল কার্য্যই ক্ষণভঙ্গুর, মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গ সেই চিত্ত শুদ্ধির একমাত্র উপায়। তাই মহাপ্রভুর জীবনের পূর্ণ ও বৈষ্ণব-মহাজনানুমোদিত আলোচনা দ্বারা বঙ্গ-সমাজকে গৌরাঙ্গভাবের ভাবুক করা, বর্ত্তমানের সমস্ত জটিল সমস্যার একমাত্র মীমাংসা। যথাসম্ভব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদর্শ, বাংলার জনসাধারণের জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কয়েকজন 'পতিত' পরিচালক লইয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ গোষ্ঠী" প্রতিষ্ঠিত হইল।"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি—প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। সে প্রাচীন নবদ্বীপের আর অস্তিত্ব নাই, ভাগীরথীগর্ভে প্রাচীন নবদ্বীপ আত্মগোপন করিয়াছে। এখনকার অন্যূন দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও প্রাচীন নবদ্বীপের কিয়দংশ বিদ্যমান ছিল। যে স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের বাটী ছিল, মহারাজ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সেইস্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালসহকারে সেই মন্দিরও গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এখন আবার সেই স্থানে চর পড়িয়াছে। শ্রীযুত ব্রজমোহন দাস মহাশয় দশ পনর বৎসর চেষ্টার ফলে, সেই মন্দিরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক গঙ্গাগোবিন্দসিংহের মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ভাব সকল মানচিত্র এবং এসিয়াটীক সোসাইটির প্রকাশিত দলীল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানেই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির থাকাই সম্ভবপর। দাস মহাশয় ঐ স্থানের মৃত্তিকাখনন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে এবং বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধাচরণে খনন-কার্য্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমাদের মনে হয় যে, এই খননকার্য্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কারণ, দাস মহাশয় যে স্থান প্রাচীন মায়াপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, যদি সেই স্থানে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের ভিত্তি বা ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টেরও বড় সামান্য লাভ হইবে না। কারণ ঐ স্থানটি গভর্ণমেণ্টের খাস-মহালের অন্তর্গত। তথায় গভর্ণমেণ্টের প্রায় তিন হাজার বিঘা

ভূমি আছে। অধুনা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ এবং পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ উভয় পথ দিয়া নবদ্বীপে যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে, বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহুব্যক্তি নবদ্বীপে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দশ বা পনর বৎসর পূর্ব্বে যে নবদ্বীপে ২০৷২৫ টাকাতে এক কাঠা জমি বিক্রয় করিতে পারিত না, এখন নবদ্বীপে যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে, সেই নবদ্বীপের অনেক স্থানে এক কাঠা জমীর মূল্য এক হাজার টাকাও হইয়াছে। এখনই, প্রাচীন মায়াপুর অঞ্চলে, অর্থাৎ শ্রীযুত দাস মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে, অনেকেই ভূমি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদি ঐ স্থানে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে, মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সান্নিধ্য বলিয়া ঐ অঞ্চলে ভূমি সংগ্রহের জন্য লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে; ফলে, খাসমহাল বিলি করিলে গভর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট লাভ হইবে।

এই জন্য আমাদের মতে, গভর্ণমেণ্টের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ নবদ্বীপের পরপারে, কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত বড় রেল পাতিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এই সময় যদি নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে একটি শাখা-রেল মায়াপুরের ভিতর দিয়া গঙ্গার তীর পর্যান্ত অগ্রসর হয় তাহা হইলে, কেবল যে যাত্রীদিগের যাতায়াতের সুবিধা হইবে, তাহা নহে, গভর্ণমেণ্টের খাস-মহাল অনতিবিলম্বে বহু-জনাধ্যুষিত নগরে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আমরা শুনিলাম, বেঙ্গল পূর্ত্তবিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত বোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি সত্বর নবদ্বীপে গমন করিবেন। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া এবং নবদ্বীপের সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন অধিবাসীদিগের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া সুব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। আমরা শুনিলাম যে, গভর্ণমেণ্ট যদি মন্দির আবিষ্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তবে এই মন্দির আবিষ্কারের জন্য যে এক সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, মন্দির আবিষ্কার-সমিতির কর্তৃপক্ষ তাহা গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিতে সম্মত আছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এখন যদি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে আর কিছু দিন পরে মন্দির আবিষ্কার সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে, কারণ ঐ ভূমি কেহ ক্রয় করিয়া তথায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে, আর খনন কার্য্য চলিবে না। আমরা আশা করি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নবদ্বীপে গিয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।—হিতবাদী, ১১ই চৈত্র, ১৩৩৩।

নবদ্বীপ ও জাতীয় সমস্যা—হিন্দু-বঙ্গের পল্লীসমাজের রাজধানী বা কেন্দ্র নবদ্বীপ। বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত দেশকর্ম্মিগণ যদি এই কথাটা বুঝিতে পারিতেন ও এই কথাটী যথার্থরূপে বুঝিয়া দেশসেবা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যে বিফলতা দেখা যাইতেছে, তাহা বহুলপরিমাণে কমিয়া যাইত। নবদ্বীপে এখনও পণ্ডিত আছেন, টোল

কার্য্য করিতেছে। যে প্রণালীতে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় আন্দোলনের অনুকূল নহে, প্রতিকূল। চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণ এবং ছাত্রগণ, সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহকেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেই ধারণা লইয়াই তাহারা চলেন. ২০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যখন জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন হয়, দেশের দানবীরগণ যে সময়ে মুক্তহস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা জাতীয় শিক্ষায় দান করেন. সে সময়ে যদি জাতীয় শিক্ষার নেতৃগণ নবদ্বীপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন এবং এই সংস্কৃত-শিক্ষার ব্যবস্থাকে কালের উপযোগী করিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে দেশে এতদিনে যুগান্তর হইত এবং সত্যকার একটা জাতীয় শিক্ষা দেশে দাঁড়াইয়া যাইত। কিন্তু তখন দেশের হৃদয়ের সহিত সুপরিচিত লোক দেশে ছিল না ; তাই আজ জাতীয় শিক্ষা, সাহেব-কলওয়ালার কলের মিস্ত্রী গড়িবার একটা কারখানায় পরিণত হইয়াছে !

বর্ত্তমান সময়ে নবদ্বীপে মাড়োয়ারীরা এক বিশাল ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন. এই ব্যবস্থায় সহস্রাধিক স্ত্রীলোকের জীবিকা চলিতেছে। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এ প্রকারের দান আর নাই। পূর্ব্ববঙ্গের দরিদ্র হিন্দু বিধবাগণ নানা কারণে দেশে থাকিতে পারে না, তাহারা দলে দলে নবদ্বীপে আসে। তাহারা এখানে আসিয়া দাসীবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিত ; তাহাতেও জীবিকা চলিত না। পেটের দায়ে অনেককে জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। এই নিরুপায় বিধবাগণের জঠরানল প্রশমিত করিয়া মাড়োয়ারী ধনিগণ খুবই ভাল কাজ করিতেছেন। দেশকর্ম্মিগণের যদি নবদ্বীপের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা, এমন কি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর সাহায্য লইয়া মাড়োয়ারী দাতাগণের দ্বারা চরকা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন। এই এক হাজার স্ত্রীলোক দৈনিক তিন ঘণ্টা করিয়া চরকা চালাইলে এবং তাহার সহিত তুলার চাষ ও তাঁতের ব্যবস্থা করিলে, এক নবদ্বীপ হইতেই লক্ষ টাকার খদ্দর উৎপাদিত হইতে পারিত। কিন্তু বিধিবদ্ধ ভাবে সেরূপ কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। নবদ্বীপের লোকের দ্বারা মাড়োয়ারীদিগকে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা একেবারেই অসম্ভব। মাড়োয়ারী ধনিগণ যখন প্রথমে নবদ্বীপে আসেন, তখন নবদ্বীপের অনেক ধর্ম্মধ্বজী সাধু মহান্ত তাহাদের তোষামোদ ও পদলেহন করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। মাড়োয়ারীরা কর্ম্মবীর ; তাহারা লোকচরিত্র ভালই বোঝে এবং নিজেদের স্বার্থও খুব ভাল বোঝে ; সুতরাং নবদ্বীপের লোভী, বঞ্চক, ও পীড়ক অভিনেতা সাধুদিগকে তাহারা ঘৃণা না করিয়া পারে না।

এখন দরকার নবদ্বীপে একদল সৎচরিত্র ত্যাগবীর স্বদেশ-ভক্ত সুশিক্ষিত ধর্ম্ম-প্রচারক প্রস্তুত করা। খৃষ্টান মিশনারিদের ধর্ম্ম-প্রচারকের উচ্চ পদ পাইতে হইলে বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ, ত্রিপিটক, আবেস্তা এমন কি চৈতন্য-চরিতামৃত পর্য্যন্ত পড়িতে হয়। শ্রীরামপুরের B. D ও D. D. উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেখিলে ইহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের

হিন্দু সমাজে ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া গুরুগিরি করিতে হইলে, পুরাতন পুঁথির কয়েকটা বচন ছাড়া, কিছুই জানিবার প্রয়োজন নাই। আফগানিস্থান কোথায়, অশোক মহারাজা কতদিনের লোক—এসব সংবাদও জানিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারের ধর্ম্ম লইয়া যে জাতি পড়িয়া রহিয়াছে, সে জাতি বর্ত্তমান জগতে মানবের উচ্চাধিকার কিছুতেই পাইতে পারে না। ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ প্রভৃতি উদারপন্থি ও যুগোপযোগী। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রাচীন; জনসাধারণের হৃদয়ের উপর এই ধর্ম্মের প্রভাব এতই বেশী যে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের সহিত ইহার তুলনাই করা যায় না। এখন দেখিতে হইবে— ব্রাহ্ম সমাজ বা আর্য্য সমাজ বা Theosophical Society যে যুগবাণী প্রচার করিতেছেন, সেই যুগবাণী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূর ধর্ম্মে আছে কি না। যদি থাকে, তবে নবদ্বীপের সংস্কার করা আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশে, শ্রীহট্টে, নিম্ন আসামে এবং উড়িষ্যায় এমন হিন্দুর গ্রাম নাই, যেখান হইতে নবদ্বীপে তীর্থযাত্রী না আসে—এমন গ্রাম নাই, যেখানে নবদ্বীপের বাবাজী বা গোস্বামী, ভিক্ষুক বা কীর্ত্তনীয়া না যায়। লোক-শিক্ষার কত বড় একটা ব্যবস্থা পড়িয়া রহিয়াছে! কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই ব্যবস্থার কোন সদ্ব্যবহার হয় নাই। খবরের কাগজ, ইংরাজী ও বাঙ্গালা কতই বাহির হইতেছে কিন্তু নবদ্বীপের যে সমুদয় সংবাদ, দেশের ও সমাজের জন্য অতীব প্রয়োজন, তাহার কিছুই ঐসব কাগজে হয় না। নবদ্বীপে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহার দ্বারা সমাজের ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু দেশে তাহার প্রতিকারের জন্য কোন রূপ চেষ্টা নাই। আবার, এমন ও চেষ্টা হয়ত কিছু কিছু আছে, যাহা দেশের পক্ষে হিতকর; সেই সব চেষ্টাগুলিকে কেহ মনোযোগপূর্ব্বক দেখে না। হিন্দুবঙ্গে নবদ্বীপের স্থান যে এখনও খুব উচ্চ, হিন্দুবঙ্গের আভ্যন্তরীণ জীবন-স্রোত এখনও নবদ্বীপের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত, একথা আমাদের দেশের শিক্ষিত কর্ম্মিগণ জানেন বলিয়াই মনে হয় না।

বাঙ্গালা দেশের সকল স্থান হইতে অসংখ্য নরনারী, তীর্থ-দর্শনের জন্য নবদ্বীপধাম আসিয়া থাকে। নবদ্বীপে আসিয়া তাহারা কিরূপ ব্যবহার পায়, ইহা কি দেখিবার বিষয় নহে? ঠাকুরবাড়ী মোটেই প্রাচীন নহে। কোন একজন ধনী ব্যবসা করিবার জন্য সেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার গায়ে লিখিয়া দিয়াছে—ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের সূতিকা ঘর, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের মাসির বাড়ী; কেহ লিখিয়াছে—এই খানে গৌরাঙ্গের উপনয়ন হইয়াছিল, এই খানে গৌরাঙ্গের টোল ছিল; ইত্যাদি ইত্যাদি। কত রকমের কথা, অথচ সব কথাই মিথ্যা—ইহা বালকেও জানে। দিন দুপুরে প্রকাশ্য ভাবে এই প্রকারের মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া হাজার হাজার নরনারীকে ঠকাইয়া যাহারা পয়সা রোজগার করিতেছে, তাহারাও সমাজে ভদ্রলোক, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? আজ বৈদ্য কায়স্থ নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণকে মানিতে চাহে না—কেন মানিবে? তাহারা ব্রাহ্মণকে

অপমানিত করিতে উদ্যত—কেন অপমান করিবে না? এই যে মিথ্যার ব্যবসায়, এই যে প্রকাশ্য ভাবে লোকবঞ্চনা, এই যে ধর্ম্মের নামে ব্যাভিচার, ইহার জন্য কি ব্রাহ্মণেই দায়ী নহে? এতদিন পর তিন জন বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি ভেটের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বেকার সমুদায় মন্দিরেই মালিক ব্রাহ্মণেরাই! সুতরাং আজ যে হিন্দু-সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অনৈক্যের জন্য হিন্দু-সমাজ দুর্ব্বল হইয়া নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইতেছে, ইহার মূল দায়ী নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা। তাঁহারা যদি এই মিথ্যার ব্যবসায় না করিতেন, যে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দোহাই দিয়া রোজগার করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের প্রেমের এক বিন্দুও যদি তাঁহাদের হৃদয়ে থাকিত, সেই প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যদি তাঁহারা গ্রামে গ্রামে পতিত জাতির দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া তাহাদের জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালা দেশে হিন্দু-সমাজে সত্যযুগের আবির্ভাব হইত—ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা কি করিয়াছেন এবং কি করিতেছেন? কেবল হিংসা ও দলাদলি, কেবল বঞ্চনা ও দম্ভ, কেবল প্রবলের তোষামোদ ও দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার। সুতরাং, নবদ্বীপের সমস্যা কত বড় সমস্যা, এই হিন্দু সংগঠনের যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশ কর্ম্মীর তাহা চিন্তা করা উচিত।

নবদ্বীপের তীর্থ-যাত্রীদের ট্যাক্স আছে। তীর্থ-যাত্রীদের থাকিবার জন্য সরাইবাড়ী আছে। সরাইবাড়ীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারী আছে। তীর্থযাত্রীদের কলেরা হয় বলিয়া একটী কলেরা হাঁসপাতালও আছে। কাগজে কলমে সবই আছে। ন্যূনকল্পে ২০ হাজার তীর্থ যাত্রী ধুলোটের উৎসবে নবদ্বীপধামে আসিয়া থাকে। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলারই লোক আসে। সেই সব জেলায় কংগ্রেসও আছে, কর্ম্মী আছে, তাহারা চাঁদাও তোলে, সভা সমিতিও করে, দরকার হইলে জেলেও যায়, আবার কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে সেখানেও যায়। দেশে যে মানুষ নাই, প্রাণ নাই—একথা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক জেলা হইতে হাজার দু-হাজার লোক এই নবদ্বীপে আসিয়া সাধ্যমত মুক্ত হস্তে ধর্ম্মের নামে অর্থ ব্যয় করিতেছে, এই সব লোক অশিক্ষিত ও সরল প্রাণ, তাহারা নবদ্বীপে আসিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয় কি না, তাহার খবর লইবার জন্য কোন বিচক্ষণ দেশকর্ম্মী কোন জেলা হইতে এ পর্য্যন্ত আসেন নাই; সরাইবাড়ীর অবস্থা, ঠাকুর বাড়ীতে যাত্রীদের অবস্থা, হাঁসপাতালে রোগীর অবস্থা কিরূপ, তাহা জানাবার জন্য কাহারও কৌতূহল হয় নাই, অতএব আমরা বলিতে বাধ্য—দেশে লোক আছে, প্রাণও আছে—কিন্তু বোধের অভাব খুবই বেশী।—জাগরণ, ২১শে চৈত্র, ১৩৩৩।

বঙ্গ-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ

প্রথম অধ্যায়—বিষয়-বিভাগ

[বর্ত্তমান গ্রন্থখানি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে M. A, B. L, D. Lit, মহোদয়ের History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800-1825—নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদ স্থল-বিশেষে, ভাবানুবর্ত্তন বা মর্ম্মানুবাদ। এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া, গ্রন্থকার মহোদয়, ১৯১৮ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৫২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি, ইংরাজী ভাষায় রচিত—তদুপরি, ইহার মূল্যও সাধারণ পাঠক-বর্গের পক্ষে সুলভ নহে। এইরূপ বহু মূল্যবান পুস্তক, যাহাতে বঙ্গের সাধারণ পাঠকবর্গ, মাতৃভাষার সাহায্যে আস্বাদন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সুযোগ পদান করা বিধেয়। গ্রন্থকার ডাক্তার মহাশয়েরও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ মত আছে—বলিতে কি, তিনি অতি আহ্লাদের সহিত, তাঁহার এই বহু মূল্যবান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠক-বর্গকে ধন্য ও চরিতার্থ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহোদয়, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে, কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের এবং প্রসঙ্গতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধের, বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ-ধারার আলোচনা আছে।

এরূপ গ্রন্থ, সুলভ মূল্যে প্রতি পল্লীতে, মাতৃভাষায় অনূদিত হইয়া বিতরিত হইলে, পল্লীবাসিগণ, তাঁহাদের মাতৃভাষার ভাণ্ডারে কি অমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত আছে, তাহার আংশিক পরিচয় বা আভাষ প্রাপ্ত হইবেন; এবং এ-বিষয়ে যথাসম্ভব জ্ঞান লাভ করিয়া, তাঁহারা স্ব-স্ব আয়ত্বাধীন স্থান মধ্যে, মাতৃভাষার প্রাচীন রত্নোদ্ধার বিষয়ে যত্নপর হইবেন। বঙ্গের কোন্ পল্লী কবির-গানের কথা জানে না—কোন্ পল্লীতে অনুসন্ধান করিলে, প্রাচীন পুঁথি মিলিবে না? কিন্তু পল্লীবাসীদিগকে এ-সকলের আবশ্যকতা বুঝানই দায়! বর্ত্তমান গ্রন্থ, পল্লীবাসী ও পল্লীশিক্ষকগণের মধ্যে সমধিক প্রচারিত

আছে। অন্যান্য বহুবিধ উপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুদ্ধ লুপ্তরত্নোদ্ধার বিষয়ে পল্লীবাসীদিগকে প্রবুদ্ধ ও সচেষ্ট করিতে পারিলেই, আমরা আপাততঃ যথেষ্টরূপ পুরস্কৃত হইলাম, মনে করিয়া কৃতার্থ হইব।—অনুবাদক।]

১। আধুনিক সাহিত্য—বঙ্গদেশে ইংরেজাধিকার স্থায়িত্ব লাভ করিবার পরবর্ত্তী কাল হইতে যে বঙ্গ সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই সাধারণতঃ 'আধুনিক-সাহিত্য' নামে অভিহিত হয়। এই আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব আছে—তাহা একাধারে যেমন সমুজ্জ্বল, তেমনি বাহুগুণোপেত ও জটিল রহস্যময়। এরূপ বৈচিত্র্যময় সাহিত্যকে কোন একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত করা যে কেবল দুঃসাধ্য তাহা নহে—ভ্রমাত্মকও বটে। কেন না, এই সময় মধ্যে বঙ্গসাহিত্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বিবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কোন সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্গসাহিত্য এখন নিজের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য-বিষয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিলে, অশোভন হইবে না—কিন্তু, ইহার এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নমুখী গতির মধ্যেই, ইহার মূল সুর বা ধারাটি যেন কোথায় গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা প্রাণশক্তিসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, ও অধ্যবসায়-পরিপুষ্ট—বিচারণাপূত, সুসংস্কৃত শিক্ষা-নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও সুসংযত। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন, ইহা সর্ব্ববিধ আদর্শ বা নিয়মকে অবজ্ঞাভরে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; কিন্তু সামান্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উদ্দেশ্য বা ভাবধারা প্রকাশের ছন্দঃ বা গতির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, এই যুগের সাহিত্যের এমন একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে, যাহা অন্যান্য যুগের সাহিত্যের সহিত ইহার পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য স্বতঃ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাপতির যুগে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', কিম্বা ভারতচন্দ্রের যুগে 'নীলদর্পণ' প্রচারের কল্পনাও কি আমরা করিতে পারি? কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের গ্রন্থে, জীবনের যে-সকল সমস্যা বর্ণিত ও যে-সকল চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে প্রতিফলিত চরিত্র ও জীবন-সমস্যার আলোচনা-পদ্ধতির কত প্রভেদ! বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ বা রামপ্রসাদের তুলনায় মাইকেল, হেম ও নবীন, কি নূতন জগৎই না আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন! আদর্শ, ভাব ও লক্ষ্য—সেকালে ও একালে, এ-তিনের কত প্রভেদ! এই সকল বৈশিষ্ট্য কি, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কিন্তু যদিও আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে, মনোভাব প্রকাশের বহুবিধ ধারা বা প্রকাশ-রীতি যুগপৎ প্রচলিত রহিয়াছে, তত্রাচ, বর্ত্তমান সাহিত্যের বাক্-ধারা ও আলোচ্য বিষয় মধ্যে, যুগ-সাহিত্যের এরূপ অভ্রান্ত ও সুস্পষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, তাহা দ্বারা আমরা অন্যান্য যুগের সাহিত্যের সহিত, নিঃসন্দেহে ইহার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই সকল বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য যে কি, তাহা আমরা এই সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হইবার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। ফলতঃ আধুনিক সাহিত্য এখন যেরূপ সমুন্নত

অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে যে ইহা যথাযথরূপে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে,—একথা আমরা মুখবন্ধেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

২। সূচনার কাল-নির্দ্দেশ—বঙ্গ-সাহিত্যের এই সুর বা ভাব পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মভাবে কাল-নির্দেশ, বা ইহার সামাজিক হেতু নির্ণয় করা, সামাজিক গতি-বিজ্ঞানের এক কঠিন সমস্যার কথা। সাধারণভাবে বলিতে গেলে,—এ-দেশে ইংরাজ শাসনের স্থায়িত্ব ও পাশ্চাত্যভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই, আমাদের 'আধুনিক-সাহিত্যের' সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলির অধিকৃত-কাল সামান্য নহে—প্রায় সমগ্র শতাব্দী—১৭৫৭—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীযুদ্ধের ফলে, এ-দেশে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; ইহার মাত্র তিন বৎসর পরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র পরলোক গমন করেন। সুতরাং মোটামুটিভাবে, এই বৎসরই, এই ভাব-পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুকাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দকে, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাচীন ধারার মূল সুরের অবসান ও নবযুগের আবির্ভাব-কাল বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, এই উভয় তারিখই সূক্ষ্ম বিচার-নির্দ্দিষ্ট নহে। কেন না, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সাহিত্যে, আধুনিক ভাব বা সুর পরিলক্ষিত হয় না; আবার, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই, সাহিত্যের এই নূতন ভাবধারার সূচনা পরিলক্ষিত হয়—বলিতে কি, স্বয়ং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাও এই নূতন ভাবের প্রভাবমুক্ত নহে। তবে, মোটামুটি একটা সময়-নির্দ্দেশ প্রয়োজন হইলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যেই তাহা মিলিতে পারে। এইভাবে আমরা, শ্রেণীবিভাগের সৌকর্য্যার্থ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকেই, স্থূলতঃ নব-ভাবের সূচনার প্রারম্ভ কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোন কোন ভ্রান্ত লেখক, এই যুগকে 'ভিক্টোরিয়া যুগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন—এই নামকরণ কেবল যে অ-প্রকৃত তাহা নহে—ভ্রমাত্মক; সুতরাং, অপরকে ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত করে। Frederic Harrison নামক বর্ত্তমানকালের একজন খ্যাতনামা সমালোচক প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—'কোন রাজার শাসন-কাল, অব্দ বা শতাব্দী-বিশেষ, অথবা অপরবিধ কোনরূপ স্বেচ্ছাকৃত সময়-বিভাগ, ভাব-বিকাশের কাল, বা ভাব-সংগঠনের নিয়ামকরূপে গ্রহণ করা চলে না। কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি-বিশেষের নামে, বহুবর্ষব্যাপী কোন যুগের পরিচয় প্রদান করা একটা সাধারণ কৌশল মাত্র। ফলতঃ, এই সকল মনীষী-বাক্য স্মরণ রাখিয়াও আমরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকেই, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের সূচনার প্রারম্ভকাল বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি।

৩। সূচনার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কাল—কিন্তু এই সূচনার প্রারম্ভ বৎসর, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া [illegible]

অতিবাহিত হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিবৃত্ত-লেখকের পক্ষে, সেই কালের কথা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কেননা, এই সময় মধ্যে সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইলেও, অন্যবিধ কর্ম্মচেষ্টার বিরাম ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত—শুদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক নহে—বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসেও একটা প্রবল বিপ্লব বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছিল। সুতরাং সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা কালে, সুদূর পরবর্ত্তী সময়েও ইহার ফল-সম্ভাবনার কথা উপেক্ষা করা চলিবে না।

আবার উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়, সাহিত্য-বিষয়ে তেমন ফলপ্রসূঃ নহে। কিন্তু এই সময়ই, প্রকৃতভাবে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের সংগঠনের কাল। কেননা, বহু দেশ ও জনহিতকামী ইংরাজ ও ভারতীয় মহানুভব, এই সময় বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই কালক্রমে অঙ্কুরিত ও পরিণত হইয়া, বঙ্গ-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে—একথা, মাতৃভাষানুরাগী বঙ্গবাসী মাত্রেই, কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করিয়া থাকেন।

৪। কাল-বিভাগ—এই নিমিত্ত আমরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকেই, মোটামুটিভাবে সূচনার প্রারম্ভকাল বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এখন আমরা সর্ব্বপ্রথম ভূমিকা স্বরূপ, যে সকল রাষ্ট্র নৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য-সম্পর্কিত ঘটনা সমাবেশ বা কারণ-পরম্পরায় আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের সূচনা সম্ভবপর হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মূল কারণ সম্বন্ধে আলোচনা ও তৎসমুদয়ের মীমাংসা বা সামঞ্জস্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিব। এই নিমিত্ত আমাদিগকে ১৭৫৭ (অথবা ১৭৬০) হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের সাধারণভাবে বিবিধ বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ এবং বঙ্গসাহিত্যের উপর তৎসমুদয়ের প্রভাব-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে।

(১)
পূর্ব্বকথা, প্রারম্ভিক আলোচনা
১৭৬০—১৮০০ খ্রীঃ

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুরে মিশন-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া, কেরী সাহেবের অভিধানের শেষ খণ্ড প্রকাশ ও হিন্দুকলেজের ভিত্তিস্থাপন কাল—অর্থাৎ, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়, বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে—সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হিসাবে না হইলেও, ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় —অতি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় কাল বলিয়া মনে হয়। কেননা, এই সময় মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের সূচনা—আবার এই সময় মধ্যেই, পাদরী ও সিবিলিয়নগণের বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রচেষ্টা এবং বঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও প্রচলনের জন্য সাধারণ বা ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

(২)
সূচনা-কাল
১৮০০—১৮২৫ খ্রীঃ

পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর মধ্যে 'তিলোত্তমা', 'নীলদর্পণ', ও 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচার-কাল পর্য্যন্ত আমরা এক মহা উত্তেজনাপূর্ণ পরিবর্ত্তনের যুগে আসিয়া উপনীত হই। এই সময় দেশবাসিগণ, নব নব আশা ও উৎসাহে উদ্বোধিত হইয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত নব নব পাশ্চাত্য ভাবসম্পদ্ আত্মস্থ করিবার জন্য বিপুলোদ্যমে চেষ্টায় রত হইয়াছে। এই জাগরণের যুগে, কি সমাজ-বিষয়ক, কি ধর্ম্ম-বিষয়ক, কি সাহিত্য-বিষয়ক—সর্ব্ববিধ বিষয়েই দেশবাসীকে বিপুল দ্বন্দ্বকলহে প্রমত্ত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু সকল বিষয়েই যে তাহারা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে। ইংরাজী শিক্ষার সমস্যা, এখন স্থায়ীভাবে মীমাংসিত হইয়া, পাশ্চাত্যের বিজয়-গৌরব বিঘোষিত হইয়াছে—বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীয় সমাজ, নব-ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ উদ্দেশে, নূতন সুর ও ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ, ইহা নবভাবে উদ্বোধিত সংস্কারকামী বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের যুগ। এই সময় মধ্যে যখন দেশবাসী নিত্যনূতন পরীক্ষায় নিযুক্ত, দেশময় সর্ব্বত্র যখন নূতন ভাব ও নূতন চিন্তার ধারা প্রকটিত, সেই সময় প্রচুর পরিমাণে নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়া, কতকগুলি নবভাবের ভাবুক লেখকের সৃষ্টি করিল এবং ইহার ফলে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভাব-বন্যার প্রবাহের সূচনা আরম্ভ হইল।

(৩)
জাগরণের যুগ
১৮২৫—১৮৫৮ খ্রীঃ

ইহার পর আমরা তৃতীয় যুগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই যুগ যেমন ফলপ্রসূঃ, তেমনি কর্ম্ম-সাফল্যে সমুজ্জ্বল ও ভবিষ্য-আশায় গৌরবান্বিত। এই যুগে, সাহিত্য ও জীবনের সর্ব্ববিধ প্রাচীনভাব, নবযুগের সম্যক্ উপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত করা হইল—বঙ্গে সাহিত্যিক যুবক-সম্প্রদায়, এই যুগের নেতৃত্ব পদ অধিকার করিল।

(৪)
পরিবর্ত্তনের যুগ
১৮৫৮—১৮৯৪ খ্রীঃ

৫। আলোচ্য বিষয়—আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভকাল তাদৃশ ফলপ্রসূঃ নহে—এই সময় মধ্যে যে সকল গ্রন্থকারের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাঁহারা সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। আমরা কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে, কেবলমাত্র এই সকল সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও তাহার মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই, আমরা ইহার স্বচ্ছন্দ বা মনোজ্ঞ রূপ দর্শন করিতে পাইব না—প্রবেশ করিয়াই, আমরা হোমরের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইব না। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের শোক-সন্তপ্ত হইলে চলিবে না। বলিতে কি, আমাদিগকে কোন একজন সুলেখকের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল লেখকের রচনার মাধুর্য্য বা আকর্ষণী-শক্তি বহুদিন পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, একরূপ বহু অখ্যাতনামা লেখকের

জনতা অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা আমাদের পক্ষে শুভদায়কই বলিতে হইবে। কেননা, এরূপ প্রচেষ্টার ফলে, আমরা আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার, এবং এই সময়ের খণ্ডিত ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাসের সহিত মিলিত ও সম্বন্ধযুক্ত করিয়া পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ প্রাপ্ত হইব। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা যেন প্রাথমিক যুগের কথা তত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে চাহি না—পরবর্ত্তী কালের নব নব উন্নত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া, আমরা সাহিত্যের প্রারম্ভের ইতিহাস যেন উপেক্ষা করিতেই উন্মুখ হই। কিন্তু প্রকৃতভাবে ঐতিহাসিক পর্য্যবেক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও উন্নত, আমরা তাহারই প্রতি ধাবিত হইব—ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তনীতির অনুবর্ত্তনের উদাহরণ দুর্ল্লভ। একটা পরিবর্ত্তনের যুগে লেখকগণ, মানব বা প্রকৃতির পরিপুষ্টি বা উৎপত্তি হইতে পৃথক্ করিয়া, শুদ্ধ তাহার ভাবানুবর্ত্তনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে এরূপ আশা করা সমীচীন নহে। হিউম সাহেবের মত, সভ্য মানুষ, অসভ্যকে দেখিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না—কেন না, বর্ত্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ এই যে, অসভ্যগণ ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া, ক্রমপরিণতির নিয়মানুবর্ত্তনে সভ্য জাতির সহিত ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া যাইবে। সুতরাং, সুসভ্য জাতির সহিত অসভ্য জাতির নৈকট্য অস্বীকার করা চলে না। তদ্রূপ, সুষ্ঠু-সাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের অসংস্কৃত ও অসম্বৃত রচনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে; কেন না, এই উভয় যুগের সাহিত্যের মধ্যে কোন এককালের সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া, অপর যুগের সাহিত্যের সম্যক্‌রূপ আলোচনা করা সম্ভব হয় না।* সুতরাং, কেরী বা মৃত্যুঞ্জয়ের মত লেখকগণের অক্ষম চেষ্টা-প্রসূত তথাকথিত সাহিত্যের যে আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, তাহারও তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে, প্রতি পদে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সময়ের অপব্যবহার হইবে বলিয়া মনে করি না—কেন না, এই যুগের সাহিত্য, সমৃদ্ধ বা বিভবশালী না হইলেও, ভবিষ্যৎ আশা-বর্ত্তিকার সমুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে পরিদীপ্তমান রহিয়াছে।

'রতন'-লাইব্রেরী—বীরভূম } শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি, এ

কার্ত্তিক, ১৩৩৪

শ্রীকৃষ্ণ ও মহাকাল

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

ভাগবতধর্ম্ম

প্রথম ভাগ

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন
প্রণীত

মূল্য এক টাকা মাত্র

সিউড়ী পোঃ—বীরভূম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ১১টী প্রবন্ধে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের নিত্যত্ব, ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুবক্তা ও সুলেখক। আলোচ্য বিষয়েও তিনি যথেস্ট অন্তর্দৃষ্টি ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার যে প্রণালীতে ভাগবতধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ইহা যে ভক্তগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ভাবে এই আলোচনা করিলে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যগণের নিকট বিষয়টী প্রীতিপ্রদ হয়, গ্রন্থকার তাহা জানেন। সুতরাং গ্রন্থখানি এই সম্প্রদায়েরও প্রিয় হইবে। আমরা ইহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

—হিতবাদী ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

শ্রীকৃষ্ণ ও মহাকাল

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় রাজা, সেই সময়ে দ্বারকানগরে এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণীর একটি সন্তান জন্মিয়াই মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্ম্মিক। তিনি ভাবিলেন,—আমরা কোন পাপ করি নাই, আমাদের বাড়ীতে অকাল মৃত্যু কেন? শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জানিতেন, রাজার পাপে রাজ্যের মধ্যে অকালমৃত্যু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। তিনি তাঁহার শিশুপুত্রের মৃতদেহ কোলে লইয়া রাজবাড়ীর দুয়ারে গিয়া বলিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি-সম্পন্ন, প্রবঞ্চক, লোভী ও স্বার্থপর রাজার কর্ম্মদোষে আমার এই পুত্র অকালে মরিয়াছে; যে-রাজা হিংসা-পরায়ণ, দুশ্চরিত্র ও অজিতেন্দ্রিয়, প্রজারা যদি তাহার আনুগত্য করে, তাহা হইলে সেই প্রজারা দারিদ্র্য প্রভৃতি নানারূপ কষ্ট পাইয়া থাকে।"

কাতরস্বরে এই কথাগুলি বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীর দুয়ারে শিশুপুত্রের মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া মনের কষ্টে চলিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে, ব্রাহ্মণের আর একটি পুত্র হইল, সেটিও সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ সেই মৃতদেহ লইয়া পূর্ব্বের কথাগুলি বলিয়া কাঁদিয়া রাজার দুয়ারে মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের আটটি পুত্র মরিয়াছে, আর ব্রাহ্মণ মৃতদেহগুলি রাজার দুয়ারে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু, রাজবাড়ী হইতে কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা হয় নাই।

এইবার ব্রাহ্মণের নবম পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু। ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ববারের মত মৃত পুত্র কোলে করিয়া রাজবাড়ীর দুয়ারে কাঁদিতেছেন। সেই সময়ে অর্জ্জুন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছিলেন। তিনি শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণের কাতর-বাক্য শুনিয়া ব্যথিত হইলেন ও বলিলেন—"আপনি আর কাঁদিবেন না। দ্বারকায় কি এমন কোন ক্ষত্রিয় বীর নাই,

যিনি আপনার শিশুপুত্রকে রক্ষা করিতে পারেন? আপনি এখন শান্ত হউন, এবার
---া উপায় নাই। আমি এখন দ্বারকায় থাকিব। ইহার পর যদি আপনার পুত্র হয়,
। আমি যদি সময় মত সংবাদ পাই, তাহা হইলে যেমন করিয়াই পারি, আপনার পুত্রকে
। করিব, তাহার দ্বারা যজ্ঞ করাইব। যে-রাজা ব্রাহ্মণের ধন, পত্নী ও পুত্র রক্ষা
াতে না পারে, সে-রাজা রাজাই নহে, কেবল রাজার পোষাক পরিয়া রাজাগিরির
ভনয় করে। আমি আপনার পুত্র রক্ষা করিব, যদি রক্ষা করিতে না পারি, তাহা
েল আগুনে প্রবেশ করিয়া নিজের প্রাণদান-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

অর্জ্জুনের এই দম্ভপূর্ণ কথায় ব্রাহ্মণের ভালরূপ বিশ্বাস হইল না। ব্রাহ্মণ
লেন—"মহাশয়, আপনি কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই দ্বারকাপুরে বলরাম
ছেন, শ্রীকৃষ্ণ আছেন, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আছেন; তাঁহাদের তুল্য ক্ষত্রিয় বীর
বীতে নাই। একটি একটি করিয়া আমার নয়টি পুত্র অকালে মরিয়া গেল, রাজার
রে আসিয়া অনেক কাঁদিলাম। তাঁহারা কেহই প্রতিকার করিলেন না, বা করিতে
রলেন না। আপনি কে? তাঁহারা যাহা পারিলেন না, আপনি তাহা করিবেন;—
কথায় আমার যে বিশ্বাস হয় না।"

অর্জ্জুন নিজের পরিচয় দিলেন, তাঁহার গাণ্ডীবের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন,—
াহ্মণ, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনি কি জানেন না, আমার বিক্রমে দেবাদিদেব
াদেবও পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন? আপনি ভাবিবেন না; প্রয়োজন হইলে, মৃত্যুর সহিত
করিয়া আপনার মৃতপুত্রগণকে আনিয়া দিব।"

কিছুদিন গেল। ব্রাহ্মণ-পত্নীর আবার সন্তান হইবে। ব্রাহ্মণ, অর্জ্জুনকে সংবাদ
লন। ব্রাহ্মণের সন্তানটিকে মরণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পবিত্র জলে
ুচিত্তে আচমন করিয়া অর্জ্জুন মহাদেবকে স্মরণ করিলেন ও প্রণাম করিলেন।
রণ মাত্র দিব্য অস্ত্র-সমূহ অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি অস্ত্রযুক্ত অনেকগুলি
ণর দ্বারা সূতিকাগৃহ অবরুদ্ধ করিলেন। দেখা যাউক, এই বাণের পিঞ্জর ভেদ করিয়া
া কেমন করিয়া সূতিকাঘরে প্রবেশ করে?

সন্তান হইল, কয়েকবার কাঁদিল। তাহার পর তাহার দেহ পর্য্যন্ত অন্তর্হিত
ল; কোথায় গেল, কেহই বুঝিতে পারিল না। অন্যবারে প্রাণ চলিয়া যায়, দেহ

পড়িয়া থাকে। এবার দেহও চলিয়া গেল, অর্জ্জুন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না।

শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গেলেন ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আমি কি মূর্খ। আপনারা আমার পুত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই, আর আমি সেই দাম্ভিক ও অকর্ম্মণ্য অর্জ্জুনের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম।" ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিতেছেন, অর্জ্জুনও বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়াছেন। অর্জ্জুনের দিব্যবিদ্যায় অধিকার ছিল; তিনি সেই বিদ্যার সাহায্যে যমালয়ে গেলেন। সেখানে ব্রাহ্মণের মৃত-পুত্রের সন্ধান পাইলেন না। সেখান হইতে ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, নিঋ‌র্তি, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র পাইলেন না। অর্জ্জুন লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবেন; জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিবেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে। অর্জ্জুন আগুনে প্রবেশ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"নিজেকে নিজে অবজ্ঞা করিও না। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ কোথায় আছে, আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব। তুমি ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে লইয়া আসিতে পারিবে; জগতে তোমার কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণের রথ, দেবলোকের রথ; মর্ত্ত্যলোকের নহে। রথের ঘোড়া চারিটি; তাহাদের নাম শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক; তাহারাও দিব্যলোকের। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য এই রথ ও এই ঘোড়া, দিব্যলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই রথে চড়িলেন। রথ চলিল, বিদ্যুতের গতি ছাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের রথ চলিল। সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র ছাড়াইয়া, সপ্তপর্ব্বত ও সপ্ত লোকালোক ছাড়াইয়া রথ চলিল। অন্ধকার; গভীর, ভীষণ ও দুর্ভেদ্য অন্ধকার! রথ আর চলে না ঘোড়াগুলি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন। সুদর্শনের ছটায় পথ আলোকিত হইল। সেই আলোকে পথ দেখিয়া ঘোড়াগুলি রথ লইয়া চলিল। তাহার পর আলো, এমন আলো, যে অর্জ্জুনের চক্ষু আর সে আলো সহ্য করিতে পারিতেছে না। রথ আকাশ হইতে নামিল; এইবার সমুদ্র, কি ভয়ানক তরঙ্গ! রথ সেই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। দূর, দূর—অতিদূর; বহুদূর পরে দেখা গেল—

সহস্র মণিময় স্তম্ভযুক্ত এক বিশাল গৃহ। সেই ভবনের মধ্যে অনন্তদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার এক সহস্র ফণা, ফণার উপর মণি জ্বলিতেছে; দ্বিসহস্র নয়ন,—দেখিতে অতিশয় ভীষণ; কণ্ঠদেশ নীল—যেন নীল স্ফটিকের পর্ব্বত; সহস্র ফণায় সহস্র জিহ্বা—সবই নীলবর্ণ। ইনিই অনন্তদেব। অনন্তদেবের দেহের উপর পুরুষোত্তম বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহের কান্তি সুনিবিড় মেঘপুঞ্জের ন্যায়, পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান, মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন। তিনি অসংখ্য কিরীট কুণ্ডলে শোভিত। তাঁহার অষ্টবাহু, আজানুলম্বিত। গলায় কৌস্তুভমণি, বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন। চারিদিকে পার্ষদগণ ও মূর্ত্তিমান অস্ত্রগণ দাঁড়াইয়া আছেন; আর পুষ্টি, কীর্ত্তি, অজা, নিখিল সমৃদ্ধি, শ্রী ও পরমেষ্ঠিপতি তাঁহার সেবা করিতেছেন।

তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং সহস্র মূর্দ্ধণ্যফণামণিদ্যুভিঃ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বনং শিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বং॥
দদর্শ তদ্ভোগ সুখাসনং বিভুং মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমং।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণং॥
মহামণিব্রাত কিরীটকুণ্ডল-প্রভাপরিক্ষিপ্ত সহস্র কুন্তলং।
প্রলম্বচার্ব্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতং॥
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈশ্চক্রাদিভি র্মূর্ত্তিধরৈর্নিজায়ুধৈঃ।
পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্ত্যাজয়াখিলর্দ্ধিভির্নিষেব্যমাণং পরমেষ্ঠিনাং পতিং॥

১০মস্ক—৮৯অ, ২৭—৩০ শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সসম্ভ্রমে সেই অনন্ত আত্মাকে প্রণাম করিলেন ও যোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরমেষ্ঠিগণের অধিপতি ভূমাপুরুষ হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বলিলেন—"তোমরা নর-নারায়ণ, তোমাদের দুইজনকে দেখিবার জন্য, আমার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল, এইজন্য ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে লইয়া আসিয়াছি। ধর্ম্মরক্ষার জন্য তোমরা দুইজন আমার অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের বিনাশ করিয়া আবার আমার নিকট আগমন কর। তোমরা নর-নারায়ণ, তোমরা পূর্ণকাম; মর্য্যাদারক্ষা ও লোকশিক্ষার জন্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছ।"

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া

পুত্রগণকে সঙ্গে লইলেন ও মর্ত্ত্যলোকে দ্বারকাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা নাই, মৃত পুত্রগণকে পাইলেন। অর্জ্জুন বুঝিলেন—মানুষের বিক্রম কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ; আর কিছুই নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের উননববই অধ্যায়ে এই উপাখ্যানটি আছে। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। কলিযুগের যুগধর্ম্ম কি ; কলির মানুষ আমরা ; আমরা কোন্ পথে চলিলে সমগ্র মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ হইবে, প্রধানতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে তাহা অবধারণ করিতে হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ।

কিন্তু, পুরাণের উপাখ্যান সমূহ কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অনেকেরই জানা নাই। জানা নাই বলিয়া, তাহারা স্বীকার করিতেও পারে না, বিশ্বাস করিতেও পারে না, যে শ্রীমদ্ভাগবতে বা পুরাণে সত্য সত্যই ভারতের সুপ্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা কলিযুগের উপযোগী করিয়া প্রচার করা হইয়াছে ;—এই শ্রীমদ্ভাগবতই ভারতের সুপ্রাচীন ও সর্ববজন-স্বীকৃত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান-সমূহ কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার অনুবর্ত্তী গোস্বামীপাদগণের দ্বারা তাহা জগৎকে জানাইয়াছেন। আজ প্রয়োজন, সেই গোস্বামীপাদগণের অভিমত, মীমাংসা ও ব্যাখ্যা-প্রণালীর আলোচনা। পূর্বে যে-উপাখ্যানটি বলা হইল, পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় সেই উপাখ্যানটির বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ 'ষট্ সন্দর্ভের' অন্তর্গত 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে' এই আলোচনা আছে। এই আলোচনায় পুরাণের উপাখ্যানের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের কতকগুলি প্রণালী (Some Principles of Interpretation) আছে। বর্ত্তমান যুগের লোক সেই প্রণালীগুলি যাহাতে বুঝিতে পারে, জানিতে পারে ও প্রয়োগ করিতে পারে, তাহারই সাহায্যের জন্য আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠক-পাঠিকাগণ, কৃপা করিবেন ও ধীরভাবে কথাগুলি পড়িবেন। সাধু বৈষ্ণবের কৃপায় এই আলোচনার দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতি ও পুষ্টি হইবে এবং শাস্ত্রের সহিত আমাদের প্রকৃত পরিচয় হইবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দ-কর্ত্তৃক ভাগবত-ধর্ম্মের যে তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে—তাহার সর্ববপ্রথম ও সর্ববপ্রধান কথা—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—

শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ যে কৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা নহে; কৃষ্ণই ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শিক্ষা বা কেন্দ্রস্থ শিক্ষা (The central doctrine, ইহাই। মহাপ্রভু বলিলেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহো সভার আধার॥

এই সারসত্য বা মূল সত্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারা পূর্ব্বের উপাখ্যানটি পড়িয়া বলিবেন, —'এ কেমন কথা! মহাকালপুরে অনন্ত শয্যায় যে-পুরুষ রহিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ, হে অর্জ্জুন, তোমরা উভয়ে আমার অংশ, ভূভার হরণ করিয়া তোমরা আবার আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে!"

যাঁহারা শাস্ত্র-বিশ্বাসী, বিভিন্ন প্রকারের শাস্ত্রবাক্যের সুমীমাংসার দ্বারা যাঁহারা পারমার্থিক সত্য অবধারণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে শাস্ত্র-বাক্য নানা প্রকারের। মীমাংসা দর্শনে বলা হইয়াছে,—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—শাস্ত্রে এই ছয় প্রকারের বাক্য আছে। এই ছয় প্রকার বাক্যের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতির সহিত অন্য কাহারও বিরোধ হইলে, শ্রুতির কথাই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতির পর লিঙ্গ, তাহার পর বাক্য প্রভৃতি। ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে হইতে সমাখ্যা বা উপাখ্যান সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। মনে রাখিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের মহাকালপুর গমনের যে প্রস্তাবটি বলা হইল, তাহা 'সমাখ্যা' বা আখ্যায়িকা। এখন চিন্তা করুন—শ্রুতি কি? 'শ্রুতি' বলিতে বেদকেই বুঝায়। কিন্তু, এই বেদ পুরাণেও আছেন। সুতরাং, শ্রুতি কি? উত্তর, পুরাণে যে-সব সাক্ষাৎ উপদেশ নিরপেক্ষভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই শ্রুতি—Direct and absolute instructions—। শ্রুতির তুলনায় লিঙ্গ, বাক্য-প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা ক্রমশঃ কম সাক্ষাৎ ও কম নিরপেক্ষ; (Less direct and less absolute) অর্থাৎ অধিক পারম্পর্যিক (more indirect) ও অধিক সাপেক্ষ (more relative)। তাহা হইলে, সমাখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলিতেছেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই যে উক্তি, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের হইলেও,—ইহা শ্রুতি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সমাখ্যার সহিত এই শ্রুতির বিরোধ হইলে সমাখ্যাটিকে অবজ্ঞা করিব না তাহাকে বাদ্-ছাদ্ দিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া গ্রহণ করিব। শ্রুতির সহিত যদি সমাখ্যার বিরোধ না হইত, তাহা হইলে কোনরূপ আপত্তি হইত না।

শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের অভিপ্রায় ঠিক্‌মত বুঝিতে হইলে, 'শ্রুতি'-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাথমিক কথা জানিতে হইবে। শ্রুতি বা বেদ নিত্য। কিন্তু বেদের শব্দ নিত্য, কি স্ফোট (Idea) নিত্য, এ-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে মীমাংসক, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক প্রভৃতি বিদ্বৎ-মণ্ডলীর মধ্যে বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। সেই বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ করার প্রয়োজন নাই। বেদের 'স্ফোট' বা (Idea) নিত্য, অভ্রান্ত ও সর্ব্বথা গ্রহণীয় বলিলে, এ যুগের অনেকেই আপত্তি করিবেন না। এই 'শ্রুতি' বা Eternal Idea ঋষিবিশেষের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে—has been revealed to some Seer। এই ঋষিকে যিনি স্বীকার করেন এই ঋষি বা গুরু যাহা দেখিয়াছিলেন বা পাইয়াছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য বা পাইবার জন্য যাঁহার আগ্রহ আছে, তিনি এই 'শ্রুতি'কে মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার মনন করিবেন বা সাধন করিবেন এবং কালে ঋষি যাহা দেখিয়াছিলেন বা পাইয়াছিলেন বা হইয়াছিলেন, তিনিও তাহা দেখিবেন, পাইবেন ও হইবেন। ইহাই সাম্প্রদায়িক সাধন-রাজ্যের কথা। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যটিও সেই প্রকারের একটি শ্রুতি বা মন্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের ঋষি বেদব্যাসের নিকট, তৎপুত্র শ্রীশুকদেবের নিকট, তৎশিষ্য উগ্রশ্রবা সূতের নিকট এবং পূর্ব্বে ও পরে আরও অনেকের নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও এই মন্ত্রেরই দ্রষ্টা। অতএব ইহা শ্রুতি।

এইবার সমাখ্যা-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। পুরাণে অনেক আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকাগুলি পৌরাণিকের নিজের রচনা নহে। এগুলি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, নানা জনে নানা প্রকারের ভাবের প্রেরণায়, এই আখ্যায়িকাগুলি প্রচারিত করিয়াছিল। পৌরাণিক সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত

ঋষিও এই সব আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব আখ্যায়িকার প্রত্যেক কথাটিই নিরপেক্ষ সত্য, এরূপ মনে করিবেন না। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, 'তত্ত্বতঃ' বুঝিবে। অন্তর্মুখী হইয়া নিজের ভিতরে নিত্য-সত্য-সমূহের সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, Meditate on the Eternal Principles—আর সেই তত্ত্বগুলির প্রকাশরূপে আখ্যায়িকাগুলি বুঝিবে। আগে ভিতরে, তাহার পর বাহিরে। From within outwards.

কিন্তু, এই সাধনা করিতে হইলে সঙ্কল্পাত্মক মনের (Abstract Mind) বিকাশ (Development) প্রয়োজন। অনেকের তাহা হয় নাই। তাহাদের বিকল্পাত্মক মন (Concrete mind) বিকশিত হওয়ায় আখ্যায়িকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া (with the details) তাহারা গোলযোগ সৃষ্টি করে, তত্ত্বাংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সেকালে যে নানারূপ 'সমাখ্যা' প্রচলিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি ? শ্রীকৃষ্ণ কত বড় ? পৃথিবীতে আর কেহ অত বড় হয় নাই, সেইজন্যই ভারতের ঋষি তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। 'ব্রহ্ম'-কথার অর্থই বৃহদ্বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় বড় বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহাদের সম্বন্ধে যে-সব গ্রন্থ ছাপা হইয়া প্রতিদিন বাহির হইতেছে, সেই সব গ্রন্থ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, ব্যাপার কি ? শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-সম্বন্ধে ছয়জন গ্রন্থকার ছয়খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; এই গ্রন্থগুলি পড়িলে দেখিবেন, যে-গ্রন্থ-খানি যত পরের লেখা, তাহাতেই তত বেশী অলৌকিক ব্যাপারের সমাবেশ। Later the book, gteater the miracles. এখন চিন্তা করিয়া বলুন দেখি, কোন ভদ্রলোক (Sensible man) এই ঘটনাগুলিকে বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে কি না। এই ঘটনাগুলি 'সমাখ্যা।' এগুলি যে মিথ্যা, তাহা বলি নাই। কিন্তু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান চাই। Psychology of Religion নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা চাই। অনেক ঘটনা আছে, যাহা লেখকের বা দ্রষ্টার উষ্ণমস্তিষ্ক-সঞ্জাত, তিনি অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা দেখিয়াছিলেন, ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই ; আবার এমন ঘটনা আছে, যাহা কোন স্বার্থপর ও চতুর লোক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই রচনা করিয়াছে। এখন চিন্তা করুন—এই সব সমাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য কবে নির্দ্ধারিত হইবে। নির্দ্ধারিত হইবে কিনা, বলিতে পারি

করুন, যদি এই সমাখ্যাগুলি বাঁচিয়া যায় বা টিকিয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে ? 'শ্রুতি' আসা চাই, গোস্বামীমহাশয় আধ্যাত্মিকতার কোন্ সোপানে অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপ কি, এ-সম্বন্ধে সঠিক্ ও সুনিশ্চিত সংবাদ কোনও ঋষির মধ্য দিয়া আসা চাই, অন্যান্য ঋষির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় তাহার প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই ; তাহার পর সেই শ্রুতি বা তত্ত্বের আলোকে, এই সমুদয় সমাখ্যার প্রকৃত মূল্য বা মর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এগুলি গল্পমাত্র।

গোস্বামী মহাশয়ের কথাই উল্লেখ করিলাম, কিন্তু এরকম অনেক আছে। নবদ্বীপের এক বাবাজীকে, তাহার শিষ্যেরা একেবারে পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি বলিতেছে। শিশিরকুমার ঘোষের সহিত এক প্রেততাত্ত্বিকের তপঃলোকে দেখা হইতেছে। কেহ বা মৈত্রেয় ঋষির অবতার, কাহারও কাহারও দুইশত ছাপান্ন জন্মের ইতিহাস ছাপা হইয়া বাহির হইতেছে। এগুলি সবই সমাখ্যা। শ্রুতির প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত ভদ্রলোকে এগুলিকে অতি সাবধানে গ্রহণ করিবে যাহারা শ্রুতিহীন ও মন্ত্রহীন, অর্থাৎ নিত্য-জগতের কোনও তত্ত্বের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, বা পরিচয় সাধনের চেষ্টা নাই, যাহাদের সঙ্কল্পাত্মক মন এখনও বিকশিত হয় নাই, বেদের মতে তাহারা এখনও পশু, তাহারা এখন চতুর ও প্রবলের ক্রীতদাস, তাহারা এখনও মনুষ্য-পদ-বাচ্য নহে।

শ্রুতি ও সমাখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি 'দিগ্‌দরশন' করাইলাম। আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ধর্ম্মজীবন চাহেন, যাঁহারা সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ বা উন্নতি চাহেন, তাঁহারা খুব ধীরভাবে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

আমরা এইবার শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের মীমাংসার অনুসরণ করিতেছি। "শ্রুতি কি" সে-সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু ভাল কথা জানিতে পারিব।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই যে উপদেশ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎভাবেই দিয়াছেন। এই কারণে ইহা যদি শ্রুতি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে মহাকাল পুরুষ যে সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'তোমরা আমার অংশ, পৃথিবীর কাজ সারিয়া আবার শীঘ্র আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে' এই বাক্যও শ্রুতি হউক।

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, মহাকাল-পুরুষের বাক্য, সাক্ষাৎ উপদেশ নহে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সকল স্থানে ও সকল কালেই তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার

কখনও ব্যতিক্রম হয় না, অতএব তাঁহাকে উপদেশ দিবে কে ? মহাকাল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য আনাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বরূপ তাঁহাদিগকে বলিবার জন্য আনান নাই।

এমন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও আছেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান' বলেন না, শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং পুরুষ, বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা নারায়ণের বিলাস-মূর্ত্তি বা অবতার বলেন। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের মত বা ধারণা (conception) দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে ভূমাপুরুষের বা মহাকাল-পুরুষের অংশ বলিয়া অন্য কোন স্থানেই বর্ণনা করা হয় নাই।

প্রস্তাবটির ভিতরে যে কথা আছে, তাহাদের মধ্যেও বিরুদ্ধতা (Contradiction) দেখা যাইতেছে। একবার বলিতেছেন—'তোমরা আমার নিকট শীঘ্র আসিবে' আবার বলিতেছেন—"তোমরা নরনারায়ণ ঋষি, তোমরা ধর্ম্মাচরণ কর।"

উপাখ্যানটিতে আরও নানারূপ গোলযোগ আছে। মহাকালপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে একবার বলিতেছেন—তোমরা নরনারায়ণ ঋষি, আবার বলিতেছেন—তোমরা আমার অংশ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, নরনারায়ণ ঋষি চিরকালই বদরিকাশ্রমে আছেন, কাজেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই দুইজন ঋষি হইলে ভূমাপুরুষের নিকট যাইতে পারেন না। আর যদি ভূমাপুরুষেরই অংশ হন, তাহা হইলে তাঁহারা লীলা শেষ করিয়া যখন স্বধামে অর্থাৎ ভূমাপুরুষে ফিরিয়া আসিবেন, তখন আর নরনারায়ণ ঋষি থাকিতে পারেন না।

আর এক কথা। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যদি ভূমা-পুরুষের অংশ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সব সময়েই তাঁহাদের দেখিতে পাইতেন। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের দশটি সন্তানকে নিজপুরে লইয়া আসিয়া দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে এত কাণ্ড করিয়া নিজের কাছে আনাইলেন কেন ? শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যদি ভুমাপুরুষের অংশ হইতেন, তাহা হইলে সেই ভূমাপুরুষ ইচ্ছামাত্রই তাঁহাদের দেখিতে পাইতেন, সকল সময়েই তাঁহাদের দেখিতে পারিতেন। অতএব এই প্রস্তাব বা আখ্যায়িকা পড়িয়া কেহ ভুল বুঝিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ মহাকাল-পুরুষের অংশ নহেন, মহাকালপুরুষই শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

এই কথায় আপত্তি হইবে। একজন বলিবেন, দূর হইতে মহাকালপুরুষের অঙ্গের ছটা দেখিয়া অর্জ্জুন অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তো শ্রীকৃষ্ণকে বরাবর

দেখিতেছিলেন ; মহাকালপুরুষের তেজঃ নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা অধিক, নতুবা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটাদর্শনে অভ্যস্ত-চক্ষুঃ অর্জ্জুনের এই প্রকারের পরাভব হইবে কেন ? ইহার উত্তর কিছু কঠিন নহে। ভগবান্ যখন লীলা করেন, তখন তাঁহার সমগ্র শক্তি সকল সময়ে প্রকাশিত করেন না ; যতটুকু প্রকাশ করা দরকার ততটুকুই প্রকাশ করেন, অবশিষ্টাংশ গোপন রাখেন। ইহাই তাঁহার লীলাকৌতুক। লীলাতে এই প্রকারের অনেক ব্যাপারই আছে। যেমন শাল্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শাল্ব যখন মায়া-বসুদেবকে বধ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণও যেন কিছুক্ষণের জন্য শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদের মত শ্রীমদ্ভাগবতে খণ্ডিত হইয়াছে। তাহার পর, জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার নরলীলা। আবার এই মহাকালপুরগমন-লীলায় দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অশ্বগুলি অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছে না, শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রের দ্বারা পথ দেখাইতেছেন। ইহাই বা কি প্রকারে হইতে পারে ? জরাসন্ধ যখন প্রথমবার মথুরা অবরোধ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণের এই রথ ও অশ্ব-চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছিলেন। তখন তাহাদিগকে প্রকৃতির আবরণ সমূহ ভেদ করিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে এখন তাহাদের এ দুর্দ্দশা কেন ? ইহার উত্তর, শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়া কিছু কম শক্তি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লীলায় এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের প্রতি ভক্তির ভাব দেখাইয়াছেন, ইহাও নরলীলার কৌতুক। এই সব দেখিয়া কেহ ভাবিবেন না—শ্রীকৃষ্ণ অংশ, আর ভূমাপুরুষ অংশী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নরলীলায় অন্যান্য দেবতা ও ঋষিগণের প্রতিও ভক্তি দেখাইয়াছেন।

এই গেল এক প্রকারের বিচার ; এইবার আর এক প্রকারের বিচার আরম্ভ হইতেছে। আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছেন, প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্রের উত্তরাধিকারি হইয়াছেন, একটা সুলভ ধর্ম্মমত অল্পায়াসে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তাড়াতাড়ি করিয়া কোন বড় জিনিস পাওয়া যায় না। শাস্ত্রীয় মীমাংসা একটু কঠিন ;—সত্য, কিন্তু ধৈর্য্যসহকারে ইহার ভিতর প্রবেশ করিলে বিশেষ লাভ আছে, খুব ভালরকম মজুরী পাওয়া যায় ; পরিশ্রমের চেয়েও বেশী মজুরী পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মহাকালপুরগমণের যে-লীলা সে-লীলায় উপাখ্যানের ভাব লইয়া

এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি (Text) লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। শ্লোকগুলির মোটামুটি অর্থ বা বাহিরের অর্থ (The Surface-meaning) প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়াছে, এইবার বিচার-পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে, কোন গম্ভীরতর অর্থ (Some deeper meaning beneath the surface) আছে কি না।

শাস্ত্রবাক্যের গভীরতর অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, দুইটি জিনিসের আলোচনা করিতে হইবে ,—তাৎপর্য্য ও শব্দ।

প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির তাৎপর্য্য লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। ভগবান্ আপনাকে লইয়া আপনিই খেলা করিতেছেন, ইহাই তাঁহার স্বরূপের লীলা। শ্রীবৃন্দাবনে ইন্দ্র-যজ্ঞ রহিত করিয়া যখন তিনি গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করেন, সে সময়ে ব্রজবাসি-গণকে নিজের মতানুসারে পরিচালিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই তাঁহাদিগকে নিজের এক দিব্যমূর্ত্তি দেখাইলেন। এই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইয়া সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবাসিগণের সহিত নিজের সেই দিব্যমূর্ত্তিকে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মহাকাল-পুরুষরূপ নিজেরই একমূর্ত্তি অর্জ্জুনকে দেখাইলেন, অর্জ্জুন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন, এবং অর্জ্জুনের সহিত নিজেই নিজেকে প্রণাম করিলেন। গোবর্দ্ধন-লীলার একটি শ্লোক এবং মহাকালপুরগমন-লীলার একটি শ্লোক, তত্ত্বাংশে অর্থাৎ তাৎপর্য্য হিসাবে ঠিক্ একরূপ। হরিবংশ-গ্রন্থেও এই উপাখ্যান বা সমাখ্যা আছে। হরিবংশের সহিতও সামঞ্জস্য করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইবে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহাকালপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দর্শন করিতে চাহেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেগুলিকে যদি আমি লইয়া আসি, তাহা হইলে ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিবেন। তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যানের শেষাংশে দেখা যায়—অর্জ্জুন বুঝিলেন, পুরুষগণের যাবতীয় বৈভব শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই সিদ্ধ হইয়াছে।

যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতং ॥

এই যে 'পুরুষ'—ইহার অর্থ সাধারণ মানুষ নহে। 'পুরুষ' কথার অর্থ ভগবৎ-স্বরূপ—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি। ভূমা-পুরুষ বা মহাকালপুরুষও তাহার অন্তর্গত। অতএব, এই কথার দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বা অংশিত্ব প্রমাণিত ও প্রতিপাদিত হইল।

আরও এক কথা আলোচনা করিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, উপক্রম ও উপসংহার, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, এই প্রস্তাবটি কি কারণে ও কি ভাবে উত্থাপিত হইল এবং ইহার পূর্ব্বের কথা কি। আর দেখিতে হইবে—এই প্রস্তাবের দ্বারা কি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইল। তাহা না করিলে, অর্থাৎ উপক্রম ও উপসংহারের সামঞ্জস্য না করিলে, কোন কথারই প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরিতে পারা যাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের উননব্বইএর অধ্যায়ে এই উপাখ্যান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহাকালপুরগমনলীলা কথিত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে দুইটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটি দ্বিতীয় উপাখ্যান। প্রথম উপাখ্যানটির নাম—**ত্রিদেবী-পরীক্ষা।**

সেই উপাখ্যানটি এইরূপ। সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ হইতেছে। অসংখ্য মুনি সমবেত। তাঁহাদের মনে এক সন্দেহ হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—ইঁহাদের মধ্যে কাহার মহত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক? কি করিয়া মীমাংসা হইবে? ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুর উপর ভার পড়িল, মীমাংসা করিতে হইবে। ভৃগু ব্রহ্মার সভায় গেলেন, কিন্তু ব্রহ্মাকে প্রণামও করিলেন না, স্তবও করিলেন না। ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি রাগান্বিত হইলেন। ভৃগু তাঁহার পুত্র, ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু করিলেন না, ক্রোধ সম্বরণ করিলেন; কিন্তু, ক্রুদ্ধ হইলেন,—ইহা সত্য। ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করিয়া ভৃগু শিবলোকে গেলেন। মহাদেব ভৃগু দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে আসিলেন; ভৃগু বলিলেন, তুমি যথেচ্ছাচারী, আমাকে আলিঙ্গন করিও না। ভৃগুর কথা শুনিয়া মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলের দ্বারা ভৃগুকে বধ করিতে উদ্যত। দেবী শঙ্করী শিবকে শান্ত করিলেন। ভৃগু এইবার বৈকুণ্ঠে গেলেন, সেখানে দেখেন ভগবান্ হরি, মা লক্ষ্মীর ক্রোড়ে শুইয়া আছেন। ভৃগু তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত! ভগবান্ হরি, লক্ষ্মীর সহিত উঠিয়া বিছানা হইতে নামিয়া ভৃগুর চরণে প্রণাম করিলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন—"আপনার কুশল তো, কোন কষ্ট হয় নাই তো, আমরা অন্যমনস্ক ছিলাম, মার্জ্জনা করিবেন আপনার পদচিহ্ন

আমার ভূষণ হইবে।" ভৃগু সরস্বতী তীরে ফিরিয়া মুনিগণের নিকট হরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। ভৃগুর মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া মুনিগণ বলিলেন—যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ; যাঁহা হইতে জ্ঞান, চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য, অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও আত্মার মলনাশক যশঃলাভ হয়; যিনি শান্ত, সমচেতা, ন্যস্তদণ্ড, অকিঞ্চন, মুনিগণের পরমাগতি, সত্ত্ব যাঁহার প্রিয়মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার ইষ্টদেবতা; নিষ্কাম, শান্ত, নিপুণবুদ্ধি মহাত্মারা যাঁহার ভজনা করেন, সেই ভগবানের গুণময়ী মায়ার দ্বারা রাক্ষস, অসুর ও দেবতা সৃষ্ট হইয়াছে; সেই ভগবান্ হরিই পুরুষার্থের হেতু।"

এই উপাখ্যানে যে-হরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই হরিই শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য মহাকাল-পুরগমনের কথা বলা হইয়াছে—অতএব "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—ইহাই এই সমাখ্যার সার কথা।

হরিবংশ-গ্রন্থে আছে—ভূমাপুরুষের তেজঃ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্জ্জুন ঐ যে তেজঃ দেখিতেছ, উহা অন্য কিছু নহে—উহা আমারই সনাতন তেজঃ—"মত্তেজস্তৎ সনাতনম্"। সুতরাং প্রকৃত তাৎপর্য্য পাওয়া গেল; শ্রীকৃষ্ণই অংশী বা মূল, আর ভূমাপুরুষ তাঁহার অংশ; প্রিয় সখা অর্জ্জুনের সহিত কৌতুকলীলা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অভিনয় করিয়াছিলেন।

এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাকালপুরুষকে 'পুরুষোত্তমোত্তম' বলা হইয়াছে। ইহা হইতেই অনেকের মনে হয়, বুঝি ইঁহার পরে বা ইঁহার উপরে আর কেহ নাই। 'পুরুষোত্তমোত্তম' কে? পুরুষ = জীব, জীব হইতে উত্তম পরমাত্মা বা জীবান্তর্যামী, তাঁহা হইতে উত্তম এই মহাকালপুরুষ বা ভূমাপুরুষ। এই পুরুষ শ্রীভগবানের প্রভাব-স্বরূপ।

মহাকালপুরুষের নিজের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক—

> দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
> ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
> কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
> হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ (১০-৮৯-৩২)

ব্রাহ্মণের ছেলেগুলিকে যে আমি আমার কাছে লইয়া আসিয়াছি, সে তোমাদের দুইজনকে দেখিবার জন্য। ভারস্বরূপ অসুরেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের বধ করিয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য তোমরা কলায় অবতীর্ণ হইয়াছ। এখনও অসুর বাকি আছে, তাহাদের ধ্বংশ করিয়া শীঘ্র আমার নিকট চলিয়া আইস।

শ্লোকটির ইহা স্থূল অর্থ। এখন আলোচনা করিতে হইবে—ইহার কোন শব্দের বা পদের গভীরতর অর্থ কিছু আছে কি, না। একটি কথা—"কলাবতীর্ণৌ"—এই পদটি সম্বোধন পদ। ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে 'কলাবতীর্ণ'-দুইজন! "কলাবতীর্ণ" কথার অর্থ কি? পদটি অনায়াসেই মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস হইতে পারে। তাহার অর্থ হইবে—'কলা-যুক্ত' হইয়া অবতীর্ণ। আবার সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে। তাহার অর্থ, কলাতে অর্থাৎ মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। এই গেল একটা কথার অর্থ।

আর একটা কথা আছে 'ত্বরয়েত'—ইহার অর্থ সাধারণতঃ এইরূপ করা হয়—তোমরা ত্বরা করিয়া চলিয়া আইস। কিন্তু ইহা ছাড়া এই কথাটির আর এক প্রকার খুবই স্বাভাবিক অর্থ করা যাইতে পারে। পৃথিবীর ভারস্বরূপ যে-সব অসুর এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগকে বধ করিয়া সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। "ত্বরয়েতং" প্রার্থনা। এই দুইটি শব্দের যখন এইরূপ স্বাভাবিক অর্থ হইতে পারে, এবং এই প্রকারের স্বাভাবিক অর্থ করিলে যখন মূল সিদ্ধান্ত বা শ্রুতির সহিত এই সমাখ্যার সামঞ্জস্য হয়, তখন কষ্টকল্পনার দ্বারা অন্যরূপ অর্থ করিয়া শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটাইবার প্রয়োজন কি?

তাহা হইলে মহাকাল-পুরুষের কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই। আমি মহাকাল-পুরুষ, যাহারা মুক্তি লাভ করে, তাহারা আমার নিকট আসে। শ্রীকৃষ্ণ যে-সব অসুরকে বধ করেন, তাহারা মুক্তি লাভ করে। অন্যান্য অবতারের হস্তে নিহত হইলে মুক্তি হয় না, স্বর্গাদি উচ্চলোকে গতি হইয়া থাকে। মহাকালপুরুষ বলিতেছেন, অসুরগণকে বধ করিয়া তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা কর—ইহা তাঁহার আদেশ নহে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট ইহাই তাঁহার প্রার্থনা।

পরের শ্লোকটি এই—

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিতৌ ঋষভৌ লোকসংগ্রহং ॥

ইহার অর্থ। তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ ঋষি, তোমরা পূর্ণকাম হইয়াও নিজে আচরণ করিয়া অন্যকে সেইরূপ আচরণ করাইবার জন্য অর্থাৎ লোক-সংগ্রহের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছ।

ইহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ। ভূমাপুরুষ বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ, হে অর্জ্জুন, তোমরা স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবৎ-সখা ঋষভ। নরনারায়ণ ঋষি যাঁহারা লোক-সংগ্রহের জন্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, তাঁহারা তোমাদেরই অল্পাংশ মাত্র। নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণের অংশ, নরঋষি অর্জ্জুনের অংশ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন— "নারায়ণো মুনীনাঞ্চ"—মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ আমার বিভূতি। পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ করিলেই সামঞ্জস্য হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই উপাখ্যানের শেষাংশে যে-মন্তব্য দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে সমুদয় রহস্য বেশ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার মন্তব্য এইরূপ--মহাকাল পুরুষের মহৈশ্বর্য্য-দর্শনে প্রথমেই অর্জ্জুন অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। অর্জ্জুন ভাবিলেন—আমি পাণ্ডুপুত্র, আমি মর্ত্ত্যবাসী, সকলের মূলভূত এই পরমেশ্বরকে যে আমি দর্শন করিলাম, ইহা বিস্ময়জনক ব্যাপার ; শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ইহা সাধিত হইল। তাহার পর অর্জ্জুন কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, এই মহাকাল পুরুষ বলিলেন—"যুবয়ো দিদৃক্ষুণা"—তোমাদের দুইজনকে দেখিবার জন্য উৎসুক যে-আমি, সেই আমা-কর্ত্তৃক। যিনি সকলের আদি, সেই পরমেশ্বরের, তাঁহার অংশরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য এই ইচ্ছা কেন ? আর যদিই বা ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাঁহার ভিতরে এই ইচ্ছা কেন ? 'দিদৃক্ষু' এই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, 'দিদৃক্ষা' ব্যবহৃত হয় নাই। "দিদৃক্ষুণেতি তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়েণ দিদৃক্ষায়াঃ সার্ব্বদিকত্বং বুধ্যতে।"

তাহার পর অর্জ্জুন ভাবিতেছেন,—না হয়, তাঁহার সকল সময়েই এইরূপ ইচ্ছা হইল ; কিন্তু, তিনি যখন পরমেশ্বর, বিশ্ব যখন তাঁহারই সৃজ্য, তখন করামলকবৎ অর্থাৎ হস্তস্থিত আমলকি ফলের তুল্য, তিনি বিশ্বের সমুদয় বস্তু সকল সময়েই দেখিতে পারেন ;

তাহা হইলে দ্বারকার যে-শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি সকল সময়ে দেখিতে পান না কেন ? ব্রাহ্মণের পুত্রকে হরণ করিবার জন্য মহাকালপুরুষ প্রত্যেক বৎসর দ্বারকায় গিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান নাই। দ্বারকা নগরের তৈলিক-তাম্বুলিক প্রভৃতি সকলেই দেখিতে পায়, কিন্তু মহাকাল-পুরুষ বৎসর বৎসর দ্বারকা নগরে গিয়াও, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাও বড়ই বিস্ময়ের কথা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যায় না। এই মহাকালপুরুষ ব্রহ্মণ্যদেব, অথচ তিনি প্রত্যেক বৎসর ব্রাহ্মণের সন্তান হরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে অকারণ দুঃখ দান করিতেছেন ; ইহারই বা অর্থ কি ? শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য মহাকালপুরুষের অতিশয় উৎকণ্ঠা হইয়াছে, সেই উৎকণ্ঠা এতই প্রবল, যে সেই উৎকণ্ঠা-নিবন্ধন যাহা অকৃত্য, যাহা করা উচিত নহে, তাহাও তিনি করিতেছেন। আবার, ব্রাহ্মণের সন্তান-হরণ-রূপ অন্যায় কার্য্য যাহা তিনি করিতেছেন, তাহা নিজেই করিতেছেন, কোন সেবক পাঠাইয়া তাহার দ্বারা করান নাই ; ইহাও অতিশয় বিস্ময়ের বিষয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, দ্বারকানগর হইতে সন্তানহরণ করা অন্যের ক্ষমতাতীত, সেইজন্য মহাকালপুরুষকে স্বয়ং এই কার্য্য করিতে হইয়াছে। মহাকালপুরুষ ভাবিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিজের নগরবাসী ব্রাহ্মণকে আমি এমন প্রকারের একটা কিছু দুঃখ দিব, যাহা নিবারণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন। এই মহাকালপুরুষ অন্তর্যামীস্বরূপ, ব্রাহ্মণের সন্তান হরণ করিয়া ব্রাহ্মণের অন্তরে এক প্রেরণা দিলেন। সেই প্রেরণায় ব্রাহ্মণ মুখর হইয়া পুত্রের মৃতদেহ কৃষ্ণের দ্বারে ফেলিয়া দিয়া কৃষ্ণের নিন্দা করিয়া আসিলেন। অর্জ্জুন এই প্রকারে চিন্তা করিতেছেন। যতই ভাবিতেছেন, তাঁহার বিস্ময় ততই বাড়িয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যে ব্যাপার, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; যতই ভাবিতেছি বিস্ময় বাড়িয়া যাইতেছে। হরিবংশ-গ্রন্থে আছে, অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং ন চান্যথা ॥

আমার দর্শন লাভের জন্য সেই মহাত্মা-কর্ত্তৃক অর্থাৎ মহাকালপুরুষ-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-বালকগণ

অপহৃত হইয়াছে মহাকালপুরুষ মনে করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিবেন। অন্য প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আরও যেন বলিলেন—আমি দ্বারকাবাসী ঐ ব্রাহ্মণের জন্য কালপুরুষের নিকট যাই নাই। হে অর্জ্জুন, তুমি আমার সখা, আমি তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই কালপুরুষের নিকট গিয়াছিলাম। ঐ ব্রাহ্মণের জন্যই যদি আমি যাইতাম, তাহা হইলে তাহার প্রথম পুত্রই যখন নিহত হইয়াছিল, সেই সময়েও আমি যাইতাম; তাহার নবম পুত্র হত হইলেও আমি যাই নাই। শেষে যখন দেখিলাম, এইবার না গেলে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তুমি প্রাণত্যাগ করিবে, তখন আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই সব কথা শুনিয়া অর্জ্জুন নিশ্চয় করিলেন—পরমব্যোমনাথ পর্য্যন্ত পুরুষগণের যাহা কিছু পৌরুষ, তৎসমুদয় শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পায় সম্পাদিত।

এই ঘটনাটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলার শেষাংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন এরূপ হইল, পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী তাহা বলিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—ইদন্তু ভারতযুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কৃতমপি শ্রেষ্ঠকথন প্রস্তাবেনাত্রোক্তমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। এই ঘটনাটি ভারত যুদ্ধের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের শেষাংশে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বলা হইতেছে, এই ঘটনাটি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক বলিয়া, সেইখানেই ঘটনাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উপসংহার

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই মন্তব্য শ্রীজীব গোস্বামীর মীমাংসার অনুরূপ। এখনকার দিনে একদল লোক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ জানিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রব্যাখ্যায় বা ধর্ম্ম সাধনায় কোনরূপ রহস্য থাকিবে না। এই যে একটা ভাব, ইহা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ আছে, এবং আমাদিগকে তাহার আলোচনা করিতে হইবে। শাস্ত্রবাক্যের বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রের সদ্ব্যাখ্যা করার উপায় কি তাহার উদাহরণ স্বরূপে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। শাস্ত্র মানিয়াও মানুষ কত দূর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে, এই প্রবন্ধ পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

গুরুবাদ

প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা খুব বড় আপত্তি,—গুরুবাদ বা মধ্যস্থতাবাদ। আমাদের দেশে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতেই এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। মানুষ ভগবানের ভজনা করিবে করুক, খুবই ভাল কথা, কিন্তু মানুষ যে মনে করে আর একজন মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিলে ভগবানের ভজনা হয় না; এই প্রকারে একজন মানুষকে গুরু বলিয়া ধরিতে গিয়া মানুষ আর ভগবানের ভজনা করে না, মানুষ মানুষেরই ভজনা করে। একদল ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক এই নরপূজার বিরোধী। গুরুবাদ বা মধ্যস্থতাবাদের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি, ইহাই তাহার হেতু।

এমন অনেক ধর্ম্মমত আমাদের দেশে আছে, যাহাতে ঈশ্বরের বা ভগবানের ভজনাই নাই, তাহা গুরুরই ভজনা করে এবং বলে মানুষ মানুষেরই ভজনা করিবে। ঈশ্বরের ভজনার আবশ্যক নাই, গুরুর ভজনা করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। যদি ঈশ্বর থাকেন এবং সেই ঈশ্বরকে লাভ করার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে গুরুর ভজনার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইবে।

গুরু-উপাসনা সম্বন্ধে এই দুই চরম মত। একমতে গুরুকে একেবারে বাদ দিয়া কোনরূপ মধ্যস্থের সাহায্য না লইয়া, ঈশ্বরকে আমার আত্মার আত্মা বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে তাহার উপাসনা; আর এক মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই গুরুরই একান্তভাবে আরাধনা। এই দুই প্রকারের চরমপন্থার আবার অনেকরূপ মাঝামাঝি মীমাংসাও আছে। এই মতগুলি শাস্ত্রানুসারে আলোচনা করিতে হইবে। 'হরিভক্তিবিলাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধকে বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ ভদ্র বৈষ্ণব প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন, আমরা প্রথমে সেই হরিভক্তিবিলাসের মতের আলোচনা করিব।

প্রথম কথা, কোনও গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রত্যেক নরনারী বাধ্য কিনা। স্বভাবতঃ মনে হয় যেন সকলেই বাধ্য। কিন্তু শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে গুরূপসত্তির অর্থাৎ গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করার যে-কারণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে সন্দেহ হয়, আমাদের সমাজে যাঁহারা গুরুর শরণাগত হইতেছেন, তাঁহারা এই কার্য্যের প্রকৃত অধিকারী কিনা।

শ্রীগুরূপসত্তিকারণ

চারিটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এই চারিটি শ্লোকের প্রথম দুইটি নিবন্ধকারের নিজের শ্লোক

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্যতামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই যে মূল, কৃপা ছাড়া যে-কিছু হইবে না, তাহাতে সন্দেহ বা মতভেদ নাই। এই কৃপার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের সঙ্গ পাওয়া যায়। ভক্তের সঙ্গ হইলেই ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিতে পাওয়া যায়। ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে ইচ্ছা হয়, আমারও ভক্তি হউক। এই অবস্থায় মানুষ সদ্গুরুর ভজনা করিবে। গুরুর আশ্রয় গ্রহণের ইহাই ব্যবস্থা—ভক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা হইলে মানুষ সদ্গুরুর শরণাগত হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যাহার ভাগ্যে ভক্তসঙ্গ ঘটে নাই, ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিয়া ভক্তিলাভের জন্য যাহার অন্তরে মোটেই কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই, সে ব্যক্তি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি করিবে? এই শ্লোকটী পড়িলে স্বভাবতঃ এই কথাটাই মনে হইবে। ইহার পরের শ্লোক এইরূপ ঃ—

অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ।
দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাতিতিশ্বেদপি তাং সুধীঃ॥

ইহলোকে সর্ব্বদাই নানা প্রকারের দুঃখ অনুভব করিতে হয়। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় পরলোকেও দুঃসহ দুঃখভোগ হইয়া থাকে, যিনি সুধী, তিনি এই দুঃখশ্রেণী হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিশ্চয়ই অভিলাষী হইবেন।

এই শ্লোক হইতে দুইটী কথা পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ এই সংসার যে দুঃখে পরিপূর্ণ ইহা বুঝা চাই. দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে মরণের পরও পরলোকে নানারূপ দুঃখ আছে, এই কথাতেও বিশ্বাস হওয়া চাই। এই অনুভব ও বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে তিনিই সদ্গুরুর শরণাগত হইয়া এই দুঃখে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিবেন। বর্ত্তমান যুগে কয়জন লোক সংসারকে সত্য সত্য দুঃখালয় বলিয়া বিবেচনা করে? সকলেই পরিশ্রম করিতেছে, অর্থার্জ্জন করিতেছে, সুখলাভের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছে। পরলোক-সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই তেমন বিশ্বাসও নাই, আর যৎসামান্য বিশ্বাস থাকিলেও সেজন্য কোনরূপ দুর্ভাবনার তাড়না নাই। আবার এমন অনেক বিলাতী মত আছে যাহা পরলোকে বিশ্বাস করিলেও পরলোক সম্বন্ধে মানুষকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়াছে। পরলোকে যে কোনরূপ কষ্ট আছে ইহা তাহারা মানে না। তাহারা জানে ও বিশ্বাস করে পরলোক বড়ই সুখের স্থান। ইহাই যদি বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষের মানসিক অবস্থা হয়, তাহা হইলে গুরুর শরণ গ্রহণ করার স্থান কোথায়? অথচ দেখিতেছি এখন আমাদের দেশে ব্রাহ্ম-সমাজের মতের সুপ্রবল প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। গুরু, সদগুরু, সিদ্ধগুরু ও অবতারের সংখ্যা নাই।

প্রত্যেকেরই দলে অসংখ্য নরনারী দীক্ষিত হইতেছেন, সুতরাং শাস্ত্রের এই কথা লোকে মানিয়া চলেন কিনা চিন্তা করিয়া তাহা বুঝিতে হইবে।

এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক

(১)

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীবঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃস্যাৎ॥

(২)

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান ভবাব্ধিঃ ন তরেৎ স আত্মহা॥

বহু বহু জন্ম চলিয়া গিয়াছে, বহু বহু যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, তাহার পরে এই মনুষ্যদেহ পাওয়া গিয়াছে। মনুষ্য জন্ম সুদুর্ল্লভ। এই জন্মেই পুরুষার্থলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু দেহ অনিত্য, যতদিন এই দেহ থাকে, মৃত্যু যতদিন না এই দেহ ধ্বংস করে, ততদিন সর্ব্বদা মোক্ষলাভের জন্য চেষ্টা করিবে। ভগবান বা ভগবানের কৃপা অনুকূল বায়ুর ন্যায়। ইহাই প্রথম সম্বল এবং ইহা সুলভ। গুরু কর্ণধার, আর মানব দেহ সুদুর্ল্লভ তরণী, এইগুলি পাইয়াও যে ব্যক্তি সংসার সাগর উত্তীর্ণ না হয়, সে আত্মঘাতী।

এই দুইটী শ্লোকেও যে কথাগুলি বলা হইল তাহাও বুঝিতে হইবে। মানব জন্ম সত্যই যে সুদুর্ল্লভ, এই মানব দেহ যে ভগবানের বিশেষ কৃপায় পাওয়া গিয়াছে, এই কথাটা ঠিক মত কয়জন লোক বুঝিতে পারে? আমাদের দেশের লোকে এই কথাটা যখন বুঝিত তখন আমাদের দেহ নিরোগ, সুস্থ, সক্ষম ও সুন্দর ছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া দিনচর্য্যার বিধিগুলি সকলেই যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিত। বালক বালিকারা জীবনের প্রথম হইতে নিয়ম অনুসারে চলিতে অভ্যস্ত হইত, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। শাস্ত্রানুশাসিত ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার প্রথম ও প্রধান অন্তরায়, আমাদের এই দেহ। মানব দেহের মূল্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই মানব দেহের দ্বারা যে পরমার্থ লাভ হয়, সেই পরমার্থ সম্বন্ধেও আমাদের কোনরূপ বোধ নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে গুরুকে কর্ণধার করিয়া অর্থাৎ সদ্‌গুরুর শরণাগত হইয়া তাঁহার উপদেশ মত এই দেহের দ্বারা সাধনা করিয়া ভবসাগর পার হইবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কয়জন লোক ভবসাগর পার হইতে চায়? ভবসাগর পার হওয়ার অর্থ কি তাহাই বা কয়জন লোক বোঝে? আমরা অনেকেই শুনিয়া শুনিয়া কথাটা শিখিয়া রাখিয়াছি। সময় নাই, অসময় নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই যেখানে সেখানে যখন তখন কথাটা আওড়াইয়া যাইতেছি। কিন্তু এই ভবসাগরের অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও

আমার ভোগ্য এই জগতের পারে যে এক নিত্য ও পূর্ণ জগত রহিয়াছে এবং আমরা, এই মানবেরা তীর্থযাত্রীর মত জানিয়া বা না জানিয়া সেই অমৃতলোকের অভিমুখে চলিয়াছি—একথাটাই বা বুঝে কয়জন? যদি তাহা বুঝিতাম তাহা হইলে আমি দেহ ও ইন্দ্রিয় সুখের জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল হইতাম না। আমার এই আমিটাকে উঁচু করিয়া, বড় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতাম না। তাহা হইলে আমি হিংসার পথ ছাড়িয়া প্রেমের পথের পথিক হইতাম। স্বার্থ সাধনের পথ ছাড়িয়া সেবার পথ অবলম্বন করিতাম. আত্মপুষ্টির জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য এত উদ্বিগ্ন না হইয়া সানন্দে আত্মদানের মহাব্রত অবলম্বন করিতাম।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক চারিটি আলোচনা করিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবার অধিকার বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। বড় জিনিস লইয়া খেলা করিতে নাই। তাহা পাপ। উচ্চ ও মহৎ আদর্শকে খর্ব্ব করলে অপরাধ হয়। সুতরাং যাঁহারা সদ্‌গুরুর দোহাই দেন ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইবেন এবং শাস্ত্রের এই উপদেশগুলি স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ আমাদের এই সুপ্রাচীন বেদপন্থী সমাজে ঐ প্রাচীন জীবনাদর্শ কি প্রকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার সদুপায় চিন্তা করিবেন।

এই গেল, কেন সদ্‌গুরুর শরণাগত হইব, তাহার হেতু। এইবার

গুরূপসত্তি

অর্থাৎ কে কখন কি প্রকারে গুরুর শরণাগত হইবে, কয়েকটি শ্লোকে তাহাই কথিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে প্রবুদ্ধ যোগেশ্বর বলিয়াছেন;—

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥

পূর্ব্বের শ্লোক চারিটিতে শিষ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ গুরুপদাশ্রয়কামীর অধিকার সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে এই শ্লোকটিতে ঠিক সেই কথাই সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে বলা হইল। পূর্ব্বের শ্লোক চারিটিতে সদ্‌গুরুর সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছুই বলা হয় নাই। এই শ্লোকটিতে তাহাও বলা হইল। এই শ্লোকটিতে বলা হইল যিনি মোক্ষরূপ পরম কল্যাণ চাহেন তিনিই গুরুর শরণাগত হইবেন, কয়জন লোক মোক্ষরূপ পরম কল্যাণ চাহে? মানুষ চাহে ভুক্তি ও সিদ্ধি। ইহলোকেও সুখে থাকিব, পরলোক যদি থাকে সেখানেও সুখে থাকিব, দশজনের মধ্যে একজন হইব—ইহাই মানবের স্বাভাবিক কামনা, শাস্ত্র বলেন এই সব মানুষ ত্রিবর্গের উপাসক। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ইহাদের নাম ত্রিবর্গ। এই

ত্রিবর্গের উর্দ্ধে যাহা আছে, আমার ব্যক্তিগত সুখ ও লাভ অপেক্ষা যাহা উচ্চতর ও মহত্তর, তাহার জন্য সত্য সত্য কয়জন লোকের প্রাণ ব্যাকুল হয়? এই ব্যাকুলতা যাহাদের হয় তাহারাই সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবার অধিকারী। এইবার বলিতেছেন সেই সদ্‌গুরু কে। তিনটি লক্ষণের দ্বারা সদ্‌গুরু নির্ণীত হইয়াছেন। (১) তিনি বেদে বা বেদাখ্য ব্রহ্মে পারদর্শী হইবেন। বেদবিদ্যায় পারদর্শিতা না থাকিলে তিনি শিষ্যের সন্দেহ সমূহ নিরস্ত করিতে পারিবেন না। (২) তাঁহার অপরোক্ষ অনুভব অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভব থাকা চাই। তাহা না থাকিলে তিনি শিষ্যের হৃদয়ে কোনরূপ বোধ সঞ্চারিত করিতে পারিবেন না। (৩) তিনি পরম শান্তভাবাপন্ন হইবেন। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন হইতে যে সমস্ত ক্ষোভ বা চঞ্চলতার উদয় হইতেছে, তাঁহার প্রকৃতিতে সেই সমুদয় ক্ষোভ, চঞ্চলতা বা দুর্ব্বলতা থাকিবে না। এই প্রকারের সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের টীকায় এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে যিনি ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বদাই শ্রবণ কীর্ত্তন পরায়ণ সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠই সদ্‌গুরু। এই ব্যাখ্যা সঙ্গত। কিন্তু এই লক্ষণগুলিকে বাহ্য লক্ষণ বলা যাইতে পারে। ভিতরের কথা এই যে বেদের জ্ঞান, পরব্রহ্মের অনুভব ও ক্ষোভহীন শান্তচরিত্র—এই তিনটি গুণ থাকা চাই। তাহার পর তিনি শ্রবণ কীর্ত্তন পরায়ণ হউন। বেদেও ঠিক এই কথা আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এই উভয়ই হওয়া চাই; অর্থাৎ বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের তত্ত্ব উত্তমরূপে জানা চাই এবং অপরোক্ষ অনুভব চাই। কেহ বলিতে পারেন যদি অপরোক্ষ অনুভবই থাকিল তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞানের প্রয়োজন কি? তত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক স্থলে শাস্ত্রজ্ঞানকে গৌণ বলিয়াছেন। ইহার উত্তর এই—

একজন প্রতিভাশালী লোক ভালরূপ পড়াশুনা না করিয়া নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে খুব বেশী রকম জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। এই প্রকারের প্রতিভাশালী লোককে অধিকাংশ স্থলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক করা যায় না। কারণ, তিনি যে প্রণালীতে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রই সেই প্রণালীতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; এক এক জন ছাত্রের প্রকৃতি এক এক রূপ, শক্তিরও তারতম্য আছে। সুতরাং শিক্ষককে বুঝিতে হইবে কোন ছাত্রের প্রকৃতি ও অধিকার কিরূপ এবং কোন পথে চালাইলে তাহার উপকার হইবে। এই কারণেই শিক্ষকতা করিতে হইলে মনস্তত্ত্ব জানা চাই। কেবল সংস্কৃত ভাষা জানিলেই একটি ছাত্রকে ঠিক মত সংস্কৃত শিখাইতে পারা যাইবে না। সংস্কৃত জানা চাই, আর—সেই ছাত্রটিকেও জানা চাই। আবার ২৫টি ছাত্রকে পড়াইতে হইলে ঐ ২৫টিরই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বুঝা চাই। বেদ কি, শাস্ত্র কি? অতীতের ঋষিদের অভিজ্ঞতার সমষ্টির নামই বেদ ও শাস্ত্র। কত রকমের মানুষ আছে, কত রকমের চিন্তা আছে, কত রকমের সন্দেহ ও তাহার মীমাংসা আছে,

নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। এইজন্যই শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়োজন। যিনি শাস্ত্রানুশীলন করেন নাই, কিন্তু নিজের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা কিঞ্চিৎ অপরোক্ষানুভব করিয়াছেন তিনি যে পূজ্য ও প্রণম্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে সদ্গুরু বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইবেন না—ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়। এ বিষয়ে যাঁহার যাহা মত তিনি তাহারই অনুবর্ত্তন করুন। শাস্ত্রের যাহা তাৎপর্য্য আমরা তাহাই বলিলাম।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়া আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকং" পূর্ব্বে আমরা যে তিনটি লক্ষণ দেখাইয়াছি এই শ্লোকে তাহাই স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। (১) মদভিজ্ঞ,—ভগবান সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ ভগবানকে ভক্তেরা কত প্রকারে জানিয়াছেন, ভগবানকে কত প্রকারে জানা সম্ভব, ভক্তের বা উপাসকের কতপ্রকার অবস্থা দেখা গিয়াছে বা হইতে পারে। এই সমুদয় ব্যাপার যিনি জানেন তাঁহাকেই অভিজ্ঞ বলে। এই অভিজ্ঞান যে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন। (২) মদাত্মক,—যাঁহার চিত্ত ভগবানে সন্নিবিষ্ট, অর্থাৎ যিনি অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা বা প্রজ্ঞা দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ অনুভব করিতেছেন। (৩) শান্ত,—প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তাদি গুণসম্পন্ন। অতএব দেখা যাইতেছে অভিজ্ঞা, প্রজ্ঞা ও জিতেন্দ্রিয়তাদি গুণ—এই তিনটি যাহাতে আছে তিনিই সদ্গুরু। ক্রমদীপিকা নামক তন্ত্রের গ্রন্থ হইতে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

> "বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতিরিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং।
> ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগলরজো রাগিনী মদ্বহন্তং।
> বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগম বিমল পথাং সম্মতং সৎসু দীপ্তং
> বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত॥"

কাম প্রভৃতি রিপুসমূহ যাঁহার প্রধ্বস্ত হইয়াছে, যিনি নির্ম্মলাঙ্গ অর্থাৎ ব্যাধিবিহীন, শ্রীকৃষ্ণের চরণে যাঁহার গরিষ্ঠা ও রাগযুক্তা ভক্তি আছে, বেদ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট ও সাধুজনসম্মত সাধন পথ যিনি জানেন, যিনি দান্ত, সেই প্রকারের ব্রাহ্মণ গুরুর শরণাগত হইবে। এই শ্লোকে প্রথম বলা হইল বিপ্রগুরু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ মতভেদ দেখা যাইতেছে। যাঁহারা জাতিভেদ মানেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মাইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যাঁহারা পুরুষানুক্রমে সুদীর্ঘকাল শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছেন, ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক হইয়া রহিয়াছেন এবং দীক্ষাদান প্রভৃতি গুরুর কার্য্য করিতেছেন, আজকাল তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল আপত্তি ও আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আপত্তি যে সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ অনেকে ব্রাহ্মণ

বংশে বা শাস্ত্রজ্ঞ গুরুবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শাস্ত্রচর্চ্চাও করেন নাই,পরমার্থতত্ত্ব জানিবার জন্য কোনরূপ সাধনাও করেন নাই, এমন কি সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় সচ্চরিত্রতারও অভাব আছে। এই প্রকারের লোক কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মাইয়াছি বলিয়া যদি অভিমান করেন এবং মনে করেন যে তাঁহারা অযোগ্য হইলেও সদ্‌গুরুর কার্য্য করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, তাহা হইলে আপত্তি না হইয়াই পারে না, কিন্তু ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন বা সুপ্রসিদ্ধ গুরুবংশোৎপন্ন সকলেই কি এই প্রকারে অধঃপতিত হইয়াছেন? ইহার উত্তরে বলিতেই হইবে "না, সকলেই অধঃপতিত হন নাই।" শাস্ত্র-জ্ঞানে ও সাধনশীলতায় এখনও ব্রাহ্মণ উচ্চ স্থানের অধিকারী। সুতরাং যদি দেখা যায় যে শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাস প্রভৃত সম্মানিত গ্রন্থে ব্রাহ্মণকেই গুরু করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে যাঁহারা শাস্ত্রানু-সারে চলিতে চাহেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই বিপথগামী হইয়াছেন। তাঁহারা হয়ত সংশোধনের অতীত, কিন্তু যাঁহারা এখনও শাস্ত্রের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া সেই আলোকে জীবন যাত্রা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক, শাস্ত্রবিশ্বাসী জনগণের উচিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করা এবং তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের নষ্ট-গৌরব উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা সমাজের যথার্থ হিতসাধন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা। শাস্ত্রের যদি ইহাই মত হয় যে ব্রাহ্মণগুরুই শ্রেষ্ঠ, আর আমরা যদি শাস্ত্রানুসারে চলিতে চাই তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে ধ্বংস করিয়া বা নূতন ব্রাহ্মণ গড়িয়া তুলিয়া সমাজে বিপ্লব আনয়ন করা উচিত নহে। বর্ত্তমান সময়ে সমাজ-বিপ্লব কোন প্রকারেই হিতকর হইবে না। দুএকজন লোক বা দুএকটী দল এই প্রকার বিপ্লবের দ্বারা আপাততঃ কিছুদিনের জন্য লাভবান হইলেও তাহার ফল সর্ব্বনাশজনক হইবে, তবে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় দেখিতে হইবে, কেহ কেহ বলিতে পারেন এই সমুদয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণেরই রচনা,সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। কথাটা বড়ই কঠিন। যাহারা বুঝিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাস সম্বন্ধে বলিবার কথা এই যে শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু এই গ্রন্থের সংগ্রহকারক আর শ্রীসনাতন গোস্বামী এই গ্রন্থের যখন টীকা লিখিয়াছেন, তখন এই গ্রন্থ তাঁহার অনুমোদিত, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী গোস্বামিগণের ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, পরার্থপরতা ও প্রতিভা সকলেই জানেন। তাঁহারা যে বেদপন্থী সমগ্র সমাজের কল্যাণের দিকে না চাহিয়া শাস্ত্রের কুমীমাংসা করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের পুরুষানুক্রমিক স্বার্থ বা প্রাধান্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ও সভ্যদেশের সহিত হিন্দুস্থানের ইতিহাসের তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের ন্যায় একটা জাতি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধনা রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রাচীন [illegible]

সাধনা ও সভ্যতা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে কেহ জানেনা, কি হওয়া প্রয়োজন তাহাও কেহ জানেনা। কিন্তু তুলনামূলক ইতিহাস অলোচনা দ্বারা এই কথাটী বুঝিতে পারা যায়।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সকলে সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবার অধিকারী নহে। এই অধিকার লাভের জন্য সাধনা প্রয়োজন। সেই সাধনা কিছুই নহে।—সৎসঙ্গ, শাস্ত্র শ্রবণ, সৎচিন্তা, সদাচার প্রতিপালন প্রভৃতি। এই গুলি করিতে করিতে মানুষের চিত্ত বিকশিত হইবে এবং মানুষ বুঝিতে পারিবে এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও জীবন ছাড়া আরও বৃহত্তর জগৎ ও জীবন আছে। আমরা আজ মরণের কারাগারে বন্দী হইয়া আছি, মোহাচ্ছন্ন হইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু পরিত্রাণ আছে—পরিত্রাণের সেই উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক,এই প্রকারের চিন্তা যাহার মনে জাগিয়া উঠিবে, তিনিই সদ্‌গুরুর শরণাগত হউন। কেহ কেহ বলিতে পারেন আমার ভিতরে এইরূপ চিন্তা জাগিয়াছে; আমি পরিত্রাণ চাই—আমি পরমার্থ চাই। কিন্তু অন্য কোন মানুষের শরণাগত হইয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই, আমি লেখাপড়া শিখিয়াছি, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়াছি, শাস্ত্রের অর্থও বুঝি, সুতরাং শাস্ত্রের উপদেশানুসারে আমি চলিতে থাকিব। তাহাতে কি আমার পরমার্থ লাভ হইবে না? কথাটা বড়ই কঠিন। এই যুগ স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগ, প্রত্যেক মানুষ স্বপ্রতিষ্ঠ বা আত্মসংস্থ হইতে চাহেন। প্রত্যেক মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন আমার ভিতরেও ভগবান আছেন, আমিও আমার আত্মায় শ্রীভগবানের বাণী শুনিতে পাই। আমি সেই বাণী শুনিয়া জীবনের পথে চলিব, সমাজ যদি আমার কল্যাণ করিতে চাহেন তাহা হইলে আমার স্বাধীনতা অপহরণ না করিয়া, আমি যাহাতে আত্মসংস্থ হইতে পারি, আমি যাহাতে আমার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, আমি যাহাতে আমার স্বাধীন চিন্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারি, সমাজ আমাকে সেই প্রকারের শিক্ষা দান করুন। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা অনেকে এই কথাই বলিতেছেন। প্রাচীন জগতে প্রবল ও চতুর লোক দুর্ব্বলের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের আয়ত্বাধীন করিয়া পশুর ন্যায় জঘন্য অবস্থায় তাহাদিগকে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, মানবের স্বাধীনতা তাহাদের দেয় নাই, এই প্রকারে সুদীর্ঘকাল যাহারা পদানত ও বিদলিত হইয়া রহিয়াছে, আজ জগৎ জুড়িয়া তাহাদের জাগরণের দিন আসিয়াছে। যাহারা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাজকেরা অর্থাৎ ধর্ম্মাচার্য্যেরা একটী সুপ্রবল দল, আর ভারতের ব্রাহ্মণেরা সেই দলের শিরোমণি। সুতরাং এই ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করা, যাজকতন্ত্র উৎপাটন করা একান্ত ভাবে আবশ্যক। হিন্দু সমাজে অসন্তোষের আগুণ জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণকে ধ্বংস করিবার জন্য চারিদিকে আন্দোলন চলিতেছে, আর এই আন্দোলন ও অসন্তোষের মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা নহে সুতরাং যদি কেহ বলেন যে আমি কোন

ব্যক্তিবিশেষকে গুরু না করিয়া নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনাবুদ্ধির উপরে ধর্ম্মজীবন গঠন করিব, তাহা হইলে তাঁহার কথায় আপত্তি করিবার কোনরূপ সঙ্গত হেতু নাই, তবে শাস্ত্রকার কি বলিয়াছেন তাহাও দেখা উচিত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন।

গুরূপসত্তি নিত্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে এই নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বেদ-স্তুতিতে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়।

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ ॥

এই শ্লোক যে ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে একজন সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক। এই শ্লোকের অর্থ এই :—

যাহারা ইন্দ্রিয় গুলিকে ও প্রাণ সমূহকে বশীভূত করিয়া এবং মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিয়া পরমার্থ লাভ করিতে চাহে, অথচ ইহলোকে শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করে না, তাহাদের অবস্থা বড়ই ভয়ানক। সে অবস্থা কেমন ?—যেমন বণিক নৌকাতে অনেক মূল্যবান দ্রব্য লইয়া সমুদ্র পার হইতেছে, কিন্তু তাহার নৌকায় কর্ণধার নাই। তাহার কি হইবে ? তাহার নৌকা নানা প্রকারে কষ্ট পাইয়া পরিশেষে নিরুপায় হইয়া সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, পরমার্থকামী মানুষ সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া সাধন পথে অগ্রসর না হইলে তাহারও অবস্থা এইরূপ হইবে। প্রকৃত কথা এই, অন্তর্জগৎ বলিয়া একটী বিশাল রহস্যময় জগৎ রহিয়াছে। আজকাল যাহারা সমুন্নত মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা ইহা ভাল করিয়া জানেন। ধারণা, জপ, ধ্যান, ন্যাস প্রভৃতি ক্রিয়া করিলে মানুষের অন্তর্জীবনে নানাপ্রকারের ব্যাপার ঘটিতে থাকে। এই সব ব্যাপারের দ্বারা অমঙ্গলও হইতে পারে। এই কারণে একজন শাস্ত্রজ্ঞ সূক্ষ্মানুভাবসম্পন্ন ও শান্তচিত্ত পরিচালকের আবশ্যক।

সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিলে স্বাধীনতার হানি হইবে কেন তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। যিনি প্রকৃত গুরু, তিনি যথেচ্ছাচারী নহেন, তিনি প্রভু হইলেও যথেচ্ছাচারী নহেন। তিনি মিত্র ও প্রিয়, একথা প্রাচীন শাস্ত্রেই আছে। বৈষ্ণবেরা অনেকে গুরুকে সখী বা সখা বলিয়া থাকেন, সুতরাং প্রকৃত গুরু শিষ্যকে অন্ধভাবে তাঁহার আদেশ মানিয়া লইতে বলিবেন না। তিনি যুক্তি দিবেন, ভাব দিবেন, প্রেরণা দিবেন; শিষ্য বিবেচনা করিয়া নিজের বুদ্ধির আলোকে সাধনপথে অগ্রসর হইবেন। পথে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলে বা কোনরূপ সন্দেহের উদয় ইহলে গুরু সেই বিঘ্ন দূর করিবেন ও সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, অবশ্য এই গুরু সদ্গুরু হওয়া চাই। নতুবা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় বিপদগ্রস্ত

হইতে হইবে। ইহাও বেদের উপদেশ, ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইয়াছে—ইহা অনেকটা সত্য, কিন্তু শাস্ত্র যে মানুষের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাকে অধঃপাতিত করিয়াছে, ইহা একেবারেই সত্য নহে; একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা শাস্ত্রের সহিত পরিচিত নহেন। ব্রাহ্মণের ভিতর অনেকে যথেচ্ছাচারী আছেন, আর কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বা যথেচ্ছাচারী নাই? কিন্তু যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সর্ব্বদাই শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিতেছেন এবং অনন্যকর্ম্মী হইয়া শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে নিজের জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণই সদ্গুরু, বুঝিয়া সুঝিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে স্বাধীনতার হানি হইবে কেন? ইহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থের অভিপ্রায়।

গুরুর লক্ষণ

পূর্ব্বে সামান্যভাবে বলা হইয়াছে। এখন তাহাই বিশেষভাবে বলা হইতেছে। মন্ত্রমুক্তাবলী নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে নিম্নের শ্লোক কয়টী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকগুলি এই:—

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচার তৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোহনন্তো বিমর্শকঃ।
সগুণোহর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্র পরায়ণঃ।
উহাপোহ প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরু স্যাদ্গরিমানিধিঃ॥

১। অবদাতান্বয়ঃ। যাহার অন্বয় বা বংশ অবদাত অর্থাৎ শুদ্ধ,—যাহার বংশে পাতিত্যাদি দোষ ঘটে নাই, এই লক্ষণটী বিশেষভাবে স্মরণীয়। এমন ব্রাহ্মণবংশ কি বাংলাদেশে নাই, যাঁহারা অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া বংশপরম্পরায় শাস্ত্রানুশীলন করিতেছেন ও শাস্ত্রোক্ত সদাচার যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতেছেন? এই প্রকারের ব্রাহ্মণবংশ এখনও আছে। তবে সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই বংশ রক্ষা করা কঠিন, আজকাল আমাদের দেশে যে সব নূতন গুরু বা অবতারের আবির্ভাব হইতেছে, যাঁহাদের দলে অনেক লোক প্রবেশ করিতেছে এবং দলপুষ্টির জন্য যাঁহারা সর্ব্ববিধ আধুনিক উপায় অকুণ্ঠিত চিত্তে ও প্রকাশ্যভাবে অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলে এই সমুদয় ব্রাহ্মণ বংশ ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত, এবং তাঁহারা অনেকটা সফলতাও লাভ করিয়াছেন, এখন

যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই সমুদয় বংশ রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু কঠিন হৌক বা সহজ হোক, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে, সফলতা বা বিফলতা ভগবানের হস্তে। সৎশাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া যাঁহারা চলিতে চাহেন তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া অনুসন্ধান করুন এবং এই প্রকারের ব্রাহ্মণবংশ যাহাতে রক্ষা পায় সে জন্য চেষ্টা করুন।

২। শুদ্ধ।—প্রথমতঃ শুদ্ধ ও পতিত্যাদি দোষশূন্য বংশে জন্ম হওয়া চাই। কিন্তু কেবলমাত্র সৎবংশে জন্ম হইলেই হইবে না, নিজেও শুদ্ধ বা পাতিত্যাদি দোষশূন্য হওয়া চাই। গুরুবাদের একটা রহস্য আছে তাহা জানিয়া রাখা দরকার। ভগবানই আদি গুরু। তাঁহার এই গুরুরূপপ্রকাশের নাম মহাবিষ্ণু, মহাশিব বা পরম ব্যোমনাথ। সেই মূল হইতে তাঁহার গুরুশক্তি অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা জীবের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হইবে এবং জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, সেই শক্তি শিষ্য-পরম্পরায় জগতে সংক্রামিত হইতেছে। পৃথিবীতে যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে সদ্‌গুরুর কার্য্য করেন তাঁহাদের মধ্য দিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মধ্য দিয়া সেই শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে, কাজেই দেহ ও ইন্দ্রিয় বিশেষরূপে শুদ্ধ না হইলে সেই শক্তির ক্রিয়া হয় না। আমাদের সমাজে গর্ভাধান প্রভৃতি যে সমুদয় সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, সেই সমুদয় সংস্কারের উদ্দেশ্য দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ প্রভৃতির পরিশোধন ও পরিশুদ্ধি-রক্ষা। এই কারণেই যে বংশে কখনও পতিত্যাদি দোষ ঘটে নাই, সেই বংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছে এবং যিনি সেই বংশে জন্মাইয়া ঐ শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু। তাঁহারই দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধির মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের গুরুশক্তি ক্রিয়া করিবেন এবং সেই শক্তির ক্রিয়া দ্বারা শিষ্যের চেতনায় পারমার্থিক বোধ সঞ্চারিত হইবে।

৩। স্বোচিতাচারতৎপর :—নিজের যেটী বিহিত আচার তাহাই অবলম্বন করিয়া যিনি চলেন তিনিই সদ্‌গুরু। ইহা হইতে আর কিছু না হোক্ একটা কথা পাওয়া যায়। অনেক লোক আছেন তাঁহারা বাহিরের খুঁটী নাটী লইয়াই ব্যস্ত। ভিতরের কথা বা মূল রহস্য জানেও না, বোঝেও না এবং জানিবে না ও বুঝিবে না। তাহারা কতকগুলি বাহিরের চিহ্নকে আচার বলিয়া মনে করে, বাহ্য আচার যে আচার নহে তাহা নয়। কিন্তু কেবল বাহিরে চাহিলে হইবে না। শাস্ত্র বলিলেন "স্বীয় বিহিত আচার।" অতএব তিনি যখন তত্ত্বদর্শী তিনি নিজের আচার নিজে জানেন। হঠাৎ তাহার বিচার করা অপরের উচিত নহে। সন্দেহ হইলে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লওয়া উচিত, কিন্তু তাড়াতাড়ি সমালোচনা করা উচিত নহে।

৪। আশ্রমী.—আজকাল একটা রীতি হইয়াছে অজ্ঞাতকুলশীল ও অপরিচিত সন্ন্যাসীকে গুরু করা। গুরুগিরি বেশ লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া অনেক চতুর লোক সন্ন্যাসীর পোষাক পরিয়া দালাল নিযুক্ত করিয়া বিজ্ঞাপন ও বুজরুকীর সাহায্যে গুরুগিরির যৌথ কারবার খুলিয়া দিয়াছেন।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে ভাল লোক নাই তাহা বলি নাই। কিন্তু যে সব সন্ন্যাসী গৃহস্থ নরনারীকে ধরিয়া তাহাদের কানে ফুঁ দিয়া গুরুগিরি করিতেছেন এবং ধনবান গৃহস্থের বাড়ী সুখাদ্য ও সুপেয় এবং অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহাদের নিন্দা করিতেছি। আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি তাঁহারা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। কোন কোন স্থলে কাহারও কাহারও পক্ষে হয়ত ইহা নিন্দনীয় নহে, কিন্তু যে সমুদয় সন্ন্যাসী ব্যাপকভাবে কেবল শিষ্য করিবার জন্য দেশে দেশে ঘুরিতেছেন তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞানতা বশতঃই হৌক বা লোভপ্রযুক্তই হৌক সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। আমরা বিনীতভাবে দেশের লোককে সাবধান করিয়া দিতেছি। গুরু আশ্রমী হইবেন অর্থাৎ গৃহস্থ হইবেন। এই গুরু গৃহস্থের গুরু, সন্ন্যাসীর গুরু সন্ন্যাসী হইবেন। সন্ন্যাসী গৃহস্থমাত্রেরই পূজ্য। তাঁহারা উপদেষ্টার কার্য্য করিবেন, তীর্থসংস্কার শাস্ত্ররক্ষা প্রভৃতি তাঁহাদের কার্য্য। বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে সমাজ রক্ষা, ইহাও তাঁহাদের কার্য্য। গৃহস্থের পক্ষে এই সমুদয় কার্য্য করা সকল সময় সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীরা এই সমুদয় কার্য্য করুন। সমাজ তাঁহাদের পূজা করিবে, নিজে গৃহস্থ না হইয়া সাধারণতঃ গৃহস্থের গুরু হইবেন না। এ বিষয়ে শাস্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থা আছে, সাধারণ ভাবে গুরুর কার্য্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরাই করিবেন। আজকাল সন্ন্যাসী গুরুর পসার বৃদ্ধি-নিবন্ধন নানা স্থানে নানারূপ অনর্থ ঘটিতেছে, নানারূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সব কথা একত্র করিয়া প্রচার করা উচিত এবং সংঘশক্তি জাগরিত করিয়া গুরুত্ব-ব্যবসায়ী গুরুগণকে সংযত করা উচিত। গৃহস্থের সুখ দুঃখ গৃহস্থই বুঝে। অপরোক্ষানুভবসম্পন্ন সন্ন্যাসী বা অবধূত ও সদ্‌গুরু হইয়া সমাজ রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাও বিশেষ বিধি। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। কিন্তু আপাততঃ আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আশ্রমী ব্রাহ্মণেরাই গৃহস্থের গুরু হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

এই কয়টী প্রধান লক্ষণ, অন্যান্য লক্ষণগুলি এই, ক্রোধহীন, বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধাবান, অসূয়াহীন, প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশধারী, যুবা, সর্ব্বভূতহিতে রত, ধীমান, স্থিরমতি, আকাঙ্ক্ষাহীন, অহিংসক, বিবেচক, বাৎসল্যাদি গুণবান, ভগবৎ পূজায় কৃতবিধি, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সক্ষম, হোমমন্ত্রপরায়ণ, বিচারে শক্তি-বিশিষ্ট, শুদ্ধচিত্ত ও কৃপালু। এই গুণগুলি সদ্‌গুরুর থাকিবে। প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন, সুবেশধারী প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে শিষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃই গুরুর প্রতি অনুরক্ত হইবে। গুরুর সহিত সম্বন্ধ সুখকর সম্বন্ধ বা ভালবাসার সম্বন্ধ হইবে। গুরু আসিলেই শিষ্যের যদি মনে হয়, বিপদাপন্ন হইলাম গুরুর নিকট

হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই যে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ. ইহা ঠিকমত হয় নাই ; ইহা না হইলেই ভাল হইত। বলা হইয়াছে, গুরু 'যুবা' হইবেন। এখানে 'যুবা' বলিতে বয়সে যুবক নহে। যৌবনের যেগুলি ভাল জিনিস, সেগুলি থাকা দরকার। দেহের লাবণ্যের মূল্যও আছে, সার্থকতাও আছে। যৌবনের উল্লাস, উৎসাহ, আশাশীলতা, ভাবোন্মত্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সাধনশীল ব্যক্তির চিরদিনই অক্ষুণ্ণভাবে থাকে। নিত্য ও অমৃতে বাস করিবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, বার্দ্ধক্যের অবসাদ ও নৈরাশ্য তাঁহাকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে না। 'প্রিয়দর্শন, সুবেশধারী' প্রভৃতি গুণের কথা বলা হইয়াছে, এগুলিও প্রয়োজন। মলিন হওয়া, কদর্য্য হওয়া ধার্ম্মিকতা নহে।

অগস্ত্য সংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও পূর্ব্বের কথাগুলিই সমর্থিত হয় : সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণ হইবেন, গৃহস্থ হইবেন, শাস্ত্রজ্ঞ ও বিষয়-নিস্পৃহ হইবেন।

পঞ্চরাত্রের উদারতা

প্রাচীন ভারতবর্ষে ভাগবত, সাত্বত, বৈখানস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি সম্প্রদায় ছিলেন। সেই সমুদয় সম্প্রদায়ই এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে পরিচিত। নারদ-পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থ বিখ্যাত ও প্রাচীন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নামে যে গ্রন্থখানি বাজারে চলিতেছে, সেখানি সেই প্রাচীন গ্রন্থ কিনা, সন্দেহ। যাহা হউক পঞ্চরাত্রের মত খুব উদার। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে নারদ পঞ্চরাত্রের যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সেই শ্লোকগুলি এইরূপ—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহঃ।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয় সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেহভিষেচিতঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োহনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ
সজাতীয়েন শূদ্রেন তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ সর্ব্বদা॥

ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের মন্ত্রগুরু। ব্রাহ্মণের অভাবে শান্তাত্মা, ভগবন্ময়, বিশুদ্ধচিত্ত (ভাবিতাত্মা), সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাবিধানবিৎ, শাস্ত্রবেত্তা, সৎক্রিয়াপরায়ণ ; মন্ত্রসাধন, গুরুসাধন ও দেবসাধন এই

তিন প্রকারের সিদ্ধিসমান্বিত, ক্ষত্রিয়কে আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত করিবে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের গুরু হইবেন না। ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অপর তিন বর্ণের গুরু হইবেন। বৈশ্যও উপযুক্ত হইলে গুরু হইতে পারেন, তবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নহে, কেবল বৈশ্যের ও শূদ্রের। আবার শূদ্রও গুরু হইতে পারেন, কিন্তু কেবল শূদ্রের; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নহে।

এই মত উদার, কারণ এই মতানুসারে সকলেরই গুরু হইবার অধিকার আছে। তবে অবশ্য উপযুক্ত হওয়া চাই, নতুবা সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই মত উদার হইলেও বিপ্লবজনক বা ধ্বংশ-কর নহে। এই মতে যে-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের কথা বলা হইল, তাহা যে জন্মগত, গুণগত নহে, সে-বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবসর নাই।

এই শ্লোকগুলির পরে ঐ পঞ্চরাত্র-গ্রন্থেরই অপর যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও আলোচ্য। তাহার তাৎপর্য্য এই। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাইলে, অন্যবর্ণের নিকট দীক্ষা লইবে না; লইলে হানি হইবে। পদ্মপুরাণেরও মত এই। পদ্মপুরাণ বলেন, ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব হওয়া চাই, নতুবা তিনি সদ্গুরু নহেন।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ
সহস্রশাখ ধ্যায়ী চ ন গুরু স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

মহাকুলপ্রসূত সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী হইলেও, যদি তিনি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না। অবশ্য, বৈষ্ণবের গুরু।

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, এই বৈষ্ণব কে? ইহার উত্তরে পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, যিনি বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজা-পরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব।

তন্ত্রসারের মত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের তন্ত্রসার গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালাদেশে সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থেরও প্রারম্ভে শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের ন্যায় গুরুতত্ত্ব মীমাংসিত হইয়াছে। গুরু-সম্বন্ধে এই উভয় গ্রন্থেরই মত অনেক বিষয়েই একরূপ। তন্ত্রসারও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণই গুরু হইবেন। পঞ্চরাত্রের উদার মত তন্ত্রসারে নাই। আজ এই পর্য্যন্তই রহিল, এ বিষয়ে ভালরূপ আলোচনা আবশ্যক।

জন্মান্তর-প্রসঙ্গ

১। ত্রিগুণ ও মৃত্যুর পর

ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিনী, সাধুভক্তপালয়িত্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহারই উপদেশ অনুসারে, এই তত্ত্ব কথা আরম্ভ করিতেছি।

মৃত্যুর পর কি হয়? গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের নাম "গুণত্রয়বিভাগযোগ" সেই স্থানে এই প্রশ্নের নিম্নরূপ উত্তর পাওয়া যায় প্রকৃতির তিনগুণ—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। যাহা কিছু হইতেছে, এই তিনগুণের দ্বারাই হইতেছে। আমাদের উপর সর্ব্বদাই এই তিনগুণের ক্রিয়া হইতেছে। সত্বগুণের ক্রিয়া যখন প্রবল, তখন আমরা একটা সংশয়হীন, জ্ঞানালোকযুক্ত, নির্ম্মল ও সুখময় অবস্থা অনুভব করি। রজোগুণ যখন প্রবল, তখন নানা বিষয়ে আসক্তি জন্মে ও উদ্যমসহকারে কর্ম্মরত হই। আবার, যখন তমোগুণ প্রবল হয়, তখন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, কিছুই বুঝিনা, অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকি। এই তিন প্রকারের অবস্থার বিবিধরূপ সংমিশ্রণে এই জীবন চলিতেছে। চলিতে চলিতে একদিন মৃত্যু হইবে। মৃত্যু শেষ নয়, তবে স্থূলদৃষ্টিতে শেষ বলিয়াই মনে হয়। মৃত্যুর সময়ের অবস্থা কিরূপ, মৃত্যুর সময়ে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের মধ্যে প্রধানরূপে ও প্রবলরূপে কোন্‌গুণের ক্রিয়া হইতেছিল, তাহা জানিতে পারিলে গীতার উপদেশানুসারে মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যদা সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫

যখন সত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়, দেহধারী যদি সেই সময়ে লয়প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি উত্তমবিদ্‌গণের (হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকগণের) অমল লোক সমূহ লাভ করেন। ১৪। রজোগুণের প্রাবল্যের সময় মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্তগণের লোকে (মনুষ্যলোকে) জন্ম হয়, আর তমোগুণের প্রাবল্যের সময় মৃত্যু হইলে মূঢ় যোনিতে (পশ্বাদি যোনিতে) জন্ম হয়। ১৫।

২। গুণাতীত

এই ত্রিগুণের অতীত একটি অবস্থা আছে। গীতা সেই অবস্থাকেই মানবের চরম ও পরম লক্ষ্য বলিয়াছেন। সেই অবস্থা লাভ করা অবশ্য খুবই কঠিন। বহু বহু জন্মের সাধনা ব্যতিরেকে সেই অবস্থা পাওয়া যায় না। কিন্তু, গীতা যখন সার্ব্বজনীনরূপে জগতে প্রচারিত হইয়াছেন, এখন যখন গীতার উপদেশ শুনিবার অধিকার স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু সকলকেই দেওয়া হইয়াছে, তখন এই ত্রিগুণাতীত বা নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থাটি কিরূপ, এবং এই অবস্থা লাভ হইলেই বা কি হয়, তাহাও আমাদের জানা উচিত। কেবল তাহাই নহে, জীবনের চরমলক্ষ্যরূপী এই অবস্থাটি নিয়মিতভাবে স্মরণ করা ও চিন্তা করাও উচিত।

প্রথম হইতেই গীতার উপদেশ. "নিস্ত্রৈগুণ্য হও"— "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"। এই অবস্থাটি কিরূপ তাহাও নানাস্থানে বলা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বেশ ভাল করিয়া বলা হইয়াছে।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩
সম দুঃখ সুখ স্বস্থঃ সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ (তিন গুণের এই তিন প্রকারের প্রভাব আমাদের উপর ক্রিয়া করিলেও যিনি বিরক্ত হইয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ করেন না, আবার ঐ ক্রিয়া নিবৃত্ত হইলে তাহারা আবার হউক, এরূপ আকাঙ্খা করেন না, অর্থাৎ তাহারা থাকুক আর না থাকুক, তাহাতে যাঁহার একেবারে কিছুমাত্র আসে যায় না। ২২। যিনি উদাসীনের মত অচঞ্চলভাবে বসিয়া আছেন, গুণের ক্রিয়ার দ্বারা একেবারে অবিচলিত; গুণগুলি গুণেই আছে, তাহারা নিজের নিজের কাজ করিতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া যিনি বিচলিত হন না। ২৩। যিনি সুখদুঃখে সমান, আত্মস্থ, লোষ্ট্র পাষাণ ও স্বর্ণে সমভাবাপন্ন; প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞানী, ধীর, নিন্দা ও প্রশংসায়, মান ও অপমানে, শত্রু ও মিত্রে সমভাবাপন্ন, সর্ব্বপ্রকার উদ্যমপরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত। ২৩।২৪

এই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাও গীতায় বলা হইয়াছে।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

এই ত্রিগুণই কর্ত্তা, এই ত্রিগুণ-ছাড়া আর অন্য কর্ত্তা নাই, দ্রষ্টা (বিবেকী জীব) যখন এইরূপ অনুদর্শন করেন, তখন গুণ হইতে যিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তাহাকে দেখেন, এবং আমার ভাব (ভগবদ্ভাব) লাভ করেন। দেহী দেহজাত এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম, মরণ ও জরাজনিত দুঃখরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমৃত লাভ করেন।

এই নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা অন্য প্রকারেও পাওয়া যায়, এবং এই উপায় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪ ২৬

যিনি অব্যভিচারী ভক্তি-যোগের দ্বারা আমার (শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীভগবানের) সেবা করেন তিনি এই গুণ সকল সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন।

এই গুণাতীত অবস্থা, ও তাহার ফল বর্ণনা করাই গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এই কারণে প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে, আবার তোমাকে সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিব। যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধ হইতে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥

এই জ্ঞান লাভ করিলে, কি ফল হইবে, তাহাও দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥২

এই জ্ঞান (চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যে-জ্ঞান শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষরূপে বলিয়াছেন) মুনিগণ উপাশ্রয় করিয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সাধর্ম্ম্য (তুল্যাবস্থা) লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সৃষ্টিকালেও বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়েও ব্যথিত হন না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম "ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগ" এই অধ্যায়েও জন্মান্তর, পরলোক ও জন্মান্তর হইতে পরিত্রাণের কথা বলা হইয়াছে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসৎযোনি জন্মসু ॥২২
উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥

পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহকে ভোগ করেন। এই গুণ সঙ্গই সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। এই দেহে পরমপুরুষই উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর; তিনিই পরমাত্মা নামে কথিত। যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে প্রকারেই থাকুন তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।

৩। সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে আমরা দেখিলাম দেহধারী মানবের পক্ষে মৃত্যু ধ্বংস নহে, একটা অবস্থান্তরমাত্র। এই কথা গীতার প্রারম্ভেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগে বলা হইয়াছে। যেমন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি গৃহ্নাতি নবানি দেহী ॥

জীর্ণ বসনসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যেমন নূতন অন্য বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে, সেইরূপ জীর্ণ শরীরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দেহী নূতন দেহসমূহ গ্রহণ করে।

এই অবস্থান্তর কিরূপ, পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা তাহার কিছু আভাস পাইলাম। মৃত্যুর পর মানুষের চারি প্রকার অবস্থা হইতে পারে। তমোগুণের প্রাধান্য লইয়া মরিলে নিম্নযোনিতে অর্থাৎ পশু প্রভৃতি হইতে হয়, রজোগুণের প্রাধান্য লইয়া মরিলে আবার ফিরিয়া মানুষই হইতে হয়, সত্ত্বগুণের প্রাধান্য লইয়া মরিলে আর নীচে আসিতে হয় না, ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হয়, আর গুণাতীত অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে ভগবানের সাধর্ম্ম্য পাওয়া যায়। তৃতীয় অবস্থাকে ক্রমমুক্তি আর চতুর্থকে সদ্যমুক্তি বলা হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পর মানুষের সম্মুখে দুইটি পথের একটি উন্মুক্ত হয়। একটি পথে গেলে আর ফিরিতে হয় না, আর একটি পথে গেলে ফিরিয়া আসিতে হয়। অক্ষর ব্রহ্মযোগ বর্ণনায় অষ্টম অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ পথের কথা বলা হইয়াছে।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬

জগতের এই দুই গতি ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। একটির দ্বারা অনাবৃত্তি, আর একটির দ্বারা পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

গুণাতীত অবস্থা পাইলে যে শ্রীভগবানের সাধর্ম্ম্য পাওয়া যায় ইহাও কথিত হইয়াছে।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬

পরমাসংসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীভগবানকে) প্রাপ্ত হন। তাহার ফলে তাঁহাদিগকে এই দুঃখালয় ও অশাশ্বত পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না। হে কৌন্তেয় ব্রহ্মার লোকপর্য্যন্ত জীবগণ পুনরাবর্ত্তী হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

মন্তব্য ও সংবাদ

বুদ্ধ-উৎসব—ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে বুদ্ধদেব ও তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক, আর এই আলোচনা বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত হওয়া আবশ্যক। ষোল বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটা হাওয়া উঠিয়াছিল এবং বৌবাজারের বৌদ্ধ বিহারের চেষ্টায় কিছু কিছু আলোচনা হইত। তাহার পর কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে নূতন বুদ্ধবিহার হইয়াছে—সেখানে আলোচনাও হয়, কিন্তু সেই আলোচনার কোনরূপ প্রভাব কলিকাতার বাহিরে একেবারেই অনুভূত হয় না। কিন্তু আলোচনা প্রয়োজন, গ্রামে গ্রামে বিশেষভাবেই এই আলোচনা প্রয়োজন। আমরা এই আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিতে বহুকাল অর্থাৎ গত ১৬।১৭ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মনীষি আশুতোষের নেতৃত্বে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। পালিসাহিত্যের ও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু এখন আশুতোষের কাজের প্রতিক্রিয়ার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত; এই আলোচনা থাকিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই আলোচনা প্রয়োজন, বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

সুখের বিষয় 'হিন্দু সংগঠন'—আন্দোলনের ফলে এই আলোচনার প্রয়োজন স্থানে স্থানে অনুভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে কুমিল্লা হইতে কতিপয় দেশসেবক একখানি মুদ্রিত পত্র প্রচার করিয়াছেন; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ॥

"শ্বেত বরাহ কল্পাদ্যা বৈশাখী পূর্ণিমা শুভা।
যস্যাং জাতঃ প্রবুদ্ধশ্চ দেহমুক্তস্ততঃ পরম্॥
মনুজানাং হিতার্থায় বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ।
অতশ্চ সা তিথি শ্রেষ্ঠা কথ্যতে বুদ্ধপূর্ণিমা॥
পবিত্রায়াং তিথৌ তস্যাং ক্ষেমদায়াং বিশেষতঃ।
জীবহিংসা ন কর্ত্তব্যা ধর্ম্মার্থমোক্ষকামিভিঃ॥"

মানবের মুক্তির জন্য ন্যনাধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু নগরে

পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শুদ্ধোদন রাজার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। ইনি নারায়ণের নবম অবতার। মানবের দুঃখ দর্শনে অল্প বয়সেই ইনি ভাবী রাজত্বের ও ঐহিক সুখ ভোগের মমতা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিযোগে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া বুদ্ধগয়া নামক স্থানে এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। অনন্তর নানা স্থানে ভ্রমণ ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অবশেষে কুশীনগর নামক স্থানে অপর এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অনন্ত সত্বায় লীন হন। এই হেতু বৈশাখী পূর্ণিমা বা **বুদ্ধ-পূর্ণিমা** অতি পবিত্র।

বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা অতি উচ্চ। পৃথিবীর নানা দেশে বহু লোক ঐ ধর্ম্ম পালন করিতেছে। যাহারা সাক্ষাতভাবে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী নহে, তাঁহারাও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি করিয়া থাকে। **"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"** এইটী তাঁহার একটী বিশেষ উপদেশ। ভারতের অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী। বাঙ্গালাতেও নিরামিষাশীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু বাঙ্গালী মৎস্যপ্রিয় বলিয়া ভগবানের আদেশ সম্পূর্ণরূপ পালন করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ বাঙ্গালী অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে একটী দিন এই আদেশ পালন করে।

বর্ত্তমান বৎসরে ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার **বুদ্ধ-পূর্ণিমা**। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ঐ দিবস কুমিল্লার হাট বাজারে মৎস্য মাংসাদি আমিষ দ্রব্য বিক্রয় হইবে না। হিন্দু মুসলমান সকলে ঐ দিবস নিরামিষ আহার করিবেন ও ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবেন।

ঐ দিবস প্রত্যূষে নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংকীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুমান ৭ ঘটিকার সময় ৺বালাবাবাজীর আখড়ায় উপস্থিত হইবে। তথায় ধর্ম্ম বিষয়ে অসাম্প্রদায়িকভাবে বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রদত্ত হইবে। পশ্চাৎ ভগবানের নামে লুট হইবে। সর্ব্বসাধারণকে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

এই কার্য্যটি ভাল। বুদ্ধদেবের নামে পূর্ব্ববঙ্গে একদিনের জন্যও নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থাও মন্দ নহে। হাটবাজারে মাছ বিক্রয় বন্ধ করার চেষ্টা করিলে একটা মারামারি ও ঝগড়াঝাটি এবং একটা দলাদলিও হইতে পারে—সুতরাং এই প্রকারের একটা উত্তেজনার সম্ভাবনা না থাকিলে কুমিল্লার ন্যায় স্থানে কোনরূপ কার্য্য হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা ভাল, তবে আমরা তাঁহাদের রচিত তিনটি সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নে আরও দশটি শ্লোক যোজিত করিয়া দিতেছি। বাহ্য ও স্থূল কর্ম্ম অপেক্ষা অনুশীলন-মূলক কর্ম্ম (cultural work) বেশী দরকার ; তবে তাহাতে উত্তেজনা কম।

শাক্তানাং শিবভক্তানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ যন্মতম্।
কর্ম্মবাদি জ্ঞানবাদি ভক্তিমার্গ বিচরতাম্ ॥
তথা চাদ্বৈতবাদিনাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিনাম্।
দ্বৈতবাদিনাং পুনর্হি ন তেন স্বকীক্রিয়তে ॥
স্বাগত স্যাস্য বুদ্ধস্য শিক্ষা যা প্রোক্তা মৌলিকী।
তত্ত্বতঃ ভেদবাদিনাং নাস্তি কোঽপি ভেদো মহান্ ॥
বেদ প্রোক্তো জ্ঞানবাদ বিদ্বদ্ভির্যোতি উচ্যতে।
বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন নূনং তস্য প্রচারকঃ ॥
মহাসত্য মিদং কথ্য জনগণ সমীপতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা সংশয়হীনো ভবেদ্ধি নিখিলো জনঃ ॥
তিথাবস্যাং তথান্যাসু সত্যমিদং প্রচারিতম্।
জীবানাং নিঃশ্রেয়সায় ভারতবর্ষবাসিনাম্ ॥
মন্দিরেষু চ সর্ব্বেষু স্বাগত সৌম্যমূর্ত্তয়ঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য পূজা তাসাং কারয়িতব্যা বিধিনা ॥
দৃষ্ট্বা শ্রীভগবান্ বুদ্ধে জনান্ ভক্তি বিরহিতান্।
গতো হি ত্যক্তভারতঃ অভিমানক্ষোভাহতঃ ॥
অতস্তে দুর্দ্দশাপন্নাঃ সীদন্তি দেশবাসিনঃ।
প্রতীক পূজনাত্তস্য মন্দিরে মন্দিরেঽধুনা ॥
সুখং পুনরবাপ্স্যন্তি তে হি ভাগ্যহীনাজনাঃ।
প্রসন্নশ্চেদ্ বুদ্ধদেবো গৌরবং তেভ্যো দাস্যতি ॥

সেরপুর বগুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় আমাদের অনুরোধে এই শ্লোক কয়টি রচনা করিয়াছেন।

সঙ্গীত রচয়িতা স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একটি অপ্রকাশিত গান—বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রাম নিবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব এই সঙ্গীত রচয়িতা বাঙ্গলা ১৩০৩ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ১২৯১ সালে তাঁহার সঙ্গীত পুস্তক "সদ্ভাব সঙ্গীত" রঙ্গপুর তাজহাটের বদান্য ভূম্যাধিকারী স্বর্গীয় রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে প্রথম মুদ্রিত

হইয়াছে। কবির মৃত্যুর অনেক দিন পরে 'সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি' নামক গোবিন্দচন্দ্রের আর একখানি পুস্তক রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে কোন তারিখ নাই, কবির জীবনী নাই, সূচীপত্রের কোন শৃঙ্খলা নাই—তবে বৃহৎ শুদ্ধিপত্র আছে। কলিকাতার অনুকরণে চাঁদা তোলার জন্য যে কাজ করা যায়, তাহা এইরূপই হইয়া থাকে। যাহা হউক সেই পুস্তকে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত একটি ভূমিকা আছে—তাহাতে গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা না থাকিলেও অনেক সংবাদ আছে। গোবিন্দচন্দ্রের অনেক গান নষ্ট হইয়াছে, অনেক গান আবার কবিযশঃপ্রার্থী অন্য লোক নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা সেরপুরে তাঁহার রচিত একটি গান পাইয়াছি—যতদূর জানি ইহা পূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। গানটি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

ললিত—ঝাঁপতাল

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুত্তলি সনে।
সেই জানে তোর খেলার মর্ম্ম যে থাকে তোর সদা ধ্যানে॥
রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে
আপনি খেল সেই বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হ'য়ে
ধন্য মিছে মায়াভ্রমে ঘুরাও মা ভুবনে॥
সর্ব্ব জীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল
ভার্য্যারূপে ব্রহ্মময়ী প্রণয়েরি খেলা খেল,—
তুমি শিশু মূরতি হ'য়ে আলো কর সূতিকা গৃহ,
খেলায়ে নানা খেলা অন্তে শ্মশানে লুকায়ে দেহ;
ধন্য মায়া এতেও মোরা বুঝেও বুঝিনে॥
কেমন মহামায়া মা তোর, পায় না বিধি বিষ্ণু ভেবে,
শ্মশানে রয় সদা শিব, সেও তব মায়া প্রভাবে,
আপনার মায়ায় আপনি যাতায়াত কর বারম্বার
নিজে বুঝনা নিজের মায়া সেও ত তোমার মায়া বিকার;
সে মায়া দ্বিজ গোবিন্দকে আজ বুঝাবে কেমনে॥

সেরপুর-বগুড়ার আরও তিনজন সাহিত্য-সেবক

—কোনও গ্রামে বা জনপদে একজন ভাল কবি বা সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়া কিছিদ

প্রসিদ্ধি লাভ করিলেই স্বভাবতঃ সেইস্থানে আরও কবি ও সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়া থাকে। সেরপুর গ্রামের আরও তিনজন উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় সাহিত্যসেবকের আমরা পরিচয় পাইয়াছি।

১। যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী—জন্ম বাঙ্গালা ১২৭১ সাল ১৮ই অগ্রহায়ণ– মৃত্যু ১৩১৪, ১৬ই পৌষ। তাঁহার রচনাবলী গান ও পাঁচালীর পালা ৬ খণ্ডে সর্ব্বসমেত ডিমাই ১২ পেজি আকারের ৫৭৩ পৃষ্ঠায় কাশী হইতে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে।

২। ৺ কালীকিশোর মুন্সী (রায়বাহাদুর)—জন্ম—বঙ্গাব্দ ১২৫৬। মৃত্যু—১৩০৭ সাল ৭ই অগ্রহায়ণ। ইঁহার রচিত দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হৃদয় কুসুম (কবিতা), ফুল মালিকা (গান) একত্রে ১৩০ পৃষ্ঠা, বগুড়া হইতে ছাপা হইয়া তাঁহার জীবনকালেই বাহির হইয়াছিল। ইঁহার রচিত "হিন্দু হতাশ" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে। ইঁহারা উভয়েই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সেরপুরের সুপরিচিত জমিদার পরিবারের—

৩। হরগোপাল দাস কুণ্ডু– ১৩৩৩ সনের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ৺ কাশীধামে মৃত্যু হয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ৺ গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় প্রণয়ন করিয়াছেন।

১। সদ্ভাব সঙ্গীত, ২। সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি, ৩। প্রমীলার চিতারোহণ, ৪। অঙ্গুরী সংবাদ, ৫। সতী নিরঞ্জন, ৬। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, ৭। শুম্ভনিশুম্ভ বধ পাঁচালী, ৮। কলঙ্কভঞ্জন, ৯। ললিত লবঙ্গকাব্য।

স্বর্গীয় হরগোপাল দাস কুণ্ডু প্রণীত ও রংপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত সেরপুরের ইতিহাস নামক গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলির নাম পাওয়া যায়। সেরপুরের ইতিহাসে কথিত হইয়াছে ঐ পুস্তকগুলির পাণ্ডুলিপি সেরপুরের কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট আছে এবং চেষ্টা করিলে প্রকাশিত হইতে পারে। আমরা সেরপুরে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম সেই পাণ্ডুলিপি-গুলি একদিন ছিল, কিন্তু এখন আর নাই উদ্ধারেরও বিশেষ কোনো আশা নাই সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রংপুর সাহিত্যপরিষদ যথাসময়ে চেষ্টা করিলে রক্ষা করিতে পারিতেন। আরও অনু সন্ধানের ফলে কিছু আশা হইয়াছে, গ্রন্থগুলি পাওয়া যাইতে পারে।

নওগাঁ ও মাণিকগঞ্জ—২৪শে চৈত্র তারিখে সিউড়ি হইতে রওনা হইয়া ২৫শে সন্ধ্যায় রাজসাহী জেলার মহকুমা নওগাঁ পহুছিলাম। গাঁজার চাষের জন্য নওগাঁ বিখ্যাত। পূর্ব্বে গাঁজাচাষাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল না, দালাল ও মধ্যস্থ মহাজন লাভবান্ হইত, চাষী খুব কম লাভই পাইত। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল, ডোনাভান সাহেবের প্রস্তাবে সরকারী কো-অপারেটিভ্ বিভাগ হস্তক্ষেপ করিলেন, গাঁজা-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার নাম "নওগাঁ গাঁজা-কাল্‌টিভেটার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড"। ইংরাজী [illegible] সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই

সমিতির সভ্য-সংখ্যা প্রায় ৪০০০, ইহার মধ্যে এক অষ্টমাংশ হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গাঁজা-চাষীদের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। 'নওগাঁ'এ নদীর উপর পুল করিবার জন্য এই সমিতি রাজসাহী জেলাবোর্ডকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে দেড় লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন। এই সমিতির অর্থ সাহায্যে ২টি ইংরাজী বিদ্যালয়, ২টি হাঁসপাতাল, প্রায় ১০০টি প্রাইমারী বিদ্যালয় চলিতেছে এবং ৩ মাইল পাকা রাস্তা হইয়াছে। মুসলমান মেম্বারদের জন্য একটি বৃহৎ ও সুন্দর মস্‌জীদ ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ জলাশয় হইয়াছে, মাদ্রাসার সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। এবারে হিন্দু মেম্বরদের সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইল, সেই মন্দিরে মধ্যস্থলে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি, তাহার পশ্চিমে শিবলিঙ্গ ও পূর্ব্বে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া নওগাঁ গিয়াছিলাম। মস্‌জিদ হইতে মন্দিরের দূরতা অধিক নহে, মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ মস্‌জিদ্ হইতেও বোধ হয় শোনা যায়, কিন্তু সেজন্য হিন্দু মুসলমানে কোনরূপ বিরোধ নাই। হিন্দু মন্দিরের ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক মুসলমান আসিয়াছিলেন। সংবাদ পাইলাম, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

নওগাঁ আসিয়া একটি বড় দরকারী কথা জানিতে পারিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার "অমৃতবাজার পত্রিকায়" একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল যে "নওগাঁ সহরে একজন মুসলমান মৌলভী আসিয়া একজন হিন্দুপণ্ডিতের নিকট তর্কে পরাস্ত হইয়া হিন্দু হইয়াছেন, আরও অনেক মুসলমান হিন্দু হইবে, বলিহারের রাজকুমার টাকা দিয়াছেন।" নওগাঁ আসিয়া ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এই সংবাদে একেবারে মিথ্যা, নিছক মিথ্যা, ইহার কোনই ভিত্তি নাই। দেশের ভদ্রলোকেরা জানিয়া রাখুন এই প্রকারের অনেক খবর, কাগজে বাহির হয়।

নওগাঁ হইতে মাণিকগঞ্জ আসিলাম। এখানেও হিন্দু-মুসলমানে কোন বিরোধ নাই। এখানে একটি কালিবাড়ী আছে, কালিবাড়ীতে হরিসভা হয়, বৎসরের শেষে হরিসভার উৎসব হইয়া থাকে। সেই উৎসবে আহূত হইয়া মাণিকগঞ্জ আসিলাম। এখানে পূর্ব্বেও আসিয়াছি, সুতরাং অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন। ঢাকা জেলায় ম্যাজিষ্টেটের নোটিশ দেওয়া আছে যে বাদ্যসহ মিছিল বাহির করিতে হইলে লাইসেন্স লইতে হইবে। হরিসভা হইতে দরখাস্ত হইল, লাইসেন্স আসিল। যাহা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত লাইসেন্সে তাহা ছিল। একটি গলির ভিতর মস্‌জিদ্ আছে, সেই মস্‌জিদের নিকট বাজনা থামাইতে হইবে। হরিসভা কি করিবেন, নগনকীর্ত্তন বাহির করিবেন কিনা। অনেক বাদানুবাদ হইল, যাঁহারা প্রাচীন লোক তাঁহারা সকলেই বলিলেন নগরকীর্ত্তন করিতে হইবে, যে-গলিতে মস্‌জিদ্ আছে, সে-গলিতে আমরা যাইব না। আর একদল বলিলেন, আমাদের অধিকারে যখন হস্তক্ষেপ হইয়াছে তখন আমরা মিছিল বাহির করিব না। ফলে মিছিল বাহির হইল না। মিছিল বাহির করা হইবে কিনা এই লইয়া সহরে নানারূপ বাদানুবাদ হইল—সকল কথাই শুনিলাম।

একদল বলিলেন, লাইসেন্স চাহিলেই তাহাতে মস্‌জিদের সম্মুখে বাজানা বন্ধ করার সর্ত্ত থাকিবে, ইহা জানাই ছিল ; অতএব লাইসেন্সের দরখাস্ত করা হইল কেন ? আর একদল বলিলেন লাইসেন্স যখন লওয়া হইয়াছে, তখন কীর্ত্তন বাহির হউক, যে গলিতে মস্‌জিদ্ আছে সে গলিতে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। আর একদল বলিলেন আমাদের সর্ত্ত যখন লোপ হইতেছে তখন কীর্ত্তন বাহির না করাই ভাল। যুবকেরা অনেকে আইন অমান্য করিয়া সত্যাগ্রহ করিতেও প্রস্তুত। শেষ পর্য্যন্ত মিছিল বাহির হইল না। জানিয়া রাখা ভাল মাণিকগঞ্জের মহকুমা হাকিম একজন হিন্দু।

রামকেলি প্রাচীন গৌড়নগরের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে সুপবিত্র রামকেলিগ্রাম। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই গ্রামে বাস করিতেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রামে আসিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে কৃপা করিয়াছিলেন। এই কারণে রামকেলি হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এখানে একটি মন্দির আছে—বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন—শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। ইহা ছাড়া শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের দারুময়ী মূর্ত্তি আছেন। একটি তমালের গাছ আছে, তাহার চারিদিক বাঁধানো, তমালের তলে একখানি পাথর, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র পদচিহ্ন, লোকে বলে ইহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন। মন্দিরের চারিদিকে আটটি ছোট ছোট জলাশয় অষ্ট সখীর কুণ্ড বলিয়া পরিচিত। এই সব ছাড়া একটি খুব ড় দিঘি আছে, তাহা: নাম রূপ-সাগর। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন রামকেলির উৎসব। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই লোক সমাগম হইয়া থাকে। প্রায় সাতদিন দোকান পশার ও লোকজন থাকে।

পূর্ব্বে এই রামকেলি তীর্থে যাত্রীদের বড়ই অসুবিধা ছিল। প্রথম অসুবিধা জলাভাব—রূপসাগর ভরাট হইয়া গিয়াছে, জল খুবই খারাপ ; অষ্টসখীর কুণ্ড একেবারে শুকাইয়া যায়। যেমন জলের কষ্ট, তেমনি থাকিবার কষ্ট। হিন্দু তীর্থযাত্রীরা খুবই কষ্ট-সহিষ্ণু, ধর্ম্মলাভের জন্য তাহারা সর্ব্ববিধ অসুবিধা সহ্য করিতে পারে বলিয়াই এতদিন এই তীর্থে আনুমানিক পনর হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মালদহ জেলার সদর সহর ইংরাজ বাজার হইতে রামকেলি নয় মাইল। বাঙ্গালা ১৩৩০ সালে ইংরাজ বাজার সহরের সুপরিচিত মুটুক্ষ্যাপার চেষ্টায় রামকেলির জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রস্তাব হয় যে রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে। তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, ডাক্তার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ্ প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রথমে এই সব সরকারী কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরিত এক মুদ্রিত আবেদন পত্র বাহির করা হয় এবং মুটুক্ষ্যাপা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তাহাতে সুবিধা হইল না। তাহার পর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে জমিদার শ্রীযুক্ত যদুনন্দন চৌধুরীকে সভাপতি করিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশি গোস্বামী এম. এ. বি. এল এই সমিতির

সম্পাদক। রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া জলকষ্ট নিবারণের জন্যই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা, সমিতির নাম হইল রামকেলি-সংস্কার-সমিতি। রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধার ছাড় তীর্থস্থানের অন্যান্য সংস্কার ও উন্নতিবিধানও এখন এই সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সমিতি এখনও রেজেষ্ট্রি করা হয় নাই, স্থিরীকৃত হইয়াছে শীঘ্রই রেজেষ্ট্রি করা হইবে।

১৩৩১ সাল হইতে ইংরাজ বাজারের ভদ্রলোকগণের দৃষ্টি রামকেলির উপর পড়িয়াছে। সেই বৎসরই প্রথম স্বেচ্ছাসেবকগণ মহিষের গাড়ীতে করিয়া প্রায় আধ মাইল দূর হইতে পানীয় জল আনিয়া যাত্রীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। দেশের কল্যাণ এই সব ত্যাগশীল ও পরার্থপর যুবকগণেরই উপর। ১৩৩১ সালে আমরা সর্ব্বপ্রথম রামকেলি যাই। বারদুয়ারি বলিয়া সেখানে একটি মুসলমান যুগের প্রাচীন ঘর আছে - সম্ভবতঃ ঐ ঘরখানি 'দরবার-ভবন' ছিল। যাত্রীরা অনেকে ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ স্থানে একদিন বক্তৃতা করিয়া কিছু টাকাও তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেবারে একদিন নগর কীর্ত্তনেও সামান্য কিছু সংগৃহীত হয়।

১৩৩২ সালে রামকেলির উৎসবে রামকেলি-সংস্কার-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩৩৩ সালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতি করা হইয়াছিল।

রামকেলির সংস্কার খুব প্রয়োজন, সমগ্র বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসমাজের স্বার্থ ও কল্যাণ ইহার সহিত বিজড়িত। সুতরাং যাঁহারা এই কার্য্যের ভার লইয়াছেন, তাহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। ১৩৩১ সালের পর আর রামকেলি যাই নাই, মালদহের খবরের কাগজে যতটুকু খবর বাহির হয়, তাহাই জানিতে পারি।

১৩৩১ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে, নবদ্বীপের ধূলট উৎসবের সময়, সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয় নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন। রামকেলির কথা, রামকেলি-সংস্কারের কথা, প্রত্যেক বৈষ্ণবতীর্থেই উৎসবের সময় আলোচনা করা দরকার। সেই সময়ে নবদ্বীপ রাধারমণ সেবাশ্রমে আমাদের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং রামকেলি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সভায় বহরমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত (এখন স্বর্গীয়) বনবিহারী সেন, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এই সভার মন্তব্য সমূহের মধ্যে একটি প্রার্থনা ছিল—রামকেলির জমিদার ও রূপসাগরের মালিক ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের নিকট রূপসাগর-সংস্কারের অনুমতি লওয়া হউক। বনবিহারী বাবু এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং তিনি বলেন যে সভার মন্তব্য প্রেরণ ছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবেও এজন্য চেষ্টা করিবেন।

রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধারের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের নাম ছাপাইয়া চাঁদা উঠিতেছে, অথচ মালিকের সঙ্গে এ-সম্বন্ধে কোন বোঝা-পড়া হয় নাই, ইহা এই সমিতির একটি খুব বড় ভুল। উত্তেজনার স্রোতে পড়িয়া আমরা অনেক প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য প্রাথমিক বিষয় ভুলিয়া যাই এবং সেজন্য পরে অনুতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই ঘটনাটির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Counting without the host,—যিনি নিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ যিনি মূল, তাঁহাকে বাদ দিয়া গণনা করা। যাহা হউক; পরে মহারাজার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

এ বৎসর, ১৩৩৪ সালে রামকেলি সংস্কার-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আহ্বান বা নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম। সুতরাং রামকেলি-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আগামী বারে বলা যাইবে।

শ্রীমদনমোহনের সেবা—রামকেলি সংস্কার-সমিতি রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া জলকষ্ট নিবারণের জন্যই প্রথমে চেষ্টান্বিত হন। কাজেই আর একটি দরকারী ব্যাপারের কথা তাঁহারা ভাবেন নাই বা ভাবিতে পারেন নাই। রামকেলি তীর্থের মূল সামগ্রী শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ। যে-কেলি-কদম্বমূলে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপসনাতনের প্রথম মিলন হয়, সেই কেলিকদম্ববৃক্ষ মদনমোহন বিগ্রহের মন্দিরেরই অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এই মন্দিরটিই রামকেলি-তীর্থের প্রাণ-স্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিগ্রহ সেবার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যিনি সেবাইত, তিনি ব্রাহ্মণ তাঁহার বাড়ী মুর্শিদাবাদ – লালবাগ। তিনি প্রায় আসেন না। সম্বৎসর কোনরূপ সেবা পূজা বা অতিথিসেবা হয় না। মেলার সময় তাঁহার লোক আসিয়া প্রণামীর টাকাগুলি লইয়া যায়। ইংরাজ বাজারের কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমরা নানারূপ আলোচনা করি। কবিরাজ মহাশয় সাধনশীল বৈষ্ণব, তিনি মদনমোহনের সেবার ভার গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু তিনি সেবাইতের সহিত কোনরূপ বোঝাপড়া করেন নাই। সেবাইত দেখিলেন মন্দির-সংস্কার হইল, নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইল; তিনি ভাবিলেন এইবার মন্দিরের আয় বাড়িবে; কাজেই তিনি আসিয়া মন্দির অধিকার করিলেন। যাহা ছিল, তাহাই হইল। বিগ্রহের সেবা-পূজার কোনরূপ বন্দোবস্ত হইল না। আমরা গত বৎসর লালবাগে বসিয়া ঐ সেবাইত-মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। লালবাগ-অঞ্চলের কোন ভক্ত যদি তাঁহার সন্ধান করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে শ্রীমদনমোহনের সেবা-পূজার উন্নতিবিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে রামকেলি-সংস্কারের চেষ্টা সফল হয় এবং হিন্দু-

সংবাদপত্রের অত্যাচার—পাবনার সাপ্তাহিক 'সুরাজ' কোনও একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া কলিকাতার "বসুমতী" পত্রিকা-সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"এই প্রসঙ্গে দৈনিক বসুমতীর মন্তব্য পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। দেশের সৎ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ একখানি সংবাদপত্র কিভাবে অসৎ ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে, "বসুমতী" তাহার এক দৃষ্টান্ত দিয়াছে।" বিজ্ঞাপনজীবি অনেক সংবাদপত্রই কোন ধ্রুবনীতির অনুসরণ করে না, বা করিতে পারে না। তাহারা যেন বেড়ার উপর বসিয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করে, যখন যেদিকে সুবিধা হয়, সেইদিকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করা, জাতীয়-সাধনার সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য হওয়া দরকার। মফঃস্বলে স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন কর্ম্মের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং এই শ্রেণীর সংবাদপত্রকে সংশোধিত বা নিঃশেষিত করার জন্য মফঃস্বলে বিধিবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ-চেষ্টা প্রয়োজন।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

জ্ঞানদাসের হেঁয়ালি-পদ:—'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ১৯।১ পত্রিকা হইতে প্রাচীন কবি জ্ঞানদাসের একটী হেঁয়ালি-পদ, অর্থসহ উদ্ধৃত হইল—

"যুগলরূপ"

সখি, হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এ চারি পঙ্কজ,
নয়নে দেখ চাহিয়া ॥ ৩
পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর,
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারি গজের উপরে শোভিত
যুগল কেশরিরাজ ॥৭
কেশরী উপরে এ দুই উদয়,
উদয় উপরে গিরি।

গিরির উপরে এ দুই তমাল
চারি শাখা আছে ধরি ॥ ১১
তাহে আছে, সখি, একটি তমাল
নবঘন সম দেখি।
একটি তমাল. সোনার বরণ,
শুনলো, মরম-সখি ॥ ১৫
তাহে ফলিয়াছে অরুণ বরণ,
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তার শাখা দল ॥ ১৯
তা পর এ দুই কীরের বসতি
তা পর চকোর চারি।
তা-পর এ দুই, চাঁদের বসতি
পিবইতে ইহ বারি ॥ ২৩
তা-পর দেখহ বিধু সে অরুণ
তা-পর ময়ুর অহি।
জ্ঞানদাস কহে মরমক বাত
এ কথা জানে না কোহি ॥ ২৭

২ চারি পঙ্কজ—রাধাকৃষ্ণ চরণ চতুষ্টয়। ৪ বিংশ শশধর—কুড়িটি নখচন্দ্র। ৫ গজ—করীশুণ্ড তুল্য চারি উরু। ৭ কেশরিরাজ—রাধাকৃষ্ণের ক্ষীণ মধ্যদেশ। ৯ গিরি—শ্রীমতীর স্তনযুগ। ১০ দুই তমাল—সুবিস্তৃত স্কন্ধদ্বয়। ১১ চারি শাখা—চারি বাহু ১২-১৫ একটি শ্রীকৃষ্ণের, অপরটি শ্রীমতীর। ১৭ চারি ফল—পক্কবিম্ব সম চারি ওষ্ঠাধর। ১৮ ফুল—কুন্দকলিসমা দন্ত পংক্তি। ২০ কীর—শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা যুগল। ২১ চকোর চারি—চারি চক্ষু। ২২ চাঁদ—মুখচন্দ্র। চারি চক্ষু মুখচন্দ্রদ্বয়ের সুধাপানে সমুৎসুক। ২৪ বিধু—শ্রীকৃষ্ণের শ্বেত চন্দনের ফোঁটা ও শ্রীমতীর সিন্দুর বিন্দু। ২৫ ময়ূর—শিখিপুচ্ছের চূড়া; অহি—শ্রীমতীর সর্পের ন্যায় বেণী। [রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত গ্রন্থে প্রদত্ত অর্থের সহিত, এই সকল অর্থের কিছু তারতম্য আছে]

বীরভূমি]

মাসিক পত্রিকা

[৮—৮

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

ভ্রমর-গীতা

২ মন্তব্য ও সংবাদ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

ভাগবতধর্ম্ম

প্রথম ভাগ

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন
প্রণীত

মূল্য এক টাকা মাত্র

সিউড়ী পোঃ—বীরভূম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ১১টী প্রবন্ধে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের নিত্যত্ব, ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুবক্তা ও সুলেখক। আলোচ্য বিষয়েও তিনি যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার যে প্রণালীতে ভাগবতধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ইহা যে ভক্তগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ভাবে এই আলোচনা করিলে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যগণের নিকট বিষয়টী প্রীতিপ্রদ হয়, গ্রন্থকার তাহা জানেন। সুতরাং গ্রন্থখানি এই সম্প্রদায়েরও প্রিয় হইবে। আমরা ইহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি

—হিতবাদী ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

ভ্রমর-গীতা

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ের ১০টি শ্লোক, দশম হইতে উনবিংশ পর্য্যন্ত 'ভ্রমর-গীতা' নামে পরিচিত। প্রথমে শ্লোকগুলির স্থূল বা সাধারণ অর্থ আলোচনা করা যাইতেছে।

১

শ্রীগোপ্যুবাচ

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥

হে মধুপ (মধুকর, মাতাল, বা মন্ত্ররক্ষক), তুমি কিতবের (কপটের, ধূর্ত্তের) বন্ধু, তুমি আমাদের পা ছুঁইও না, নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিও না। তোমার মুখলোম রাঙ্গা কেন? ও কিসের রং? আমাদের সতীনের বুকে শ্রীকৃষ্ণের মালা মর্দ্দিত হইয়াছে, সেই মালার কুঙ্কুমের রং তোমার মুখে লাগিয়াছে। তুমি আর আমাদের চরণ ছুঁইওনা। মথুরার রাজা কৃষ্ণ, সেই সব মানিনীদের প্রসন্ন করুন। তুমি তাঁহার দূত, তোমার জন্য তিনি যাদবদের সভায় বিড়ম্বিত হইবেন।

'উজ্জ্বল-চন্দ্রিকার' অনুবাদ—ভ্রমর ভ্রমে উদ্ধব প্রতি শ্রীরাধা—

ভ্রমর ভণ্ডের মিতা! চরণে না দিও মাথা, সপত্নী কুচের যেই মালা।
তাহার কুঙ্কুম লয়া, নিজ শ্মশ্রু রাঙ্গাইয়া, তুমি কেন ব্রজপুরে এলা॥
যার দূত তুমি হেন জন।
মানিনী মথুরানারী, তার প্রসাদ কর হরি, যদুসভায় পাবে বিড়ম্বন॥

২

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।

নিজের মোহিনী অধরসুধা একবার-মাত্র পান করাইয়া, তুমি যেমন ফুলকে পরিত্যাগ কর, ঠিক্ তেমনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন। পদ্মা (লক্ষ্মীদেবী) তাঁহার পাদপদ্মের কেন পরিচর্য্যা করেন ? তিনি বোধ হয় সেই উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যা কথায় হৃতচিত্তা হইয়াছেন !

অধরের সুধা যেই, পরম মোহন সেই, আমাদিকে করাইল পান।
ভৃঙ্গ যেন ছাড়ে ফুল, করিতে মন ব্যাকুল, হরি কৈল মথুরা পয়ান ॥
এই বড় অদ্ভুত মোরে।
কিবা এই তার গুণ, লক্ষ্মীর হরিল মন, সেই আসি পদ সেবা করে ॥

৩

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিমগৃহানামগ্রতো নঃ পুরাণং।
বিজয় সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ ক্ষপিত কুচ রুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥

হে ষট্পদ (ভ্রমর), গৃহহীন যদুগণের অধিপতির এত গুণগান আমাদের কাছে কেন করিতেছ ? তিনি যে আমাদের কাছে পুরাতন। এখন যাঁহারা তাঁহার প্রেয়সী, তাঁহাদের কাছে তাঁহার প্রসঙ্গ গান করগে ! শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়-রোগ সারিয়া গিয়াছে, তাঁহারা তোমাকে পুরস্কার দিবেন।

হেদে হে নির্ব্বুদ্ধি ভৃঙ্গ, ছাড়হ গানের রঙ্গ, আমরা কেবল বনবাসী।
ত্বরায় যদুসভা যাও, কৃষ্ণপ্রিয়া গুণ গাও, সেথা গেলে পাবে সুখরাশি ॥

৪

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ কপট রুচির-হাস ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃস্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভুতির্বয়ং কা অপিচ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃ শ্লোকশব্দঃ ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে, এমন নারী কে আছে, যে শ্রীকৃষ্ণের দুষ্প্রাপ্য। কপট ও সুন্দর হাসি তাঁহার ভ্রূদুটিতে সর্ব্বদা খেলা করিতেছে। লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদরেণু উপাসনা করেন। আমরা কে ? তুমি তাঁহাকে বলিও—'উত্তম শ্লোক' শব্দটি দীনের প্রতি যিনি দয়া করেন তাঁহার প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

স্বর্গ ভূমি রসাতল, তাথে নারী সকল, কেহ তোমার সুদুর্ল্লভ নয়।
যে তোমার কপট হাস, যাঁকা ভুরুর বিলাস, যাথে পদ্মা পদদাসী হয় ॥

হায় বিধি, বড় অগেয়ান।

এমন কপট জনে, কপটিয়া নাহি ভনে, 'উত্তম শ্লোক' কৈলা নাম॥

৫

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈরনুনয় বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।

স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসৃজদকৃত চেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্॥

মাথা সরাও, পা ছাড়। চাটুবাক্যের দ্বারা অনুনয় করিতে ও দূতের কার্য্যে তুমি খুব চতুর; মুকুন্দের নিকট ইহা শিখিয়া আসিয়াছ, সবই বুঝিলাম। আমরা তাঁহার জন্য পতি, অপত্য, ইহলোক, পরলোক সবই ছাড়িলাম। কিন্তু, তিনি এমনি অসংযত-চিত্ত যে আমাদেরও ছাড়িলেন! তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই জানিবার নাই।

পদ ছাড় ভৃঙ্গ তুমি, তোমারে জানি যে আমি, তুমি বহু জান অনুনয়।

তোঁহে দেখি দূতবরে, মুকুন্দ পাঠাল তোরে, এ ত তোমার উপযুক্ত নয়॥

ওহে ভৃঙ্গ, দেখ আমাদের অপমান।

যার লাগি সব ছাড়ি, ছাড়ি গেল হেন হরি, তার সনে কিসের সন্ধান॥

৬

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাং।

বলিমপি বলিমত্ত্বা বেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষ-বদ্ব স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ॥

তিনি ব্যাধের মত কপিরাজ বালিকে বিদ্ধ করেন, স্ত্রীজিত হইয়া অর্থাৎ সীতার কথামত কামপরবশ সূর্পনখার নাক কাণ কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করেন, বলিরাজার পূজার দ্রব্য ভোজন করিয়া কাকের মত করিয়া তাহাকে বন্ধন করেন। অতএব, সেই কৃষ্ণের সখ্যে আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু, কি করিব, তাঁহার কথা এমনি যে ত্যাগ করা যায় না!

পূর্ব্বজন্মে রাম হঞা, বালি কপি বিনাশিয়া, যেহ কৈল ব্যাধের আচার।

সূর্পনখার নাসা কর্ণ, তাহা কৈল ছিন্নভিন্ন, বড়ই নির্দ্দয় মন তার॥

পুনশ্চ বামন হয়া, বলির সর্ব্বস্ব লয়া, পুনঃ তারে করিল বন্ধন।

হেন কৃষ্ণবর্ণ যে, তার সখা চাহে কে, তভু তারে নাহি ছাড়ে মন॥

৭

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীয়ূষবিপ্রুট্ সকৃদদন বিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মাঃ বিনষ্টাঃ।

সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥

তাঁহার চরিতলীলা কাণের অমৃত। এককণা একবার সেবন করিলে দ্বন্দ্বধর্ম্ম (রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি) বিধূত হয়। এই অবস্থা যাহাদের হয়, অসৎ তুল্য এই অবস্থা লাভ করিয়া তাহারা হঠাৎ দুঃখিত গৃহকুটুম্ব ছাড়িয়া ভোগহীন পাখীর মত ভিক্ষুচর্য্যা অবলম্বন করে।

যার লীলা সুধাসম, করি তার চর্ব্বণ, পক্ষীগণ ছাড়ে দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম।
এখন নিজ পরিবার, ছাড়ি ভিক্ষু-আচার, করে দেখি ফাটে মোর মর্ম্ম॥

৮

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ॥

হে দূত যেমন কৃষ্ণসার হরিণীগণ অজ্ঞ বলিয়া ব্যাধের কৃত্রিম গান বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিয়া শরাহত হয় এবং যাতনা পায়, আমরাও সেইরূপ সেই কুটিল কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার নখস্পার্শের তীব্রশরে পুনঃপুনঃ যাতনা পাইতেছি, অতএব সেকথা ছাড়িয়া অন্য কথা বল।

আমরা মুগ্ধা নারী, তার কথায় শ্রদ্ধা করি, বান্ধা গেনু যেমন হরিণী।
তাহার পাইনু ফল, দুঃখে তনু টলমল, জর জর এসব কামিনী॥
শুন, আমার মন্ত্রণা-বচন।
অন্য কথা কহ মুখে, শুনি মনে পাই সুখে, না করিহ কৃষ্ণের বর্ণন॥

৯

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্ব পার্শ্বং সতত মুরসি সৌম্যঃ শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে॥

প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তুমি সখা, প্রিয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তুমি কি আবার আসিলে? তুমি আমার প্রিয় ও মাননীয়, বল তোমার কি চাই? হে সৌম্য, তোমার কৃষ্ণের পক্ষে মিথুনীভাব দুস্ত্যজ। তাঁহার পার্শ্বে আমাদিগকে কেন লইয়া যাইবে। তাঁহার বধূ লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহার বুকে বাস করেন।

তুমি ত আইলে পুনঃ, কৃষ্ণ মোর প্রিয়জন, কি দিয়াছেন আমাদের তরে।
তুমি কি চাহিছ ধন, মাননীয় দূত জন, তাহা অগ্রে কহত সত্বরে॥
যতেক ব্রজের নারী, লয়্যা যাবে মধুপুরী, এ লাগি কি এসেছ ফিরিয়া।

১০

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্।
কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগুরু সুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু॥

সৌম্য, আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এখন মথুরায় আছেন ত? তিনি পিতৃগৃহ ও বন্ধু গোপগণকে স্মরণ করেন কি? আমরা তাঁহার কিঙ্করী, আমাদের কথা কি বলেন? তিনি কবে আসিয়া অগুরুবৎ সুগন্ধ হস্ত আমাদের মস্তকে আবার স্থাপন করিবেন?

শুধাই বিনয় করি, মথুরাতে আছে হরি, পিতৃগৃহ স্মরেন কখন।
গোপগণে পড়ে মনে, এই দিব্য বৃন্দাবনে, মনে পড়ে যত কেলিগণ॥
মোরা তার দাসীগণ কভু করেন স্মরণ, কিছু কথা কহেন কখন।
তার যেই ভুজদ্বন্দ্ব, তাহাতে অগুরু গন্ধ, পুনঃ কিরে পাব দরশন॥

এই ঘটনাটি কোন্ সময়ের, এইবার তাহাই বলা হইতেছে। বৃন্দাবন ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় গিয়াছেন এবং কংসকে বধ করিয়াছেন। কংসবধের পর দেবকী ও বসুদেবের বন্ধন মোচন ও উগ্রসেনকে রাজসিংহাসন প্রদান। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন এবং গুরুগৃহে গমন। সান্দীপনি মুনিকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকট চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে তাঁহারা যাবতীয় বিদ্যালাভ করিলেন এবং গুরুদক্ষিণা-স্বরূপে মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় হইতে আনিয়া দিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলেন।

উদ্ধব রথে চড়িয়া সন্ধ্যাকালে নন্দব্রজে আসিলেন। রাত্রিতে নন্দ ও অন্যান্য গোপ-গণের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইল। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ তাঁহাকে দেখিলেন। গোপীগণ তাঁহাদের মর্ম্মবেদনার কথা উদ্ধবকে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা একেবারে পাগল হইলেন—সেই অবস্থায় শ্রীরাধা একটি ভ্রমরকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন এই ভ্রমরকেই দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া সেই ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা এই দশটি শ্লোক বলিয়াছেন। আমরা অনুবাদসহ শ্লোক দশটি উপরে বলিয়াছি—এখন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীতে' এই শ্লোক কয়েকটি কিভাবে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা আস্বাদন করুন।

কোন গোপী ক্রোধ করি উদ্ধব গোচরে।
ভ্রমর করিয়া দূত ছলে কিছু বলে ॥
সতিনের কুচতট বিলোলিত মালে।
তাহার কুঙ্কুম তোর মুখ লোম জালে ॥
পরশ না কর ভৃঙ্গ চরণ আমার।
যদুকুলবিড়ম্বন এ দূত যাহার ॥
শুন শুন ভ্রমরা হে কিতবের মিত।
ভাল ত কহিলে তুমি দূত সুচরিত ॥
পুরনারী প্রসাদ করুক পুররাজ।
তাঁ০ কথ না কহিয় গোপীর সমাজ ॥১
সকৃত অধর সুধা করাইয়া পান।
ত্যজি গেল কৃষ্ণ যেন তোমারি সমান ॥
কিরূপে কমলা দেবী পদ যুগ সেবে।
এমত বঞ্চকে না বাড়াই অনুরাগে ॥
হেন বুঝি তাহার উত্তম যশঃ শুনি।
ভুলিল কমলা দেবী তত্ত্ব নাহি জানি ॥২
বনচরি আমি সব নাহি গৃহ পুরী।
তাঁর গুণ কেনেবা গাইস উচ্চ করি ॥
পুরপতি কথা পুরনারী আগে কহ।
তাঁর ঠাঞি যে তোমার বাঞ্ছিত তাহা লহ ॥
অর্জ্জুনের প্রিয় তোর নপুংসক সখা।
আমা সভা বিদ্যমানে তার না কহিয় কথা ॥
ভ্রমর বলয়ে যদি এত দোষ জান।
তবে কেন ভজিলে তাহার কথা শুন ॥৩
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমত নারী আছে।
তাহার কপট হাস কটাক্ষ বিলাসে ॥
সেরূপ দেখিলে যেই নহে বিমোহিতা।
কি দোষ তাহার যার কমলা বণিতা ॥৪

পায়ে না পড়িহ ভৃঙ্গ না ধর চরণে।
বিনয়-পণ্ডিত সে কপট ভাল জানে।
তুঞি সে তাহার দূত জানিস চাতুরী॥
তোমার কপট গোপী ভাণ্ডিতে না পারি॥
পতি সুত গৃহ কুল যার লাগি ত্যজি।
সে কেনে ত্যজিয়া যায় কিছু নাহি বুঝি॥
এতেক জানিনু তাঁর মূর্খ ব্যবহার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার কিছু নাহিক বিচার॥৫
বিনা অপরাধে বালি বান্ধি কেনে মারে।
সূর্য্যবংশে জন্মিঞা ব্যাধের কর্ম্ম করে॥
স্ত্রীর লাগি বনে বনে বেড়ায় হারাইয়া।
সূর্পনখার নাক কান ফেলায় কাটিয়া॥
বলিরাজা আছিল ত্রিভুবনের ঈশ্বর।
তার পূজা লইয়া তার হরয়ে সকল॥
পাতালে বান্ধিয় তাকে নিল নাগপাশে।
কাক, বলি খাইয়া যেন সেই যজ্ঞ নাশে॥
নামে কালো রূপে কালো অন্তরে কালিয়া।
তা সনে পীরিতি করে নির্ল্লজ্জ হইয়া॥
তবু তার কথাখানি ছাড়নে না যায়।
না দেখিল আমি সবে তাহাতে উপায়॥৬
যদি বল তার কথা না কহিয় আর।
স্ত্রী হইয়া কেমতে পারিব ছাড়িবার।
সকৃত যাহার গুণ শুনি ধীরগণে।
সুতদার দুঃখিত তাজয়ে সেইক্ষণে॥
পক্ষ যেন ভূমে ভিক্ষা মাগি মাগি খায়।
স্ত্রীজাতি আমা সবার কি আছ উপায়॥৭
কুটিলের বচন মানিল সত্য করি।
কুটিলের গীতে যেন সতী মরে [illegible]॥

তবে তার কথা ছাড়ি আর কথা কহ।
কিছু যদি চাহ তুমি তাহা মাগি লহ ॥৮
সত্য কি আসিবে হেথা সে নন্দনন্দন।
কিবা তথা লঞা যাবে সেই গোপীগণ ॥৯
কিবা মধুপুরে হরি আছয়ে কুশলে।
পিতা মাতা বন্ধুগণ কভু কি স্মঙরিলে ॥
কিঙ্করীগণের কথা শুনিলে কাহাতে।
শ্রীভুজ কবে সে আর তুলি দিব মাথে ॥১০
ভৃঙ্গ লক্ষ করি গোপী উদ্ধবের তরে।
এইরূপে নানাবাণী কহে নানা ছলে।
ভক্তিরসগুরু শ্রীল গদাধর জ্ঞান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান ॥

"ভ্রমর-গীতা"র শ্লোক দশটির সাধারণ অর্থ ও 'উজ্জ্বল-চন্দ্রিকার' ও শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য্য-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীর' বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকগুলির মধ্যে যে-অর্থগত যোগ আছে, কি-প্রকারের চিন্তা বা অনুভবের মধ্য দিয়া একটির পর আর একটি শ্লোক কথিত হইয়াছে, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। আমরা শ্রীধরস্বামী কথিত সেই তাৎপর্য্য নিবেদন করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটি জিনিস প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের যে-অধ্যায়ে এই শ্লোকগুলি আছে, সেই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকগুলির সহিত পরিচয় আবশ্যক। প্রথমে অর্থসহ সেই শ্লোকগুলি বলিয়া, শ্রীধরস্বামী কথিত তাৎপর্য্য বলা হইবে। উপাখ্যানাংশ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় রথে চড়িয়া উদ্ধব নন্দগোকুলে আসিয়াছেন। রাত্রিতে ব্রজদেবীগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথা-আলাপনে তিনি রাত্রিযাপন করিয়াছেন।

ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ সকালে উঠিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে আবার গোকুলে রথ আসিয়াছে। রথ দেখিয়া গোপীগণের প্রাণ আবার কাঁদিয়া উঠিল। বড়ই দুঃখময়ী স্মৃতি! এমনি করিয়াই রথ আসিয়াছিল, সে কবেকার কথা? রথে চড়িয়া অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গিয়াছে, ব্রজবাসীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আবার গোকুলে

রথ আসে কেন ? বিরহপীড়িতা গোপীগণ দারুণ ব্যথায় কত কি ভাবিতেছে ! এমন সময়ে—

শ্রীশুক উবাচ

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনং।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলং॥১

ব্রজনারীগণ সেই কৃষ্ণানুচর উদ্ধবকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে বেশ, বড়ই সুন্দর; মনোহর। দীর্ঘ, বিলম্বিত ছুটি বাহু; নবীন কমলতুল্য লোচন-যুগল; পীতবাস পরিধান; বুকে পদ্মহার; পদ্মের মত মুখখানি শোভায় ঝলমল করিতেছে; গণ্ডদেশে কুণ্ডল দুলিতেছে।

সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেশভূষণঃ।
ইতি স্ম সর্ব্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকাস্তমুত্তমশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ং॥
তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং সব্রীড়হাসেক্ষণ সূনৃতাদিভিঃ।
রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে বিজ্ঞায় সন্দেশ হরং রমাপতেঃ॥২

উদ্ধবকে দেখিয়া ব্রজদেবীগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন— ইনি কে ? সুন্দর দর্শন; ইনি কোথা হইতে আসিলেন, ইনি কাহার সন্তান ? ইঁহার বেশ-ভূষা যে ঠিক্ অচ্যুতেরই মত। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা সকলে উৎসুক হইয়া, উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই যাঁহার আশ্রয়, সেই উদ্ধবের চারিদিকে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। বিনয়াবনত গোপীগণ—লজ্জামাখা হাসি, লজ্জামাখা দর্শন ও সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা উদ্ধবকে আপ্যায়িত করিলেন। উদ্ধব আসন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের দূত জানিয়া গোপীগণ তাঁহাকে নির্জ্জনে বলিতেছেন—

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতং।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥৩

আমরা জানি, আপনি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবক, আপনার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পিতামাতার প্রীতি-সাধনের জন্য আপনাকে পাঠাইয়াছেন, তাই আপনি এখানে আসিয়াছেন।

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ॥৪

পিতামাতা ছাড়া, এই গোকুলে তাঁহার মনে করার মত আর কিছু ত দেখিতে পাই না। বন্ধুদের প্রতি স্নেহবন্ধন মুনিরাও ছাড়িতে পারেন না।

অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনং।
পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষটপদৈঃ ॥৫

পিতামাতাই বন্ধু, পিতামাতা ছাড়া অন্যের সহিত যে ভালবাসা, তাহা অর্থকৃতা, কার্য্য-নিমিত্তা ; যতক্ষণ কাজ থাকে, ততক্ষণই ভালবাসা, কাজ হইয়া গেলে আর ভালবাসা থাকে না। যেমন স্ত্রীলোকে পুরুষের ভালবাসা, যেমন ফুলে ভ্রমরের ভালবাসা।

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্যং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণং ॥৬

ইহার উদাহরণ অনেক. গণিকারা ধনহীন পুরুষকে ত্যাগ করে ; অসমর্থ রাজাকে প্রজারা ত্যাগ করে ; বিদ্যালাভ হইলে ছাত্রেরা শিক্ষককে ত্যাগ করে, দক্ষিণা দেওয়া হইয়া গেলে যজমান পুরোহিতকে ত্যাগ করে।

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহং।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ং ॥৭

ফল ফুরাইয়া গেলে পাখীরা বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, আহার হইয়া গেলে অতিথিরা গৃহস্থের গৃহ ত্যাগ করে, উপপতিগণ অতৃপ্তা নারীকে ত্যাগ করে।

ইতি গোপ্যোহি গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোর বাল্যয়োঃ ॥৮

গোপীদের বাক্য দেহ ও মন গোবিন্দগত,—তাঁহারা কায়মনোবাক্যে গোবিন্দ ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। গোবিন্দের জন্য তাঁহারা একেবারেই লোক-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের দূত উদ্ধবের নিকট তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর কার্য্যাবলী গান করিতেছেন কাঁদিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যের ও কৈশোরের কার্য্যাবলী ভাবিতে

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥৯

ব্রজগোপীদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন কোন একজন গোপী (শ্রীরাধা, তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থায়) একটি মধুকর দেখিতে পাইলেন। ঐ গোপী তখন প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম ধ্যান করিতেছিলেন; তাঁহার মনে হইল ঐ মধুকর দূত, প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন; এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐ গোপী বলিতে লাগিলেন।

ধূর্ত্তের বন্ধু মধুকর, পদে নমস্কার করিয়া কি প্রার্থনা জানাইতেছ? না, তুমি আমার পা ছুঁইও না। মধুকর যেন বলিতেছে—'কেন ছুঁইব না, আমি কি দোষ করিলাম?' উত্তর—'দেখ মধুকর, তোমার রং কালো, তোমার দাঁড়ি গোঁফ্ও কালো; কিন্তু এখন দেখিতেছি তোমার দাঁড়ি গোঁফে লাল রং মাখা। এই রং কোথায় মাখিয়াছ? আমাদের সতীনের বুকে কুঙ্কুম আছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের গলার মালায় কুঙ্কুম লাগিয়াছে, তোমারও মুখে সেই মালার কুঙ্কুমের রং লাগিয়াছে। তোমার মত লোক যাহার দূত, সেই মধুপতিকে বলিও, তিনি ঐ সব মানিনীদের প্রসন্ন করুন, তাহা হইলে তিনি যদুদিগের সভায় বেশ বিড়ম্বিত হইবেন।১০

মধুকর যেন বলিতেছে,—'কেন, তাঁহাকে এমন করিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন কেন? তিনি আপনাদের কি অপকার করিয়াছেন?' উত্তর—'তিনি কি অপকার করিয়াছেন? তিনি ঠিক্ তোমারই মত দুর্ম্মনা। তুমি যেমন মধু খাইয়া ফুলকে পরিত্যাগ কর, তিনিও ঠিক্ তেমনি করিয়া, মাত্র-একবার, তাঁহার মোহিনী অধরসুধা পান করাইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা বুঝি না, লক্ষ্মী কেন সেই অবিজ্ঞের পাদপদ্মের পরিচর্য্যা করেন? সেই উত্তম-শ্লোকের মিথ্যা কথায় লক্ষ্মী চিত্তহারা হইয়াছেন। লক্ষ্মী যে অবিদগ্ধা, আমরা তাহা নহি।১১

কি মধুকর, খুব যে হুঙ্কার করিয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেছ। আমাদের কাছে কি আর বলিবে? গৃহহীন যদুদের সেই রাজা আমাদের কাছে, নিতান্তই পুরাতন; আমাদের অজানা যে কিছুই নাই। এখান হইতে যাও। সেই বিজয়-সখা (অর্জ্জুন-সখা) শ্রীকৃষ্ণের এখন যাহারা সখী তাহাদের কাছে গিয়া সেইখানে শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা

গান কর। শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের হৃদ্রোগ ক্ষয় হইয়াছে, তাহারা তোমাকে তোমার আকাঙ্খিত বস্তু দান করিবে।১২

মধুকর যেন বলিতেছে,—'না মা, এমন কথা বলিবেন না। আপনাকে স্মরণ করিয়া করিয়া তাঁহার অনঙ্গ-বিক্লব হইয়াছে ; তিনি বিরহে কাতর হইয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন, তাই আমি আসিয়াছি। উত্তর—'না, মধুকর একথা বলিও না। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে এমন নারী কে আছে, যে শ্রীকৃষ্ণের দুস্প্রাপ্য ? কপট ও সুন্দর হাসিতে তাঁহার ভ্রূযুগল সর্ব্বদাই উল্লসিত। লক্ষ্মী তাঁহার পদধূলির উপাসনা করেন। আমরা কে ? আমরা তো তাঁহাদের তুলনায় একেবারে নগণ্য। তবে, মধুকর, তুমি তাঁহাকে একটি কথা বলিও।" "উত্তম-শ্লোক" বলিয়া যে একটি শব্দ আছে, সেই শব্দটি দীনজনের প্রতি যাঁহার দয়া আছে, তাঁহারই প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।' (ইহার অর্থ—আমরা দীন, আমাদের প্রতি যখন শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা নাই, তখন, তাঁহাকে 'উত্তমশ্লোক' বলা যায় না।) ১৩

এই কথা বলার পর গোপীর মনে হইল, ভ্রমর যেন চরণমূলে প্রবেশ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে ; তাই ভ্রমরকে বলিলেন—'নিজের মাথার উপরে আমার চরণ ধরিতেছ কেন ? চরণ পরিত্যাগ কর।' কিন্তু, ভ্রমর চরণ ছাড়ে না। তখন বলিলেন—'দেখ আমি সব জানি। মুকুন্দের নিকট এই বিদ্যা শিখিয়াছ। দৌত্য-কর্ম্ম ও প্রিয়-বচনের দ্বারা অনুনয় করিতে তুমি খুব পণ্ডিত। তুমি প্রার্থনাচতুর, তোমার সবই বুঝিতেছি। আমরা মুকুন্দকেও বিশ্বাস করি না, তোমাকেও বিশ্বাস করি না।' মধুকর বলিতেছে,—'কেন, মুকুন্দ কি এমন অপরাধ করিয়াছেন ? উত্তর—'একথা বলিও না। তাঁহার জন্য আমরা ইহকালের পতি পুত্রাদি এবং পরকাল ছাড়িলাম, আর তিনি এমনই অসংযতচিত্ত যে আমাদের একেবারে ত্যাগ করিলেন ! তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার আর কিছুই নাই।১৪

আর কি জান ? শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মসমুদয় অনুসন্ধান করিয়া আমাদের অতিশয় ভয় হইতেছে। পূর্ব্বজন্মে শ্রীরামচন্দ্র অবতারে ইনি কপিরাজ বালিকে বিদ্ধ করেন। দেখ, ব্যাধ কোন প্রাণীকে বধ করে, তাহার মাংস খাইবার জন্য ; কিন্তু

তাহার পর সীতার প্রীতির জন্য,—সূর্পনখা স্ত্রীলোক, তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করেন। এই সূর্পনখা কামার্ত্ত হইয়া তাঁহাদের নিকটে গিয়াছিল। তাহারও পূর্ব্বজন্মে বামনাবতারে, বলির উপহার ভোজন করিয়া কাকের মত তাহাকে বন্ধন করেন। অতএব সেই কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের সখ্যে আর প্রয়োজন নাই। হে মধুকর, যদি বল, তাহা হইলে সর্ব্বদা তাঁহার কথা গান কর কেন? তাহার উত্তর, ঐ কৃষ্ণের কথারূপ অর্থ এমনি যে উহা পরিত্যাগ করা যায় না। ১৫

আবার দেখ, তাঁহার কথা ত্রিবর্গলতার উন্মূলনী; তথাপি আমরা তাহা ছাড়িতে পারি না, কি করিব? তাঁহার অনুচরিতই লীলা, উহা কর্ণের অমৃত; ঐ অমৃতের কণা একবারমাত্র সেবন করিলে রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বধর্ম্ম একেবারে নিরস্ত হইয়া যায়। এই অবস্থা যাহাদের হয়, তাহারা অসৎতুল্য বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহারা তাহাদের দুঃখিত আত্মীয় কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া ভোগহীন পক্ষীর মত ভিক্ষুচর্য্যা করিয়া থাকে, কোন প্রকারে প্রাণধারণ মাত্র করিয়া থাকে। অতএব এই কৃষ্ণকথা পরিত্যাগ করাই উচিত, কিন্তু ত্যাগ করিতে পারি না। [এই গেল শ্লোকটির নিন্দাপর অর্থ। আর একটি অর্থ আছে, তাহার নাম শ্রৌত অর্থ কৃষ্ণকথা পারমার্থিক, অতএব ছাড়িব কেমন করিয়া। এই কথায় দ্বন্দ্বধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে মানুষ দীন অর্থাৎ তুচ্ছ যে গৃহ কুটুম্ব তাহা ছাড়িয়া অকিঞ্চন হইয়া পড়ে, তাহার আর 'আমার' বলিতে সংসারে কিছুই থাকে না। তখন সারাসার বিবেকচতুর হংসের ন্যায় ভিক্ষুচর্য্যা অর্থাৎ পারমহংস্য বৃত্তি অবলম্বন করে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কথা পরমপুরুষার্থরূপ, সুতরাং ঐ কথার্থ দুস্ত্যজ।] ১৬

মধুকর যেন বলিতেছে,—'এখন এ সব কথা কি বলিতেছেন, যখন নির্জ্জনে তাঁহার সঙ্গে বিহার করিতেন, সে-সময়ে এই সব কথা ত বলেন নাই!' 'দূত, এ কথার উত্তর দিতেছি; ব্যাধের গান না বুঝিয়া অজ্ঞান কৃষ্ণসার হরিণী যেমন শরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যাতনা পায়, আমরাও সেইরূপ অজ্ঞান। কৃষ্ণের কুটিল কথা সত্য মনে করিয়া তাঁহার নখস্পর্শজাত তীব্র কন্দর্প পীড়া ভোগ করিতেছি। অতএব, অন্য কথা বল।'১৭

গোপীর মনে হইল, মধুকর যেন চলিয়া গেল, এবং আবার ফিরিয়া আসিল। এইবার মধুকরকে বলিতেছেন,—'তুমি প্রিয় কৃষ্ণের সখা। কৃষ্ণ কি তোমাকে পুনর্ব্বার

কাছে লইয়া যাইতে চাও। আমাদের সেখানে কেন লইয়া যাইতে চাও। শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই যুগলে বিরাজ করিতেছেন। মিথুনীভাব তাঁহার দুস্ত্যজ। লক্ষ্মী-বধূর সহিত তিনি সর্ব্বদাই একত্রে আছেন।'১৮

মধুকর যেন গোপীকে কোনরূপ সুমন্ত্রণা দিলেন। সেই সুমন্ত্রণা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'হে সৌম্য, গুরুকুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এখন কি মধুপুরেই আছেন? তিনি কি পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবন্ধুগণকে স্মরণ করেন? আমরা তাঁহার কিঙ্করী, আমাদের কথা কি কখন বলেন? তিনি কবে আবার আসিবেন? কবে আসিয়া তাঁহার অগুরু-সুগন্ধ হস্ত আমাদের মাথায় স্থাপন করিবেন?১৯

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দুইটি ব্যাপারের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কুরুক্ষেত্র মিলন আর উদ্ধবের ব্রজে আগমন, এই দুইটিই সেই বিশেষ ব্যাপার। উদ্ধব-সম্বাদের প্রাণের কথা এই ভ্রমর-গীতা। বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে গ্রন্থ চুরির পর শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরের রাজসভায় গিয়া রাজার অনুরোধে এই ভ্রমর গীতাই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং ভ্রমর গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়াই রাজা বীর হাম্বির এবং তাঁহার স্বজনবর্গ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসরের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

> শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
> উদ্ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে হয় রাত্রি দিনে॥
> দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।

শ্রীরাধিকার এই উন্মাদ ও প্রলাপ, এই ভ্রমর গীতা।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার শ্রীশ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে ভ্রমর গীতার এই শ্লোক দশটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আমরা এইবার তাঁহার মতের আলোচনা

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের চরম অবস্থার নাম "দিব্যোন্মাদ"। এই দিব্যোন্মাদের নানারূপ অবস্থা ভেদ আছে। তন্মধ্যে উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্পই প্রধান

প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ।
ভূরি ভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥

মহাবিরহের সময় প্রিয়তমের সুহৃদকে দেখিলে ভিতরে খুব ক্রোধ হয়, সেই গূঢ় ক্রোধ হইতে নানা প্রকারের ভাবযুক্ত জল্প বা কথা বাহির হইতে থাকে। ইহারই নাম চিত্রজল্প। ইহার শেষ এক তীব্র উৎকণ্ঠা।

উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা গ্রন্থে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের নিম্নরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণের সুহৃদ্ দেখি গূঢ় রোষ করে।
বহু ভাবময় হঞা তীব্রোৎকণ্ঠা ধরে॥

এই চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ। ১। প্রজল্প ২। পরিজল্প ৩। বিজল্প ৪। উজ্জল্প ৫। সংজল্প ৬। অবজল্প ৭। অভিজল্প ৮। আজল্প ৯। প্রতিজল্প ১০। সুজল্প

এষ ভ্রমরগীতাখ্যো দশমে প্রকটীকৃতঃ।
অসংখ্য ভাববৈচিত্রী চমৎকৃতি সুদুস্তরঃ॥

চিত্রজল্পের এই দশটি অঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভ্রমর গীতার দশটি শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে। এই চিত্রজল্প ভাবের ভাব-বৈচিত্র্যের সংখ্যা নাই, ইহা এতই চমৎকার যে ইহার রহস্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

ভ্রমর গীতার দশটি শ্লোকের এক একটি শ্লোক চিত্রজল্পের এক একটি অঙ্গ। আমরা নিম্নে, অবস্থার নাম, লক্ষণ এবং শ্লোকের মর্ম্মার্থের দ্বারা কিঞ্চিৎ আস্বাদনের চেষ্টা করিব। উজ্জ্বল নীলমণির শ্লোক ও উজ্জ্বল চন্দ্রিকার অনুবাদ উদ্ধৃত হইবে।

১ প্রজল্প

অসূয়েৰ্ষ্যা মদযুজা যোঽবধারণ মুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥
অসূয়েৰ্ষ্যা মদযুক্ত প্রিয়ের হুঙ্কার।

অসূয়া, ঈর্ষ্যা ও মদযুক্ত অবজ্ঞার ভাবের দ্বারা প্রিয়ের যে অকৌশল বলা হয় তাহার নাম প্রজল্প। অকৌশল বলিতে অপটুতা, মনোমালিন্য, বিরোধ প্রভৃতি বুঝায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্লোকের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমুদয় ভাবগুলি দেখাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ।

নিজের কান্তের প্রিয় সুহৃৎ উদ্ধব মথুরা হইতে সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছেন শ্রীরাধা যেন তাহাকে দেখিয়াও দেখিতে পান নাই, এইরূপ অবস্থা। এস্থলে একটি কথা জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই সত্য, কিন্তু শ্রীরাধার প্রসঙ্গ নানা স্থানেই আছে। ভ্রমর গীতার প্রারম্ভে আছে, 'কাচিৎ' অর্থাৎ কোন একটি গোপী মধুকর দেখিয়া সেই মধুকরকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত কল্পনা করিয়া এই সব কথা বলিতে লাগিলেন। এই গোপীই শ্রীরাধা। বৈষ্ণবতোষণী টীকায় 'কাচিৎ' এই পদটির শ্লিষ্টার্থ করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহার অর্থ শ্রীরাধা। "কে প্রেমসুখে আসমন্তাৎ চিৎ জ্ঞানং যস্যাঃ সা" যে নারীর সমগ্র জ্ঞান প্রেমসুখে বিহ্বল, তিনি শ্রীরাধা। "কঃ সর্ব্বেষাং প্রেমসুখং আচিনোতি ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধয়তি যা সা" সকলের প্রেমসুখ যিনি ক্ষণে ক্ষণে বাড়াইতেছেন, তিনি শ্রীরাধা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভাবের দিক্ হইতে বলিতেছেন—"হ্লাদিনী শক্তিসারবৃত্তিরূপস্য প্রেম্নোঽপি যা সপ্তমী ভূমিকা মহাভাবস্তন্ময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীয়ম্ ।"হ্লাদিনী শক্তির সার বৃত্তিরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমের সপ্তম ভূমিকা যে মহাভাব, সেই মহাভাবময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা।

স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব এই সাতটি প্রেমের ভূমিকা। প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে এই ভূমিকাগুলিতে আরোহণ করে। যাহা হউক 'ভ্রমর গীতা' শ্রীরাধারই উক্তি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাতেও এই শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার 'উজ্জ্বল নীলমণি'র টীকাতেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এই উভয় টীকা অবলম্বন করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকপাঠিকাগণ একবার করিয়া মূল শ্লোক দেখিয়া লইবেন, তাহা হইলে টীকার-তাৎপর্য্য গ্রহণে সুবিধা হইবে।

এবং মদর্থোজ্‌ঝিত লোকবেদস্বানাং হি বো মষ্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

তোমরা আমার নিমিত্ত যুক্তাযুক্ত (লোক), ধর্ম্মাধর্ম্ম (বেদ) এবং স্নেহত্যাগের দ্বারা আত্মীয় স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে, এই জন্য আমি লুকাইয়াছিলাম। সত্য করিয়া কি আমি তোমাদের পরিত্যাগ করিতে পারি? আমি লুকাইয়া লুকাইয়া তোমাদের প্রেমালাপ শুনিতেছিলাম। তোমরা আমার প্রিয়া, আমি তোমাদের প্রিয়; তোমরা অবলা তোমাদের পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সুদুস্কর। অতএব আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের পক্ষে একেবারে অসঙ্গত।

সুন্দরীগণ, তোমাদের সহিত আমার এই মিলন নিরবদ্য, নিরুপাধিক। তোমাদের প্রতি আমার যাহা করা উচিত তাহা আমি চিরকালেও করিতে পারিব না। তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ। আমি উপযুক্ত প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। তোমাদের শীলতার দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম।

যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে এই সব কথা বলিয়াছেন, আর এখন এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তিনি ধূর্ত্ত। আর, তুমি যখন তাঁহার দূত কথার দ্বারা ভুলাইতে আসিয়াছ, তখন তুমি সেই বঞ্চকের বন্ধু। অতএব, তুমি আমার পা ছুঁইও না। "এ কি কথা, আমাকে কি নমস্কার করিতেও দিবেন না?" না, তুমি মধুপ, তুমি মদ্যপান করিয়াছ। তোমাকে ছুঁইলে আমার চরণ অপবিত্র হইবে। সুতরাং প্রণাম করিবারই যদি ইচ্ছা থাকে, দূরে সরিয়া গিয়া প্রণাম কর। "এ কি কথা, আমি দোষহীন, আমাকে অকারণ মাতাল বলিয়া নিন্দা করেন কেন?" না, মিথ্যা বলি নাই, সত্য কথাই বলিতেছি। আমার সপত্নীর বক্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ-সংঘর্ষ হইয়াছে। সেই সংঘর্ষের দ্বারা যে মালা বিমর্দ্দিত হইয়াছে সেই মালারই কুঙ্কুম তোমার শ্মশ্রুতে লাগিয়া রহিয়াছে। [ইহা দিব্যোন্মাদের কথা। আসল কথা, ভ্রমরের শ্মশ্রুই ঈষৎ পীতবর্ণ।] আমি মান করিয়াছি, আর তুমি কিনা আমার সপত্নীর বুকের কুঙ্কুম যাহা শ্রীকৃষ্ণের মালায় লাগিয়াছিল, সেই কুঙ্কুমে মুখ-লোম লাল করিয়া আমাকে অনুনয় করিবার জন্য আসিয়াছ। তোমার একেবারেই

বিবেক নাই, তাহা থাকিলে মুখপ্রক্ষালন করিয়া আসিতে। মাতাল না হইলে কি এরকম বিবেকাভাব হয়? তুমি বোঝ না, ঐ রং দেখিয়া আমার মান আরও বাড়িয়া যাইতেছে? "যাই হোক্, যা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন আপনি প্রসন্ন হউন।" মধুপ, তুমি মদ্যপালক, যাও, তোমার নিজস্থানে যাও; তোমার প্রভুর পানের জন্য মদ্য পালন করিও এবং পানও করিও। সেই কার্য্যই তোমার উপযুক্ত, তোমার মত বুদ্ধিহীন কখনও দূতের কাজ করিতে পারে না। "আচ্ছা, বেশ, আমার দ্বারা যদি দূতের কাজ নাই হয়, তাহা হইলে এখন আমি মথুরায় ফিরিয়া যাই, গোপেন্দ্রনন্দন স্বয়ং আসিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবেন।" "না, না, তাঁহাকে আর আসিতে হইবে না। তিনি আর গোপেন্দ্রনন্দন নহেন, তিনি এখন যাদবদের পতি হইয়াছেন। ব্রজেশ্বরীর গর্ভজাত পুত্র, গোপজাতি; এখন ভাগ্যবশে ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছেন। মানিনী ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণকে তিনি প্রসন্ন করুন, সেই মানিনীরা সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুন, আমরা নিকৃষ্ট গোপনারী, আমাদের সঙ্গে তাঁহার কি? মথুরানাগরীরা অসংখ্য—একজনকে খুসি করিলে আর একজন মান করিবে, আবার তাহাকে খুসি করিলে আর একজন মান করিবে। চিরকালই তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের এখানে আসিবার তাঁহার অবসর কোথায়? "দেবি, আপনি তাঁহার সর্ব্বসৌভাগ্যনিধি, এমন কথা বলিবেন না! আপনাতে যদি তাঁহার মন নাই, তাহা হইলে তিনি আমাকে দূত পাঠাইবেন কেন?" তুমি তাঁহার উপযুক্ত দূত। তাহা না হইলে ক্ষত্রিয় নারীগণের কুঙ্কুমের রং মাখিয়া আসিবে কেন? তোমার প্রভুর যদুসভায় বহু বিড়ম্বনা হইবে। যদুস্ত্রীগণের স্বামীরা জানিতে পারিলে বিড়ম্বনা করিবে। তোমার মত যাঁহার দূত, তাঁহার কি আর সভামধ্যে বিড়ম্বনা না হইয়া যায়? গোপ কৃষ্ণের এই কার্য্যে যদুগণেরও সকল দেশে নিন্দা হইবে। আ হা হা (শ্লেষ) তুমিই তাঁহার ঠিক্ দূত। তিনি মধুপতি। (মধু কথার অর্থ মদ্য।) তিনি মদের রাজা, অতএব মদ্যপায়ী। মদ্যপানের চিত্তবিক্ষেপেই তিনি তোমার মত ভ্রমরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

(ক) কিতব—এই কথায় অসূয়া

(খ) সপত্ন্যাঃ প্রভৃতি কথায় ঈর্ষ্যা (বৈষ্ণবতোষণীমতে গর্ব্ব)

(ঘ) মধুপতি সেই সব মানিনীকে প্রসন্ন করুন, ইহাতে অবধারণ বা অবজ্ঞা
(বৈষ্ণবতোষণী মতে ঈর্ষ্যা)

(ঙ) যদুসভায় বিড়ম্বিত হইবেন—ইহাতে অকৌশলোদ্গার—

২। পরিজল্প

প্রভোর্নির্দ্দয়তা শাঠ্যং চাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতা ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং॥
প্রভুর নির্দ্দয়তা শাঠ্যাদির উপপাদন।
'পরিজল্প'-ভঙ্গে নিজ সুধীত্ব কথন॥

প্রভুর নিষ্ঠুরতা, শঠতা ও চপলতা প্রভৃতি বেশ করিয়া দেখাইয়া শেষে ইঙ্গিতে নিজের যে বিচক্ষণতার প্রকাশ, তাহার নাম পরিজল্প।

পূর্ব্বের কথাগুলি শুনিয়া ভ্রমর বলিতেছে—"আমরা ভ্রমর, আমাদের মুখলোম স্বভাবতঃই একটু পীতবর্ণ, কুঙ্কুম লাগিবে কেন? আর, শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতি একতান-মানস, মধুপুরীতে তিনি স্বপ্নেও অন্য স্ত্রী দর্শন করেন না; তাঁহার কোনই অপরাধ নাই; আপনি মান করিতেছেন কেন?" ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—দেখ, মাত্র একবার নিজের মোহিনী অধরসুধা পান করাইয়াছে। [প্রকৃত কথা, বহুবার অধরসুধা পান করাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধা বলিতেছেন 'মাত্র একবার'। ইহাতে অনুরাগ-নিবন্ধন তৃষ্ণাধিক্য ব্যঞ্জিত হইতেছে।] তাঁহার অধরই সুধা। সেই সুধা একবার মাত্র পান করাইলেন কেন? আমরা যাহাতে মরিয়া না যাই, সেইজন্য অধরসুধা পান করাইলেন। ইহারা যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে আমার দেওয়া কষ্ট সহ্য করিবে কে, আমি আর কাহাকেই বা কষ্ট দিব? এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমাদিগকে জোর করিয়া অধরসুধা পান করাইয়াছে। [পায়য়িত্বা—নিজন্ত—অতএব 'বলাৎকার' বুঝাইতেছে।] অধরসুধা পান করাইয়া আমাদিগকে সুখদান করাই যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে মাত্র-একবার পান করাইবে কেন? পুনঃ পুনঃ পান করাইত। কথাটা ঠিক্ কিনা, তুমিই বিচার কর।

ভ্রমর যেন বলিতেছে—"মানিলাম, যাহা বলিতেছেন, সবই সত্য; কিন্তু আপনারা সাধ্বী, তাঁহার প্রতি আপনাদের স্পৃহা কেন?"

একথা বুঝিলে না ? তাঁহার অধরসুধা মোহিনী, তাহাতে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, ইহলোক ও পরলোকের জ্ঞান থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ জোর করিয়া সেই অধরসুধা পান করাইয়াছে! দেখ, বিষের গাছ, নিজে পালন করিয়া, তাহাকে নিজ হাতে কাটিতে নাই ; এই যে সাধারণ নীতি, শ্রীকৃষ্ণ তাহাও রক্ষা করে নাই। তাহার প্রীতি এবং অপ্রীতি উভয়ই অতিশয় বিচিত্র। অধরসুধা পান করাইয়া ভ্রমর যেমন মালতীপুষ্প পরিত্যাগ করে, ঠিক্ সেইরূপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে!

ভ্রমর বলিতেছে—"আপনাদের কোনরূপ দোষ ছিল, সেইজন্য তিনি আপনাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

ভ্রমর যখন মালতীফুলকে পরিত্যাগ করে, তখন মালতীফুলের কি কোন দোষ থাকে ? সৌরভ্য, সৌকুমার্য্য, পবিত্রতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি মালতীফুলের গুণগুলি আমাদের আছে, একথা ব্রজে প্রসিদ্ধ। আর চপল ও আত্মসুখান্বেষী প্রভৃতি যত দোষ ভ্রমরের আছে, কৃষ্ণেরও সেই দোষগুলি আছে, ইহাও সকলে জানে—অতএব আমার কথা সত্য, কেবল কবিতামাত্র নহে। চঞ্চল ভ্রমর সুপবিত্র মালতীফুল পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পুষ্পসমূহে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই ভ্রমরধর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণে আমরা কেন মালিনী হইব না ? [অলঙ্কারশাস্ত্রমতে পূর্ব্বের কথা দুইটি ধ্বনি ও অনুধ্বনি।]

ভ্রমর বলিতেছে—"কিন্তু, শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দোষ। শাস্ত্রজ্ঞ গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ গুণে নারায়ণ-তুল্য।"

হউন তিনি নারায়ণ, কিন্তু, তাঁহার পরবঞ্চনাদি দোষ প্রত্যক্ষতঃ দেখা যাইতেছে। শাস্ত্রের কথায় প্রত্যক্ষের অপলাপ করিব কিরূপে ? তবে যদি বল লক্ষ্মী তাঁহার পরিচর্য্যা করেন কেন ? তাহার উত্তর বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের একদল স্তাবক আছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে 'উত্তমঃশ্লোক' বলে, সেই স্তাবকগণের স্তুতি শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর চিত্ত অপহৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবী বড়ই সরলা। কিন্তু, বিধাতা আমাদের বিচক্ষণতা, বিদগ্ধতা, বুদ্ধিবৈচিত্র্য প্রভৃতি গুণ দিয়াছেন ; সুতরাং আমরা লক্ষ্মীর মত বঞ্চিত হইব কেন ?

(ক) মোহিনী অধরসুধা পান করাইয়াছে—ইহাই শঠতা।

(খ) সদ্য ত্যাগ করিয়াছে—ইহাই নিষ্ঠুরতা।

(গ) শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের তুল্য—ইহাই চপলতা।

(ঘ) আমরা লক্ষ্মীর ন্যায় সরলা নহি—ইহাই স্ববিচক্ষণতার ভঙ্গি।

পরিজল্পের সংজ্ঞায় পূর্ব্বোক্ত চারিটি লক্ষণ ছাড়া, 'আদি' এই পদটি আছে, তাহাতে অকৃতজ্ঞতা, প্রেমশূন্যতা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

৩। বিজল্প

ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ॥
ব্যক্ত অসূয়া যাথে গূঢ় মান ধরে।
বিজল্পেতে কৃষ্ণচন্দ্রে কটাক্ষোক্তি করে॥

ভিতরে গূঢ় মান, আর বাহিরে অসূয়া; এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণে যে উপহাসাত্মক কটাক্ষ, তাহারই নাম বিজল্প।

ভ্রমর ঝঙ্কার করিতেছে। শ্রীরাধা ভাবিতেছেন, ভ্রমরের রাগ হইয়াছে, তাই নিজের গান করিবার শক্তি দেখাইতেছে। তাই বলিলেন—ভ্রমর, গোপীসভায় তুমি কি গান করিতেছ? তুমি অজ্ঞান, তোমার গানে গোপীরা প্রসন্ন হইবে না। তবু, তুমি পুনঃ পুনঃ গান করিতেছ। আর যদুপতির গান, আমাদের সম্মুখে করিতেছ? তোমার সেই যদুপতির জন্য আমরা গৃহত্যাগিনী হইয়া এই বনপ্রদেশে বসিয়া আছি, তোমাকে যে একমুষ্টি চণক ভিক্ষা দিব, সে সামর্থ্যও আমাদের নাই। যদি বল, একখানা পুরাতন কাপড়, কিম্বা ব্যবহৃত মালা দাও; শোন, আমরা তাহাও দিব না, তুমি পুরাণ গান করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণ যে যদুপতি, ইহাই সপ্রমাণ করিতেছ। দেখ ভ্রমর, তুমি ষট্পদ, তোমার ছয়খানি পদ। পশুর চরণ চারিখানি, তুমি পশুর দেড়গুণ। তোমার কিছুই বুদ্ধি নাই। কোথায় কি গান গাহিতে হয়, তাহা তুমি জান না। পশু তুমি, কেমন করিয়া জানিবে? পুরাণ গান গাহিতেছ, কি করিয়া ভিক্ষা পাইবে?

ভ্রমর বলিতেছে,—সত্যই আমি পশু, আমার উপর আপনারা রাগ করিবেন না। গান করাই আমার জীবিকার্জ্জনের উপায়, আপনারা আমাকে উপদেশ করুন।

উত্তরে বলিতেছেন—তবে শোন, তোমার প্রভু বিজয়সখ, কামযুদ্ধে তিনি যাহাদের কাছে জয়ী হইয়াছেন, বা যাহাদের কাছে পরাস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাও; আর

সেই জয়-পরাজয়ের কথা গান কর। [(শ্লেষ) তিনি পূর্ব্বে ছিলেন সুবলের সখা, এখন অর্জ্জুনের সখা হইবেন ; এই ভবিষ্যত কথা 'বিজয়সখ' বলায় শ্রীরাধার মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইল।] যাহাদের নিকট যাইয়া তোমাকে গান করিতে বলিলাম, তাহাদের বুকের জ্বালা দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা তোমার গান শুনিয়া তোমার পূজা করিবে।

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে মানগর্ভা অসূয়া ; আর উত্তরার্দ্ধে উপহাসাত্মক কটাক্ষ।

৪। উজ্জল্প

হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষায়া।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে॥

ভিতরে গর্ব্ব, বাহিরে ঈর্ষ্যা, এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের কুহকতার কীর্ত্তন ; আর অসূয়াযুক্ত আক্ষেপ। ইহারই নাম উজ্জল্প।

গর্ব্বগর্ভ ঈর্ষ্যাতে হরির কুহকতা।
সাসূয় আক্ষেপ কহে উজ্জল্পের প্রথা॥

ভ্রমর যেন বলিতেছে—হে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শিরোমণে, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ দিবানিশি আপনার ধ্যানে পীড়িত ও খেদান্বিত। আপনি প্রসন্ন হইলেই তাঁহার নিস্তার, নতুবা নহে।

এই কথায় অসূয়াযুক্ত হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—নারী ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের সময় কাটে না, তাহা আমি ভাল করিয়াই জানি। মথুরায় যদি স্ত্রীলোকের সঙ্গ না পাইতেন, তাহা হইলে আমাদের ধ্যান করিতেন, প্রসন্নতা সাধন করিতেন, বা মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য তোমার ন্যায় দূতকে পাঠাইতেন। যদি, বল মথুরানারীরা ক্ষত্রিয় জাতি, তাঁহারা গোপজাতি শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গীকার করেন না—তাহা হইলে তাহার উত্তর, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে তাঁহার দুষ্প্রাপ্য নারী নাই। যদি তিনি স্বর্গে যান, তাহা হইলে দেবীরা আসিবে ; যদি রসাতলে যান তাহা হইলে নাগপত্নীগণ পতি ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আসিবে, মথুরা-নারীদের আর কথা কি ? যদি বল, ঐ সব অঙ্গনা পাইতে হইলে কিছু মূল্যের প্রয়োজন ; তবে বলি মূল্যের অভাব কি ? শ্রীকৃষ্ণের কপট হাস্য আর ভ্রূক্ষেপের দ্বারা দেবপত্নীগণ পতি ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিক্রয় করিয়া থাকে। কপট শ্রীকৃষ্ণ নবপ্রিয়, যাহাকে নূতন লাভ করেন, তাহাকে ভালবাসেন, পুরাতন হইলে পরিত্যাগ

করেন দেবপত্নীদের আর কথা কি, নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত তাঁহার পদরেণুর উপাসনা করেন। নাগপত্নীগণের এই কথাও আমরা দেবী পৌর্ণমাসীর নিকট শুনিয়াছি। তাহা হইলে আর আমাদের কথা কি, আমরা তো ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নাই। আমরা একে মানুষী, তাহার পর গোপজাতি, তাহার পর বৃন্দাবনীয়।

[এই যে বাক্যগুলি ইহা দৈন্যময় হইলেও উঁচু করিয়া মাথা নাড়িয়া এমন কণ্ঠস্বরে বলা হইল, যে তাহাতে গর্ব্বযুক্ত ঈর্ষ্যা প্রকাশিত হইল। সেই ঈর্ষ্যায় লক্ষ্মী প্রভৃতি অপেক্ষাও শ্রীরাধার প্রেমের ও রূপলাবণ্যের আধিক্য প্রকাশিত হইল।]

আর দেখ, সন্তপ্ত ও দীনহীনজনকে যিনি দয়া করেন তাঁহাকেই উত্তমঃশ্লোক বলে। শ্রীকৃষ্ণে সে লক্ষণ নাই, অতএব তিনি মিথ্যা উত্তমঃশ্লোক। [এই উক্তির আক্ষেপময় ধ্বনি এই—যদি আমাদের মত দুঃখিত জনকে দুঃখমুক্ত না করেন, তাহা হইলে তিনি 'উত্তমশ্লোকপদবাচ্য' কি প্রকারে হইবেন ?]

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা, তৃতীয় চরণে গর্ব্বময় ঈর্ষ্যা, আর চতুর্থ চরণে অসূয়াপূর্ণ আক্ষেপ।

৫। সংজল্প

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ॥

দুর্ব্বোধ্য সোল্লুণ্ঠোক্তির দ্বারা, আর বিশেষ প্রকারের আক্ষেপ মুদ্রার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতির যে কথন, তাহার নাম সংজল্প।

স্তুতিপূর্ব্বক যে দুর্ব্বাদ করা হয় তাহার নাম সোল্লুণ্ঠনম্ বা সোল্লুণ্ঠঃ। জটাধর ইহার এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন।

দুর্ব্বাদঃ স্যাদুপালম্ভস্তত্র যঃ স্তুতি পূর্ব্বকঃ।
সোল্লুণ্ঠনং সানন্দস্তু যত্তত্র পরিভাষণম্॥
সোল্লুণ্ঠ গম্ভীর ক্ষেপ বাক্য কহে বাম।
কৃষ্ণে অকৃতজ্ঞ উক্তি, 'সংজল্প' তার নাম॥

নির্মঞ্ছনীয়চরণছ্যুতে দেবি ; দেবি, আপনার চরণ নখের ছটা কোটি কোটি লক্ষ্মীকেও পরাজিত করে স্বীকার করিলাম, শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট অপরাধী। দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। এই বলিয়া ভ্রমর প্রণাম করিতেছে।

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—চরণ ছাড় তোমার মাথার উপর আমার চরণ কেন ধারণ করিতেছ? চরণ ছাড়িয়া দাও, এখান হইতে দূর হইয়া যাও। আমি সব জানি, লক্ষ্মী প্রভৃতির মত আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। তুমি মুকুন্দের নিকট হইতে আসিয়াছ প্রিয়োক্তিরচনারূপ দৌত্যকর্ম্মের দ্বারা অনুনয় করিতে তুমি খুব বিচক্ষণ। তুমি মুকুন্দের নিকট এই অনুনয়-প্রকার শিখিয়াছ, তোমার চরিত্রাদি আমি সম্যক্‌রূপে জানি।

ভ্রমর বলিতেছে—কর্ত্রি, তিনি আপনার প্রাণকোটির অধিক ; তাঁহার সহিত বিগ্রহ (বিরোধ) করিয়া কি হইবে? আমাকে মধ্যস্থ করিয়া সন্ধি করাই সঙ্গত। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাঁহার জন্য আমরা সব ছাড়িয়াছি, মহারাসের বংশীধ্বনি শুনিয়া অন্তর্গৃহগতা গোপীরা পুত্রাদি ছাড়িয়াছে, আমরা পত্যাদি ছাড়িয়াছি, ধন্যা প্রভৃতি কুমারীরা পিত্রাদি ছাড়িয়াছে। ইহলোক পরলোক সবই আমরা ছাড়িয়াছি। আর সেই আমাদের, তিনি—পরিত্যাগ করিলেন! বল দেখি, কত বড় অকৃতজ্ঞ তিনি! যিনি এইরূপ কঠোর, তাহাতে আর সন্ধান করিবার কি আছে?

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে সোল্লুণ্ঠা আক্ষেপমুদ্রা, উত্তরার্দ্ধে অকৃতজ্ঞতা ; তাহা ছাড়া নির্দ্দয়তা, পরদ্রোহিতা, প্রেমশূন্যতা প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে।

৬। অবজল্প

হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব ধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা।
যত্র সের্ষ্যং ভিয়েবোক্তঃ সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥

হরির চরিত্রে কাঠিন্য বা নিষ্ঠুরতা আছে, কামিত্ব বা নিজ সুখমাত্র অন্বেষণ আছে, ধূর্ত্ততাও আছে ; সুতরাং ভয় হয়। কাজেই হরির প্রতি আসক্ত হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। এই কথা বলা হইতেছে, কিন্তু ঈর্ষার সহিত বলা হইতেছে। সেই উক্তির নাম অবজল্প।

হরির কাঠিন্য ধৌর্ত্ত্য সের্ষাভয়ে কয়।
আসক্তির অযোগ্যতা অবজল্প হয়॥

ভ্রমর বলিতেছে—দেবি, শ্রীকৃষ্ণের মন অতীব কোমল আমরা সকলে দেখিয়াছি, তিনি আপনারই ধ্যান করেন।

উত্তরে শ্রীরাধা বলিতেছেন—দূত, তুমি নিতান্ত সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়াছ, তাঁহার তত্ত্ব তুমি কিছুই জান না। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই জন্মেই কঠোর তাহা নহে। আমরা পৌর্ণমাসী দেবীর নিকট তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথাও শুনিয়াছি। যখন তিনি ক্ষত্রিয় কুলে রামচন্দ্ররূপে জন্মাইয়া ছিলেন তখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্যাধের মত বালি রাজাকে বিদ্ধ করেন। নির্দ্দয়ভাবে ও গুপ্তভাবে এই কার্য্য করেন। এই কার্য্যে তিনি ব্যাধের ধর্ম্মও পালন করেন নাই। (অলুব্ধধর্ম্মা) ব্যাধ বানর বধ করে না, বানরমাংস অভক্ষ্য, কাজেই অক্রেয়। আবার অন্য অধর্ম্ম শোন। সূর্পনখা নারী, কামপীড়িতা হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল, তাহার নাক কাণ কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিলেন। কি নিষ্ঠুরতা! সূর্পনখা যে আর কোথাও যাইবে বা আনন্দ পাইবে, তাহার উপায়ও থাকিল না। যদি বল, তখন তিনি জটাবল্কল পরিধান করিতেন, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই কার্য্য করিয়াছিলেন,—ইহা মোটেই সত্য নহে। তিনি স্ত্রীজিত অর্থাৎ সীতাপরতন্ত্র হইয়াই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বজন্মে বামন হইয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইয়াছিলেন। সেবারে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শান্তি, অকৈতব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরম ধার্ম্মিক বলিরাজকে তদ্দত্ত পূজার উপহার ভোজন করিয়া, স্বর্গ হইতে, ত্রৈলোক্য রাজ্যের আধিপত্য হইতে একেবারে পাতালে ভূবিবরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। [এই স্থানে মূলে পাঠান্তর আছে। 'পিষ্টপাৎ' পাঠে এইরূপ অর্থ হইবে। আর 'অবেষ্টয়ৎ' পাঠে পরের অর্থ হইবে] কাক যেমন যজ্ঞের বলি খাইয়া স্বজাতীয় অন্যান্য সকলকে ডাকিয়া আনিয়া সেই স্থান বেষ্টন করে, এবং চীৎকার করিয়া গালাগালি করে, সেইরূপ বলিকে বন্ধন করিলেন। অতএব সেই কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের বহুজনে বহু প্রকারের সখ্যে প্রয়োজন নাই। তাহার এক প্রকারের সখ্যেই রক্ষা নাই। আমরা গৌর-বর্ণা, তাহার সখ্যের দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই অশুদ্ধচিত্তা হইব। ভয়ের কারণ রহিয়াছে।

ভ্রমর বলিতেছে—আপনারা শুদ্ধচিত্তা কি প্রকারে? আমি দেখিতেছি আপনারা

উত্তর—পরনিন্দা করি নাই, কথার অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক জন্মের চরিত্রের যাহা অর্থ তাহাই বলিতেছি। তিনি আমাদের দুঃখ দিবেন, আর আমরা যথার্থ কথা বলিতে পাইব না? ইহাতে নিন্দা করাই হউক আর যথার্থ কথাই বলা হউক, ইহা দুস্ত্যজ, ইহা ত্যাগ করা যায় না। কেবল যে আমরাই ত্যাগ করিতে অক্ষম তাহা নহে কেহই ত্যাগ করিতে পারিবে না, মুনিগণও ত্যাগ করিতে পারিবেন না। [মূলে কর্ত্তৃপদের উল্লেখ না থাকায় এইরূপ অর্থ হইল।]

(ক) বিদ্ধ করিলেন—ইহাতে কাঠিন্য

(খ) স্ত্রীজিত—ইহাতে কামিত্ব

(গ) 'বলিমপি'—ইহাতে ধূর্ত্ততা

(ঘ) অসিতসখ্যৈঃ—ইহাতে আসক্তির অযোগ্যতা, ইহা ছাড়া ভয় এবং ঈর্ষা রহিয়াছে।

৭। অভিজল্প

ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ।
যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতং॥

ভঙ্গি করি তার ত্যাগ উচিত কহয়।
পক্ষীগণে খেদ দেয় এই কৃপা হয়॥
সেই কৃপাবলে তার ত্যাগ উচিত।
"অভিজল্প" সেই রস শাস্ত্রে বিদিত॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিদেরও খেদান্বিত করেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত; ভঙ্গি করিয়া এই প্রকারের অনুতাপবাক্য বলার নাম অভিজল্প।

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—আমরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত সখ্য করিয়াছিলাম, তাহার ফলে দুঃখিনী হইয়াছি, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার লীলা কথা সমগ্র জগৎকে সন্তাপিত করে। তাঁহার প্রতিক্ষণের কার্য্যই লীলা; সেই লীলা কাণের অমৃত, তাহার শব্দগুলিই সুখকর, অর্থের ত কথাই নাই। তাহার এক কণামাত্রেরও যদি কিঞ্চিৎ আস্বাদন হয়, তাহা হইলে, স্ত্রীপুরুষের সখ্যরূপ যে দ্বন্দ্বধর্ম্ম তাহা একেবারে

শোনে স্ত্রীস্নেহ পরিত্যাগ করে, পুত্র পিতামাতা ত্যাগ করে, পিতামাতা পুত্র ত্যাগ করে। এই প্রকারে তাহাদের সকলই নাশ পায়। এই সব নাশে তাহাদের দুঃখ হয় না, কারণ তাহাদের তখন বৈরাগ্য হইয়াছে। সাংসারিক লোকের অনুভব তাহাদের আর থাকে না। আর এক কথা, এই সব লোক স্নিগ্ধমনা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণের ফলে অত্যন্ত কঠোর, নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন হইয়া পড়ে। তাহারা কথা শ্রবণমাত্রেই (সপদি) গৃহ কুটুম্ব পিতৃ-শ্বশ্রু প্রভৃতি পরিত্যাগ করে। আত্মীয়দের উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইবার কেহ নাই, কাল কি খাইবে তাহার ব্যবস্থা নাই ; তাহারা তাহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়াছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। আত্মীয়বর্গকে কুশবারি সংযোগে মৃত্যুর হাতে সম্প্রদান করিয়া চলিয়া যায়। হায়, হায়, স্ত্রীপুত্রাদি মরিয়া গেল ! কিন্তু ইহাতে তাহার নিজের কি সুখ হয় ? তাহাও হয় না। চিত্ত-বিক্ষেপ-নিবন্ধন সে একটি কড়িও সঙ্গে লয় না, দীনভাবে গৃহত্যাগ করে। ভার্য্যাদি রোদন করিতেছে, কিন্তু, সে এমনি কঠোর, সেজন্য ক্ষোভ নাই। এই প্রকার অবস্থা যে একজন দুজন বা চারি পাঁচজনের হইয়াছে তাহা নহে ; শত শত সহস্র সহস্র জনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। তাহার পর, তাহারা খায় কি ? পাখীর মত তাহারা ভিক্ষুচর্য্যা করে। পাখী যেমন গোধূমাদির কণা ভিক্ষা করার মত কুড়াইয়া কুড়াইয়া খাইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করে, তাহাদেরও ঠিক্ সেইরূপ অবস্থা হয় ; কোন স্থান হইতে স্থূল ভিক্ষা আসে না। তাহার পর ভিক্ষুক হইয়া আমাদের দুঃখস্থানে এই বৃন্দাবনে আসিয়া আমাদের সঙ্গের ফলে মহাদুঃখী হইয়া পড়ে। তাঁহার লীলাকথায় মৎস্যাণ্ডিকাময় ধুতুরার বীজ-চুর্ণ আছে ; কথা যিনি বলেন তাঁহার পোষাক সাধুর মত, কিন্তু তিনি মহাঘাতক। পুরাণ পুস্তক, যাহাতে লীলা কথা আছে, সেগুলি জাল। তাহারা এই জালে পড়িয়া যায়, কক্ষে পুস্তক লইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্যাসদেব প্রভৃতি এই পুরাণের জাল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে আছে শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া যে বুঝিবে, তাহারই দশা গোপীর মত হইবে, সে চিরদুঃখসাগরে পতিত হইবে। এই মতলবেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস প্রভৃতির দ্বারা এই পুরাণ শাস্ত্ররূপ জাল প্রস্তুত করাইয়াছেন। এই প্রকারে অপরের দুঃখ দর্শনই শ্রীকৃষ্ণের সুখ। শ্রীকৃষ্ণই যখন মূল, তখন এই প্রকারে

এই পদ্যটির প্রত্যেক সিদ্ধান্তেই ব্যাজস্তুতির দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই শ্লোকে সজ্জনগণকে পাখীর মত খেদান্বিত করেন, অতএব সেই কৃষ্ণকে ত্যাগ করাই সমুচিত,—এই যে অনুতাপময় বাক্য, ইহাই অভিজল্প।

৮। আজল্প

জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্যত্র কীর্ত্তিতং।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প-উদীরিতঃ॥
কৌটিল্যেতে কহে হরি মোরে পীড়া দিব।
অন্য কথায় সুখ হয় তাহাই শুনিব॥
এই মত ভঙ্গি করি কহয়ে বচন।
আজল্প বলিয়া তারে কহে কবিগণ॥

মূলে নির্ব্বেদ; তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও দুঃখদত্ব বলা হইতেছে; আর ভঙ্গির দ্বারা অন্যের সুখদত্ব বলা হইতেছে তাহার নাম আজল্প।

ভ্রমর বলিতেছে, আপনারা যাহা বলিতেছেন, মানিয়া লইলাম, তাহা সবই সত্য। তাহা হইলে আপনারা পরম বিজ্ঞ হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য করিলেন কেন?

উত্তর—তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের কাছে চিরঋণী রহিলাম, এই ঋণ কখনও শোধ হইবে না। আমরা তাঁহার এই সব ছলনা বাক্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। ব্যাধের গানে কৃষ্ণসার বধূ যেমন বিশ্বাস করে, আমাদেরও তেমনি হইয়াছিল। সে কেমন জান? কৃষ্ণসার বধূ যেমন পরে শরাঘাত দর্শন করে, আমরাও সেইরূপ তাঁহার নখ-স্পর্শের তীব্র কন্দর্প-পীড়া অনুভব করিলাম। [অসকৃৎ] একবার ফলদর্শন করিলাম, কিন্তু জ্ঞান হইল না; আবার ঠকিলাম, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। অতএব, বিদূষক আর একথা বলিও না। এখন আমাদের সুখকর অন্য কোন কথা বল। এই শ্লোকে আজল্পের লক্ষণ-সঙ্গতি খুবই স্পষ্ট।

৯। প্রতিজল্প

দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন প্রাপ্তির্নার্হেতি সু ব্রতং।

স্ত্রী-সঙ্গ গোবিন্দ কভু না পারে ছাড়িতে।
আমাদের প্রাপ্তি তাথে হইবে কেমতে ॥
দূতের সম্মান করি এই কথ কয়।
রসশাস্ত্রে 'প্রতিজল্প' তার নাম হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দম্পভাব যখন দুস্ত্যজ, তখন আর প্রাপ্তির ঔচিত্য কোথায়? দূতকে সম্মান করিয়া এই কথা কথিত হইলে তাহার নাম প্রতিজল্প।

শ্রীরাধার এখন উন্মাদ অবস্থা, ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীরাধা কিছুক্ষণ ভ্রমরকে দেখিতে পান নাই, ভ্রমর হয়ত কিছুক্ষণ অন্যত্র গিয়াছিল। ভ্রমরকে দেখিতে না পাইয়া খেদ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন - হায়, হায় বড় তীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা দূতকে সন্তপ্ত করিয়াছি। দূত মথুরা চলিয়া গিয়াছে, কৃষ্ণকে সব কথা বলিয়াছে, কৃষ্ণ আমায় উপেক্ষা করিয়াছেন! এইরূপ ভাবিতেই কলহান্তরিতা দশা উপস্থিত। বড় দুঃখেই ভাবিতেছেন, আমার প্রিয় কান্ত প্রেমাম্বুধি, সদ্গুণমৌলি, তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া দূত আবার আসুক; এইরূপ মনে করিয়া পথের দিকে চাহিতেছেন। হঠাৎ দেখেন দূত বা ভ্রমর আসিয়া উপস্থিত। ভ্রমরকে দেখিয়া এবার আদর করিয়া বলিতেছেন,—তুমি আমার প্রিয়সম, আমার প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি তাঁহার সখা। আমি তোমায় বাক্যশরে তাড়িত করিয়াছি, কিন্তু তুমি নিজের সদাশয়তা-প্রযুক্ত আমার অপরাধ গণনা কর নাই, আবার ফিরিয়া আসিয়াছ। আমি বুঝিলাম, আমার প্রিয় আমার প্রতি অতিশয় প্রেমবান্, আমার কোটি অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমাকে আবার আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব বল, তুমি কি চাও? বল, তোমার কি অনুরোধ, তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করিব।

ভ্রমর বলিতেছে—আমি চাই, আপনি মথুরা চলুন।

"আচ্ছা, মথুরা যাইব" শ্রীরাধা এই কথা বলিয়াই ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পুরস্ত্রী-বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন তাহা দেখিলেই আমার মান হইবে। তাই বলিলেন, দেখ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অন্য প্রেয়সীর সঙ্গে রহিয়াছেন, আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া কি হইবে?

ভ্রমর বলিতেছে,—না, না, তিনি সেখানে একাকীই আছেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই একাকী।

না, তিনি সর্ব্বদাই শ্রীনাম্নী বধূর সহিত একত্রে থাকেন। এই শ্রীবধূ পুরুষ হইয়া, শ্রীবৎস চিহ্নরূপে সর্ব্বদা তাঁহার বুকে বিরাজিত। শ্রী দেবী, কাজেই তাঁহার নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিবার শক্তি আছে। তিনি কখন স্বর্ণরেখা রূপে শ্রীকৃষ্ণের বুকে থাকেন, আবার কখন যুবতী নারীরূপে তাঁহার সহিত বিহার করেন।

এই শ্লোকে দূতকে সম্মান করা হইল, দূতের কথা অঙ্গীকার করাও হইল, কিন্তু পরে অনৌচিত্য জানাইয়া প্রত্যাখ্যান করা হইল। ইহাই প্রতিজল্প।

১০। সুজল্প

যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে॥
ঋজুতা, গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, সোৎকণ্ঠা, চপল।
সুজল্প জিজ্ঞাসা করে সম্বাদ সকল॥

এইবার শ্রীরাধা অনুতাপ করিতেছেন। হায়, হায়, আমি যে পাগল হইলাম। দূতকে যাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাহার কিছুই ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তখন সম্ভ্রমপূর্ব্বক দূতকে বলিতেছেন—আহা, তিনি কি মধুপুরীতেই আছেন? না ব্রজের মত মধুপুরীও ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন? মধুপুরী এখান হইতে নিকট, মধুপুরীতে থাকিলে তাঁহার এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে। [তিনি সুখে আছেন ত? একথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; কারণ শ্রীরাধা জানেন শ্রীকৃষ্ণ গোপিকার প্রেম স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই ব্যাকুল; কেবল অনুরোধ-বশে মধুপুরীতে আছেন।] তিনি আর্য্যপুত্র; দুর্বিনীত যদুগণ প্রতারণা করিয়াছে। তিনি তাঁহাদের কেহই নহেন। তিনি বাৎসল্যসমুদ্র ব্রজরাজের একমাত্র প্রাণপুত্র। তিনি এখন ভাবিতেছেন, হায়, হায়, আমার পিতা আমাকে ব্রজে লইয়া যাইতে কোনরূপ উপায় করিতে পারিলেন না, এখন আমি কি উপায় করিব? আমি যে আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারি না! এই কারণেই তিনি মধুপুরীতে আছেন, ইহাতে তাঁহার কি দোষ? নন্দ মহারাজ অতি সরল, নিজের পরিণামও দেখিতে পান না। এমনি সরল তিনি, তাই এমন পুত্রকে মধুপুরীতে রাখিয়া ব্রজে চলিয়া আসিয়াছেন। ব্রজরাজের সরলতাই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু। নতুবা ব্রজরাজ্ঞী কণ্ঠে করিয়া তাঁহার পুত্রকে মথুরায় লইয়া যাইতেন

তুলিয়া দিতেন না। এই প্রকারের সরল পিতা মহাপ্রতারক বসুদেব-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন। বসুদেব তাঁহার পুত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তিনি ব্রজে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন; নিজের বাড়ীর কোষাগার, রন্ধনাগার, শয়নাগার প্রভৃতির আর মার্জ্জন লেপন হয় না; সমুদয় তৃণ, ধূলি, পত্র ও লতাতন্তুতে আচ্ছন্ন। এই যে শূন্যায়িত নন্দ ভবন, শ্রীকৃষ্ণ কি তাহা স্মরণ করেন? অন্য গৃহে সুবলাদি সখাগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, ইহা কি তিনি স্মরণ করেন? আর দেখ, পুরস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনের মত সেবা করিতে জানে না; শ্রীকৃষ্ণের কিসে সুখ হয়, তাহাদের সে উপলব্ধিই নাই। বনমালাগুম্ফনে, স্থাসক-সম্পাদনে (চার্চ্চিকা বা চন্দনাদির দ্বারা দেহবিলেপন বিশেষে) বীটিকা নির্ম্মাণে (পাণ সাজায়), বীণাবাদনে, রাগতালাদি সৃষ্টিতে, গীতনৃত্য রাস প্রভৃতিতে, সৌন্দর্য্যলাবণ্যবৈদগ্ধ্যে, প্রশ্নোত্তরবিলাসে, সংপ্রয়োগলীলায়, প্রেম স্নেহ মান প্রণয় প্রভৃতিতে, আমরা তাঁহাকে যেমন সুখ দিয়াছি, মথুরা নারীরা তেমন সুখ দিতে পারে না। ইহা স্মরণ করিয়া মথুরানারীদের তিনি বলিবেন, যাও তোমরা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাও, তোমাদের সেবায় আর প্রয়োজন নাই, আমি কাল সকালেই ব্রজে চলিয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি কবে ব্রজে আসিয়া তাঁহার অগুরুসুগন্ধ ভুজ আমাদের মাথায় রাখিয়া আমাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বলিবেন,—প্রাণপ্রেয়সীগণ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমি আর কখনও কোথাও যাইব না। ত্রিভুবনে তোমাদের সদৃশ আর কেহই নাই।

এই শ্লোকের প্রথম চরণে আর্জ্জব বা সরলতা। দ্বিতীয় চরণে নিজের প্রসঙ্গ উত্থাপনের দ্বারা গাম্ভীর্য্য। তৃতীয় চরণে দৈন্য, চতুর্থ চরণে চপলতা ও উৎকণ্ঠা। ঐশ্বর্য্যপক্ষীয় ব্যাখ্যাতারা বলেন চিত্রজল্পের প্রলপনমাধুর্য্য শুনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই ভ্রমর-রূপে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা উন্মাদ নহে; শ্যামপীতাংশুক উদ্ধবকেই ভ্রমর সাজাইয়া এই সব কথা বলা হইতেছে।

ভ্রমরগীতার ন্যায় ভক্তপ্রিয়, উচ্চ ও গভীর সামগ্রীর যথাযথ ব্যাখ্যা বা রস-উদ্ঘাটন, আমাদের ক্ষমতার অতীত। ভাবের দ্বারা যাহা আস্বাদন করিতে হয়, তাহার সহিত পরিচিত হইবার কয়েকটি প্রণালী বা পদ্ধতি আছে। এই প্রণালী আধুনিক মনস্তত্ত্ব-সম্মত। সমগ্র সামগ্রীর সহিত পুনঃ পুনঃ পরিচিত হইতে হয়, জিনিসটিকে

ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নাই। এই কারণে আমরা তিন বার সমগ্র সামগ্রীটি ব্যাখ্যা করিয়াছি, একই শ্লোকের নিম্নে তিন প্রকার ব্যাখ্যা দিই নাই, তাহা ছাড়া দুইটি বঙ্গানুবাদও দেওয়া হইয়াছে।

পদাবলীসাহিত্যে ভ্রমরগীতার পদ বড়ই বিরল। ইহা খুব আশ্চর্য! এত বড় ব্যাপার লইয়া প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণ কিছু লেখেন নাই, ইহা খুব বিস্ময়ের কথা। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে এক শ্রীজ্ঞানদাসের দুইটি পদ আমরা পাইয়াছি—অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অনুসন্ধান চলিতেছে। আপাততঃ ঐ দুইটি পদ মুদ্রিত হইল, অন্য পদ পাইলে প্রকাশিত হইবে।

১

যোই নিকুঞ্জে, রাই পরলাপয়ে সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে, সব মনোরঞ্জনে, মিলল মধুকর-রাজ ॥
রাইক চরণ, নিয়ড়ে উড়ি যাওত হেরইতে বিরহিণী রাই।
সখী অবলম্বনে, সচকিত লোচনে, বৈঠত চেতন পাই ॥
অলি হে, না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ, বরণ গুণ যৈছন, ঐছন সবহুঁ তোহারি॥
পুররঙ্গিনী, কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত, কানু-কণ্ঠে বনমাল।
তাকর শেষ, বদনে তুয়া লাগল, জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥

২

ওরে কালা ভ্রমর তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি, আমার মন্দিরে কিবা কাজ ॥
ব্রজবাসিগণ দোখ, নিবারিতে নারি আঁখি, তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ অনল একে, তনুক্ষীণ শ্যাম শোকে, নিভান অনল দিলে জ্বালি ॥
মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ, চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি হেথা কেনে, দুখ দিতে মোর প্রাণে, মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥
সে সুখ সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর, এবে সে আমার দুখ দেখ।
কহিও কান্তর ঠাম, ইহ বিরহিণী নাম, জ্ঞানদাস কহে না উপেখ ॥

নন্দকিশোর দাস নামক একজন বৈষ্ণব কবি, "বৃন্দাবনলীলামৃত" ও "রসপুষ্প কলিকা" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই কবির কোনরূপ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। বটতলা হইতে "বৃন্দাবন লীলামৃত" ছাপা হইয়াছে; তাহাতে ভ্রমর-গীতার প্রথম শ্লোকটির পদ্যানুবাদ পাওয়া যায়। এই পদ্যানুবাদ অতি সুন্দর। অন্যান্য শ্লোকগুলির তিনি অনুবাদ করেন নাই; কিম্বা বটতলার প্রকাশকেরা তাহা বাদ দিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। সিউড়ীর "রতন"-লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থের কেবলমাত্র "রাস-লীলার" পাণ্ডুলিপি আছে। অন্যান্য অংশ নাই। এই গ্রন্থের অনুসন্ধান আবশ্যক।

এই গ্রন্থ হইতে ভ্রমর-গীতার তাৎপর্য্য ও প্রথম শ্লোকের আস্বাদন উদ্ধৃত করিলাম। একটি গভীর ও উচ্চ বিষয়কে সার্ব্বজনীন করিবার জন্য কতরূপে চেষ্টা করা হইয়াছে, উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই মত গোপীগণে, বাহ্যবৃত্তি বিস্মরণে
কৃষ্ণগত বাক্য কায়মনে।
কৃষ্ণ-দূতোদ্ধব যবে, ব্রজেতে আইল তবে,
ত্যাগ কৈলা লৌকিকাচরণে॥
কহে শুক ব্যাসের নন্দন।
অত্যন্ত রহস্য কথা, রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা,
প্রেমানন্দ-রসে নিমগন।
যে নাগরী প্রেমরঙ্গে, করে উপপতি-সঙ্গে,
কদাচিত না কহে বচনে।
অতি অকথ্য কথা, প্রেম রসময় গাথা,
নিজ মুখে কহে গোপীগণে॥
লজ্জা ধর্ম্ম গেল দূরে, ধৈরজ ধরিতে নারে,
রোদন করয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
গান করে প্রিয় কর্ম্ম, কে বুঝে তাহার মর্ম্ম,
পুনঃ পুনঃ স্মরিয়ে অন্তরে॥
কৈশোরে যতেক লীলা, পৌগণ্ডে যে কৈল খেলা,
যত ইতি করিল কৌমারে।

নিরুপাধি প্রেম হৈতে, সকল উঠয়ে চিত্তে,
শুনি উদ্ধবের চমৎকারে ॥
এথানে কহিব কথা, মন দেহ সব শ্রোতা,
অতিশয় অপূর্ব্ব বচনে।
ব্রজাঙ্গনাগণ যত, কৃষ্ণসুখ অভিমত,
বাল্যাবধি কৈল আচরণে ॥
ত্রিবিধ প্রকার রতি, মধুপুর দ্বারাবতী,
সাধারণী সমঞ্জসা হয়ে।
ব্রজে ব্রজ বধূগণে, কৃষ্ণ সুখের কারণে,
কেবল সমর্থা রতিময়ে ॥
রতি ক্রমে প্রেম হয়, স্নেহ মান পরণয়,
ক্রমে রাগ অনুরাগ সীমা।
তবে যে উপজে ভাব, তারে কহি মহাভাব,
কে কহিবে তাহার মহিমা ॥
মুকুন্দ মহিষী-বৃন্দে, সেই ভাব প্রেমানন্দে,
সদাই দুর্ল্লভ অতিশয়।
ব্রজদেবীগণ-বেদ্য, সতত সে ভাব হৃদ্য,
যারা কৃষ্ণসুখে সুখী হয় ॥
সেই ভাব পুনর্ব্বার, রূঢ়, অধিরূঢ় আর,
দুইরূপে কহে মহাজনে।
সকল সাত্বিকোদ্দীপ্ত, একক্ালে যবে ক্লীপ্ত,
তবে রূঢ় করিয়া বাথানে ॥
রূঢ় উক্ত পরকার, হৈতে বিশিষ্টতা আর,
কোন দশা যবে প্রাপ্ত দেখি।
সেই অনুভাবগণ, অপরূপ নিরূপম,
অধিরূঢ় করি তবে লিখি ॥
সেই অধিরূঢ় সারে, মোদন মাদন যারে,
দুইরূপ [illegible] কহয়।

তাহাতে প্রথম হয়, মোদন আশ্চর্য্যময়,
ত্রিজগতে কভু না জন্ময়ে ॥
উদ্দীপ্ত সৌষ্ঠব যার, হেন যে সাত্ত্বিক সার,
শ্রীরাধা মাধব দোঁহাকার।
যবে হয় এককালে, পণ্ডিত সকলে বলে,
মোদন মাধুর্য্য সর্ব্বদার ॥
কান্তাগণ সঙ্গে করি, যদ্যপি বিহরে হরি,
রাধাভাব মোদন দর্শনে।
সবাকার মনে ক্ষোভ, সে ভাব আস্বাদ লোভ,
কোনরূপে নহে আস্বাদনে ॥
প্রেমের সম্পত্তি খ্যাতা, হয় যে যে কৃষ্ণকান্তা,
তা সবার অতিক্রমকারী।
অতিশয়িতাদি গুণ, প্রেমাধিক্য নিরূপণ,
মোদন সকল ভাবোপরি ॥
রাধিকার যূথ-মাঝে, সর্ব্বদা মোদন রাজে,
কখন না হয় স্থানান্তর।
যেঁহো অতি শোভাময়, হ্লাদিনী শক্তির হয়,
সুবিলাস অতি প্রিয়বর ॥
বিচ্ছেদ দশাতে পুনঃ, মোদন সখি মোহন,
যে বিরহ বিবশ হইতে।
সাত্ত্বিক সুদীপ্তময়, কত অনুভাব হয়,
বিশেষিয়ে না পারি বর্ণিতে ॥
শেষে দিব্যোন্মাদ হয়, সুবিদ্বানগণ কয়,
সে রসে রসিক যার হিয়া।
বৃন্দাবনেশ্বরীতে সে, মোহন প্রকট ভাসে,
অন্য জনে না দেখি চাহিয়া ॥
পুনঃ সে মোহনে যবে, কোন দশান্তর লভে,
ভ্রমাভা ক্কাপি বৈচিত্র্যময়ী।

তাহে যত ভাব প্রেমা, ক্রিয়া মুদ্রা অনুপমা,
দিব্যোন্মাদ করি তারে কহি ॥
যাহাতে উদ্‌ঘূর্ণাময়, চিত্রজল্প আদি হয়,
তার ভেদ অনেক প্রকার।
প্রথমে কহিব শুন, উদ্‌ঘূর্ণা সে বিলক্ষণ,
নানা বিবশতা চেষ্টা যার।
যেইকালে মধুপুরী, গমন করিলা হরি,
রাধিকার উদ্‌ঘূর্ণা সে দশা।
ললিত-মাধব গ্রন্থে, নাটক প্রবন্ধ ছন্দে,
তৃতীয়াঙ্কে স্ফুট সব ভাষা।
অত্যন্ত বিরহ শোকে, প্রিয়ের সহসালোকে,
গূঢ় রোষোহভিজৃম্ভিত হৈয়া।
বহু ভাবময় জল্প, তারে কহি চিত্রজল্প,
তীব্রোৎকণ্ঠা অন্তিম পাইয়া ॥
কাচিৎ হ্লাদিনী-সার, বৃত্তিরূপ প্রেম যার,
সপ্তম ভূমিকা মহাভাব।
তন্ময়ী রাধিকা নামা, যার চেষ্টা অনুপমা,
অনন্ত অপার প্রেমভাব ॥
মথুরা অঙ্গনা সনে, কৃষ্ণের বিহার মনে,
ভাবিয়া উদ্ধতমনা হৈলা।
মধুকর দেখি মনে, কৃষ্ণদূত করি মানে,
মোরে প্রসাধনে পাঠাইলা ॥
এতেক কল্পনা করি, ভ্রমরে নেত্রান্ত ধরি,
কহিতে লাগিলা প্রজল্পনে।
মধুকর উপদেশে, উদ্ধবের প্রতি ভাষে,
ব্যাজ স্তুতি নিন্দা সুবন্ধনে ॥
অসংখ্য ভাব বৈচিত্রী, দুস্তর সে চমৎকৃতি,
চিত্রজল্প দশা সুনিশ্চয়ে।

যদ্যপি নাহিক পার, অতিশয় সুবিস্তার,
সংক্ষেপার্থ করি নিবেদিয়ে ॥
দশ অঙ্গ চিত্রজল্প, প্রথমতঃ সে প্রজল্প,
দ্বিতীয়ে পরিজল্পিত নাম।
তৃতীয়ে যে আজল্প, চতুর্থে সে উজ্জল্প,
সংজল্প পঞ্চম অঙ্গাখ্যান ॥
অবজল্প ষষ্ঠে মত, সপ্তমে অভিজল্পিত
অষ্টমে আজল্প কহি যারে।
নবমে যে প্রতিজল্প, দশমেতে সে সুজল্প
দশমে ভ্রমর গীতাসারে ॥

প্রথম শ্লোকের আস্বাদন

স্বপদ কমল, সৌরভ চঞ্চল; ভ্রমত ভ্রমরা হেরি।
তহি প্রতিজল্পতি, দিব্যোন্মাদবতী, শ্রীবৃষভানু কিশোরী ॥
তুমিত মধুপ, মধুপুরাধিপ, তোমারে কে দূত কৈলা।
পীতাম্বর সখ, প্রেমাস্বমুরুখ, ব্রজপুরে কেনে আইলা।
শুনহে মধুপ, ধূর্ত্তজন বন্ধু, তোরে নিষেধিয়ে আমি।
কিতব বচনে, মোসবা চরণে, পরশ না কর তুমি ॥
যদি কর মনে, হেন কহে কেনে, কৃষ্ণের ধূর্ত্ততা কিবা।
সেইত বচন, কহিব এখন, সাবধানে মন দিবা ॥
বৃন্দাবনবাসে, আপনি সে ভাষে, মুঞিতো সবার ঋণী।
গমনের কালে, দূতদ্বারে বলে, তুরিতে আসিব আমি ॥
এতেক কহিয়া, রহে পাশরিয়া, প্রবঞ্চক অতিশয়।
অতএব তারে, ধূর্ত্ত কহি তোরে, বৃথা দুঃখ উপজয় ॥
এত সব শুনি, বন্ধু দোষ মানি, পুনরপি তুমি কহ।
তোমার চরণে, করিতে প্রণামে, কি কারণে নিষেধহ ॥
তবে যে বচন, কহি তাহা শুন, পুষ্পরসে মাতোয়াল।

পরশিলে যাঙ্গ, হৈব অপবিত্র, এ লাগি কহিয়ে তোরে।
যদি নমস্কারে, থাকে প্রয়োজন, তবে কহ যাই দূরে॥
যদি কহ অয়ি, কৃষ্ণপ্রিয়ে ময়ি, মিথ্যা অপবাদ দেহ
পুষ্পরস খাই, কভু ছুষ্ট নহি, মাতাল কেমনে কহ॥
তাহার কারণ, কহিব এখন, শুনি বিচারহ মনে।
পরিবাদ নহে, সহজ কহিয়ে, মাতাল সমান গুণে॥
সপত্নী-কুচে ত, কৃষ্ণ বক্ষঃধৃত, বিলোলিতা যেই মালা।
কুচযুগে করি, কৃষ্ণবক্ষে ধরি, কিবা বিমর্দ্দিত ভেলা॥
তাতে সব কুচ, কুঙ্কুম সংযুত, মালার সৌরভ পাঞা।
তার মধুপানে, হৈয়া মাতোয়াল, এথা আইলা দূত হৈয়া॥
সেইত কুঙ্কুম, চিহ্ন পীতিম, দেখিয়ে তোমার মুখে।
ও মুখে চরণে, ছুঁইবে কেমনে, তেঞি নিষেধিয়ে তোকে॥
আমরা মানিনী, এই তত্ত্ব জানি, প্রসাদন লাগি আইলা।
সে কুচ কুঙ্কুম, বিনা প্রক্ষালন, না বুঝিয়া দূত হৈলা॥
বিবেক অভাবে, হেন কৈলা যবে, সে মদ্যপান লক্ষণে।
তোর দরশনে, বাঢ়ে আর মানে, বিচারি দেখহ মনে॥
যদি কহ শুন হও পরসন্ন, যৈছে তৈছে হই আমি।
শুন হে মধুপ, মদ্যের পালক, মধুপুরে যাও তুমি॥
নিজ প্রভু পেয়, সেই মদ্য পাক্য, পিব তাহা নিরবধি।
সে কর্ম্ম করণে, দূত প্রকরণে, তোমার সে হয়ে বিধি।
যদি কহ মোরে, কৈলে তিরস্কারে, চলি যাব মধুপুরে।
আপনে আসিয়া, গোপেন্দ্রনন্দন, প্রসাদন করু তোরে॥
তাহার কারণ, শুনহ এখন, সে কেনে সাধিবে মোরে।
নানা অনুসন্ধানে, করিয়া সাধনে, যবে ছিল ব্রজপুরে॥
ব্রজে ব্রজেশ্বরী, গর্ভজাত হরি, ব্রজেন্দ্র নন্দন সেহোঁ।
ভাগ্যবশ হৈতে, ক্ষত্রিয় কুলেতে, মধুপতি হৈল তিহোঁ॥
অতএব মানিনী, ক্ষত্রিয় রমণী, গণের প্রসাদ বহু।

মধু স্ত্রী অগণ্যা, রূপ গুণ ধন্যা, সদাই বিহার করে।
একের সহিতে, বিহার করিতে, অন্য মনে মান ধরে॥
তার প্রসাদনে, মানবতী আনে, তারে প্রসাদন করু।
প্রবাহ রূপেতে, সবার সহিতে, সে মধুপতি বিহরু॥
তাহাতে এখানে, করিতে গমনে, অবসর নহে তাঁর।
অথবা এখানে, গোপাঙ্গনাগণে, কিবা প্রয়োজন আর॥
যদি কহ পুনঃ, করি নিবেদন, কৃষ্ণপ্রিয়ে দেবি রাধে।
তুমি সেই হরি,-প্রিয়া সর্ব্বোপরি, সব সৌভাগ্যের নিধে॥
যদি বা তোমাতে, নহে তার চিত্তে, তবে কেন তিঁহো মোরে।
এই ব্রজপুরী, পাঠাইলা হরি, সাদন করিতে তোরে॥
তবে কহি শুন, অতি বিলক্ষণ, যার দূত তোমা হেন।
যাদব-নাগরী, রতিচিহ্নধারী, যদুসভাবিড়ম্বন॥
যাহা সভাকার, পতিব্রতাসার, সে কৃষ্ণ করই নাশে।
ব্যক্ত হবে যবে, যদুগণে তবে, বিড়ম্বিবে সুবিশেষে॥
তুমি যার দূত, তুমি এ অদ্ভুত, যদুর দেশের দোষে।
যাদব রমণী, কৃষ্ণভোগ্যা জানি, নিন্দা হৈবে সর্ব্বদেশে॥
স্নেষেত কহত, তুমি যার দূত, ঈদৃশ সে মধুপতি।
মধুনামিতি, মদ্যানাং পতি, মদ্যপ নিশ্চয় অতি॥
যে মদ্য বিক্ষেপে, তোমা হেনরূপে, ভ্রমরেরে দূত কৈল।
সে হরি যেখানে, যাহ সেইখানে, তোরে এ বচন বৈল॥
কিতবের বন্ধু, মধুপ কহিতে, প্রথমে অসূয়া হৈল।
সপত্নীর কুচ, কুঙ্কুম বলিতে, ঈর্ষাভাব উপজিল॥
আমার চরণ, না কর স্পর্শন, এই অহঙ্কার হয়।
মথুরা নাগরীগণ প্রসাদউ, মুদ্রাবধীরণে কয়॥
যদুসদসিতি, বচনে বদতি, প্রিয় অকৌশলোদ্গার।
চিত্রজল্প হেন, শুন শ্রোতাগণ, প্রজল্প আখ্যান যার॥
শ্রীনন্দনন্দন, সদা নিমগণ, রাধাভাব গুণমতি।

এই মত চিত্রজল্প আর নব অঙ্গে।
নব শ্লোকে কহে নানাভাব রসরঙ্গে ॥
অন্ত কি কহিব যাহা উদ্ধব আপনে।
কৃষ্ণ যারে আপন সমান করি মানে ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা বাখানয়ে যেঁহো।
ব্রজাঙ্গনার ভাব প্রেম না বুঝয়ে তেঁহো ॥
যদবধি দশ অঙ্গ কৈল প্রজল্পন।
অতি চিত্র চমৎকার করিয়া শ্রবণ ॥
শ্রীরাধার প্রেমভাব তরঙ্গ লহরী।
সর্ব্বভাবামৃতশ্রেষ্ঠ অতি চমৎকারী ॥
সে তরঙ্গ হিল্লোলে উদ্ধব নিমগনে।
আপনারে রক্ষা করে অনেক যতনে ॥
যোগজ্ঞান-সংপুটে সঙ্কেত যে আনিল।
মহাভাব-ত.ঙ্গে বহিয়া কাঁহা গেল ॥
কৃষ্ণপ্রিয় উদ্ধবের যাতে চমৎকার।
সে ভাব তরঙ্গ বর্ণে যোগ্যতা কাহার ॥
রাধিকার চিত্রজল্প করিতে শ্রবণে।
কৃষ্ণ মধুকররূপে কহে মহাজনে ॥
কৃষ্ণপ্রতি করে যেই তাড়ন ভৎর্সন।
তার ভাব বর্ণিবে এমত কোনজন ॥
সেই প্রেমভাবগণে করি নমস্কার।
সংক্ষেপে কহিল কিছু না কহিল আর ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দ (কিশোর) দাস ॥

মন্তব্য ও সংবাদ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ সম্বন্ধে একটি কথা—শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য্য কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ একটি বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। এই গ্রন্থ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়া বাহির করিয়াছেন। "ভ্রমর গীতা" লিখিবার সময় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি দেখিলাম। দেখিয়া এতই দুঃখিত হইয়াছি, যে তাহা সকলকে না জানাইয়া পারিলাম না। শ্রীমদ্ভাবগত-শাস্ত্র সামান্যমাত্রও জানেন, এমন কোন লোক এই পাণ্ডুলিপি দেখেন নাই। ৬৮ চরণ মাত্র আমরা পড়িলাম, আর সিউড়ি রতন লাইব্রেরীর একখানি পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেশের কাজ করিব বলিয়া জনসাধারণের নিকট টাকা লইয়া সেই টাকা খরচ করিয়া কাজ করিবার সময় আমরা কি প্রকারে কাজ করি, তাহার একটা খুব বড় নমুনা এই গ্রন্থখানি। এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের অবসর নাই। দেশের একটা ভবিষ্যৎ আছে, আজকাল ইহা মনে রাখা উচিত। এই গ্রন্থখানি ভাল করিয়া ছাপাইয়া পরিষৎ নিজেদের ক্রটি স্বীকার করুন। এখন অনেক বিষয়েই প্রায়শ্চিত্ত করার দিন আসিয়াছে।

আমরা যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার দ্বিতীয় চরণে 'কম্পিয়া' স্থানে সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থে আছে 'কম্পিয়া'। ৪র্থ চরণে 'মুখলোম' স্থানে আছে "মুখলোপ"। ৭ম চরণে 'মিত' স্থানে আছে 'মত'। ২৩শ চরণে 'ভ্রমর' স্থানে আছে 'মরেত'। ৩৭শ চরণে 'বাণি' স্থানে আছে "রাণি"। আর অধিক দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

পাগল বাবা শ্রীমৎ হরনাথ ঠাকুরের তিরোভাব—গত ২৫শে মে, বাঙ্গালা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, সুবিখ্যাত পাগল হরনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে তাঁহার জন্ম হয়; তিনি বি, এ, ক্লাস্ পর্যন্ত পড়িয়া কিছুদিন কাশ্মীর রাজ্যে কার্য্য করিয়াছিলেন। নিজ গ্রামেই তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। ইংরাজী দৈনিক কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছে।

His life-long attempt was to enliven his countrymen with the sweet

message of Lord Gouranga, preaching amongst them Nam—Prem. His warmest love for the untouchables was uncommon. His religious teachings couched in sweetest language soothed care-worn hearts of worldly sufferers. He has millions of followers all over India, bound one another in a common tie of affection. In his demise the country suffered an irreparable loss. Amrita Bazar Patrika.

দেশবাসী নরনারীকে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুরবাণী শুনাইয়া নবজীবনে উদ্বোধিত করাই, তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টা ছিল। তিনি জনসাধারণের মধ্যে নাম ও প্রেম প্রচার করিতেন। অস্পৃশ্যগণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভালবাসা ছিল। অতি মিষ্টভাষায় তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, সংসারসন্তপ্ত জনগণের হৃদয় তাঁহার কথায় জুড়াইয়া যাইত। সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার সহস্র সহস্র ভক্ত আছে; এই ভক্তগণ প্রেমসূত্রে বদ্ধ। তাঁহার তিরোভাবে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মাচার্য্যগণের ক্রিয়া বুঝিবার মত লোকমত গঠিত হয় নাই। রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলন-সমূহ যে-প্রণালীতে চলিতেছে, তাহা নিতান্তই বহির্মুখী। কাজেই বহুসংখ্যক নরনারীর হৃদয়ের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারিত করিয়া যাঁহারা মানুষের প্রকৃত জীবন গঠন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এযুগে নানারূপ অবিচার হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমান যুগেরই বা দোষ কি, সকল যুগে এবং সকল দেশে মানবের প্রকৃত বন্ধু ধর্ম্মাচার্য্যগণ নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

আমাদের কাগজের ৮—৫ সংখ্যায় ঠাকুর হরনাথের বিরুদ্ধে লিখিত এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন ঠাকুর জীবিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় ঐ পত্রখানি ছাপা হইতে হইতেই ঠাকুর চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের সাধনার দ্বারা ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হইবে; তিনি তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে এক, তিনি তাঁহার ভক্তগণের জীবনে এখন বাস করিতেছেন। সংবাদ-পত্রের আলোচনার কোনই মূল্য নাই। তবে মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বিরুদ্ধ-মতও জানা দরকার, এই কারণেই ঐ পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমরা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সেরপুর হইতে বগুড়া-সহরে আসিয়া সন্ধ্যার পর পাব্লিক্ লাইব্রেরীতে খবরের কাগজে তাঁহার তিরোভাবের বার্ত্তা পড়িলাম ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। এবার মেদিনীপুর সহরে ঠাকুরের জন্মোৎসবের আয়োজন হইতেছিল, আমাদেরও ইচ্ছা ছিল সে সময় মেদিনীপুর যাইতে। কাজেই খুব দুঃখিত হইলাম। মেদিনীপুরে জন্মোৎসব আর হইল না, ঐ ব্যয়ে বিরহোৎসব হইল। মেদিনীপুরে ঠাকুরের যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের মধ্যে এমন ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সাধু-

প্রকৃতির লোক আছেন, যে তাঁহাদের ভাব দেখিলেই ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয়। সংবাদপত্রের আলোচনা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার।

শিলং হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু সারদাচরণ ধর মহাশয় ৮ই আষাঢ় তারিখে এক পত্র লিখিয়াছেন,—"বীরভূমিতে দেশের সমক্ষে বর্ত্তমান সমস্তাগুলির আলোচনা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। লোকশিক্ষার জন্ম এগুলির আলোচনা সকল পত্রিকাতেই হওয়া উচিত। উপস্থিত ফাল্গুন সংখ্যাতে পাগল ঠাকুর হরনাথসম্বন্ধে বিরুদ্ধ উক্তি দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি অধুনা পরলোকগত; তাহাতে অধিকতর দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।"

আমাদের কৈফিয়ৎ আমরা দিয়াছি, আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও ভালরূপ আলোচনা করিতে পারিব।

ঠাকুর হরনাথের শেষ পত্র—২৫শে মে ১৯২৭, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, বুধবার, কৃষ্ণা নবমী, রাত্রি ৯টার সময় ঠাকুর হরনাথ তাঁহার জন্মভূমি বাঁকুড়া জেলার সোণা-মুখী গ্রামে অপ্রকট হইয়াছেন। গত বৎসর তাঁহার যখন জন্মোৎসব হয়, সেই সময়ে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে ইংরাজী ভাষায় এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পত্রখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু ভক্তগণ তাহা প্রচার করেন নাই। তাঁহার তিরোভাবের পর মেদিনীপুর-উৎসবে উহা মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উহার বঙ্গানুবাদ করিলাম।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানবাসী আমার অতি-প্রিয় পিতামাতাগণের প্রতি—

আজ আমার হৃদয়ে এক মহা ঝড় উঠিয়াছে। পাগলের মনে পলে পলে নানা চিন্তা উঠিতেছে, আর অসীম সাগরে মিলাইয়া যাইতেছে। আমি এমন কোন শক্তির সন্ধান কখনও জানি নাই, এখনও জানি না, যাহার সাহায্যে এই সব চিন্তা কথায় কিম্বা লেখায় ব্যক্ত করা যায়।

একটি গুপ্ত কথা শোন। আমার লুকাইবারও কিছু নাই, না দেওয়ারও কিছু নাই। আমি সব দিব। আমি যখন স্বেচ্ছায় বাঁধন পড়িয়াছি, তখন আর দড়ি প্রভৃতির দরকার কি? তোমরা যখন একবার আমাকে ধরিয়াছ তখন ধরিয়াই থাক, মনে রাখিও ইহা লীলাময়েরই লীলা।

এই বাহ্য জগৎ আমার অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ। কালের প্রারম্ভ হইতে অভিনয়ের জন্য আমি এই রঙ্গমঞ্চে আসিতেছি।

সম্প্রতি আমার মন, আর মনের সঙ্গে দেহ, ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। জানি না এরূপ অবস্থা কতদিন চলিবে। আর আমি চারিদিকের এই বাঁধন সহিতে পারি না। খেলা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে; আর, ইহাতে আমোদ পাইতেছি না। নূতন দেশে নূতন খেলার জন্য আমাকে এখন

প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি যদি থাকিয়া যাই, ভাল ; আর যদি চলিয়া যাই ক্ষতি নাই। আমার সাধ, জন্মে জন্মে আমি তোমাদের হই, আর তোমরা আমার হও।

এখন ধর্ম্মজগৎ গভীর আঁধারে ডুবিয়া যাইতেছে। এই কারণে যাঁহারা খুব বিচক্ষণ লোক, তাঁহারাও একটা ভুল আলো দেখিয়া, সেই আলো-কে সত্য মনে করিয়া শান্তির আশায় তাহারই পিছনে ছুটিতেছেন। পরে তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিবে আর তাহারা দ্বিগুণ আঁধারে ও দ্বিগুণ দুঃখে পতিত হইবে। কাজেই ইহা সঙ্গত, যে তোমরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

তোমরা যখন আমার আপনার, তখন আমার যাওয়া আসার কথা ভাবিও না। আমার আবার আবির্ভাব তিরোভাব কি ? যাদুকর-সম্বন্ধে কি বলিতে পার, যে সত্যই সে চলিয়া গেল ? যদিও শত শত দর্শকের সম্মুখে সে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল, শত শত দর্শকের চোখে ধূলা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সত্য কথা, যাদুকর সব সময়েই দর্শকদের মধ্যে আছে, কিন্তু কেহই তাহা ধরিতে পারে না। আমার আবির্ভাব-তিরোভাবও ঠিক্ সেইরূপ। ইহা কি খুব আশ্চর্য্যজনক ? অথচ, এই সোজা কথা, অনেক বিজ্ঞের কাছেও অমীমাংসিত প্রহেলিকা।

যে অভিনেতাকে তিনবার আসরে নামিতে হইবে, সে একবার বা দুইবার দেখা দিয়া একেবারে রঙ্গস্থল ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সে কেবল পোষাক বদ্‌লায় ; সকলের মধ্যেই বসিয়া থাকে, সময় যখন হয় যথাযুক্ত সাজ পরিয়া নিজের ভূমিকার অভিনয় করে। অভিনেতা পোষাক বদ্‌লাইয়া যখন বসিয়া থাকে তখন দর্শকেরা তাহাকে চিনিতে পারে না, কিন্তু দলের লোকেরা তাহাকে চেনে। সে যে সাজেই থাকুক, দলের সকলেই ঠিক চিনিতে পারে। কাজেই যাহারা তিরোভাবের কথা বলে, তাহারা অন্তরঙ্গ নহে।

তোমরা আমার আপনার, তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনই কারণ নাই। তোমরা সুখে থাক ; তোমাদের সুখ দেখিয়া আমি চলিয়া যাইব। তোমরা আমার ; তোমরা প্রত্যেকেই আমার সজীব সংবাদ। কাজেই আমার ইচ্ছা, তোমরা ষোল আনা পবিত্র হও।

নিজের স্বামী ছাড়িয়া অন্যের সেবা করিও না। তাহার ভালবাসা চোখের, হৃদয়ের নহে। তাহার ভালবাসা মাত্র দুদিনের। তাই বলি দুদিনের ভালবাসায় সারাজীবনের সুখের অপচয় করিও না। স্বামীর পরম প্রিয় হইয়াই থাকিও।

যাহা থাকিল, তাহাই লইয়া নিজের নিজের কাজ কর—ইহাই আমার শেষ ইচ্ছা।

একখানি মূল্যবান্ পত্র—স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদয়াল গুপ্ত শর্ম্ম মহোদয় আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। 'বীরভূমি'র এক সংখ্যায় "বৈদ্য" নামক পুস্তকের সমালোচনায় এবং নব্য-অবতার-বাদ-প্রসঙ্গে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহারই সম্বন্ধে এই পত্রখানি

লিখিয়াছেন। পত্রের প্রত্যেক কথাই আমার অনুমোদিত এবং স্বীকার্য্য। উত্তর দিবার মোটেই কিছু নাই। পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

"আপনার সঙ্গে যখন প্রথম আমাদের গ্রামে (বিক্রমপুর, বাহেরক) দেখা হয় তখন হইতেই আপনাকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছি এবং এই জন্যই প্রকাশ্য প্রতিবাদে আমার রুচি নাই।

আপনি যেভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, আপাততঃ যে সমুদায় বিষয় একটু রুচি বহির্ভূত তাহাও আপনি যেরূপ সুন্দরভাবে আমাদের মনের সম্মুখে ধরিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমাদের স্বতঃই মনে হইত যে আপনার দৃষ্টি জাতিগর্ব্বের বাহিরে। আপনি যখন কৃষ্ণকথা শুনান তখন একবারও মনে হয় না যে আপনি শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জন্য বলিতেছেন। তখন কি আপনি আচণ্ডাল জনসাধারণকে ভক্তিমার্গে প্রেরণ করিতে চাহেন না? তখন কি জনসাধারণ, এমন কি প্রাণি সাধারণের মধ্যে যে আত্মা সর্ব্বতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার কথা বলেন না? যদি তাহা হয় তবে আপনার পত্রিকায় জাতিতত্ত্বের মীমাংসার স্থান কোথায়?

বাস্তবিক যখন আপনার পত্রিকা পাঠ করি, অথবা আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করি, তখন মনের সকল দৈন্য চলিয়া যায়, তখন মনে থাকে না আমি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, তখন মনে থাকে না আমি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, তখন মনে থাকে না আমি কে, শুধু মনে হয় আমি বিশ্বপ্রাণের এক ক্ষুদ্র অংশ। আমিও আমার ক্ষুদ্র কুঞ্জবনটি সাজাইতে আসিয়াছি ; ভক্তির বল নাই, সাধুর কৃপা হয় নাই, সেও আসে নাই ময়ূর ময়ূরী শুক শারী আসে নাই, তাই বিশ্বপ্রাণ পদার্পণ করেন নাই। মালা গাঁথা হয় নাই, বিরহ জাগে নাই, না জানি কতকাল এই শুষ্ক কুঞ্জদ্বারে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব। তবে ভরসা আছে একদিন আমারও ডাক পড়িবে। আমার কুঞ্জেও ফুল ফুটিবে। আমার কুঞ্জেও মদনমোহন আসিবেন।

কিন্তু হায় একি আপনি আবার জাতির কথা শুনাইয়া আমাকে বিব্রত করিতেছেন কেন? তবে কি জাতি হিসাবে ভগবানের আসনে ভোজনের ব্যবস্থা হইবে? হয়তো আপনার কথা আমি বুঝিতে পারি নাই—

বলিবেন জাতি বিভাগ হিন্দু সমাজের অঙ্গ। তাহা জানি, কিন্তু জাতি সমস্যা তো আপনার প্রচারের অঙ্গ নয়। এই জন্যই আপনার পত্রিকায় ঐ সব দেখিয়া দুঃখ হয়। আপনি হয় তো এই বিষয় নিয়া তর্ক করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং আমি জানি আপনার মত একজন পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী, বক্তার নিকট আমার তর্কে পরাজয় সুনিশ্চিত, কিন্তু তর্ক এক কথা আর অনুভব আর এক কথা। আপনি আমাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারিলেও আমার অনুভূতির অসত্যতা প্রতিপাদন করিতে পারিবেন না। আর বাস্তবিক এখন কি জাতি ভেদ আছে? আছে কেবল জাতি জাতি করিয়া

আমরা সেই গর্ব্বে পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া মানবাত্মাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। হয় তো অতি প্রাচীন কালে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ বিভিন্নরূপে শিক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেন বলিয়া তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বহুপার্থক্য থাকিত, কিন্তু বর্ত্তমানে একইরূপ শিক্ষাদীক্ষা, চলা ফেরা, অশন বসন লাভ করাতে সকল শ্রেণীর লোকদের মাঝেই মানবাত্মার একই রূপ স্ফুরণ লক্ষিত হয়। এইরূপ সমাজে ধর্ম্মের সঙ্গে জাতির কোথাও মিলন নাই, সুতরাং আপনার পত্রিকায় ঐ সমুদায় দেখিলে দুঃখ হয়।

যে সকল লোক জাতি-বিরোধ নিয়া মজা দেখিতে চায় তাহারা যাহা ইচ্ছা করুক, আমি তাহাতে কিছু মনে করি না। শুধু আপনার পত্রিকায় এসমুদায় অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে আলোচনা হউক ইহাই প্রার্থনা করি। জানিনা হয় তো আমার এইরূপ ইচ্ছা ধৃষ্টতা মাত্র। হয় তো আমার বুঝিবার ভুল। ৺ভগবান করুন যেন তাহাই হয় - কিন্তু মনে হয় সংপ্রতি আপনার দৃষ্টিও নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতেছে।

আপনি বহুবার বলিয়াছেন জগৎকে আপনার দিক হইতে দেখিতে। প্রথমতঃ রাজা পরীক্ষিৎ ও বৃষের উপর অত্যাচারকারীর কথা বলিয়া বলিয়াছেন যে সর্ব্বদাই আপনাকে পরীক্ষা করিবে। জগতের দোষ না আমার নিজের কর্ম্মের দোষ। বলিয়াছেন এই প্রকার দোষ দর্শনে আত্মার উন্নতি হয়। অন্ততঃ আমি এরূপই বুঝিয়া ছিলাম।

কিন্তু আপনি সম্প্রতি কতিপয় অসৎ গুরুর বা ধর্ম্মব্যবসায়ীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া "ধর্ম্মজীবন" ব্যাখ্যা করিতেছেন (বীরভূমি মাঘ ১৩৩৩) আমরা ইহা হইতে কি বুঝিব?

আমি নিজে এইরূপ কোন গুরু বা অবতারের শিষ্য বা পূজক নহি। আসল বাদ দিয়া নকলটাকেও নিতে চাহি না। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে আপনি যদি ঐরূপ ব্যবসায়ীর দোষ দর্শন না করাইয়া, কিরূপে, নিজের দিক হইতে, আত্মপরীক্ষার দ্বারা, প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইতেছে কি না তাহার পরীক্ষা করা যায় তাহাই বলিতেন, তবে আমার মনে হয় এর চেয়ে ভাল হইত। ঐ সব গুরু নিজের কর্ম্মে নিজেই ডুবিবে। আর যাহারা ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া গড্ডলিকা প্রবাহে চলিতে অভ্যস্ত সেই সব অন্ধকে বলিলেও তাহারা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। তার চেয়ে বলুন, কিরূপে পরীক্ষা করিব পকৃত ধর্ম্ম লাভ হইতেছে কি না। বলুন কোন কোন অপরাধ ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া আসিয়া আমাদিগকে প্রতারণা করে। বলুন কিরূপে তাহাদিগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। রাম ও লক্ষ্মণকে তো আমার হৃদয়ের শিবিরে রাখিয়াছি। অন্য কাহাকেও সেখানে প্রবেশ করিতে দিবনা। কিন্তু মহীরাবণ যখন বিভীষণের রূপ ধরিয়া আসিবে তখন তাহাকে চিনিব কিরূপে? মহীরাবণের দোষ শুনিতে চাহিনা, আমার আত্মরক্ষার কবচ কি তাহাই বলুন।"

"জাত" এর গরব—'সঞ্জীবনীর' মত 'হিতবাদী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কিছু মন্তব্যও দেওয়া হইয়াছে। বেশ লাগিল বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

'সঞ্জীবনী'র জ্ঞানবৃদ্ধ বহুদর্শী ও দূরদর্শী সম্পাদক লিখিয়াছেন; "কায়স্থ বলিতেছেন আমি ক্ষত্রিয়, আমার উপবীত চাই। বৈদ্য বলিতেছেন আমি ব্রাহ্মণ, আমারও উপবীত-ধারণ ও দশাহ অশৌচ-পালনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। নমঃশূদ্র বলিতেছেন আমি বৈশ্য, আমারও উপবীত না হইলে চলে না। মালো প্রমাণ করিতেছেন আমি মল্লবর্ম্মণ ক্ষত্রিয়; আমি উপবীত স্কন্ধে ধারণ করিব। সকলেই ঐ উপবীত ও দশাহ অশৌচের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ নামের শেষে শর্ম্ম লিখিতে চাহেন। কারণ শর্ম্মা হইলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। কি শোচনীয় ভ্রম! শিক্ষায় উন্নত, চরিত্রে শক্তিমান, কীর্ত্তিতে পূজনীয়, জনসেবায় সম্মানিত, ধর্ম্মাচরণে মহৎ হইবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা তুচ্ছ বাহ্যিক চিহ্নের জন্য লালায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের সাজ পোষাক পরিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। অপূর্ব্ব তপস্যায় বলীয়ান বিশ্বামিত্রকে মহর্ষি বশিষ্ঠ সহজে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।" ব্রাহ্মণের হীনতার অনুকরণ করিতে অগ্রসর অনেকেই হইতেছেন, কিন্তু তপস্যা ও সদাচারের অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণত্বলাভের সংকল্প ত' কেহই করিতেছেন না। বীরত্বের দ্বারা, আত্মত্যাগের দ্বারা, বিপন্নের ত্রাণ দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের চেষ্টা কোথায়?

"সঞ্জীবনী" বলিতেছেন "যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারা উপবীত ধারণ না করিয়া তরবারি গ্রহণ করুন, যাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা উপবীত ছাড়িয়া শিল্প ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করুন, নিজ নিজ চরিত্রকে পবিত্রতায় ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল করুন। তবেই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইবে। আজ একটী নির্য্যাতীত নারীকে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা অঙ্গুলিটীও উত্তোলন করিতে পারেনা, তারা উপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় নাম জাহির করিতে চাহে কোন্ লজ্জায়? যাহাদের দেশে গরু নাই,—শস্য নাই, তাহারা নিজেদের বৈশ্য বলিয়া প্রচার করে কোন্ মুখে?" যাঁহারা দীক্ষামাত্র ছলে যাত্রাদলের সঙের ন্যায় কপট ব্রাহ্মণ বা দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ সাজিতে চাহেন, গৈরিকের সাহায্যে সন্ন্যাসী সাজিতে চাহেন বা অস্ত্র আইনের ভয়ে অসিজীবী ক্ষত্রিয় না হইয়া মসীজীবী ক্ষত্রিয় সাজিতে চাহেন "সঞ্জীবনীর" এই কষাঘাতে কি তাঁহাদের চৈতন্যের সঞ্চার হইবে? এই সমাজ বিপ্লবকর উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজের কি ভীষণ ক্ষতি হইতেছে তৎসম্বন্ধে "সঞ্জীবনী" বলিতেছেন "নানা স্থানে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সভা সমিতি হইতেছে। তাঁহারা সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে, ইউনিয়ন বোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কাউন্সিলে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে চাহেন। নমঃশূদ্র নমঃশূদ্রকে ভোট দিবে, সাহা সাহাকে ভোট দিবে, রাজবংশী রাজবংশীকে ভোট দিবে এইরূপই যদি নিয়ম হয়,

তবে আমরা বলিব বাঙ্গালী জাতি ভেদবুদ্ধিতে শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল—আর তার দাঁড়াইবার শক্তি কোথায়?

মতভেদ—'বীরভূমি'র যে-সংখ্যায় নব্য অবতারবাদের প্রসঙ্গ আছে, সেই সংখ্যা পড়িয়া একজন সুশিক্ষিত সুলেখক বন্ধু একপত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার নাম এখন গোপন থাকিবে অনুমতি পাইলে প্রকাশ করিব। তাঁহার পত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইংরাজীই উদ্ধৃত হইল। ইচ্ছা করিয়াই বাংলা করিলাম না।

"I am so glad to read this issue of বীরভূমি। Your application of science to Religion, your liberal outlook to Hindu-Moslem problem and your equally liberal references of Rammohan cannot but command respect of any and every thinking man. 'বাঙ্গালার নব্য অবতারবাদ' is really a great and grim social development. You have done a great service by publishing it. I wish you pass your remarks on it boldly. I know a bit of this sort of institutions. In a sense, Bijoy Kr. Goswami and even Ram Kr. Vivekananditics are not free from being responsible for this sort of cheap Guruism."

এসম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার তাহা নির্ভয়েই বলা হইবে, তবে ক্রমে ক্রমে। কারণ কথা অনেক।

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৮—৯

পৌষ, ১৩৩৪

পূতনা-মোক্ষণ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

ভাগবতধর্ম্ম

প্রথম ভাগ

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগতরত্ন
প্রণীত

মূল্য এক টাক মাত্র

সিউড়ী পোঃ—বীরভূম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ১১টী প্রবন্ধে, ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের নিত্যত্ব, ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুবক্তা ও সুলেখক। আলোচ্য বিষয়েও তিনি যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকার যে প্রণালীতে ভাগবতধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ইহা যে ভক্তগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ভাবে এই আলোচনা করিলে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যগণের নিকট বিষয়টী প্রীতিপ্রদ হয়, গ্রন্থকার তাহা জানেন। সুতরাং, গ্রন্থখানি এই সম্প্রদায়েরও প্রিয় হইবে। আমরা ইহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি

—হিতবাদী ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

পূতনা-মোক্ষণ

১। তপোবন ও বৃন্দাবন

তপোবন সাধনা, বৃন্দাবন সিদ্ধি। তপোবনে অন্বেষণ, আর বৃন্দাবনে প্রাপ্তি।

শ্রুতি বলিতে বেদকে বুঝায়। এই বেদ, অনেকগুলি বিদ্যার সমষ্টি—যেমন মধু-বিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভৃগুবারুণীবিদ্যা প্রভৃতি। এই সমুদয় বিদ্যার মধ্যে যাঁহারা মুখ্যরূপে আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম, মধুব্রহ্ম ও প্রিয়ব্রহ্মের অন্বেষণকারিণী, তাঁহারাই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রুতিচরী গোপী।

তপোবন অন্বেষণ, আর বৃন্দাবন প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি দুই প্রকার। অনিত্যের প্রাপ্তি বা প্রাপ্তির বোধ,— পাইয়াছি বলিয়া মনে করা কিন্তু সত্য করিয়া পাওয়া নহে। সংসারী লোক আমরা, আমরা ইহাকেও 'প্রাপ্তি' বলিয়া থাকি। এই 'প্রাপ্তি' কংসের স্ত্রী, ইনি কাম জগতের; ইনি ছায়া। 'প্রাপ্তি'র সঙ্গে অস্তি থাকেন। 'অস্তি' কথার অর্থ 'আছে'। 'অস্তি'র বোধ না হইলে 'প্রাপ্তির' বোধ হয় না। 'আগে হওয়া বা থাকা', তাহার পর পাওয়া। প্রথমে সৎ বা সত্ত্বা, তাহার পর চিৎ বা সত্ত্বার জ্ঞান; এই জ্ঞানের প্রকৃত পূর্ণতারই নাম আনন্দ। এই চিদানন্দই প্রাপ্তি। কংসপুরে যেমন প্রাপ্তির একটা ছায়া বা আভাস আছে, তেমনি অস্তিরও একটা ছায়া বা আভাস আছে। এই জন্য কংসের দুই স্ত্রী, অস্তি ও প্রাপ্তি। এই দুই শক্তি লইয়াই কংস ;—সে সত্যের বা নিত্যজীবনের একটা ছায়া লইয়া খেলা করিতেছে ও মরিতেছে। ইহারই নাম ভব ; ইহাই বাহির। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—"বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা"। অস্তি ও প্রাপ্তি, বা তাহাদের আভাস লইয়া কংসের যে খেলা, তাহাই বাহির দুয়ারের 'ভব' ; আর ভিতর দুয়ার খুলিলেই 'ভাব' বা বৃন্দাবন।
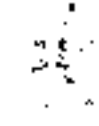
বৃন্দাবনের 'প্রাপ্তি' অন্য প্রকারের। এখানে প্রাপ্তির শেষ নাই। ইহা অশেষের প্রাপ্তি, অনন্তের প্রাপ্তি। এখানে প্রাপ্তি ও আরাধনা এক। এখানে যত পাওয়া, তত না পাওয়া। যতই পাইতেছি, মনে হইতেছে, পাইলাম না। এখানে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। বৃন্দাবন স্বরূপে বিশুদ্ধ ভাব ; কিন্তু প্রকট লীলায়, ভবের সঙ্গে কিছু মেশামেশি আছে।

এই তত্ত্বটুকু মনে রাখিয়া লীলার আস্বাদনে প্রবেশ করিতে হইবে।

২। শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বকথা

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু, কোন্ ঘটনাটি কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া বুঝিতে পারা যায় না। কোন কোন ঘটনা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবন-লীলা যাঁহাদের আরাধনার সামগ্রী বা পরমার্থ, সেই সমুদয় পূজ্যপাদ আচার্য্যগণ, লীলার ঘটনাবলী যে-ভাবে সাজাইয়াছেন, ঘটনাগুলির যে পারম্পর্য্য দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। তাহারও পূর্ব্বে পূর্ব্বকথা কিছু কিছু জানা আবশ্যক। এই কারণে আমরা সেই পূর্ব্বকথা বলিতেছি।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মথুরামণ্ডল যাদববংশের রাজ্য, মথুরানগর তাহার রাজধানী। রাজধানী হইতে কিছুদূরে একটি পাহাড়, তাহার নাম নন্দীশ্বর। ঐ পাহাড়ের অধিত্যকায় এক গোপ বাস করিতেন, তাঁহার নাম পর্জ্জন্য। তাঁহার পিতার নাম ছিল দেবমীঢ়, তিনি ছিলেন যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়। পর্জ্জন্যের মাতা ছিলেন বৈশ্যকন্যা। সেকালে এরূপ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। পর্জ্জন্যের মাতা বৈশ্যজাতি ছিলেন বলিয়া পর্জ্জন্যও বৈশ্য। পর্জ্জন্য পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি নারায়ণের উপাসনা করিয়া অনেকগুলি পুত্র লাভ করেন। কেহ বলেন সাতটি পুত্র, কেহ বলেন পাঁচটি। পর্জ্জন্যের সময়েই কেশী নামক এক দৈত্য নন্দীশ্বরে অত্যাচার করিত। এইজন্য পর্জ্জন্য নন্দীশ্বর ছাড়িয়া মহাবনের ভিতর গোকুল নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। মহাবনেরই

অধ্যায়) তাহার অর্থ 'মহাবন ও মহাবনের অন্তর্গত গোকুল'। এই গোকুলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা।

পর্জ্জন্যের পাঁচটি বা সাতটি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ না হইলেও নন্দ সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম ছিলেন। উপানন্দ নন্দ অপেক্ষা বড়, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর উপানন্দ নিজে রাজা না হইয়া নন্দকেই রাজা করিলেন ও নিজে মন্ত্রী হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উপানন্দের কথা ও তাঁহার মন্ত্রণাদানের কথা আছে। (১০ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়)। তিনি যে নিজে রাজা না হইয়া কনিষ্ঠ নন্দকে রাজা করিয়াছিলেন এবং নিজে মন্ত্রী হইয়াছিলেন, সে-কথা বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় আছে এবং ভক্তমাল গ্রন্থেও আছে।

পর্জ্জন্য গোপের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম শূর ; তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। শূরের পুত্রের নাম বসুদেব। বসুদেবও ক্ষত্রিয়। বসুদেব রাজধানীতে মথুরানগরে বাস করিতেন। নন্দ সম্পর্কে বসুদেবের ভাই। মথুরায় রাজা ছিলেন উগ্রসেন। উগ্রসেনের ভাই এর মেয়ের নাম দেবকী। বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করেন। উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্রের নাম কংস। কংসের মায়ের নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী উগ্রসেনের স্ত্রী। কংস উগ্রসেনের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্যের পুত্র। কংসের প্রকৃত পিতা কে, সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন সৌভপতি, কেহ বলেন দ্রুমিল নামক দৈত্য। কংস জন্মান্তরে হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমি নামক অসুর ছিলেন। বিষ্ণুর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সব কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, কিন্তু জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের রহস্যও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। প্রাকৃত মানবের যে-ভাবে জন্ম হয়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বা আবির্ভাব, সে-ভাবের নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও নহে। একসঙ্গে দুই স্থানে তাঁহার আবির্ভাব ;—গোকুলে ও মথুরায়। গোকুলে যে-পদ্ধতিতে তাঁহার আবির্ভাব হয়, তাহার নাম স্বাপ্নিক বিধান ; এই বিধানে দ্বিভুজ ও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া-সহ প্রথমতঃ নন্দরাজের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। সেখান হইতে শ্রীমতী যশোদা রাণীর

হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে শ্রীমতী দেবকীর হৃদয়ে সংক্রামিত হইলেন। এই যে দ্বিবিধ বিধান, ইহার তত্ত্ব বড়ই গভীর।

মথুরানগরে কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেও তাঁহার বাল্য ও কৈশোর-লীলা গোকুলে ও বৃন্দাবনে। এই সব লীলা, কোন্ সময়ে কোন্‌টি হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় না, আচার্যগণের মধ্যেও কিছু কিছু মতভেদ আছে। যাহা হউক, কিছু জ্ঞান প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণের এই সব লীলা নৈমিত্তিক, ইহা ছাড়া নিত্যলীলার সহিতও পরিচিত হইতে হইবে।

৩। ঘটনাবলী

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রথম ঘটনা **পূতনাবধ**। পূতনারাক্ষসীকে তাহার রাক্ষসী-প্রকৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহাকে সদ্‌গতি দান করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম মাত্র একমাস। পূতনাবধের পর **শকটভঞ্জন লীলা**। তিনমাস বয়ঃক্রমের সময় শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, একখানি গাড়ীর নীচে ঝোল্‌না বাঁধিয়া, শিশুকে সেই ঝোল্‌নায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপরিবর্ত্তন উপলক্ষে নন্দালয়ে উৎসব। শ্রীমতী যশোদা ও অন্যান্য পুরনারী গান করিতেছেন, ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। লোকজনকে খাওয়ানো হইতেছে; বস্ত্র মাল্য ধেনু প্রভৃতি দান করা হইতেছে। সকলেই উৎসবে মত্ত, খুব সমারোহ; এমন সময়ে শিশু তাঁহার চরণ দুইটি যেমন উপরের দিকে তুলিয়াছেন, আর অমনি গাড়ী-খানি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। গাড়ীর উপর ধাতুপাত্রে নানারূপ খাদ্যদ্রব্য ছিল, সে-সব দ্রব্য পাত্রসহ পড়িয়া গেল। শিশুই যে পদাঘাত করিয়া গাড়ী ফেলিয়া দিয়াছেন, ব্রজনারীগণ তাহা মনে করেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন পূতনার আক্রমণের ন্যায় ইহাও এক দৈবদুর্বিপাক। শ্রীমতী যশোদা দুষ্টগ্রহের আক্রমণ মনে করিয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করাইয়া স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে, শকট একজন অসুর, সে ঐ গাড়ীতে লুকাইয়া বসিয়াছিল। শিশুটির অনিষ্ট করিব, তাহাকে মারিয়া ফেলিব, ইহাই ছিল তাহার অভিপ্রায়। সে গাড়ী চাপা দিয়া শিশুকে

ষষ্ঠ মাসে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ। এক বৎসর বয়ঃক্রমের সময় **তৃণাবর্ত্তবধ।** তৃণাবর্ত্ত ঘূর্ণিবায়ুর আকার ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃণাবর্ত্তের পূর্ব্বজন্মের কোন বিবরণ নাই। অন্য পুরাণে পাওয়া যায়, তিনি সহস্রাক্ষ নামক পাণ্ড্যদেশের রাজা ছিলেন; দুর্ব্বাসা ঋষিকে অপমান করায় দৈত্যজন্ম লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহার উদ্ধার হইল।

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম যখন তিন বৎসর তখন মা যশোদা তাঁহাকে উদূখলে বন্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই উদূখলটি টানিয়া দুইটি বৃহৎ ও প্রাচীন অর্জ্জুন বৃক্ষ উৎপাটিত করেন। এই বৃক্ষ দুইটি কুবেরের পুত্র। ইহাদের নাম নলকুবর ও মণিগ্রীব। রুদ্রের অনুচর হইয়া ইহারা অতিশয় অসৎ হইয়াছিল এবং দেবর্ষি নারদের অসম্মান করিয়াছিল। তাহার ফলে ইহারা বৃক্ষজন্ম লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের উদ্ধার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই এই কথা আছে। ইহার পরের ঘটনা এক ফল-বিক্রেয়িণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ।

কিছুদিন পরে বৃদ্ধ গোপগণ পরামর্শ করিলেন নন্দীশ্বরে পুনঃ পুনঃ বিপদ ঘটিতেছে, এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া উচিত। এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহারা যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন অতি রমণীয় স্থান। তাঁহারা কিছুদিন সেখানে ছিলেন, তাহার পর আবার নন্দীশ্বরে ফিরিয়া আসেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন, বৎসচারণ ও **বৎসাসুর** বধ। তৃতীয় বৎসরের শেষাংশে দূরবনে বৎসচারণ এবং **বকাসুর বধ।**

চতুর্থ বৎসরে **অঘাসুর বধ;** অঘাসুর বধের পর **ব্রহ্মমোহন।** পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইলে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ আরম্ভ করেন। ষষ্ঠ বৎসরে **কালিয়-দমন, দাবাগ্নি-মোক্ষণ,** ও প্রলম্ব বধ। সপ্তম বৎসরে **ধেনুকাসুর বধ।** তাহার পর কৈশোর লীলা। সপ্তম বৎসরের শেষাংশে পূর্ব্বরাগ। অষ্টম বৎসরের প্রারম্ভে আশ্বিনে বেণুগীত, কার্ত্তিকে **গোবর্দ্ধন-ধারণ,** গোবিন্দাভিষেক, **বরুণলোক গমন,** ব্রহ্মহ্রদাবগাহন, হেমন্তে **বস্ত্র-হরণ,** গ্রীষ্মকালে **অন্নভিক্ষা,** ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীদের অনুগ্রহ।

বনযাত্রা, ফাল্গুনে শঙ্খচূড়বধ। একাদশ বৎসরের চৈত্র-পূর্ণিমায় **অরিষ্ট বধ**; দ্বাদশ বৎসরে **কেশিদৈত্য বধ** ও পরে মথুরাগমন।

ইহাই সংক্ষেপে শ্রীবৃন্দাবন-লীলা। অনেক কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, ভক্তগণ তাহার আস্বাদন জগৎকে দিয়াছেন। যেমন মানভঞ্জন, দানলীলা, বংশীহরণ, নৌকাবিলাস, মধুপান, সূর্য্যপূজা, কলঙ্কভঞ্জন, সুবলমিলন, গোপীগোষ্ঠ, ঝুলন, প্রহেলিকা, পাশক্রীড়া, কপটনিদ্রা, ফুলদোল, স্নানযাত্রা প্রভৃতি। এই সব লীলা পদাবলী সাহিত্যে বিস্তারিত হইয়াছে।

"শ্রীবৃন্দাবন-লীলামৃত" নামক একখানি পুরাতন ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত হইল। শ্রীবৃন্দাবন-লীলার প্রাথমিক রহস্য উদ্ধৃত অংশে কথিত হইয়াছে।

কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর বয়সে। কৃষ্ণচন্দ্র নিত্যলীলা করিল প্রকাশে॥
ত্রিবিধ বয়স আগে কহি লোকরীতে। কৃষ্ণলীলা বয়ঃক্রম কহিব পশ্চাতে॥
পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার বয়ঃ হয়। দশবর্ষ অবধি পৌগণ্ড সুনিশ্চয়॥
তারপর পঞ্চবর্ষ কহিয়ে কৈশোর। যৌবন অবস্থা পঞ্চদশ বর্ষ পর॥
এবে কহি কৃষ্ণলীলা বয়ঃ অনুক্রমে। ত্রিবিধ প্রকার যথা হয় ব্রজবনে॥
অষ্টমাসাধিক দশবর্ষ ব্রজলীলা। প্রকটরূপেতে নানা বিহার করিলা॥
সামান্য বালক হৈতে রাজার তনয়ে। একবর্ষকালে দেড়বর্ষ জ্ঞান হয়ে॥
ব্রজরাজ তনয়ের তৈছে বয়ঃক্রম। করিব বর্ণন-বিধি যে হয় নিয়ম॥
তিনবর্ষ চারি মাস বাল্যলীলা হয়। অষ্টমাস অবধি পৌগণ্ড বর্ষ হয়॥
তার পর আর তিনবর্ষ চারিমাস। দশবর্ষাবধি হয় কৈশোর বিলাস॥
এই দশবর্ষে পঞ্চদশবর্ষ সম। অষ্টমাসাধিকে ষোলবর্ষ পরাক্রম॥
ইহাতে সন্দেহ নাই শুন শ্রোতাগণ। শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ॥

নন্দকিশোর দাস

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় এক বৎসর দেড় বৎসরের সমান। ব্রজলীলা ১০ বৎসর ৮ মাস। ইহাকে দেড়গুণ করিলে ষোল বৎসর হয়। কৌমার ৫ বৎসর; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌমার ৩ বৎসর ৪ মাস। ইহাকে দেড়গুণ করিলেই ৫ বৎসর হয়। তাহার

৪। প্রকটলীলা—সিদ্ধ ও সাধক

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী গোকুলে যাঁহারা মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সিদ্ধ, আর কেহ সাধক। যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহারা হয় নিত্যসিদ্ধ, না হয় সাধনসিদ্ধ। তাঁহারা নিত্য জীবনের ও নিত্য জগতের লোক, হয় চিরদিনই এইরূপ, অথবা সাধনার দ্বারা এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ রসবস্তু নিত্যই নূতন, সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই নূতন নূতন আকারে তাহা আস্বাদন করিতেছেন। যাঁহারা সাধক,—গোকুলে সিদ্ধ পরিকরগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাধনাও প্রায় পূর্ণাবস্থায় আসিয়াছে, তাঁহারা অবিলম্বে সিদ্ধ কোটিতে প্রবেশ করিবেন। কাল ও মহাকাল, এই দুইয়ের মিলনস্থলেই লীলার প্রাকট্য হইয়া থাকে। লীলার উদ্দেশ্য দুইটি সিদ্ধগণের রসপুষ্টি, আর সাধকগণের আকর্ষণ ও তন্ময়তা সাধন।

পূতনাবধের লীলার দ্বারা আমরা ইহা উদাহৃত করিতেছি। পূতনা রাক্ষসী, কংস-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গোকুলে আসিয়াছিল। মায়াবিনী পরমাসুন্দরী নারীর মূর্ত্তি লইয়া স্নেহের বা বাৎসল্য রসের অভিনয় করিতে করিতে ছদ্মবেশে আসিয়াছিল। এযে বড় ভয়ানক কথা! সে বিষ খাওয়াইয়া শিশুটিকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিল। একি ভয়ানক বিপদ! শিশুটি যাঁহাদের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, শিশুটিকে পাইয়া, তাহাকে লালন করিবার অধিকার পাইয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছে, এই ভুবনদুর্লভ শিশুটিকে লালন করা ছাড়া আর অন্য কোন সাধ যাঁহাদের অন্তরে নাই, তাঁহারা বুঝিলেন চারিদিকে কত বিপদ, কত বাধা, কত অসুবিধা। এই সব বিপদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া, এই শিশুরত্নটিকে রক্ষা করিতে হইবে। এই যে সর্ব্বদাই 'হারাই, হারাই' এই বোধ, ইহাই রসপুষ্টি। যাহা হউক ভগবান্ রক্ষা করিলেন, পূতনা নিহত হইল। যাঁহারা সিদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানীয় তাঁহাদের আস্বাদন এই প্রকারের অনুভবের মধ্য দিয়া সাধিত হইল। আর, যদিও পূতনা রাক্ষসী, শিশুকে হত্যা করার জন্য আসিয়া, বিষময় স্তন শিশুর মুখে দিয়াছিল, সেও নিত্যলীলায় প্রবেশ করিল, মাতৃগতি লাভ করিল। মাতৃত্বের অভিনয় করিয়াও কপটী সদ্গতি লাভ করিল! এই চিন্তা, সাধকদের আকর্ষণ-মূলক। এই কারণে পূতনাবধের অন্যান্য কথা ভক্ত-সম্প্রদায়ে পশ্চাতে পড়িয়া গেল,

যে সব কথা লইয়া একালের সমালোচকগণ বিব্রত, যে সব কথা লইয়া একালের সমালোচকেরা নানারূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যার উদ্ভাবনা করিতেছেন, ভক্তসম্প্রদায়ে সে-সব কথা একেবারেই উত্থাপিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত পূতনাবধলীলার দুইটি শ্লোক ভক্তহৃদয়ের উদ্দীপন শ্লোকরূপে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইতেছে। একটি দশম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের যথা—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্বাপ সদ্‌গতিং॥

পূতনা লোকের শিশুছেলেদের হত্যা করে, সে রাক্ষসী, রক্ত খায়, হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে স্তন দিয়াও সদ্‌গতি লাভ করিল।

এই শ্লোকটি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৈমুত্য-ন্যায়ের সাহায্যে বলিতেছেন;—ভক্তির মহিমা দেখুন! হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্তনদান করিয়াই পূতনার সদ্‌গতি হইল, যদি সে উদাসীনভাবে দিত? যদি শ্রদ্ধায় দিত? আবার যদি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দিত? আবার দেখ, পূতনা হরিকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রাদুর্ভাব মাত্রকেই স্তনদান করিয়াছিল। যদি কৃষ্ণ, পরমাত্মা, সর্ব্বপরমস্বরূপ, অবতারকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ঐরূপ বুদ্ধিলাভ করিয়া এই কার্য্য করিত? বিষ দিয়াছিল; যদি তাহার বদলে ভাল বস্তু, আরও ভাল বস্তু দিত? সে রাক্ষসী; রাক্ষসী না হইয়া যদি মানবী হইত, যদি ভক্ত হইত, যদি অনুরাগযুক্ত ভক্ত হইত? যদি বাৎসল্য-রসবতী হইত? শ্রীমদ্ভাগবতও এই প্রকারের চিন্তা ও অনুভবপ্রণালী দিয়াছেন। আর একটি শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের, যথা—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া হপায়য়দপ্য সাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ৩।২।২৩

উদ্ধবের উক্তি—"অহো দুষ্ট পূতনা হত্যা করিবার জন্য স্তনে কালকূট বিষ মাখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইয়াছিল, তাহাতেও সে ধাত্রীর উপযুক্ত গতি লাভ করে। এমন

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনের প্রত্যেক লীলারই নানারূপ আস্বাদন প্রাচীনকালের ভক্তগণ আমাদিগকে দিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের কবিতা ও 'আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ' গ্রন্থের আস্বাদন অতীব বিখ্যাত। ভক্তমণ্ডলী হইতে এই কথা এবং অন্যান্য লীলাকথা একপ্রকারে আলোচিত ও আস্বাদিত হইয়াছে. আর এযুগে বঙ্কিমবাবু প্রমুখ পণ্ডিতগণ আরএক প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। এই যে দুই প্রকারের পদ্ধতি, এ-সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিলে, যাঁহারা আধুনিক উচ্চাঙ্গের তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারা লাভবান্ হইবেন।

৫। লৌকিক ও অলৌকিক

প্রাকৃত, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল এই বিশ্বব্যাপারের অনুভবের সহিত এক অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়, অসীম ও নিত্য জগতের অনুভবের যদি মাখামাখি হয়, তাহা হইলে সেই অনুভব কি প্রকারের হইয়া থাকে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক। ভাবপ্রবণ শিশুর নিকট এই জগৎ-ব্যাপার কি-ভাবে প্রতীত হয়, তাহাও মনে রাখা আবশ্যক। ইহসর্ব্বস্ব বৈজ্ঞানিক বলিবেন—সেই অনুভব বা প্রতীতি একটা কল্পনা মাত্র। শৈশবের সে কল্পনা শৈশবেই থাকে. পরিণত বয়সে আর সে-কল্পনার আলোচনা কেন? সে-কল্পনা ভ্রান্তি-মাত্র। এইখানেই আপত্তি। কে বলিল ঐ কল্পনা ভ্রান্তি! এক শ্রেণীর তত্ত্ব-বিৎ বলিবেন—ঐ কল্পনার মধ্য দিয়া আমরা পরমার্থসত্যের যতটা নিকটে ছিলাম, ঐ কল্পনাশক্তি হারাইয়া তদপেক্ষা দূরে চলিয়া আসিয়াছি। পরমার্থ সত্য হইতে দূরে চলিয়া আসায় আমরা লাভবান্ হই নাই, —ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-লীলা বুঝিতে হইলে, এই কল্পনাশক্তির ও অনুভবশক্তির প্রয়োজন। যাঁহাদের তাহা নাই, বা এই কল্পনাশক্তির ও অনুভবশক্তির অনুশীলন যাঁহারা নিরর্থক বা নিস্প্রয়োজন মনে করেন, বেশ জোর করিয়াই বলিতে পারি, শ্রীবৃন্দাবন-লীলা তাঁহাদের জন্য নহে। তাঁহারা ভাবুকের ও রসিকের প্রাণপ্রিয় বস্তুর উপর তাঁহাদের কঠোর ও নিঠুর হস্ত অর্পণ করিবেন না। তাঁহারাও ভাল লোক, তাঁহাদেরও পরমার্থ-লাভের পথ আছে, কিন্তু এ-পথ তাঁহাদের নহে।

মহাকবি শ্রীল শ্রীকর্ণপূরকৃত 'শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূ'-নামক সুপ্রসিদ্ধ ও সম্পূজিত

গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার তৃতীয় স্তবকে "পূতনাবধ"। সেই স্তবকের প্রথমেই লৌকিক ও অলৌকিকের এই মাখামাখি বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এ-কালের মানুষ, আমরা জিজ্ঞাসা করিব—এই মাখামাখি কোথায়? ভিতরে না বাহিরে? উত্তরে প্রথমতঃ বলিব—ভিতরে। বাহিরে হইলে কংস বা কংসের অনুচরেরাও শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমানন্দরসের আস্বাদন পাইত, তাহারা বঞ্চিত হইত না। তাহার পর বলিব,—শ্রোতার যদি সহিষ্ণুতা থাকে, তাহা হইলে বলিব, ভাইরে, ভিতর আর বাহির লইয়া তোমরা গণ্ডগোল করিতেছ; কিন্তু তোমরা কি জাননা যে ব্রজবাসীগণের ভিতর বাহির নাই—আর এই ব্রজবাসীরাই শ্রীবৃন্দাবনলীলার সাক্ষী। তুমি আমি যদি ব্রজবাসিগণের হৃদয়বৃত্তির কিছু অংশ পাই, তাহা হইলেই এই লীলা আমাদের নিকট সত্য হইবে, নতুবা রূপকই বল, আর কল্পনাই বল, আর কাব্যই বল, যাহা হউক একটা কিছু—কিন্তু সত্য নহে। সব পাগলই পাগল নয়—খুব যারা বড় তারাও তো পাগলেরই মত। ব্রজবাসীরা পাগল, সত্যই পাগল। তাহারা তোমাদের ভবের হাটের এক প্রান্তে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা ভাবের পাগল; তাহারা আসিয়াছে তোমাদেরও পাগল করিতে, তাহারা চলিয়া যায় নাই, এখনও তাহারা রহিয়াছে এবং মানুষকে পাগল করিতেছে, পাগল করাই তাহাদের কাজ।

শ্রীবৃন্দাবনের বা নন্দ-গোকুলের ব্যাপার কি? যিনি পরব্রহ্ম, তিনি আজ নরাকৃতি, ঠিক্ মানুষেরই মত। আর দূরে নহেন, ভূমিতে অবতীর্ণ, সীমার ভিতরে অসীমের প্রকাশ। যিনি অনন্ত, তিনি শিশু হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতেছেন। লৌকিকের মতই প্রকাশ, কিন্তু তাঁহার শ্রী তাঁহারই সহিত অবতীর্ণ হইয়া লৌকিকের ন্যায় প্রকাশিত ব্যাপারকে, এক অলৌকিকতার আলোকমণ্ডিত করিয়া "সকলজননয়নমনশ্চমৎকারকারী" করিয়াছেন। এই "চমৎকার" কথাটিই মূল রহস্য—শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ কেমন?—"সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ"। আমি মরিয়া গিয়াছি, একেবারে বিষয়গর্ত্তে ডুবিয়া গিয়াছি, অদ্ভুত ও চমৎকারের সঙ্গে আর পরিচয়ই নাই। সংসারটা বড় পুরাতন হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর বিস্ময় নাই, অত চমৎকৃতি নাই। এ বড় ভয়ানক দুরবস্থা! প্রার্থনা করুন—এস তুমি চিরনবীন, আমার হৃদয়ে মনে

এস। আমায় মাতাইয়া, জাগাইয়া কাঁদাইয়া তুমি এস। এই প্রার্থনাই লীলা-আস্বাদনের পথ।

৬। নন্দ ও বসুদেব

শ্রীমদ্ভাগবতে 'পূতনা-বধ'-লীলার উপক্রমে নন্দের সহিত মথুরায় বসুদেবের সাক্ষাতের প্রসঙ্গ আছে। অল্প কয়েকটি শ্লোক, কিন্তু বড় গভীর। সেখানে "প্রিয়দর্শন" এর কথা আছে। 'প্রিয়দর্শন' কি? আপনার কি কেহ 'প্রিয়' আছে, কেহ কি বন্ধু আছে? এই সংসারে ধর্ম্ম অর্থ কাম নিজের জন্য নহে, প্রিয়জনের জন্য, বন্ধুদের জন্য। বসুদেব নন্দকে বলিলেন—ভাই বন্ধুবর্গ ক্লেশ পাইলে ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম সুখের সাধন হয় না, এই প্রিয় বন্ধুদের সহিত সংসারের দেখা শুনা হয় না, সংসারচক্র এমনই জিনিস যে প্রিয়সঙ্গ অতিশয় দুর্ল্লভ। প্রিয়জনের সহিত ক্ষণেকের মিলন—সে-এক নবজন্ম লাভ! ইহাই বসুদেবের কথা। এমনই করিয়া নবজন্মলাভ করার মর্ম্ম যাহারা বুঝে, প্রিয়জনকে হারাইয়া শুধু তাহাদের স্মৃতির ব্যথা বুকে লইয়া এই প্রবাসে যাহারা কেবল আশায় আশায় ঘুরিতেছে, তাহারাই লীলার মানুষ;—বসুদেব ও নন্দের কথোপকথনে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। এখানেও সেই মাখামাখি আর মেশামেশি, লৌকিক ও অলৌকিক, অনিত্য ও নিত্য। বসুদেবের ভিতরে সেই নিত্য ও অলৌকিক, কিন্তু একেবারে চাপা। বসুদেবের প্রাণের ব্যথা কে বুঝিবে? নন্দ বুঝিবেন। আর নন্দের জীবনে সেই অলৌকিক বা নিত্যই প্রবল, কিন্তু প্রকটলীলায় লৌকিকের বাধ্যতাও এড়াইবার উপায় নাই।

'শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূ'—বলিতেছেন—

'তন্মধ্য এব' তাহারই মধ্যে, অর্থাৎ যদিও গোকুলে আজ পরব্রহ্ম নরাকৃতি, যদিও গোকুলে আজ পরব্রহ্ম মাতৃস্তন্যপানকারী, যদিও গোকুলে আজ সেই অলৌকিক ও লৌকিক হইয়া ব্রজবাসিগণের নয়নমনচমৎকারকারী হইয়াছেন এবং যদিও ব্রজবাসী কাহারও, আজ আর ব্রজের বাহিরে যাইবার সাধ একেবারে মনে নাই, তথাপি, 'তাহারই মধ্যে'—।

"লৌকিকতাপত্তৌ ব্রজরাজ" লৌকিকভাব অবলম্বন করাতে ব্রজরাজকে বার্ষিক

রাজকর দিবার জন্য মথুরায় কংসরাজের দরবারে আসিতে হইয়াছিল। সেই সময়েই বসুদেবের সহিত নন্দের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন। লৌকিকের সহিত অলৌকিকের এই মাখামাখি, ব্রজে অলৌকিকের বা ভাবের আধিপত্য আর মথুরায় লৌকিকের ব্রজ আক্রমণ ও ব্রজে বিঘ্ন-উৎপাদন, এই কথাগুলি শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত যে-যুগের গ্রন্থ, সে যুগে সে-কথা এতটা স্পষ্ট করিয়া বলার প্রয়োজন ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুগে প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই কবি কর্ণপুর খুলিয়া বলিলেন। আমাদের যুগে আবার একথা আরও ভাল করিয়া বলা দরকার হইয়াছে. কিন্তু কেই বা বলিবে, আর কেই বা শুনিবে? যাহা হউক, বসুদেব নন্দকে বলিলেন,—তুমি আর মথুরায় থাকিও না, তুমি গোকুলে ফিরিয়া যাও, গোকুলে নানারূপ উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

৭। আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ

পূতনা রাক্ষসী, কংস তাহাকে পাঠাইয়াছে, শিশুহত্যার জন্য। সে নন্দগোকুলে আসিয়াছে। সে মায়াবিনী: নিজের প্রকৃতি গোপন করিয়াছে, বাহিরে পরমাসুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করিয়াছে। কোথায় লাগে উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা! এমন তাহার রূপ। ব্রজবাসীরা ভিতর আর বাহির জানে না। তাহাদের কাছে ভিতর বাহির এক, জাগ্রত স্বপ্ন এক, ইহকাল পরকাল এক, লৌকিক অলৌকিক এক। মায়াবিনী পূতনাকে দেখিয়া তাহারা ভাবিল—"কিমিয়ং ভগবতী গৌরী, কিমিয়ং ভূতধাত্রী, কিমিয়ং মিন্দ্রাণী" ইত্যাদি। ইনি কি ভগবতী গৌরী, ইনি কি ভূতাধিষ্ঠাত্রী, ইনি কি ইন্দ্রাণী, ইনি কি করুণাণী। শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন? 'চম্পূ' বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ পূতনার বেশ দেখিয়াই খুসী হইলেন, এ বেশ মায়ের বেশ। পূতনা যেমন শিশুর গায়ে হাত দিয়াছে, আর অমনি তিনি পূতনার ক্রোড়ে উঠিলেন। তাহার পর শিশু পূতনার স্তনে মুখ দিয়া এমন জোরে টানিলেন, যে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হওয়ায় পূতনার রাক্ষসীমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল। পূতনার সেই বিকট ভীষণ দেহ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আপনা আপনি গোকুলের বাহিরে গিয়া পতিত হইল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শিশু কৃষ্ণ তাহার

পূতনার দেহ ছয় ক্রোশ, সেই দেহ যখন পতিত হইল, তখন তাহার চাপে কংস মহারাজের বাগানের ফলবান্ আম প্রভৃতির গাছ ভাঙ্গিয়া গেল।

এই ব্যাপার যখন হইল, তখন যশোদার অবস্থা কি ? যশোদার অবস্থাও যেরূপ, ব্রজবাসী অন্যান্য সকলের অবস্থাও সেইরূপ। চম্পূকার বলিতেছেন,—সমুদায় ব্যাপার যশোদার নিকট একটা কুহকের মত মনে হইল। 'কুহক', অর্থাৎ তাহারা জাগিয়া আছে না স্বপ্ন দেখিতেছে, ইহাও তাহাদের বোধ ছিল না। তাহার পর, আর্ত্তনাদ ও মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছিতা যশোদাকে অন্য সকলে সেবা করিয়া উঠাইলেন। তাহার পর যশোদার বিলাপ—"ছেলে কৈ, আমার ছেলে কৈ ?

"নীলোৎপল ভাবিয়া কি তারে, স্বর্গবাসিনী রমণীগণ,
কর্ণভূষণ করিব বলিয়া গোপনে করিল অপহরণ ?
কিম্বা নাগরমণীবৃন্দ নীলরত্ন ভাবিয়া
মস্তকভূষা করিবার লাগি গেল চুরি করি লইয়া ?
গন্ধর্ব্ব রমণীবৃন্দ অথবা ভাবিয়া তাহারে তমাল ফুল
বাঁধিয়া আমারে নিয়ে চলে গেল সাজাতে তাদের মাথার চুল ?
সিদ্ধাঞ্জন ভাবিয়া যোগিনী গোপনে কি গেল লইয়া
অথবা ধূর্জ্জটি লইয়া গেলেন বাল সুধাংশু ভাবিয়া ?
অথবা আমারি দুষ্ট নিয়তি এই খেলা গেল খেলিয়া ?
অযোগ্যা জননী বলিয়া সে কিগো আমারে গেল ছাড়িয়া ?"

চম্পূর অনুবাদ

এইরূপ বলিতে বলিতেই মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছার মধ্যেই কে যেন বলিল—"শীঘ্র তুমি ছেলে পাও"। অমনি মূর্চ্ছাভঙ্গ ! মূর্চ্ছা এবার নিজেই চলিয়া গেলেন। চৈতন্যলাভ করিয়া আবার যশোদা বিলাপ করিতেছেন—কে জান তোমরা বলে দাও ওগো, তোমরা কি কেউ নিয়েছ ! কোথা গেলে ছেলে পাব গো !" এই বলিয়া পাগলিনী ছুটিতেছেন, পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাইতেছেন, আবার ছুটিতেছেন ! পুররমণীগণের সাধ্য নাই তাঁহাকে শান্ত করে, সাধ্য নাই তাঁহার গতিরোধ করে। বুকে আঘাত করিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন, যেন করুণারই মূর্ত্তি। এই অবস্থায় তিনি পুত্রের

পূতনা রাক্ষসী ; ছয়ক্রোশ তাহার শরীর। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ঈশমাত্রোগ্র দংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দর নাসিকং।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজং ॥
অন্ধকূপ গভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণং।
বদ্ধসেতু ভুজোর্ব্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয় হ্রদোদরং ॥
সংতত্রসুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরং ॥

তাহার মুখে লাঙ্গলের দন্তের মত উগ্র দন্ত, নাসিকা দুইটি গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দুইটি গণ্ডশৈল, মাথায় অরুণবর্ণ কেশসমূহ প্রকীর্ণ ; চক্ষু দুইটি অন্ধকূপের তুল্য গভীর, জঘন দুইটি নদীর পুলিনের মত ; ভুজদ্বয়, উরুদ্বয় ও পদদ্বয় যেন বদ্ধসেতু, উদর জলশূন্য হ্রদের মত ; সকলই ভীষণ। গোপ গোপীগণ সেই দেহ দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইলেন।

'শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূ'-গ্রন্থে শ্রীমতী যশোদা সর্ব্বপ্রথম এই পূতনার দেহ দেখিয়াছেন। যশোদা করুণার মূর্ত্তি, ইহাও বলা হইয়াছে, তাঁহার পুত্রশোক ও মূর্চ্ছার কথা বলা হইয়াছে। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিপদ তাঁহার নিকট কেমন লাগিবে, তাহা একটু ভাল করিয়া ভাবিতে হইবে। এই যশোদার অনুভবই পূতনার দেহ পরিমাণের সাক্ষী। প্রথমে যশোদা দেখিয়াছেন, তাহার পর যশোদার ভাবে ভাবিত গোপ গোপীরা দেখিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইবে—পূতনা কে ? 'রূপকথাবাদী' (১)—নানারূপ কল্পনা করিবেন। তিনি একবার বলিবেন "বকী"—একটা বড় পাখী, তিন মাসের ছেলে খুবই সবল, তাহাকে মারিয়াছে। আবার বলিবেন, পূতনা 'বালগ্রহ'—একপ্রকার ব্যাধি, ইহার লক্ষণ শ্বাসকষ্ট, লৌকিক ভাষায় ইহাকে বলে 'পেঁচোয় পাওয়া'। খুব জোরে স্তন টানিতে পারিলে এই রোগ সারিয়া যায়। ইহাই পূতনা ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পূতনাবধ।

রূপকবাদী (২)—বলিবেন—পূতনা প্রেয়ঃমূর্ত্তি বা কামরূপিণী। ছয় ক্রোশ তাহার দেহ, পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা ভূর্ভুবস্বঃ এই ত্রিলোকে যাহা কিছু ভুক্ত হয়, তাহাই পূতনা। সে ব্রজে আসিয়াছিল, কিন্তু ব্রজে তাহার স্থান নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিলেন, ব্রজের সীমার বাহিরে কংসের উপবনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

১। Comparative Mythologist। ২। Allegorist।

নব্যতত্ত্ববাদী (৩)—গম্ভীরভাবে বলিবেন—রাক্ষস রাক্ষসীর কথা প্রাচীন জগতের সাহিত্যে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ব্যাপার নহে। বহু বহু হাজার বৎসর পূর্ব্বে, আট্‌লাণ্টিস্ বলিয়া এক মহাদেশ ছিল, সেখানকার অধিবাসীরা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিদ্যায় খুব পারদর্শী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নৈতিক জীবন খুবই খারাপ ছিল; এইজন্য তাহাদের দেশ, সমাজ ও সভ্যতা নষ্ট হইয়া গেল। তাহাদের অনেকে শেষ পর্য্যন্ত ছিল। পূতনা যে সেই দলেরই একজন নহে, কংস যে তাহাকে নিযুক্ত করে নাই, তাহাই বা কে বলিল?

লীলাবাদী বলিবেন,—আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহার কোনটিই অসম্ভব নহে; কিন্তু আমি জানি না, ঠিক কি হইয়াছিল। আমি দেখিতেছি—যশোদা প্রভৃতির আর্ত্তি, ব্রজবাসীর বিস্ময়, শ্রীকৃষ্ণের করুণা, আর পূতনার সদ্গতি।

যশোদা প্রভৃতি পুরনারীগণ পুরের বাহিরে আসিয়া পূতনার দেহ দেখিলেন। যেন একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূতনার বুকের উপর শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছেন, যেন মহাপর্ব্বতের উপর জলধরের অঙ্কুর। ব্রজেশ্বরী পুত্র পাইলেন, তাঁহার মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। তাঁহার সুখের সীমা নাই, গোপুচ্ছের দ্বারা শিশুকে বাতাস করিতেছেন, গোমূত্রের দ্বারা স্নান করাইতেছেন—এই সব মাঙ্গলিক কর্ম্ম। তাহার পর শ্রীভগবানের নামের দ্বারা শিশুর অঙ্গরক্ষা করিতেছেন।

অব্যাদজোঽঙ্‌ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরু
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎকেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কঃ॥
চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্র—
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ॥
ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনোযোগেশ্বরোঽবতু।

পৃশ্নিগর্ভস্ত তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দং শয়ানং পাতু মাধবঃ ॥
ব্রজন্তমব্যাদ্বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃপতিঃ ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ব্বগ্রহ-ভয়ঙ্করঃ ॥
ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভক গ্রহাঃ ।
ভূতমাতৃ পিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষো বিনায়কাঃ ॥
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহ প্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবাল গ্রহাশ্চ যে ।
সর্ব্বে নশ্যন্তি তে বিষ্ণোর্নাম গ্রহণ-ভীরবঃ ॥

অজ তোমার পদদ্বয় রক্ষা করুন, অণিমান্ তোমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন, যজ্ঞ তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, অচ্যুত তোমার কটিতট রক্ষা করুন, হয়গ্রীব তোমার জঠর রক্ষা করুন, কেশব তোমার হৃদয় রক্ষা করুন, ঈশ তোমার উদর রক্ষা করুন, ইন তোমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয় রক্ষা করুন, উরুক্রম তোমার মুখ রক্ষা করুন, ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন।

তোমার অগ্রে থাকুন চক্রপাণি, পশ্চাতে থাকুন গদাধারী হরি, ধনুধারী মধুহা, আর অসিধারী অজন তোমার পার্শ্বদ্বয়ে থাকুন ; শঙ্খধারী উরুগায় তোমার কোণ সমূহে থাকুন, উপেন্দ্র তোমার উপরে, গরুড় অধোভাগে, আর হলধারী পুরুষ তোমার সর্ব্বদিকে থাকুন।

হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয় সকল রক্ষা করুন, নারায়ণ তোমার প্রাণ সকল রক্ষা করুন, শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্ত রক্ষা করুন, যোগেশ্বর তোমার মনঃ রক্ষা করুন।

পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি রক্ষা করুন, ভগবান্ স্বয়ং তোমার অহঙ্কার রক্ষা করুন, মাধব শয়নকালে রক্ষা করুন, বৈকুণ্ঠ গমনকালে রক্ষা করুন, শ্রীপতি তোমাকে উপবেশন সময়ে রক্ষা করুন, সর্ব্বগ্রহের ভয়জনক যজ্ঞভোক্তা তোমাকে ভোজনকালে রক্ষা করুন, ডাকিনীগণ, রাক্ষসীগণ বালগ্রহ, কুষ্মাণ্ডগণ, ভূতগণ, মাতৃগণ, পিশাচগণ, যক্ষ, রাক্ষস বিনায়কগণ, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি এবং উন্মাদ,অপস্মার প্রভৃতি

যাহারা দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়দ্রোহী; আর স্বপ্নদৃষ্ট মহামহা উৎপাত এবং বৃদ্ধগ্রহ বালগ্রহ প্রভৃতি যত আছে, বিষ্ণুর নাম গ্রহণে ভীত হইয়া সকলে বিনষ্ট হউক।

প্রণয়বদ্ধচিত্তে ব্রজগোপীরা এই প্রকারে শিশুর মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

পূতনার বিশাল দেহ গোপেরা ছেদন করিল এবং আগুন জ্বালিয়া পুড়াইয়া দিল। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, সেই দেহের ধূম অগুরু-চন্দন-তুল্য সুরভি হইয়া উঠিয়াছিল। 'শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' এই কথা আরও বিস্তারিত করিয়া বলিলেন।

ভগবদুপভুক্ততয়া তচ্চিতাধূমস্তু কালাগুরুধূপধূম ইব গগনতলমারুহ্যোপরিতন সপ্তভুবনজনঘ্রাণতর্পণো বভুব। কিং বহুনা—যদুৎপন্না ধূমযোনয়োঽপি যানি যানি সলিলানি বেমুস্তৈরপি ভূরপি সৌগন্ধ্যবতী সমপদ্যতেত্যহো কিং বক্তব্যং ভগবতঃ কারুণ্যং। যদিয়ং বিষম-বিষময়পয়ঃ প্রদানার্থং গৃহীতজননীবেশাভাসাপি জননীলোকমাসাদিতা।

পূতনার দেহ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হওয়ায়, তাহার চিতার ধূম কৃষ্ণ অগুরু-চন্দনের ধূপধূমের ন্যায় আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া উপরিতন ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য ও বৈকুণ্ঠ—এই সপ্তভুবনবাসী লোকদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারী হইয়াছিল। অধিক কি, তাহার চিতার ধূম হইতে উৎপন্ন মেঘসকল যে-জল বর্ষণ করিল, তাহাতে পৃথিবীও সুরভিত হইল। ভগবানের করুণা! পূতনা বিষম বিষময় স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিবার জন্য কেবল জননীবেশের আভাসমাত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি ভগবান্ কৃপা করিয়া তাহাকে জননীলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

পূতনার কি হইয়াছিল, এ-সম্বন্ধে আচার্য্যগণ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মূলে আছে, "আপ সদ্গতিং"। শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করেন নাই, 'তৎক্ষণাৎ তাহার পাপ অপগত হইল'—ইহাই বলিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—'সতাং গতিং' শ্রীকৃষ্ণমেব—শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের স্তবের টীকায় আছে—'মুক্তি'। শ্রীল বিশ্বনাথের সিদ্ধান্ত—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা গোলোকে ধাত্রী-সারূপ্য লাভ করিলেন।

৮। শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিতা

কপটপটুপূতনী কটুনয়নবীক্ষিতং
ব্রজভয়দদুর্জ্জনব্রজনিধনদীক্ষিতং
বিষমবকপূর্ব্বজাকুচসবিধশায়িনং
তদসুপরিমিশ্রিতস্তনজরসপায়িনং
তদুরুতরবিগ্রহদ্রুমনিবহপাতনং
পৃথুকরিপুরাক্ষসীবিবিধভবশাতনং
নিপুণপশুপাঙ্গনাকুলকলিতরক্ষণং
প্রণয়কৃতগোরজঃ শকৃদমললক্ষণং
স্ফুটনিখিলবল্লবীহৃদয়নবচন্দনং
ভজচপলমানস ব্রজনৃপতিনন্দনং।
তব জয়তি নন্দনন্দনপদারবিন্দোরুভক্তিমকরন্দঃ।
যন্মাধুরীলবাগ্রে মুক্তিসুখং শুক্তিতামেতি॥

টীকানুযায়ী অনুবাদ—

কৃত্রিম ও অতিমনোহররূপা অতিশয় বাৎসল্যভাবের অভিনয়কারিণী, পূতনার সুতীক্ষ্ণ নয়ন তাঁহাকে দেখিতেছে; কিন্তু তাহাতে ভয় নাই, ব্রজের ভয়প্রদ দুর্জ্জনগণের বিনাশে তিনি কৃতসঙ্কল্প। বিষদান করিয়া হত্যাভিলাষিনী বকাসুরের পূর্ব্বজা পূতনা-রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া তাহার প্রাণের সহিত তাহার স্তনদুগ্ধপানকারী, পূতনার বিশাল দেহের দ্বারা বৃক্ষসমূহের পাতনকারী, অনেক বালকের হত্যাকারিণী পূতনার অতি-নিবিড় ভববন্ধনের মোচনকারী; পূতনাবধের পর ব্রজপুরনারীগণ নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের দ্বারা যাঁহার শান্তি বিধান করিয়াছিলেন; নিখিল ব্রজগোপীগণের হৃদয়াকাশে নবোদিত চন্দ্রস্বরূপ, সেই ব্রজনৃপতিনন্দন, হে আমার চঞ্চল মন, তাঁহার ভজনা কর। হে নন্দনন্দন, তোমার ভক্তিমকরন্দপূর্ণচরণারবিন্দের জয় হউক; তাহার কণামাত্র মাধুরীর নিকট মুক্তিসুখ শুক্তিতুল্য।

৯। পরিশিষ্টে একটি কথা

লীলার আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে দরকার, এই দুই প্রকারের আলোচনার তুলনামূলক আলোচনা। তর্কশাস্ত্রের কয়েকটি প্রাথমিক বিধান জানিলেই এই আলোচনা খুব সহজ বলিয়া মনে হইবে।

প্রত্যেক বিষয়েরই আলোচনা নানাপ্রকারে হইতে পারে। তাহার মধ্যে দুইটি প্রণালী খুব সাধারণ। প্রত্যেক কথার একটা ইতিহাস আছে। যেমন পূতনা-বধ। একজন জানিতে চায়, পূতনাবধের মত একটা অনৈসর্গিক (?) ব্যাপার ভারতের ধর্ম্মচিন্তায় **কি প্রকারে** উদ্ভূত হইল। এই ব্যাপারটার মূল প্রকৃতি কি? ইহার মূল কি? ইহার ইতিহাস কি? এই এক প্রকারের প্রশ্ন। বঙ্কিমবাবু এইভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহাকে বলে Existential proposition.

আর এক প্রকারের অনুসন্ধান এইরূপ। ভারতের সাধনশাস্ত্রে পূতনাবধের কথা রহিয়াছে। ইহার দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কি? What is its philosophic or religious significance। এই প্রকারের অনুসন্ধানের ফলে যে উত্তর পাইবেন, তাহাকে বলে proposition of value অথবা—A spiritual judgement.

সামান্যমাত্র চিন্তা করিলেই এই দুই শ্রেণীর জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধানের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। একটা জিনিসকে ইংরাজিতে বলে Natural antecedent—প্রাকৃতিক প্রাক্তন। প্রত্যেক ব্যাপারেরই প্রাকৃতিক প্রাক্তন-পরম্পরা আছে। কংসবধই বলুন, কালিয়-দমনই বলুন, আর রাসলীলাই বলুন, প্রাকৃতিক প্রাক্তন-পরম্পরা আছে। আমরা কোনটা জানি, কোনটা জানি না। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এই প্রাকৃতিক প্রাক্তনের আবিস্কার করেন, ইহাই তাঁহার অধিকার।

প্রাকৃতিক প্রাক্তন-পরম্পরা ছাড়া, প্রত্যেক ব্যাপারের একটা পারমার্থিক মূল্য Spritual valuation আছে। জীবনের পরিচালকরূপে, নিত্যজীবনের অনুসন্ধানের সহায়ক আলোকরূপে এই সমুদয় ব্যাপারের, অর্থাৎ কংসবধ, কালিয়দমন বা রাসলীলার সার্থকতা কি? What is its value as a guide to life and revelation.

এই দুই শ্রেণীর আলোচনা একেবারে পৃথক। এই দুই এর মধ্যে গোলমাল করা,

বড়ই বিপজ্জনক। আমরা এই প্রকারের বিপদ নানাস্থানে নানাসম্প্রদায়ে দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে রাজসাহীর কথাই মনে আছে, সে-কথা পরে বলিব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের উচ্চশিক্ষাদানকার্য্যে এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মানুষের অনুভবশক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সজাগ চৈতন্য,আর মগ্ন চৈতন্য। ইংরাজিতে বলে Conscious Mind আর Unconscious Mind অথবা Surface consciousness আর Sub-consciousness. যাহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম, পরমার্থ বা অধ্যাত্ম বলে, তাহার কারবার এই মগ্ন-চৈতন্যের সঙ্গেই বেশী। আমরা যে শিক্ষা পাই, তাহা সজাগ মনের বা Conscious Mindএর অনুশীলন, তাহাও চাই। কিন্তু তাহার দ্বারা পরমার্থের বা অধ্যাত্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। কৌশলী, বৈজ্ঞানিক আর যান্ত্রিক মস্তিষ্কের বিকাশ মানবজাতির খুবই হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাদের বলে Diplomatic, Scientific and Mechanical brain. কিন্তু হৃদয় বা বুদ্ধি (Spiritual and equitable heart) অবহেলায় পড়িয়া আছে। সে অন্ধকারকে দূর করিবে। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালী শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিল,—

দুই ভাই **হৃদয়ের** ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত এই ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।

এখন আবার ঠিক্ সেই অন্ধকারই আরও গভীর হইয়া পৃথিবী ছাইয়াছে, কে আসিয়া এই আঁধার দূর করিবে ?

১০। শ্রীরূপগোস্বামীর একটি বন্দনা

পর্ব্ববর্ত্তুল শর্ব্বরীপতি গর্ব্বরীতিহরাননং
নন্দনন্দনমিন্দিরাকৃতবন্দনং ধৃতচন্দনং।
সুন্দরীরতিমন্দিরীকৃতকন্ধরং ধৃতমন্দরং
কুণ্ডলদ্যুতিমণ্ডলপ্লুতকন্ধরং ভজ সুন্দরং॥
গোকুলাঙ্গনমণ্ডনকৃত-পূতনাভবমোচনং।
কুন্দসুন্দরদন্তমম্বুজবৃন্দবন্দিতলোচনং।
সৌভাকরফুল্লপুষ্কর বিস্ফুরৎকরপল্লবং

ভিখারীর গান

১

একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী
এ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই,
জানিনা কি চাই।
জানি শুধু, কিছু চাই
তাই, ঘুরিয়া বেড়াই।
কভু এটা, কভু সেটা
ধরিবারে চাই,
পাই মনে করি, কিন্তু
কিছুই না পাই ;
খালি হাতে ফিরে আসি
শুধু কষ্ট পাই।
শান্তি নাই, সুখ নাই—
শুধু ঘুরিয়া বেড়াই।

২

কাঙ্গাল ভিখারী একেবারে
শূন্য হৃদয় মন প্রাণ,
শুষ্কতার তীব্র জ্বালা সহিয়া বহিয়া
ছুটিয়া চলেছি অবিরাম।
যাহারে যখন পাইয়াছি
নিকটে টানিয়া আনিয়াছি
মনে হইয়াছে নিজজন।
প্রাণের কপাট খুলি
ভিতরে করেছি নিমন্ত্রণ
রাখি নাই কিছুই গোপন।
নিজের প্রাণের কথা, গভীর মনের ব্যথা
সকলি করেছি নিবেদন।
ভাবিয়াছি এই পরিচয়,
রবে চিরদিন অক্ষয় ;
ভাবিয়াছি—এ যে আমারি
শুধু আমারি।
অনাদি কালের আমারি
অনন্ত কালের আমারি
আমিও তাহারি—
ষোল আনা আমি তাহারি।
ছাড়াছাড়ি হবে না জীবনে
ছাড়াছাড়ি হবে না মরণে
তাই প্রাণের কপাট খুলি
ভিতরে ডাকিয়া আনি
নিজেরে করেছি নিবেদন।
কিন্তু, বুকে ধরে দৃঢ় করে
মিঠা আলিঙ্গন ডোরে
বাঁধিয়াছিলাম যতজন।
ঊষার কুহেলি গতে
দিবালোক প্রকাশিতে,
চেয়ে দেখি সব ছায়া

মন-গড়া কল্পনার ধন।
বস্তু নয়, ব্যক্তি নয়
কিছু নয়, কিছু নয়
শুধু আমার স্বপন
শুধু আমার স্বপন।
নাই কিছু মনের মতন
বৃথা অন্বেষণ—
শুধু আত্ম-প্রবঞ্চন।
ছায়ায় কল্পনা দিয়ে
মানস-প্রতিমা গড়ি
তাহারেই ভালবেসে
তাহারই পূজন—
শেষে বিসর্জ্জন;
এমনি করিয়া একেবারে
নিঃসঙ্গ একাকী,
শুধু ঘুরিয়া বেড়াই।
বিদেশ, অজানা সবি;
ইহাদের ভাষাভঙ্গি,
আগে ভাবিতাম 'বুঝি',
এখন বুঝেছি, বুঝি নাই—
মনে হয় ভাষাভঙ্গি,
সবি অর্থহীন
প্রাণ নাই, মন নাই
হৃদয় মোটেই নাই,
হয় জড়ের স্পন্দন,
নতুবা বঞ্চন।
অর্থ শুধু আমার মনেতে

৩

নিষ্ঠুর কে যাদুকর,
বাঁধিয়া রঙ্গের ঘর,
যাদু দেখাইছে, নিরন্তর।
সাধ হয় যাদুবিদ্যা শিখি
যাদুকর কোথা খুঁজে দেখি।
পাওয়া যায়, কিনা তারে
কে বলিয়া দিবে মোরে?
সবাই বলিছে, আমি জানি।
দেখা কি পেয়েছ তার?
জিজ্ঞাসিলে না দেয় উত্তর
বলে—'আছে, অনুমানি'।
শুধু অনুমান, তর্ক, বাক্যব্যয়,
অকারণ মস্তিষ্কের ক্ষয়;
বড় ক্লান্ত সকলি নিস্ফল।
তাই, একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী
অচেনা বিদেশে ঘুরে মরি
বন্ধু যদি আছ কেউ, কাছে এস,
এস পায়ে ধরি।
হৃদয়ের স্পর্শ দাও,
রস দাও, প্রাণ দাও
দাও আশা, দাও হাসি।
নতুবা যে আমি প্রাণে মরি॥

৪

ছায়ার মতন এসেছিল যারা,
ছায়ার মতন গিয়াছে চলি;
প্রাণের কিনারে রেখে গেছে দাগ

কিছুই হ'ল না, অসার জীবনে
বিফল স্বপন-রচনা,
আশা-নদীকূলে বসিয়া বিরলে
চঞ্চল লহরী গণনা।
বরষে বরষে দেখিতে দেখিতে
জীবন-রতন-মালিকা হইতে,
একটি একটি রতন ভূমিতে
খসে' পড়ে দিয়ে যাতনা।
জীবনের কাজ সকলি পড়িয়া
কিছুই সাধন হ'ল না।
মনে পড়ে আজ সেই খোলা মাঠ,
মনে পড়ে সেই নদীর তীর,
মনে পড়ে সেই গোধন চারণ,
মনে পড়ে সেই সমীর ধীর।
মনে পড়ে সেই প্রভাতের আলো
মনে পড়ে সেই শিশির মাখা,
শ্যামতৃণ পাতা ফোটা ফুলগুলি
আকাশের পটে যেন সে আঁকা।
মনে পড়ে ফুল তোলা মালা গাঁথা
মনে পড়ে সেই গাছেতে ওঠা,
মনে পড়ে সেই গরুর পিছনে
লাঠি হাতে ক'রে কেবলি ছোটা।
মনে পড়ে সেই তাল ঠুকে ঠুকে
নদীর বুকেতে লাফিয়ে পড়া,
মনে পড়ে সেই নেচে নেচে নেচে
ছোট পাহাড়ের মাথায় চড়া।
ভাই বোন্ কত, কত সখা সখী
হাসিমাখা মুখে সদা দেখাদেখি
সেই মেশামিশি ভালবাসাবাসি
কোথা গেছে আজ কিছুই নাই।
হারালাম বুঝি সব হারালাম।
স্বপ্ন দেখে বুঝি জেগে উঠিলাম
কিছুই বুঝি না, কিছুই বুঝি না
কেঁদে কেঁদে কিছু ভেবে না পাই।
তাই ওগো আমি নিঃসঙ্গ একাকী
অজানা বিদেশে ঘুরে বেড়াই
কিছু চাই, কিন্তু কি যে চাই
সেটা জানা নাই।
তাই কভু এটা, কভু সেটা
শুধু ধরিয়া ধরিয়া
ঘুরে বেড়াই।
শূন্য হস্তে ফিরে এসে দেখি
কিছু নাই, হাতে কিছু নাই।
শুধু ছাই, শুধু ছাই, প্রাণে কিছু নাই।
বুকে রস নাই, মুখে হাসি নাই,
দেহে বল নাই—
ওগো কিছু নাই—
নিঃসঙ্গ একাকী ঘুরে বেড়াই।

আমার বার্ষিকী

১৩৩৩ সালের ২২শে আশ্বিন (ইং ৯-১০-২৬) হইতে, ১৩৩৪ সালের ১০ই আশ্বিন
(ইং ২৭-৯-২৭) পর্য্যন্ত ৩৫৩ দিনের কার্য্য-তালিকা

ও

কিঞ্চিৎ মন্তব্য

আর দুইবার আমার বার্ষিকী ছাপাইয়াছি—মাত্র দুইবার। আমি বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় এবং আসামে ঘুরিতেছি—ইংরেজী ১৯১১ সাল হইতে। উচিত ছিল, সেই সময় হইতেই বৎসর বৎসর একটু বিস্তারিতরূপে এই বার্ষিকী লেখা। কিন্তু, উচিত কাজ ত অনেকই করা হয় নাই। 'একেবারে না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে কিছু হওয়াও ভাল'—এই নীতিকথাই এখন আমার সান্ত্বনা। যাহা হউক, যেমন, তেমন করিয়া লিখিয়া, আরও দুইবার আমার বার্ষিকী ছাপাইয়াছি। বন্ধুরা কেহ কেহ পড়িয়াছেন, তাহার মধ্যে কেহ কেহ খুসি হইয়াছেন ;—যদিও তাঁহাদের সংখ্যা কম—নিতান্তই কম। এই নিতান্ত কমের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই বার্ষিকীটাকে কেবল বিবরণী না করিয়া, ইহার সঙ্গে কিছু কিছু মন্তব্য ও অভিজ্ঞতা দিলে ভাল হয়।

আমারও এখন মনে হইতেছে, যদি ইংরাজী ১৯১১ বা ১৯১০ সাল হইতে এই বিবরণী, অভিজ্ঞতা-সহ ছাপাইতাম, তাহা হইলে দেশের অনেক আন্দোলনের ও প্রতিষ্ঠানের এবং অনেক কর্ম্মীরও ইতিহাসের কিছু কিছু মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যাইত। এখন, সমুদয় কথা মনে করিয়া লেখা কঠিন, তবে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক কথাই মনে নাই, স্মারকলিপিতেও সব কথা নাই, কিছু কিছু আছে। মনে পড়াইয়া দিলে, অনেক কথা মনে পড়িতে পারে। বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা ইহা পড়িবেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করিলে এবং ইচ্ছা করিলে, কোন কোন কথা মনে পড়াইয়া দিতে পারেন। তাঁহারা যদি তাহা করেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়, আমারও উপকার, অন্যেরও উপকার। বন্ধুগণকে এই অনুরোধটি করিবার জন্যই এই ভূমিকা।

গত দুইবারের বার্ষিকীতে একটি কথা লেখা হইয়াছিল, এবারেও তাহার কিয়দংশ ভূমিকারূপেই দিলাম। পূজার সময় আমি সিউড়িতেই থাকি। সিউড়ি আমার জন্মভূমিও নহে, আদি বাসস্থানও

আসার পর, আমাদের দ্বারা এই একত্রিশ বৎসর দুর্গোৎসব হইল। পূজার সময় সিউড়িতেই আসি, কখনও অন্যথা হয় নাই, ভগবান্ করুন, যেন অন্যথা না হয়।

প্রথম পর্ব্ব—রাজনীতি

১৩৩৩ সালের পূজার পূর্ব্বে সিউড়ি আসিতেই, রাজনীতির ঝঞ্ঝার আক্রমণ? বীরভূম জেলা হইতে কংগ্রেসের বা স্বরাজের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কয়েকমাস পূর্ব্বেই, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসে আমাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি দাঁড়াইবেন। আমি তখন সাঁওতাল পরগণার এক বনের ভিতর ছিলাম—শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে। চিঠিখানি পাইয়া একটু ভাবনায় পড়িলাম। গত নির্ব্বাচনে, বীরভূমে স্বরাজেরই জয় হইয়াছিল। সেবার যিনি স্বরাজপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবারও যদি তিনি দাঁড়ান, আর জিতেন বাবু এবং একজন পররাজী তৃতীয় পক্ষ যদি দাঁড়ান, তাহা হইলে তৃতীয় পক্ষেরই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ ভোটদাতা দুই রকম, এক রাজনীতি-ভাবা লোক (Political minded), আর এক রাজনীতি-না-ভাবা লোক। প্রথম শ্রেণীর ভোট যদি ভাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে তৃতীয় পক্ষের জয় অবধারিত। জিতেন্দ্র বাবুকে কাউন্সিলে পাঠাইতে বীরভূম জেলার ভদ্র লোকেরা ন্যায়তঃ বাধ্য। তিনি শক্তিশালী ও বিদ্বান। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে জীবনের প্রথম সময় হইতেই খাটিয়াছেন এবং লাঞ্ছনা ভোগও করিয়াছেন; বীরভূম জেলার আর কোন বিদ্বান লোক, তাহা করেন নাই। সুতরাং, সংস্কৃত দরবারে যদি সদস্যই পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে জিতেন বাবুই উপযুক্ততম লোক। কিন্তু, দেশবন্ধুর জন্য স্বরাজদলের আদর্শও রক্ষা করা উচিত। কাজেই আমি চেষ্টা করিলাম—জিতেন বাবুই দাঁড়ান, তবে স্বরাজ বা কংগ্রেসের পক্ষে। আমার চেষ্টায় কিছু হয় নাই, ইহা ঠিক্। কিন্তু কাজটা হইয়া গেল—জিতেন বাবুই কংগ্রেসের বা স্বরাজের পক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন।

কংগ্রেসের জন্যও বটে, আবার জিতেন্দ্র বাবুর ব্যক্তিত্বের জন্যও বটে, কিছু করা দরকার, ইহা আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম। তবে বিশেষভাবে ভার লইবনা, ইহাও স্থির করিয়াছিলাম। কারণ দুইটি; প্রথমতঃ সিউড়ির মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের সময় সর্দ্দারী করিয়া শেষে দুঃখ হইয়াছে, মাদারিপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের শেষ সময়ে, সভাপতি-নির্ব্বাচনে নিজের প্রতিপত্তির দ্বারা সাহায্য করিয়া পরে অর্থাৎ সফলতা লাভ করার পরে, কোনরূপ আশা বা আনন্দ পাই নাই। কাজেই স্বরাজ-পক্ষ হইতে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করা উচিত এবং দরকার হইলেও এই চেষ্টা যেভাবে হইতেছে, তাহাতে দেশের লাভ হইবে না, ক্ষতি হইবে। এই চেষ্টা ভাল, কিন্তু ইহার অনুকূল সংস্কার

ইহাই প্রথম কারণ। তবে, জিতেন বাবুর উপর আমার বিশ্বাস ছিল ; মনে হইত, তিনি কিছু করিতে পারিবেন। কাজেই, এই কারণে নৈরাশ্য আসে নাই। দ্বিতীয় কারণ, আমার শক্তি অপেক্ষা কাজ বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এই কাজ এক জায়গায় এক রকম নহে, নানা জায়গায় নানা রকম। এই সব কাজে কেবল সময় দিলেও হয় না, শক্তি দিলেও হয় না, অর্থও দিতে হয়। এই জন্য এই সমস্ত নির্ব্বাচন ব্যাপারে, পিছনে থাকিয়া যতটুকু সম্ভব ও সুসাধ্য, তাহাই করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া সিউড়ি-কেন্দ্রের সর্দ্দার হইতে বাধ্য হইলাম।

জিতেন বাবু, না জানিয়াই সরল-প্রাণে, এমন কয়েকটি মিত্রের হাতে পড়িয়াছিলেন, যাহাদের হাতে কোন ভদ্রলোকই পড়িতে চাহে না এবং দুরদৃষ্টবশতঃ পড়িলে, এড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সেই সব মিত্রের হাত হইতে রক্ষা করার জন্যই, সিউড়ি-কেন্দ্রের সর্দ্দারীর ভার আমার উপর পড়িয়া গেল, যদিও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের সাহায্য ব্যতীত আমি কিছুই করিতে পারিতাম না।

সিউড়ি সহরের অনেকগুলি সাধু যুবক ও ভদ্রব্যক্তি কেবল নিঃস্বার্থভাবে নহে, কেবল সময় ও শক্তির দ্বারা নহে, কেহ কেহ গুরুতর আর্থিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় লইয়া, কেহ কেহ পার্থিব স্বার্থের বিশেষরূপ হানি করিয়া, এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে অক্লান্ত ও অবিচল-ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আর কি বলিব। জিতেন্দ্র বাবুই জিতিলেন, ১৮০০ ভোটে প্রবল প্রতিপক্ষ পরাস্ত হইলেন। একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার সঙ্গে জিতেন বাবুর বা কংগ্রেসের পক্ষে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা খাটিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাজ একেবারে নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল, তাঁহারা কোনরূপ ময়লা স্পর্শ করেন নাই—একেবারেই করেন নাই। কিন্তু অপরপক্ষ বা তাঁহাদের লোকেরা নিজেদের সম্বন্ধে কি একথা বলিতে পারিবেন ? আমি দেখিলাম—পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া তাঁহারা নির্ব্বাচনের ময়লা অস্ত্রগুলির ব্যবহারে বিশেষরূপ নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

নির্ব্বাচিত হওয়ার পর এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা জিতেনবাবুর উচিত ছিল, কংগ্রেস বা স্বরাজ-পক্ষ হইতে কেবল বীরভূমের নহে, সকল জায়গারই এই সব ব্যাপারের আলোচনা করা উচিত ছিল। এখনও তাহা হয় নাই ; দুঃখের বিষয়—তবে এখনও সময় আছে।

পল্লীবাসী জনসাধারণের জীবনে মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায়-স্বরূপ এমন অনেক অত্যাচার, প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হয়, যাহা খুব সহজেই নিবারিত বা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রবল জমিদার জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান্ প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী লোকেরা বোর্ডের কর্ম্মচারী, ঠিকাদার, উমেদার ও

কাজ করে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক এবং সে-সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ আন্দোলন আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, বীরভূম জেলাতে দুইবারই স্বরাজের জয় হইল, কিন্তু এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, এ সম্বন্ধে আলোচনাও হইল না। কংগ্রেসের ইহাই প্রথম কাজ। এই ভারতবর্ষে "রাজনীতির খেলাকে জুয়াখেলা করিলে, রাজনীতিচর্চ্চাকে সুবিধাবাদে (Opportunism, careerism) পরিণত করিলে, সর্ব্বনাশটা শীঘ্র শীঘ্র হইবে। ভগবান্ রক্ষা করুন।

১লা কার্ত্তিক হইতে ৩রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত তেত্রিশ দিন আমরা গ্রামে গ্রামে ছুটাছুটি করিয়াছি। সে অভিজ্ঞতা বিচিত্র ও অদ্ভুত। ইহার মধ্যে যে যে গ্রামে গিয়াছিলাম, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল। দু একটা ছোট গ্রামের নাম বাদ পড়িতে পারে।

গোয়ালিআড়া, তাঁতিপাড়া, করিধা ; লোকপুর ; খটঙ্গা, ভাণ্ডীরবন, রাইপুর, লাঙ্গুলিয়া, নগরী ; মঙ্গলডিহি, বাতিকার ; লাবপুর, দাঁড়কা, কীর্ণাহার ; সাঁইথিয়া ; পাতাডাঙ্গা, চন্দ্রপুর, তাঁতিপাড়া, গোয়ালিয়াড়া ; সিউড়ি ; দুবরাজপুর, ছিনপাই ; রাইপুর, মামুদবাজার , দুবরাজপুর, কুখুটিয়া, গোপালপুর, পেরুয়া, নাক্‌রাকোন্দা, খয়রাশোল ; লাবপুর ; ঘাটহুল্ল ভপুর, লাউজোড়, লাউবেড়ে, রাজনগর ; হেতমপুর, দুবরাজপুর ; দুবরাজপুর, ছিনপাই, সাঁইথিয়া, কুণ্ডলা, সিউড়ি ; সিউড়ি ; সিউড়ি ; করিধা, রণপুর ; তাঁতিপাড়া, পড়াসিন, মেটেলা ; কুলকুড়ি, বিষ্ণুপুর, শ্রীকান্তপুর, রামপুর * * দুবরাজপুর, হজরৎপুর ; * * , * * ; * * ; ডেউচা, তেঁতুলবাড়িয়া, মকদমনগর ; ভাণ্ডীরবন, করিধা ; সিউড়ি, আনন্দপুর ; রামপুরহাট ; লাবপুর, আমদপুর, পারুই, সিউড়ি (নির্ব্বাচনের প্রথম দিন) ; আমড়াপালন, জিব্‌ধারপুর, গোবিন্দপুর, রাওতাড়া, পানুড়ে, রাইপুর, পলশাড়া, মল্লিকপুর , খয়রাশোল, লাউবেড়ে ; চহটা পুরন্দরপুর, সিউড়ি, ঘাটহুল্ল ভপুর, নগরী (নির্ব্বাচনের দ্বিতীয় দিন)। এ সম্বন্ধে, এবারে এই পর্য্যন্তই থাকুক।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—সামাজিক

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (২০-১১-২৬) বেলা তিনটার ট্রেণে সিউড়ি হইতে বাহির হইলাম। ব্যাণ্ডেল্ নৈহাটি হইয়া ঢাকা মেলে ঢাকা জেলার বেতিলাগ্রামে যাইব। গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে আরিচাঘাটে নামিলাম। পূর্ব্বেও আসিয়াছি, তখন মোটারবাস হয় নাই, ঘোড়ার গাড়ীতে বা একা গাড়ীতে মাণিকগঞ্জ যাইতে হইত। এবার দেখিলাম, মোটার বাস্ হইয়াছে। এই অঞ্চলের দু একটি গোস্বামী-সন্তান, পূর্ব্বে কীর্ত্তনে গানের ব্যবসায় করিত, এখন সে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া, টিকি কাটিয়া ছোট বড় করিয়া চুল কাটিয়া মিলিটারী কোট গায়ে দিয়া, বাস চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈকুণ্ঠে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা মাণিকগঞ্জ লইয়া যাওয়ায় উপার্জ্জন বেশী, অথবা দুকাজই একজনের দ্বারা চলিতে পারে বলিয়া তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মাণিকগঞ্জের নিকটেই বেতিলা গ্রাম। এই গ্রামে অনেক গোস্বামীর বাস, ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের অনেক শিষ্য আছে। ইঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর) পরিবারভুক্ত। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ ছিলেন, এবং ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার শিষ্য হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন বলিয়া, নিকটবর্ত্তী উথুলি গ্রামে অদ্বৈতবংশের গোস্বামীরা তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করেন। এই প্রতিযোগিতা অনেক কালই চলিতেছে। ইহার আসল কারণ 'তাত্ত্বিক' নহে, 'অর্থনীতিক';— শিষ্য লইয়া কাড়াকাড়িই ইহার হেতু। বৈষ্ণব-সম্মিলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উচিত—এই সব ঘরোয়া বিরোধের নিষ্পত্তি করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিতে হইলে, এই সব মীমাংসা প্রথম দরকার। কিছু কিছু স্বার্থ না ছাড়িলে মীমাংসা হইবে না। আপনা আপনি একটা মীমাংসা হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কাশীমবাজার প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি ধনী ভক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায়, আগুনটা এখন ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জ্বলুক, জ্বলিয়া জ্বলিয়া আপনা আপনি আগুন নিভিবে, তবে কাঠও শেষ হইতে পারে, এই একটা ভয়।

বেতিলার গোস্বামী মহাশয়গণের দুইবাড়ী, দক্ষিণ বাড়ী আর উত্তর বাড়ী; তাঁহাদের মধ্যেও বিরোধ। রাসের সময় বেতিলায় একটি মেলা হয়; বড় মেলা, ঢাকা জেলার দ্বিতীয় বৃহৎ মেলা। প্রথম মেলা ধামরাইএর রথের মেলা। মেলা মেলা, মেলায় যাহা হয়। গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, নীতিও নষ্ট হয়; আর বিলাতি মালের কাটতি হয়। প্রথম যখন মেলা হইয়াছিল, তখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই হইয়াছিল, পূজাপাদ গোস্বামীগণ রাসযাত্রা উপলক্ষে দূরদূরান্তরের শিষ্যগণকে একত্র করিয়া এই মেলা করিয়াছিলেন। এখন প্রাণটা নাই, দেহটা বাড়িয়া চলিয়াছে। সংস্কার আবশ্যক। শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ, ও এই প্রকারের শিক্ষিত ও উদারচিত্ত দু' একজন যুবক চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে সংস্কার হয়। তাঁহারা এই মেলায় প্রথমতঃ একদিন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্মরণ-উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উৎসবে দুই বাড়ীকে মিলিত করার জন্য চেষ্টা করিলাম। বেতিলা গ্রামে গোস্বামী বাড়ীতে এখনও দুইজন ভাল পণ্ডিত আছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম গোস্বামী। ইঁহারা সহোদর। আরও পণ্ডিত আছেন। এই সব মেলাকে বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্মিলনে পরিণত করিতে হইবে। কীর্ত্তন গান, ভাগবত পাঠ, কথকতা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা; যাত্রা থিয়েটার বায়স্কোপ হইলেও তাহাকে ধর্ম্মমূলক করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে যে একতা হইবে, তাহা স্বগতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহাকে ইংরাজীতে বলে Unity in diversity. বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবধর্ম্মেও এইরূপ স্বগত ভেদ আছে ও থাকিবে। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বা শ্রীনিবাস আচার্য্য, প্রভৃতি প্রত্যেকে এই ধর্ম্মের এক

বিশেষভাবে ঠাকুর মহাশয়কে উপলাভ করা ও প্রতিষ্ঠা করা। কোন চিন্তা বা কোন কার্য্য জগতে শেষ হয় নাই, ঠাকুর মহাশয়ের কাজও শেষ হয় নাই। যাহা শেষ হইয়াছে, তাহা মরিয়াছে, তাহার গঙ্গাযাত্রা করু। যাহা অমর, তাহার বৃদ্ধি হউক, বিকাশ হউক। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অনেকগুলি তত্ত্বের সমন্বয়। মূলে পঞ্চতত্ত্ব, তাহার পর আরও তাহার শাখা প্রশাখা। শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বই নরোত্তম। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এক, কিন্তু খড়দহ, শান্তিপুর, কাল্না, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, খেতরি, রামকেলি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে তাহার এক একদিক্ (aspect) বিকশিত হইবে। অথচ, ইহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিবে না। প্রত্যেকে আত্মনির্দ্ধারণ করুন। বেতিলাও করুন।

'ব্রাহ্মণ-সভা' বলিয়া বাঙ্গালায় একটা বাজে জিনিস আছে, তাহারা বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের প্রাণশক্তি কোথায় তাহা জানে না, জানার দরকারও তাহাদের নাই। তাহাদের দরকার, কয়েকজন জমিদার ব্রাহ্মণকে নেতা করিব, কাউন্সিলে পাঠাইব প্রভৃতি প্রলোভন দিয়া, তাহাদের নিকট টাকা আদায় করা। ইতিহাস বলিতেছে—চৈতন্যের ধর্ম্মই বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা। এই ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও জনসেবার ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মে সকলেই দাস ও সেবক, কোন মানুষই সেব্য নহে। যে-সব ব্রাহ্মণ পরিবার বৈষ্ণব সমাজে নেতৃত্ব করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্ববর্ণের গুরু ও শিষ্যের সহিত, সর্ব্বসম্প্রদায়ের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া বঙ্গের ব্রাহ্মণ প্রতিভার সর্ব্বোত্তম ফল এই নদীয়ার প্রেমধর্ম্মকে রক্ষা করুন।

বেতিলায় মাত্র তিন দিন ছিলাম। ৮ই অগ্রহায়ণ মানিকগঞ্জ আসিলাম। ইহার পূর্ব্বে আরও তিনবার মাণিকগঞ্জ আসিয়াছি। অনেক বন্ধু বান্ধব আছেন। প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় মাণিকগঞ্জ কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ দিলেন। তাহার সমালোচনা আমার কাগজে করিয়াছি। মাণিকগঞ্জে ৮ দিন বক্তৃতা করিলাম। বেতিলার মেলাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য, মেলা-সংস্কারের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি আন্দোলন জাগাইয়া রাখিতে মণিকগঞ্জের কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলাম। দেশের এই মেলাগুলির মধ্য দিয়া দেশের কাজ করিতে হইবে, পূর্ব্বকালে তাহা হইয়াছে এবং একালেও তাহাই হউক। এত বুঝাইলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছু করেন নাই। কারণ, পরে গিয়া বুঝিয়াছি, কংগ্রেস বা কংগ্রেস-কর্ম্মী বলিয়া কোন জিনিস সত্য করিয়া মফঃস্বলে নাই। যেখানে আছে, সেখানেও স্বাধীনভাবে ভাবিবার বা কোনরূপ নূতন কর্ম্মে হাত দিবার মত শক্তি তাহাদের নাই ; যাহারা আছে, তাহারা খুব জোর, কলিকাতার হুকুম পাইলে, তাহা পালন করিয়াছি বলিয়া একটা সংবাদ বা রিপোর্ট পাঠাইতে পারে, আর যদি চাঁদা তোলার সুযোগ থাকে,

মাণিকগঞ্জ হইতে ফিরিবার পথে হুগলী আসিলাম। আসিবার অনুরোধ ছিল। হুগলীতেও তিন দিন বক্তৃতা হইল। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের সংস্পর্শে আসিলাম জাতীয় বিদ্যালয়ে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বক্তৃতা হইল। 'জাতীয় শিক্ষা কি' সে-সম্বন্ধে ইঁহারা অবশ্য কোনরূপ আলোচনা করেন নাই এবং করিতে পারিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা কতিপয় ব্যক্তির জন্য ভোট-সংগ্রহের দূতরূপেই আছেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃত্ব লইয়া নিজেদের মধ্যেও বিরোধ হইতেছে। দেশের খবর-জানা লোকই দেশে কম, স্কুলের বই মুখস্থ করিয়া পাশ করিয়া চাকুরী করিব, অর্থাৎ দেশের সর্ব্বনাশের উপর নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণের সৌধ নির্ম্মাণ করিব, এই মন্ত্রই যাহারা শৈশব হইতে একাগ্রচিত্তে জপ করিতেছিল, হঠাৎ একদিন তাহারা স্বদেশ সেবকের খাতায় নাম লিখাইয়া খদ্দরের কৌপীন পড়িয়া অসহযোগী হইল। কোনরূপ শিক্ষানবিশী করিতে হইল না, একদিনেই নেতা হইয়া গেল, তাহাদের দ্বারা দেশের কাজ কি প্রকারে হইবে? ইংরাজ যাহাদের দ্বারা নিজের কাজ করায়, ৫ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহাদের নিজেদের হেপাজতে রাখিয়া তাহাদের মনোবৃত্তি, চিন্তা, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিশেষভাবে নিজের মত গড়িয়া দেয়, আজ একশত বৎসরকাল এই প্রকারের মানুষ তৈয়ারী হইতেছে—সেই চেষ্টার সঙ্গে যাহাদের সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহাদের বিশেষ রকমের শিক্ষা দরকার, কিন্তু সে-ব্যবস্থা কি? প্রচলিত বিদ্যালয়ের জন্য যে-সব পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়, তাহাই আবার জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়! এই ব্যাপার দেখিয়াই মহাত্মাজি সরিয়া পড়িয়াছেন।

৬ই ডিসেম্বর, ২০শে অগ্রহায়ণ সিউড়ি ফিরিলাম।

হুগলীর স্বরাজ-কর্ম্মীরা তারকেশ্বরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কতকগুলি গুরুতর ভ্রমের জন্য, অযোগ্য লোকের নেতৃত্বের জন্য, তারকেশ্বরে জাতীয়-শক্তির একটা বিরাট অপচয় হইয়া গেল! যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে। এখন দরকার—এই ব্যাপার লইয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা। একটা জাতি গড়িয়া উঠে তাহার অভিজ্ঞতার দ্বারা। এই অভিজ্ঞতাই তাহার ইতিহাস। আমরা অনেক কাজ করিতেছি, কিন্তু অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের কোন নিদর্শন নাই, কাজেই কর্ম্মের মধ্যে না আছে পারম্পর্য্য, না আছে ক্রমানুবর্ত্তিতা। কোন কর্ম্মেরই বাস্তবতা নাই। তারকেশ্বর লইয়া আড়ম্বর হইয়াছে অনেক। বীরভূম জেলার গ্রাম হইতে চাঁদা উঠিয়াছে, তাহার এক পয়সাও তারকেশ্বর পৌঁছায় নাই, নবদ্বীপে ভিক্ষা হইয়াছে, তাহাও নবদ্বীপের শৌণ্ডিকালয়ে ব্যয়িত হইয়াছে, ইহাও আমরা জানি। আরও অনেক রকম হইয়াছে। হউক, বৃহৎ কাজে এরূপ হইয়াই থাকে, তাহাতে দেশের কাজের অগ্রগতি স্থগিত হইবে না। কিন্তু যাঁহারা নেতাগিরি করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সত্যকার অভিজ্ঞতা দেশকে

সরকারের দপ্তরে চাকুরী করিতে গেলে মিথ্যা রিপোর্ট লেখায় পারদর্শী হইতে হয়। তাহারা বিদেশী তাহাদের তাহাতে চলে, কিন্তু কেবল এই বিদ্যাতেই যাহারা পারদর্শী, তাহাদেরই দল যদি দেশের কাজেও আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! হুগলীর কর্ম্মীদের বলিলাম—দয়া করিয়া আমাকে একটা বিবরণী দিবেন, কারণ আমাকে নানাস্থানে যাইতে হয়, নানাজনে জিজ্ঞাসা করে, আর তীর্থ-সংস্কারের কাজে হাত দিয়া আমাকেও অনেক ভুগিতে হইয়াছে, সুতরাং ব্যাপারটা আমার বোঝা দরকার, কিন্তু তাঁহারা দিবেন বলিয়াও দিলেন না। কি বলিব, ইহাতে তো চাঁদা উঠিবে না, সুতরাং করিয়া লাভ কি? 'হিতবাদী' কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা আমার কাগজে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, অন্যস্থান হইতে আরও খবর সংগ্রহ করিতে হইবে।

আর একটা কথা। আরিচা হইতে মোটারবাসে যাওয়ার সময় একটা কথা আমার মনে হইতেছিল। বীরভুম প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের জেলায় অনেক বাস্ ও মোটার দেখিয়াছি, কিন্তু সেখানে রাস্তা খুব ভাল। আরিচা হইতে মাণিকগঞ্জ রাস্তা খুব খারাপ, সে রাস্তাতেও যাহারা বাস্ চালাইতেছে, তাহাদের সাহস ও নিপুণতা খুব বেশী। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ঢাকা জেলার যুবকদের কর্ম্মশক্তি, সাহস ও অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করার সামর্থ্য, বীরভুম প্রভৃতি জেলার যুবকদের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। বাঙ্গালার ভবিষ্যত পূর্ব্বদিকে, পশ্চিমদিকে নহে। ভারতেরও তাই।

ত্রয়ী

১। জাগরণ

মানুষের একটা দিন আসে,—দিন নয়, তার জীবনের একটা যুগান্তর,—যখন সে হঠাৎ জগৎটাকে যেন তার অন্তরের মধ্যে দেখ্‌তে পায়। তখন সে একদিন ভোরের রোদ্দুরে মন্ত্রপড়া রূপোর কাঠি ছোঁয়ান রাজপুত্রের মত, চোখ মিলে স্মিতমুখে বাহিরের আলোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠে—'কি সুন্দর!' ভোরের আকাশে সে অসীম সৌন্দর্য্যের রশ্মির নিদর্শন পায়, গাছের সবুজ পাতার মৃদু আন্দোলনের মধ্যেও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ তার সাম্‌নে হয়। উদয়াচলের দিকে তাকিয়ে সে বলে—'রঙীন মেঘের খেলা আজি পূরব গগনে'। সন্ধ্যার আকাশে সূর্য্যের ম্লান রশ্মি যখন ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে মিলিয়ে যায়, তখন তা'র বিরহ-বিধুর মনের মাঝেও সন্ধ্যাদেবীর আহ্বানের সুর বাজ্‌তে

থাকে। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও সে সুন্দরের আভাস পেয়ে গেয়ে উঠে—"বিষম তোমার লীলা প্রভু, প্রলয় নিয়ে খেলা'।

এই যে একটা আনন্দের সুর, এটা তার হৃদয় তন্ত্রীতে নীরবে বাজে না, সমস্ত মানুষটাকে নাচিয়ে নিয়ে চলে, তা'র নাচনের তালে তালে কাব্য ফুটে উঠে—তখন সে যেন আর এ জগতের নয়, একটা আলাদা জগৎ, একটা পৃথক রাজ্যের মধ্যে গিয়ে পড়ে সে। সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে যত সৌন্দর্য্য যত আনন্দ ছিল, সব তার চারিদিকে ঘিরে আসে। তখন সে খোঁজ পায়, সেই চিরসুন্দর আর সেই চিরসুন্দরের দেশ—যে অনন্তের প্রতীক্ষায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কতকাল থাক্‌ব তারও ঠিক নাই। তবে এটা ঠিক্, আমরা এগিয়ে চলেছি সেই দেশেরই পথে। কেন? ওগো বেরিয়েছি যে তারই খোঁজে।

২। যাত্রা

বিদায়যাত্রার কালে ভবিষ্যবিরহ চিন্তার বেদনা যে মিলনানন্দের জাগরণের সাড়া, তা' ক'জন বুঝে? যাত্রাপথের পথিকের পশ্চাতে ধূলামলিন বায়ুস্তর তা'র সম্মুখের স্বপনপুরীর চিত্রকে যে আরও উজ্জ্বল ক'রে তোলে, তা'ই বা ক'জন বুঝে?

দিনের পরে আঁধার ঘনিয়ে আসে—সাঁঝের তারার ক্ষীণ প্রভা সেই আঁধারে নীল জ্যোতিঃ ফুটিয়ে তোলে—সামান্য শক্তি বিরাটকে রূপ দেয়। পথিকের হাতের একতারার সেই রূপবন্দনার গুঞ্জন উঠে। নি কড়িয়া পথিক—নি-কড়িয়া তার ঝুলি সম্বল, পথেরও শেষ নাই, পথিকেরও ভিক্ষার ঝুলি পোরে না।

কোন্ দিনের অরুণ আলোয় রাঙা ধূলো পায়ের তলে মন্থন করে পথিক তা'র প্রথম যাত্রা সুরু করেছিল, তা কে জানে? সেই যে নিজের আঙ্গিনাটীর মায়া কাটিয়ে 'জয় রাধে কৃষ্ণ' ব'লে ভিক্ষার ঝুলিটী কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিল, সে কবে, কে জানে? সমুদ্রের বুকের পরে অতল প্রেমের রাশি কখন প্রথম ঢেউ হ'য়ে দেখা দিয়েছিল,—বনানীর সবুজরঙের প্রথম আভা কবে আলোর সাথে ফুটে উঠেছিল,—পথিকের নাচনের তালে বিদায়-গীতির রনুঝুণা কখন প্রথম গুঞ্জন তুলেছিল, তা' কে জানে?

বিদায় নিয়ে যে পথে চলার সুরু, সে পথের কবে কোথায়ই বা শেষ, যে আলো ছায়ায় ঘেরা স্বপনপুরীর উদ্দেশে প্রথম পা বাড়িয়েছিলাম, সে কতদূরে তা'ই বা কে জানে?

বহুদূর এসেছি, পৃথিবী যে দিন সূর্য্যদেবের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণের পথ প্রথম বেছে নি'লে, গ্রহ তারা যেদিন অপূর্ব্ব নিয়মে সৃষ্টিচক্রের গতিতে আবর্ত্তন সুরু করলে, সেইদিন তো আমার বিদায়-যাত্রার

সুরু, সেই ক্ষণেই তো ব্রজের ধুলির সাথে আলাপন—ব্রজের পথে গোপালের সাথে খেলায় মাতলাম্—বাঁশী শুনলাম—বাঁশীর তানে যমুনার জলে হিল্লোল বইল—সেই হিল্লোলে প্রাণে স্পন্দন জাগ্‌ল—পা আর দাঁড়াতে চায় না, নেচে উঠ্‌ল—ব্রজের পথে যাত্রার সুরু হো'ল।

৩। সাধনা

মানুষ সংসারের সুরে যখন সুর দেয়, তখন সে ডুবে যায় সেই সুরের রূপের মোহে। কিন্তু প্রত্যেকের বুকের ভিতর যে অব্যক্ত ধ্বনির গুঞ্জন উঠতে থাকে, সেটা ক'জন লোকে কাণ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করে!

শুধু চেষ্টায় হয় না, একটা পথ আছে, একটা তার অভিসার করতে হয়, সে অভিসারে যেতে হ'লে বৃন্দা সখীর দরকার হয়—তখন পায়ের খোঁজ পাওয়া যায়, সেই পথে যেথায় চরণের নূপুরের রিনিঝিনি ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে।

এই যে অভিসার, এইটী হ'চ্ছে মানব-মনের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত রাগিণী, যখন মানব সব ছেড়ে যায়, মোহ সব কাটিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যায় রাগিণীর মূর্চ্ছনায়। দূরাগত বৃন্দাবনের বাঁশীর ধ্বনি, তারস্বর রাধা রাধা ডাক, সে ডাকের উত্তর দিতে, সে বাঁশীর ধ্বনির সঙ্গে মনের সুর মেলাতে অভিসারে যেতে হয়।

কিন্তু যা'র জন্য অভিসার, সে যে অখণ্ড পরমানন্দ, এ যে সত্যসুন্দর,—তাই এ সাধনাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার। পার্ব্বতী শিবকে পতিরূপে কামনা করলেন, মদনকে সহায় নিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হোল সে সাধন। তারপরে যখন যোগিণী হ'য়ে রূপ সৌন্দর্য্য সব জলাঞ্জলি দিয়ে এক মনে, একচিত্ত হ'য়ে ভিক্ষা জানালেন, তখন মহাদেব নিজে এসে ভিখারী হ'য়ে দাঁড়ালেন। এই হচ্ছে বিরাটকে পাবার উপায়। 'মনে প্রাণে চাই', এই ভেবে, মান লজ্জা ভয়—এসব বৈভব ত্যাগ করে 'কৃষ্ণ চৈতন্য' বলে সে নীলসাগরে ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

সূর্য্য উঠ্‌ল, চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়্‌ল। তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে নানারঙের খেলা চল্‌তে লাগ্‌ল। সমস্তদিনের খেলার পর আলোক-কণারা বল্‌লে 'আর পারি না প্রভু'—অমনি সূর্য্য নিজের জ্যোতি সম্বরণ করলেন, যত আলোর কণা বিশ্ব-সংসারের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সব এসে মিশে গেল সেই অখণ্ড জ্যোতির মধ্যে। এই হচ্ছে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মর্ম্ম। প্রলয়ের মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। সেইটীই তো পূর্ণ হবার কাল—সে তো শেষ নয়। বর্ষার শেষ শ্রাবণে নয়—ভাদ্রতে। শ্রাবণে সংসারে জলের বাণ ডেকেছে—উপরেও কালো জলভরা মেঘের রাশি, নীচেও

গর্জ্জনের মধ্যে, তার উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে পূর্ণানন্দেরই পরিচয় পরিস্ফুট। এক কথায়, এইখানেই সুরু হো'ল নূতন দিন, নবীন জীবনের অঙ্কপাত হো'ল এইখানেই। দিনের সৃষ্টি যেমন অন্ধকারের গর্ভ হোতেই।

এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মতন সাধনাও চিরন্তন।

অভিসারের সুরে নিজের যন্ত্র বাঁধাই হচ্ছে সাধনার প্রথম সোপান। তারপর আস্তে আস্তে ঝঙ্কার তুলে, রাগিণীর আলাপ সুরু হোক্—শেষে মূর্চ্ছনাদি অলঙ্কার এসে সব প্রাণময় করে তুলবে।

বৈষ্ণবচরণাশ্রিত—শ্রীসুধীরকুমার সিংহ

মন্তব্য ও সংবাদ

মানবের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার— এড্‌মণ্ড বার্ক (১৭২৯—১৭৯৭) আয়র্লণ্ড দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, রাজনীতিবিৎ ও লেখক। তাঁহার ফরাসী-বিপ্লব সংক্রান্ত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কুযুক্তি প্রয়োগ করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ইংরাজজাতি চিরকালের জন্য নিজেদের উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণকে রাজা উইলিয়ম্ ও রাণী মেরির উত্তরাধিকারী বংশধরগণের চরণে রাজভক্তির রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

টমাস্ পেন্ তাঁহার 'মানবের অধিকার' (Rights or man) গ্রন্থে বার্কের মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

There never did, there never will, and there never can, exist a parliament or any description of men or any generation of men, in any country, possessed of the right or the power of binding and controlling posterity to the 'end of time', or of commanding for ever how the world shall be governed, or who shall govern it ; and therefore all such clauses, acts or declarations by which the makers of them attempt to do what they have neither the right nor the power

and generation must be as free to act for itself in all cases as the ages and generations which preceeded it. The vaniety and presumption of governing beyond the grave is the most ridiculous and insolent of all tyrannies. Man has no property in man ; neither has any generation a property in the generations which are to follow.

কোন প্রতিনিধি-সভার, কোন চিহ্নিত বা বিশিষ্ট মনুষ্যমণ্ডলীর, বা কোন যুগের সমগ্র মানবমণ্ডলীর, এমন কোন অধিকার বা শক্তি নাই, যাহার জোরে তাহারা তাহাদের ভবিষ্যতের বংশধরগণকে চিরকালের জন্য কোন সর্ত্তে বাঁধিতে বা কোনও নির্দ্দিষ্টপথে বাধ্য করিয়া পরিচালনা করিতে পারে। এই প্রকারের অধিকার বা শক্তি অতীতকালে কাহারও ছিল না, বর্ত্তমানে কাহারও নাই, ভবিষ্যতে কাহারও থাকিবে না এবং থাকিতে পারে না। কাহারও এমন অধিকার বা শক্তি নাই, যে ব্যবস্থা করিয়া যাইবে পৃথিবী চিরকাল কি ভাবে শাসিত হইবে, কে বা কাহারা শাসন করিবে। কাজেই, এই ধরণের যাবতীয় বিধান, আইন বা ঘোষণা, যাহার সাহায্যে তাহাদের নির্ম্মাতাগণ নিজেদের অধিকার ও শক্তি বহির্ভূত কার্য্য করিতে চাহে এবং এমন সব কার্য্য করিতে চাহে যাহা করিবার মত সামর্থ্য তাহাদের নাই, সেই সব বিধান, আইন ও ঘোষণা একেবারেই নিরর্থক ও অকিঞ্চিৎকর। প্রতেক যুগের বা প্রত্যেক যুগের মানবমণ্ডলীর নিজের কাজ নিজের বিবেচনার সাহায্যে করিবার স্বাধীনতা আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের এ স্বাধীনতা ছিল। আমরা মরিয়া যাইব, আর মরণের পরপার হইতে সমাজকে শাসন করিব, ইহা অপেক্ষা ঘৃণ্য, ও ভ্রান্ত-অহঙ্কারময় অত্যাচার আর কি হইতে পারে? মানুষ মানুষের সম্পত্তি নহে, কোন যুগের মানুষ পরবর্ত্তী যুগের মানুষকে নিজেদের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিবে না।

রামকেলি উৎসবের পর—

১৩৩১ সালে রামকেলি গিয়াছিলাম, আর এই ১৩৩৪ সালে আবার গেলাম। কি কি পরিবর্ত্তন চোখে লাগিল, তাহাই বলিতেছি। 'বারদুয়ারী' নবাবের প্রাচীন ঘরখানি সরকার বাহাদুরের অধিকৃত—Acquired by the Preservation of Ancient Monuments Act। পূর্ব্বে মেলার সময় যাত্রীরা এই ঘরে থাকিত, কীর্ত্তনাদি হইত ; মুসলমান ভ্রাতারা কখনই আপত্তি করেন নাই। এবার গিয়া প্রথমেই শুনিলাম—মুসলমানেরা আপত্তি করিয়াছিলেন, মারামারি করিবেন এমন কথাও প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন, ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বাড়ীতে যাত্রীদের বাস করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেখানে কড়া পুলিশ পাহারা আর কয়েকটি সরকারী তাঁবু। একসঙ্গে মাত্র ১২ জন লোক ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারে, তাহার বেশী নহে। আমরা দেখিতে যাই নাই।

বারদুয়ারী বন্ধ হওয়ায়, যাত্রীদের থাকার কিছু অসুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে নূতন রকমের সুবিধাও হইয়াছে। সংস্কার-সমিতি রূপসাগরের উত্তর তীরে, তিন বিঘা জমি কিনিয়া চালা ঘর করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ থোক্‌দার নামক একজন ভক্ত তাহার নিকটই জায়গা কিনিয়া চালা ঘর করিয়াছেন, কাশীমবাজারের মহারাজাও একটি জায়গা খরিদ করিয়াছেন, সতীশ কবিরাজ মহাশয়ও বাড়ী করিয়াছেন; যাত্রীগণ বিনাব্যয়ে এই সব স্থানে আশ্রয় পাওয়ায় অনেক সুবিধা হইয়াছে। খুটু ক্ষ্যাপার অন্নদান রামকেলি উৎসবের একটি প্রসিদ্ধ ব্যাপার, আরও অনেক ভক্ত মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। এবার দেখিলাম তিনটি নলকূপ (Tube-well) বসিয়াছে। গৌড় ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি, মালদহের···, আর ময়মনসিংহের মহারাজা, এই স্থানে নলকূপ তিনটি দিয়াছেন। একটি খুব বড় চৌবাচ্চা সর্ব্বদাই জলে পূর্ণ রাখায় পানীয় জলের অভাব হয় নাই।

রূপসাগরের সংস্কার, যাহার জন্য সমিতির প্রতিষ্ঠা সে কার্য্য একেবারে কিছুই হয় নাই। এই কাজের জন্য লালগোলার মহারাজা একহাজার, কাশিমবাজার পাঁচশত, ময়মনসিংহের মহারাজা একহাজার, জেলা বোর্ড একহাজার দিয়াছেন; আর গবর্ণমেণ্ট তিনহাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সমিতির হাতে কার্য্যতঃ ছয়হাজার টাকা আছে। রূপসাগরের কাজ কিন্তু এখনও কিছুই হয় নাই।

কাজ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এইরূপ। গবর্ণমেণ্ট টাকা দিবেন, কাজ করিয়া দিবেন জেলা-বোর্ডের ইন্‌জিনিয়ার। জেলাবোর্ড তাহার ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগকে কার্য্যটি করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তবে ইনজিনিয়ার, সমিতির সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন।

রূপসাগরের কাজ কিছুই হয় নাই বরং কিছু অকাজ হইয়াছে। আটশত টাকা একেবারে লোকসান হইয়াছে। কেন লোকসান হইয়াছে, সম্পাদকের কার্য্য বিবরণী হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"গত ফেব্রুয়ারী মাসে সমিতি রূপসাগরপঙ্কোদ্ধারে হাত দেন। জেলাবোর্ডের ইন্‌জিনিয়ার্ বাবু বোর্ডের মন্তব্য অনুসারে সম্পাদকের সহিত রামকেলিধামে আসিয়া পঙ্কোদ্ধার বিষয়ে উপদেশাদি দান করেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু তৎপর তিনি আদেশ করেন যে বর্ষার পূর্ব্বে পঙ্কোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এই উপলক্ষে অপ্রিয় কথার আলোচনার দরকার নাই, তবে অনর্থক ৮০০৲ টাকার উপর ব্যয় হওয়ায়, সমিতি ও সাধারণ লোক ইহাতে বিশেষরূপে কষ্ট পাইয়াছেন; অধিক কি, কাশিমবাজারের মহারাজা এবার আসিতে চাহিয়াও এই সংবাদ পাইয়া আর আসিতে ইচ্ছুক হইলেন না।"

ইংরাজবাজার রামকৃষ্ণ আশ্রমের নেতৃত্বে ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক মেলায় উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীদের সেবা করিয়াছেন। উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকগণের নেতা হইয়াছিলেন। উক্ত সমিতির সহিত এই কার্য্যের অবশ্য কোনই সম্পর্ক নাই—তবে সংস্কার-সমিতি হওয়ায় এদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি 'বয়স্কাউট'ও মেলায় কার্য্য করিয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের লোকেরা মেলায় গিয়া ওলাউঠার রঙ্গিন বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইতে দেখিয়া তাহাতে লোকের আতঙ্কবৃদ্ধি ছাড়া আর অন্য কিছুই কাজ হয় নাই। কলেরার টিকা লইবার জন্য তাঁহারা সকলকে আহ্বান করিতেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও পুলিশ সাহেব মেলায় উপস্থিত ছিলেন। দেশবন্ধু পল্লীসমিতির একজন কর্ম্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মেলাতে তাঁহারও লণ্ঠন-বক্তৃতা হইয়াছিল।

মোটের মাথায় রামকেলির উন্নতি হইতেছে, আরও উন্নতি হইবে। যাত্রীদের অভাব অসুবিধা ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে—আবার অল্পদিনের মধ্যে রামকেলি বেশ জমিয়া উঠিবে। এখন দরকার—যাহাতে রামকেলি বেশ ভালভাবে বাড়িয়া উঠে। তীর্থস্থানকে ভালরূপে বাড়িয়া উঠিতে হইলে কি কি প্রয়োজন সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

আমরা পরে জানিতে পারিলাম, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিন হাজার টাকা পাওয়া যায় নাই। কাজ দেখাইয়া সময়ে যথারীতি লওয়া হয় নাই বলিয়া টাকাটা Lapse হইয়া গিয়াছে। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

বেদের কুব্যাখ্যা—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রবর্ত্তিত ভ্রান্ত-পদ্ধতির অনুবর্ত্তনে পাণ্ডিত্যাভিমানী কতকগুলি লোক নানারূপ অপসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া সরলচিত্ত লোককে বিপথগামী করিতেছে। যাঁহারা বেদের দোহাই দিয়া কোন কথা বলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে দুইটি কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ সমগ্র বৈদিক-সাহিত্য আমরা পাই নাই, সুতরাং বেদে ইহা নাই বা উহা নাই—এই প্রকারের কথা (Negative proposition) বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের যে-অংশ আমরা পাই নাই, তাহাতে কি ছিল আমরা কেমন করিয়া বলিব? দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুসমাজ চিরকাল না হউক, অতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন—

"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।"

বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে ইতিহাস ও পুরাণ সমূহের আশ্রয় লইতে হইবে,—ইহাই প্রকৃত পথ।

বেদে গোমেধ-যজ্ঞের কথা আছে। এই কথা আশ্রয় করিয়া দুইজন পণ্ডিত হিন্দুসমাজে গোহত্যা এবং হিন্দুমুসলমানে মৈত্রী স্থাপনের জন্য এক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়

একপ্রকার হিংস্র গোজাতি ছিল ; অনেকে বলেন, তাহারাই গোমেধযজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে অষ্টম মণ্ডলে ১০২ সূক্তের ১৬শ ঋকে গোমাতা সম্বন্ধে যে শ্রুতি আছে, তাহা হিন্দুমাত্রেরই জানা উচিত।

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্রনু বোচং চিকিতুষে জনায় মাগা মনা গামদিতিং বধিষ্ট॥

রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী, অমৃতের উদ্ভবস্থান, নিরপরাধা, মহিমাময়ী গোকে বধ করিও না।

গোমেধ-যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রীচৈতন্য ভাগবত-গ্রন্থে আছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপের কাজির সহিত বন্ধুভাবে আলোচনা করিয়া সেই কাজিদ্বারা গোবধ নিষেধ করাইয়াছিলেন। মুসলমান সমাজের অনেক শিক্ষিত লোক মহম্মদীয় শাস্ত্রে অনেক সুমীমাংসার দ্বারা গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন ; আর পাশ্চাত্যবিদ্যা-বিড়ম্বিত-বুদ্ধি আর্য্যসন্তান উল্টা পথ ধরিয়া খ্যাতিলাভের চেষ্টা করিতেছেন।

বৈষ্ণবের মতভেদ—আমার যদি কোন ধর্ম্মমত থাকে, আমি যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হই, তাহা হইলে আমার বা আমার সম্প্রদায়ে মতগুলি আমার পক্ষে উত্তমরূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতের সহিত আমার মতের কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল আছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তফাৎ আছে, তাহাও জানিয়া রাখা দরকার। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বয়স্ক নরনারী এই প্রকারে নিজ নিজ মত বুঝিয়া লইলে, সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ে আর বিরোধ থাকিবে না ; তখন প্রচলিত ভাষায় যাহাকে 'হাত দেখাদেখি করিয়া খেল' বলে তাহাই চলিবে। আমি জানি তোমাতে আমাতে মিল কোথায়, তফাৎ কোথায়। অতএব আমরা যদি ভদ্রলোক হই, তাহা হইলে আমাদের যে যে বিষয়ে মিল আছে (Points of agreement) সেই সব বিষয়ে একত্রে আলোচনা করিলে যে যে জায়গায় তফাৎ থাকে, সেটা তুমিও জান, আমিও জানি, এইরূপ তফাৎ অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে, অতএব তাহা লইয়া পুনরায় আলোচনা করিয়া বিরোধ করিবার প্রয়োজন কি ? তবে যদি বিরোধের মীমাংসার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে, আমরা উভয়েই যদি মীমাংসার জন্য সরলপ্রাণে ইচ্ছুক হইয়া থাকি, তাহা হইলে আলোচনা চলিতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী বৈষ্ণব। কিন্তু ইহার মধ্যে কতপ্রকারের মতভেদ আছে তাহা আমরা জানি না। আমরা নিম্নে কয়েক প্রকারের মত দিলাম—প্রত্যেকে চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইবেন—তিনি কোন্ মতের লোক।

তিনি গার্হস্থ্য জীবনের ও সামাজিক জীবনের সর্ব্ববিধ বিধি-নিষেধের অতীত। এই প্রকারের বৈষ্ণবের মহিমা পুরাণাদিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার বৈষ্ণব রহিয়াছে—ইহারা জাতি বৈষ্ণব। এই জাতির উদ্ভব যে-প্রকারেই হউক, ইঁহারা গৃহস্থ ও ভদ্রলোক। প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণবের মহিমা ও অধিকার যদি প্রত্যেক জাতিবৈষ্ণব দাবি করেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা থাকে না। বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথা প্রকৃত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা না হইলেও, যাঁহারা জাতিভেদ মানেন, তাঁহারা এই জাতিভেদ প্রথাকেই সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া থাকেন।

এখন সমাজে প্রশ্ন হইতেছে—এই সব জাতিবৈষ্ণব অন্যান্য গৃহস্থ হিন্দুর ন্যায় অশৌচ পালন করিবেন কিনা? যদি পালন করেন, কয়দিন পালন করিবেন? অনেকে জানেন, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অশৌচপালন লইয়া ভয়ঙ্কর গৃহবিবাদ চলিতেছে।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা সামাজিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন—গৃহী বৈষ্ণবগণ কিভাবে এবং কতদিন অশৌচ পালন করিবেন। তাঁহাদের মতে গৃহী বৈষ্ণবেরা শূদ্রাচারে একমাস অশৌচ-পালন করিলেই ভাল হয়। অপর পক্ষ বলেন—বেদের কর্ম্মকাণ্ড অবিদ্যা, সুতরাং বৈষ্ণবেরা ইহা মানিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং অশৌচপালনাদি ব্যাপারে তাঁহারা হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিধি মানিতে প্রস্তুত নহেন। এই একপ্রকার মতভেদ—ইহা সামাজিক।

২। উপাসনা সম্বন্ধেও নানারূপ মতভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা এক বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে কি না? যে সব সামাজিক ব্রাহ্মণেরা গত চারিশত বৎসর ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের গৃহে কালী, দুর্গা, শিব, শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি হিন্দুদের সমুদয় দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। এখন কেহ কেহ বলিতেছেন, হিন্দুদের সব দেবতার পূজা বৈষ্ণবেরা করে না। এই একপ্রকার মতভেদ।

৩। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকে এতদিন শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিতেছিলেন—এখন কথা উঠিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিলে হইবে না—শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা কর।

এই মতভেদগুলির আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে মূলে একটিমাত্র সমস্যা। বৈষ্ণব-মতাবলম্বী লোকেরা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য মানিবেন কিনা? ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য মানিলেই জাতিভেদ মানিতে হইবে, কর্ম্মকাণ্ডের বিধি-নিষেধও কিয়ৎপরিমাণে মানিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে; ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য মানিলে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাও করিতে হইবে, যে-ভাবেই হউক অন্যান্য দেবতাকেও মানিতে হইবে। যাহা হউক্ এবিষয়ে মতামত দিবার দরকার নাই, সকলে চিন্তা করুন—বন্ধুভাবে আলোচনা করুন, শাস্ত্র

ব্রাহ্মণের আশা—হিন্দুসংগঠনের বিপুল আন্দোলন সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে চলিতেছে। শুদ্ধি, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, এই কয়েকটি কাজে অনেকেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। যাঁহারা কাজে লাগিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে এক মতাবলম্বী তাহা নহে। যাহা হউক কাজ চলিতেছে। একদল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহারাও সাধ্যমত বিপক্ষতা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা দুর্ব্বল। শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আমাদের সমাজের শিরোমণি। তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়া বলিতেছেন এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাই হিন্দুসমাজের আত্মা। বৌদ্ধবিপ্লবের ন্যায় বহুবিপ্লবে হিন্দুসমাজ উৎপীড়িত হইয়াছে, কিন্তু পরিশেষে আবার এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাই সমাজ রক্ষা করিয়াছেন। এবারেও তাহাই হইবে। 'বঙ্গবাসী'-পত্রে এই প্রকারের একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমরাও আনন্দিত হইলাম। সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই দুইটি বিরোধীদল দ্বন্দ্ব করিয়া থাকে—একটি স্থিতিশীল, আর একটি গতিশীল। ইহাদের মধ্যে কখন একটি, কখন অপরটি প্রবল হয়—আবার কিছুদিনের জন্য উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সামঞ্জস্যের যুগই প্রকৃত গঠনের যুগ। যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, নিজের শাস্ত্রে ও নিজের সাধনায় যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা শান্তভাবে আত্মরক্ষা করুন, ভিতরে সত্য থাকিলে তাঁহাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সরল-প্রাণ ও অকৃত্রিম সমাজহিতৈষী কর্ম্মিগণ কর্ম্ম করুন, সমাজের মঙ্গলের জন্য দলে দলে আত্মোৎসর্গ করুন, প্রকৃত ব্রাহ্মণ কখনই আপনাদের বিরোধী হইবেন না। তবে কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করুন, অন্য কোন মতলব লইয়া নয়। আর সৎব্রাহ্মণেরা অসচ্চরিত্র ও স্বার্থপর, বিদেশীয় রাজশক্তির পদলেহনকারী নরপিশাচদের আনুগত্য ত্যাগ করুন, সহরের কোলাহল, এবং সংবাদপত্রও সভা-সমিতির উত্তেজনা পরিত্যাগ করিয়া কুটিরে বসিয়া তপস্যা করুন; সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। দেশের কাজে কেহ কখনও প্রকৃত বিরোধী নহে—নানা প্রকার মতভেদে চঞ্চল হইবেন না; তাহা হইলে সনাতন ধর্ম্মের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

ব্রহ্মণ্যদেবের শুভ-ইচ্ছায় বিশ্বাস করুন, নব্যভারতের সাধনাপথ আত্মহত্যার পথ নহে, আত্ম-রক্ষার পথ, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মলাভ ও আত্মপ্রসারণের পথ। তরুণ সঙ্ঘ জাগিতেছে—ইহারা জাগিবে। আজ যদি প্রথম জাগরণের মোহঘোরে অন্যায়ও কিছু করে, ভয়ের কারণ নাই। স্বয়ং ভগবান্ রথ চালাইতেছেন, তোমরা নারায়ণীসেনা, আজ আর অধর্ম্মের পক্ষে যুঝিবে না, আজ ধর্ম্মের পক্ষে তোমরা সমবেত!

বৌদ্ধবিপ্লবের পর যে-হিন্দুসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঠিক্ আগেকার হিন্দুসমাজ নহে। পরিবর্ত্তনই নিয়ম; তবে আত্মপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া বিধিনির্দ্দিষ্ট বিকাশ-পন্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে।

জ্ঞানের আলোচনা দরকার, ধর্ম্মের সমগ্র সাধনা আবশ্যক। সচ্চরিত্র ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণই এই তপস্যায় নিযুক্ত হউন। ব্রহ্মণ্যদেবের ইহাই যুগবাণী।

অবরোধ-প্রথা—মহাত্মাজীর অভিমত—'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' "জনৈক পাঠক" অবরোধ প্রথা সমর্থন করিয়া মহাত্মাজীর নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। উহার উত্তরে মহাত্মাজী ২৪-৩-২৭ তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে লিখিতেছেন—"পর্দ্দাপ্রথা সমর্থন করিয়া আপনি যে চিঠিখানা লিখিয়াছেন, তাহা আমি প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করি না। আমার মত এই যে, পর্দ্দাপ্রথা অনেকটা আধুনিক, হিন্দুদের অধঃপতনের সময় উহার সৃষ্টি হয়। যে-যুগে গর্ব্বিতা দ্রৌপদী, অথবা নিষ্কলঙ্ক-সীতা বাস করিতেন, সে যুগে পর্দ্দাপ্রথার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। গার্গীর পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করা সম্ভব ছিল না। তারপর, ভারতেরও সর্ব্বত্র পর্দ্দার অস্তিত্ব নাই; দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও পাঞ্জাবে উহা অজ্ঞাত। কৃষকদের মধ্যেও পর্দ্দাপ্রথা নাই। এই সমস্ত প্রদেশে এবং কৃষকদের স্ত্রীলোকেরা যে আংশিক স্বাধীনতা উপভোগ করে, এজন্য কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। আর একথা বলাও সত্য নহে যে, পর্দ্দার অস্তিত্ব নাই বলিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নৈতিক হিসাবে কম উন্নত। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র "জনৈক পাঠক" যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই সমর্থন করিতে চান। প্রাচীন ভারত আমাদিগকে যে নৈতিক আদর্শ দান করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চ কিছু হইতে পারে না, উহাই আমার মত। কিন্তু প্রত্যেক খুটিনাটিতেও প্রাচীনগণ অভ্রান্ত ছিলেন, এই মত আমি সমর্থন করিতে পারি না। আর কোনটা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন তাহা কে বলিবে? ১০৮টী উপনিষদের সকলগুলিই কি সমান মর্য্যাদাবিশিষ্ট? আমার মনে হয়, সম্ভব মত প্রত্যেক জিনিষকেই যুক্তি দিয়া বিচার করা উচিত এবং যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা প্রাচীন পোষাক পরিহিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত।

দুর্জ্জয় মান

রচয়িতা—জগন্নাথ দাস

[বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, খানা-জংসন ষ্টেসনের আট নয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বাংশে জোয়াড়া গোপালপুর গ্রামে, জগন্নাথ দাস বৈরাগ্য নামে একজন খ্যাতনামা রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া বাস করিতেন।

শতকের মধ্যাংশ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। কীর্ত্তন গান ইঁহাদের বংশগত ব্যবসায়—তাঁহার বংশধরগণ এখনও কীর্ত্তনগান করিয়া থাকেন।

আমরা, জগন্নাথের স্বহস্তলিখিত—'দুর্জ্জয় মান', 'বংশীহরণ', 'কুরুক্ষেত্রে মিলন', 'নন্দবিদায়' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ প্রাপ্ত হইয়াছি। এগুলিতে তিনি নিজ নামের ভনিতা দেন নাই। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার রচিত কয়েকটি পদও প্রাপ্ত হইয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভগুলির বিশেষত্ব এই যে—রস-কীর্ত্তনের পালাবন্দীগানে এক একটি আখ্যায়িকা-বিশেষের, বিভিন্ন পদকর্ত্তা রচিত পদাবলী সজ্জিত করিয়া যে ধারা অনুসৃত হয়, রস-পর্য্যায়ের ক্রম ঠিক্ রাখিয়া, এবং 'উজ্জ্বল-নীলমণি" প্রভৃতি রসগ্রন্থ-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া, সেই রসধারার পুষ্টিসাধন কল্পে, সন্দর্ভাকারে আখ্যায়িকাগুলি রচিত হইয়াছে। এইভাবে, রস-কীর্ত্তনের অবলম্বিত এক একটি আখ্যায়িকা-বিশেষ, রস-শাস্ত্রে সম্মত সরল সন্দর্ভাকারে রচনা করিয়া, তিনি জনসাধারণের সহজে রস-কীর্ত্তনের মর্ম্ম অবধারণ করিবার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

এই সন্দর্ভগুলির অপর বিশেষত্ব এই যে,—পয়ার ছন্দে রচিত অনতিদীর্ঘ এই আখ্যায়িকাগুলি কীর্ত্তনাকারে গান করাও চলে। অনেক প্রাচীন মহাজন-পদাবলীর ভাব অবিকল গ্রহণ পূর্ব্বক, এই সন্দর্ভগুলি মধ্যে যথাস্থানে সুবিন্যস্ত করিয়া সমুজ্জ্বল করা হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব সন্দর্ভগুলি আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব।—শ্রীশিবরতন মিত্র]

সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলিলা নিকুঞ্জে।
নানা পুষ্প বিকশিত অলিকুল গুঞ্জে॥
কুঞ্জ প্রবেশিয়া রাই পুষ্পশয্যা করে।
প্রাণনাথ আসিবেন কুঞ্জের ভিতরে॥
'বাসকসজ্জিকা' নাম কহিএ তাহারে।
আপন অঙ্গের বেশ করে কহিবারে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া রহে কুঞ্জপথ হেরি।
মৌনব্রতা দ্বারেতে ঈক্ষণমাত্র করি॥
তবে রাধা সখীবর্গে কহে বারেবার।
কুঞ্জ সব সাজাইল বিবিধ প্রকার ॥১০

ঋতুপতি রজনী, তাহাতে কৃষ্ণ-সঙ্গ।
কহিতে কহিতে ধনি পুলকিত অঙ্গ॥
কর্পূর বাসিত সুবাসিত জল ভরি।
রাখহ শয্যার কাছে বহু যত্ন করি॥
অঙ্গের ভূষণ সখী কর পুনর্ব্বার।
কণ্ঠেতে ঝরিয়া পড়ে অমিয়ার ধার॥
সঙ্কেত আছিল কুঞ্জে গমন করিতে।
চন্দ্রাবলীগণ সঙ্গে দেখা হলো পথে॥
ধরিয়া লইয়া গেল চন্দ্রাবলীর কাছে।
যাইতে না পাইল কৃষ্ণ সেই নিশি মাঝে ॥২২

আজি মোর আনন্দ বাঢ়িল ক্ষণে ক্ষণে।

এই মতে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গেল।

এই মত কতক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে ।
প্রবল উৎকণ্ঠা আসি হইল আচম্বিতে ॥
ক্ষেণে ঘর বাহির করএ বেরি বেরি বেরি ।
কিছু নাহি শুনে, রহে আপনা পাসরি ॥
আজ কুঞ্জে যাব বলি সঙ্কেত আছিল ।
পথমধ্যে বুঝি কিছু বিঘটন হৈল ॥
অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, রাত্রি গোঙাইতে নারে ।
একদৃষ্টি রহি পথ নিরীক্ষণ করে ॥
এইরূপে রাধিকার কতক্ষণ যায় ।
বেশভূষা হৈল সব অনলের প্রায় ॥৩৪

তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল এইমতে ।
নৈরাশ হইয়া রাধা পড়িলা ভূমিতে ॥
অতি কষ্টে সেই রাত্রি করিলা বঞ্চন ।
সখীর সহিত রাত্রি কৈল জাগরণ ॥
কন্দর্পের শরে অতি জর-জর হৈয়া ।
আছেন প্রভাতে কুঞ্জদ্বারেতে বসিয়া ॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ আইল সেই থানে ।
দেখিল অঙ্গেতে সব রতির লক্ষণে ॥
কৃষ্ণ আসি প্রণত হইয়া কথা কয়ে ।
দেখিতে অসুখ বহু বাড়িল হৃদয়ে ॥
অনুনয় বিনয় করিতে তার আগে ।
মহা ঈর্ষ্যা-দৃষ্টি করি কহে অনুরাগে ॥৪৬

কণ্ঠাগত প্রাণ যদি হয়াছে তাহার ।
দেখিতেই ঈর্ষ্যা ক্রোধ বাড়িল অপার ॥
হে মাধব, কেশব, যাহ সেই থানে ।

সরসিজ লোচনে তার স্থানে গিয়া ।
সেবন করহ তুমি নিযুক্ত হইয়া ॥
রজনীজনিত গুরু ওজাগর হৈতে ।
কষায়িত লোচন হয়েছে সুনিশ্চিতে ॥
যদি কহ নেত্র মোর সহজে অরুণ ।
তবে কেন নয়নে ঘুর্ণিত অনুক্ষণ ॥
কজ্জলবলিত বিলোচন সে তোমার ।
চুম্বনেতে বিলোচিত নিলীম আকার ॥
স্মরসঙ্করে তেমার লক্ষ ক্ষত অঙ্গ ।
নিশিতে আছিলে কোন যুবতীর সঙ্গ ॥
অনুগত জনেরে বঞ্চনা কেন কর ।
অনঙ্গ সঙ্গেতে যার জন্মিয়াছে জ্বর ॥
পুতনার বধ তাহা করিলে বিস্তার ।
বাল্য হৈতে নির্দ্দয় হয় চরিত্র তোমার ॥
শুনহে কিতব তোমা করি আলোকন ।
অতিশয় লজ্জা মোর বাড়ে অনুক্ষণ ॥
অবলা কবল করি ফির বনে বনে ।
প্রভাতে আইলে দুঃখ দিতে মোর স্থানে ॥
নয়নে কজ্জল লাগি আছে দেশে দেশে ।
প্রিয় সখীবর্গ দেখি করে উপহাসে ॥
অধরে তাম্বুলরাগ অতি শোভা করে ।
দেখি সখিবর্গ সব উপহাস ধরে ॥
নখাঘাত বক্ষস্থলে দেখি যে তোমার ।
অলস নয়ন দেখি অতি দুঃখভার ॥
কহিতে কহিতে ঈর্ষ্যা বাড়িল অপার ।
যাহ যাহ করি বলি বলে বারে বার ॥৭৬

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি

শুন প্রিয়ে চারুশীলে অকারণ মান।
মুঞ্চহ সকল তুমি দেহ মোরে দান॥
চারুশীলে তুমি অকারণ মান লয়া।
কিবা সুখ পাও তুমি মোরে দুঃখ দিয়া॥
তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে না পারি।
কাম অগ্নি আমার মানস দাহ করি॥
শুন প্রিয়ে কহ তুমি কিঞ্চিৎ বচন।
কহিলে আমার দুঃখ হবে বিমোচন॥
তুয়া দন্তরুচিরূপ কৌমুদী সকল।
অতি ঘোর তিমির নাশিব মহাবল॥
তোমার বচনচন্দ্র অমৃতের ধার।
ঝরি পড়ে দেখি লুব্ধ নয়ন আমার॥
চকোর সদৃশ মোর নয়ন যুগল।
স্ফুরিত অধর সুধা দেখিয়া বিকল॥
হে রাধিকা, প্রসন্নবদনে সত্য বদি।
আমাতে কোপিনী যদি আছ নিরবধি॥
তবে খর নয়নের শর তীক্ষ্ণ করি।
প্রহার করহ মোরে মনোরথ ভরি॥
শুন বৃষভানুসুতা বল্লভ তোমার।
ক্ষেমহ আমার দোষ চাহ একবার॥
মুরলি ধরিনু তুয়া নামের কারণে।
অহর্নিশি গান করি বুলি বৃন্দাবনে॥
যদি দুখ আছে চিত্তে করিবে তাড়ন।
ভুজ যুগে মোর অঙ্গ করহ বন্ধন॥
স্ফুরিত অধর সুধা পান করিবারে।
নয়ন-চকোর মোর উৎকণ্ঠা আচরে॥
শ্রীমুখকমলমধু দেহ মোরে দান।

সত্য যদি আমা প্রতি আছ কোপবতী।
নয়ন সন্ধান বান কর মোর প্রতি॥
যে দণ্ড করিলে সুখ উপজে তোমার।
সেই দণ্ড করি মোরে কর অঙ্গীকার॥
ভুজ দণ্ডে বান্ধি যদি না হয় সন্তোষ।
দশনে দংশন কর যাতে পরিতোষ॥
নিভৃতে বান্ধিয়া মোরে রাখ কুঞ্জ ঘরে।
দণ্ড করি নির্ভয়তা করহ আমারে॥
যদি মোর অতি দোষ হয় তুয়া স্থানে।
হাসিয়া ফেলাহ কিছু না করিহ মনে॥
তুমি মোর জীবন-ভূষণ রত্ন-খনি।
ভব-সমুদ্রের মাঝে রত্ন করি মানি॥
আমার মস্তকে তুয়া চরণ পল্লব।
অর্পণ করহ সেহ আমার দুর্লভ॥১১৮

অতি গূঢ় মান আসি বাড়িল অন্তরে।
সখীবর্গ কিছু আর কহিতে না পারে॥
কৃষ্ণ দেখিলেন বহু মান ঈর্ষ্যা তার।
সময় বুঝিয়ে কিছু না কহিল আর॥
কতক্ষণ থাকি কৃষ্ণ ধরিলা চরণে।
ঠেলিয়া ফেলিল হস্ত অতি কোপ মনে॥
হস্তের উপরে দিল তাম্বুলের বিড়া।
খণ্ড খণ্ড করি ফেলিল সব ছিঁড়া॥
পদ্মমালা গলে পরাইতে মুক্তা হার।
সেইখানে ছিড়িয়া করিল ছারখার॥
সুবাসিত কর্পূর চন্দন পরাইতে।

দেখিলেন গাঢ় মান না হয় ভঞ্জন।
নিবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণ করিলা গমন॥
মুখরার নিকটে হৃদয় বাটী আছে।
রাধিকার কেলিকুঞ্জ আছে তার কাছে॥
তার মধ্যে মাধবী কুঞ্জ মনোহর।
বসিয়া আছেন রাধা তাহার অন্তর॥
চারিদিকে সখীবর্গ আছেন বেড়িয়া।
ঝরিছে নয়ন জল বয়ান বহিয়া॥
ললিতা সম্বোধি কিছু কহে দুঃখবাণী।
আপনার আচার অভাগ্য করি মানি॥১৪০

শুন প্রাণ সখি মোর বিধি নিদারুণা।
কৃষ্ণের আদর-বাক্যে হইনু বঞ্চনা॥
হস্তেতে গাঁথিয়া মালা পরাইল গলে।
ছিণ্ডিয়া ফেলিনু তাহা মহা কোপানলে॥
মুক্তাহার পরাইল মোরে বারে বার।
মহা কোপাবশে ছিণ্ডি কৈল ছারখার॥
সেই হার ভুজঙ্গিনী দংশিল আমারে।
জলন্ত আগুনি যেন দহে কলেবরে॥
ধূলায় ধূসর চূড়া পড়িল চরণে।
তাহা আমি ফিরিয়া না চাহিলাম ভাল মনে॥
কোটি কোটি কাম মূরছিত যারে দেখি।
ঝর ঝর তাহার ঝরিল দুটি আঁখি॥১৫২

মানময়ী রাধা শুন যুকতি আমার।
মাধবে যুকতি নহে মান করিবার॥
কি রাধিকার সুখ আছে মন্দির ভিতরে।

শুন শুন মানময়ী রাধা ঠাকুরাণী।
মাধবে তোমার মান যুক্ত নাহি মানি॥১৫৮

মদন কুঞ্জেতে গিয়া বৈঠল শ্যাম।
ঘন ঘন হৃদয়ে জপয়ে রাধা নাম॥
কহিতে লাগিলা বৃন্দা সখী মুখ চাই।
আমার উপরে মান করিয়াছে রাই॥
বৃন্দাদেবী করধরি ছলছল আঁখি।
রাধার মিলন হৈলে তবে প্রাণ রাখি॥
তোমাকে যাইতে হৈল রাধার নিকটে।
মদন অনলে প্রাণ জ্বলে জ্বলে উঠে॥
তোমা বিনে মনের মরম কারে কব।
রাধা না পাইলে আমি তনু তেয়াগিব॥১৬৮

তোঁহ বড় সুচতুরী সখীর সমাজ।
রাধার নিকটে যাও না কর বেয়াজ॥
জানিল তোমার হিয়ে বড়ই পাষাণ।
কেমন করিয়া আমি ভাঙ্গাইব মান॥
তোমার পিরীতি রীতি আমি ভাল জানি।
হাতে হাতে তোরে কত শিখাইব আমি॥
বলেছিলে যাব কুঞ্জে তুমি নাই গেলে।
রজনী জাগায়ে তার এত দুঃখ দিলে॥
তোমার মিনতি রাখি একবার যাব।
প্রকার করিয়া আমি তাহারে বুঝাব॥১৭৮

প্রবোধ করিয়া দূতি গমন করিল।

নাগরের দূতি দেখি মান বেড়ে গেল।
বয়ান ফিরিয়া রাধা অমি বসিল॥
ললিতারে কহে কথা মনে বিচারিয়া।
রাধা কেন বসিলেন বয়ান ফিরিয়া॥
চন্দ্রাবলী সঙ্গে কৃষ্ণ বঞ্চিলা রজনী।
বসিয়া আছেন কুঞ্জে হইয়া মানিনী॥
হাসি হাসি কাছে বসি কহিল রাধারে।
এই লঘু দোষে ত্যাগ করিছ নাগরে॥
উঠ উঠ সুন্দরী মান দূরে করি।
এখানে আনিয়া কুঞ্জে মিলাব শ্রীহরি॥১৯০

বৃন্দাদেবী কোলে করি হস্তধরি কয়।
কৃষ্ণের উপরে মান উপযুক্ত নয়॥
ফটকিয়ে হাত অমি ছিনিয়া ফেলিল।
রাধিকার প্রতি বৃন্দা বড়ই রুষিল॥
সহজে গোয়ালা মেয়ে স্বভাব না ছাড়।
আমরা সে কেউ নই—মান হৈল বড়॥
অঙ্গুলীর দোষে সখী বাহু কাটা যায়।
এক দোষে শতগুণ বিনাশ না হয়॥
চান্দের উদয়ে ত্রিভুবন আলা করে।
পদ্ম মলিন হয় বলি নিন্দা কর তারে॥
স্থাবর জঙ্গম আদি পশুপক্ষীগণ।
জল বিনে সবাকার না রহে জীবন॥
জল পরশিলে সে কাগজ নষ্ট যায়।
জল নিন্দা কর তুমি এই অভিপ্রায়॥
সবাকার জীবন পবন সুখসার।

এইদোষে তাহার নিন্দা করহ রাধিকা।
তোমার মত কত কত আছয়ে নায়িকা॥
মধুলোভে ভ্রমর মাতিয়ে বুলে ভেসে।
কমল ভরমে যদি চম্পকেতে বসে॥
এ দোষে ভ্রমর নিন্দা কর কি লাগিয়া।
আপনি যেমন বুঝ গোয়ালার মেয়া॥
ষোড়শ' গোপিণী মাঝে বসে থাকে যে।
তাহার উপরে এত মান করে কে॥২১৬

না বুঝিয়া বৃন্দাদেবী কি বল আমারে।
এক দোষে শত গুণ সেহ নাশ করে॥
জপতপ দানধ্যান করে ইহা যেই।
দীনহীন জনে যদি তার দয়া নাই॥
রূপে গুণে কুলেশীলে সব যার ভাল।
লোচন বিহনে তার সব বৃথা হলো॥
কানুর পিরীতি রীতি আমি জানি ভালে।
অনেক মিনতি করি আমারে সে বলে॥
বংশী পরশি যবে সপতি করিল।
তবে সে আমার মনে প্রতীতি জন্মিল॥
আমারে সঙ্কেত করি রহে অন্যস্থানে।
বারে বারে তার কথা না শুনি যে কানে॥
চম্পকের মূলেতে কর্পূরে যদি নাহি পাই।
তবে সে তাহার সঙ্গে মিলি এক ঠাঁই॥২৩০

রাইর নিঠুর বাণী শুনি সহচরী।
কৃষ্ণের নিকটে আসি কহে ধীরি ধীরি॥
রাধার দেখিলাম বড় দুর্জ্জয় মান।

ক-শব্দ শুনিয়াই হস্ত দিল কানে।
জৈমিনী জৈমিনী মুখে করয়ে স্মরণে ॥
নীলবসনের বস্ত্র ঘুচায়া ফেলেছে।
অতি মনোহর সাড়ী অঙ্গেতে পরেছে।
নবঘন দেখি ক্রোধে চান্দয়া খাটাই।
শ্যামবর্ণ সখী কাছে আর কেহ নাই ॥
তরুণ তমালে চূণ লেপন করিল।
শুক পীক আদি পক্ষ কুঞ্জে না রাখিল ॥
ভুজের উপরে কাল রেখা এক ছিল।
চন্দনের বিন্দু আনি তত্তুপরি দিল ॥
জলে করি ধোয়াইল নয়ন কাজর।
মলয়জ আনি দিল কুচের উপর ॥
চারু শ্রীবুক পর এক তিল ছিল।
চন্দন আনিয়া তার উপরেতে দিল ॥
মধুকর ডরে ধনি চম্পকের তলে।
নীল চিকুর দেখি মুকুর ভাঙ্গি ফেলে ॥
শুক পক্ষী ছিল এক পিঞ্জর ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ বলি সেই ডাকে উচ্চৈস্বরে।
মানভরে ক্রোধ করি পিঞ্জর ধরিয়া।
ঝট্‌কি ফেলিল তারে আমি ধরি ধেয়া ॥
সমুদ্রের সম কোপ, মেরু সম মান।
তার মাঝে হাম ভেল রেণু সমান।
কোন রূপ ধরি যদি যেতে পার কান।
তবে সে রাইর ভাঙ্গে দুর্জ্জয় মান ॥২৫৮

নাগরে সাজায়ে দিল নাগরিনী বেশ।

কুণ্ডল খুলিয়া কর্ণে ফুল পরাইল।
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু শোভা ভাল হৈল ॥
কেশর মৃত্তিকা আমি মাখাইল অঙ্গে।
স্বর্ণচুড়ী হাতে দিল আপনার রঙ্গে ॥
পয়োধর করি দিল কদম্ব কেশরে।
চরণে আল্‌তা দেখ শোভা ভাল করে ॥
চরণে নূপুর রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে।
রাধানামে বিদেশিনী বীণাযন্ত্র সাজে ॥
বামপদ বাড়াইল নারীর স্বভাবে।
দাড়াইয়া বৃন্দাদেবী চেয়ে দেখে তবে ॥২৭০

রাধার নিকটে যায় হয়া হরষিতে।
ললিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে ॥
বীণার সুতান শুনি হরে নিল চিত।
রাইর নিকটে চেয়ে কহিল তুরিত ॥
কোথা হৈতে বিদেশিনী এলো এক জন।
বীণা যন্ত্রে গান শুনি জুড়াইল মন ॥
রাধা বলে আন গিয়া আমার নিকটে।
বীণাযন্ত্রে গান করে বিদেশিনী বটে ॥
শুনিয়া রাইর কথা ললিতা বলিল।
বিদেশিনী কাছে গিয়া উপনীত হৈল ॥
আনন্দে গোবিন্দ অতি প্রেমরসে ভাসে।
রাধার নিকটে যায় পরম উল্লাসে ॥২৮২

বসিয়া আছেন রাধা সখীর সমাজে।
করে ধরি বিদেশিনী বসাইলা কাছে ॥
কোন্ দেশে ছিলা তুমি কিবা তোমার নাম।

রাজার ভয়েতে দেশ ছেড়ে এসেছি।
মান করে প্রাণনাথ হারা হয়েছি ॥
মনের মরম সখী কহিব কাহারে।
কৃপা করি দাসী যদি রাখহ আমারে ॥২৯০

মধুর বীণার ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণে।
সব পাসরিলা রাধা হরিলা গেয়ানে ॥
অঙ্গের খুলিয়া দেয় যত আভরণ।
হাসি হাসি বিদেশিনী ফিরায় বদন ॥

কহনা আমারে সখী কোন্ ধন চায়।
যাহা চায় তাহা দিব বয়ান ফিরায় ॥২৯৬

নন্দের নন্দনে যত করিয়াছ মান।
মান-রতন ধন মোরে দেহ দান ॥
হাসিয়া বদনে রাধা বস্ত্র আচ্ছাদিল।
সব দুখ দূরে গেল আনন্দ বাড়িল ॥
নারী হয়া দাসী হতে এলে মোর স্থান।
তোমার উপরে আর না করিব মান ॥৩০০

॥ ইতি দুর্জ্জয় মান ॥

লেখক— শ্রীজগমোহন দাস বৈরাগ্য।

'রতন'-লাইব্রেরী পুঁথি নং ২৪৩৪।

শ্রীশিবরতন মিত্র

চৌর্য্যলীলা—শ্রীকৃষ্ণ চোর

শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের দুইটি পদ

১

কুতকিন্নসময়বৎসবিমোচন, চৌর্য্যবিশঙ্কিত চঞ্চল লোচন।
আক্রোশনকৃতহসিতাড়ম্বর, মুখপাটবকৃতলুণ্ঠন সম্বর।
রচিতোলূখল পৃষ্ঠ বিরাজন, রন্ধ্রিতশিক্যস্থিতবরভাজন।
গব্যবিনির্ম্মিত কপিকুলরঞ্জন, কল্পিতনবদধিহণ্ডীভঞ্জন।
জননীলক্ষিতসভয়বিলোচন, জয় জয় গোকুলপদ্ম-বিরোচন॥

২

গৃহং সখি করালিকে প্রবিশতিস্মনীলঃ শিশু-
দৃঢ়ীকুরু কবাটিকাং দধিহরং দধাম্যুদ্ধরং।
ইতি প্রকটমীরিতে মুখরয়া মহাশঙ্কটং
বিলোক্য তনুকঙ্কটীকৃততমা হরিঃ পাতু বঃ॥

(বঙ্গানুবাদ)

১

হে কুতকি! অসময়ে গরুর বাছুর খুলিয়া দাও; যখন চুরি কর, ভয়ে ভয়ে চঞ্চল চোখেতে চাও; কেহ আক্রোশ করিলে খুব হাসিতে থাক; মুখের খুব সুন্দর ভঙ্গী করিয়া চুরির অপরাধ আচ্ছাদন কর; উদূখলের উপর দাঁড়াইয়া শিকার উপর রক্ষিত ভাণ্ডে ছিদ্র করিয়া গব্যের দ্বারা বানরগণকে তৃপ্ত কর; নূতন দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দাও; মা যশোদা

চাহিলে তোমার দৃষ্টি ভয়-ব্যাকুলিত হয় ; ব্রজের পদ্ম বিকাশক সূর্য্য, তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক।

২

একদিন দধি চুরি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মুখরানাম্নী এক গোপীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। মুখরা জানিতে পারিয়া করালিকাকে বলিতেছে,—"সখি, করালিকে, দধি চুরি করিতে কৃষ্ণ ঘরে ঢুকিয়াছে, তুমি শক্ত করিয়া ঘরের কপাট বন্ধ কর, আজ চোর ধরিব।" কপাট বন্ধ হইল, শ্রীকৃষ্ণ নিরুপায়। ঘর অন্ধকার ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শরীর এত কাল করিয়া ফেলিলেন যে, সেই আঁধারে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। এইরূপ নীলাকার শ্রীহরি তোমাদের রক্ষা করুন।

তিনটি প্রাচীন ও প্রচলিত শ্লোক

১

কস্ত্বং বাল! বলানুজঃ, কিমিহ ভো, মন্মন্দিরাশঙ্কয়া
বুদ্ধং, তন্নবনীতকুম্ভবিবরে হস্তং কথং ন্যস্যসি ?
কর্ত্তুং তত্র পিপীলিকাপনয়নং সুপ্তা কিমুদ্বোধিতাঃ
বালা বৎসগতিং বিদিতুমিতি সংজল্পন্ হরিঃ পাতু বঃ॥

ননিচুরি করার জন্য শিশু শ্রীকৃষ্ণ এক গোপীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। গোপী বাহিরে ছিল, ঘরের দুয়ারে আসিয়া অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছে না, কেবল মনে হইতেছে, যেন একটা ছোট ছেলে ঘরের কোণে নড়াচড়া করিতেছে। গোপী জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কে, ছোট ছেলের মতো, ঘরের কোনে নড়াচড়া করিতেছে ? কে, তুমি ছোট ছেলে কে" ? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, ধরা তো পড়িয়াছি, এখন কি করি ? সপ্রতিভভাবে গম্ভীরস্বরে জবাব দিলেন,—"আমি, আমার বলাই দাদার ভাই।" গোপী বলিলেন—"ও, তুমি তোমার বলাই দাদার ভাই, তা' এখানে কেন বাছা!" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ভুল হইয়াছে, ভুল হইয়াছে। নিজের বাড়ী মনে করিয়া ভুলিয়া তোমাদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছি।" গোপী তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, আর প্রথমটা আলো হইতে আঁধার

আসিয়া বলিতেছে,—"বেশ ভাল কথা, তুমি তোমার বলাই দাদার ভাই, ভুল করিয়া নিজের বাড়ী ভাবিয়া আমার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছ, সবই বুঝিলাম। তবে, বাছা, ননির ভাঁড়ের ভিতর হাত ডুবাইতেছ কেন"? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ওগো, কিছু নয়, কিছু নয়। ননির ভাঁড়ে পিঁপ্ড়ে, থক্ থক্ করিতেছে, আমি বলি এত যত্নে তোলা ননি পিঁপ্ড়ায় কেন খায়, তাই ভাঁড়ের ভিতর হাত ডুবাইয়া পিঁপ্ড়া তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি বুঝি ভাল দেখিতে পাও না?" শ্রীকৃষ্ণের দুখানি হাত—একখানি ননির ভাঁড়ে দিয়াছেন, যাহা হয় একটা কিছু করিতেছেন। আর একখানি হাত, চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই পাশে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘুমাইতেছে, তাহাদের কাহাকেও কিল মারিতেছেন, কাহাকেও চিম্‌টি কাটিতেছেন, কাহারও বা চুল ধরিয়া টানিতেছেন। গোপী জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বেশ ভাল কথা, ননির ভাঁড়ের পিঁপড়া তাড়াইতেছ! কিন্তু, এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ঘুমাইতেছে. ইহাদের জাগাইতেছ কেন?" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"তোমাদের বাছুরগুলি দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইতেছে, তাই ইহাদের বাছুর বাঁধিবার জন্য জাগাইয়া দিতেছি।" বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বাড়ীর ভিতর আসিবার সময় বাছুরগুলির গলার দড়ি খুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এই লীলা বর্ণনা করিয়া ভক্ত কবি বলিতেছেন, এইরূপ জল্পনাকারী হরি তোমাদের রক্ষা করুন।

২

অপহরতি মনো মে কোঽপ্যয়ং কৃষ্ণ চৌরঃ
প্রণতদুরিত চৌরঃ পূতনাপ্রাণ চৌরঃ।
বলয়বসনচৌরঃ বালগোপীজনানাং
নয়নহৃদয়চৌরঃ পশ্যতাং সজ্জনানাং ॥

কে গো এই কৃষ্ণ চোর? কেন, কি হইল? আমার যে মন চুরি করিল! চোর, ভয়ানক চোর! কাহারও রক্ষা নাই। একজন লোক প্রণত, চরণে শরণাগত, আবার দরিদ্র, কিছুই নাই। কৃষ্ণ ভাবিলেন, উহার তো কিছু নাই, কিন্তু আমি যদি কিছু চুরি না করি, তাহা হইলে আমার সুনাম থাকে কৈ? কি লইব? উহার যে কিছুই নাই! না, আছে, উহার পাপ আছে, একজন্মের নহে, বহু বহু জন্মের, কেবল পাপ নয়, পাপবীজ,

রাক্ষসী, রক্ত খায়, শিশুহত্যা তাহার কাজ। সে ব্রজে আসিয়াছে, স্তনে বিষ পূরিয়া আনিয়াছে, যশোদার শিশুপুত্রকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিব, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু, সেজন্য শিশুর কোন উদ্বেগ নাই। শিশু যে চোর, সে কেবল চুরির কথাই ভাবে। সে প্রশান্তচিত্তে মায়ের স্তন্যপান করিতেছে, আর ভাবিতেছে, রাক্ষসী পূতনা আসিয়াছে, কপটবেশে আসিয়াছে, হত্যা করিতে আসিয়াছে, আসুক, আমার তাহাতে কি? আমি চোর, তাহার কিছু চুরি করি! কি চুরি করিব? পূতনার কি আছে? দেখিলেন, তাহার প্রাণ আছে। আর কোথা যাও, পূতনার প্রাণ চুরি করিলেন। মনচুরি, দূরিত-চুরি, প্রাণচুরি! তাহা হইলে, এচোর কেবল বড় বড় জিনিসই চুরি করে! কে বলিল? ছোট বড় সবই চুরি করে। ছোট ছোট গোপবালা, তাহাদের পরণের কাপড় আর হাতের বালা চুরি করিয়া লইল! কি বলিব, চোর ছেলেকে লইয়া অস্থির! ভাল ভাল সব ভদ্রলোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। বাহিরের ভদ্রলোক আসি-য়াছে, আজ একটু শান্ত শিষ্ট হও। কে কথা শোনে? যেমন ভদ্রলোকেরা চাহিয়াছে, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চোখ চুরি। তাহারা বলে, এ কি? আমাদের যে চোখ চুরি করিল! একজন বলিতেছে, মহাশয় সরিয়া পড়ুন, এ বড় ভয়ানক ছেলে! চোখ্ গিয়াছে, সরিয়া পড়ুন! লোকে তো অন্ধ হইয়াও সংসার করে? ভদ্রলোকেরা সরিবেন, পথ ঠিক্ করিতেছেন। যেমন সরিতে যাইবেন, দেখেন কি, শুধু তো চোখ্ নয়, চোখের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও চুরি হইয়া গিয়াছে! যাও, এখন কোথায় যাইবে? হৃদয় রাখিয়া তো কেহ কোথাও যাইতে পারে না!

৩

ক্ষীরসার পরিহারশঙ্কয়া স্বীকৃতং যদি পলায়নং ত্বয়া।
মম মানসে নিতান্ত তামসে নন্দনন্দন কথং ন লীয়সে॥

লীলা নিত্য। ভক্ত প্রথমাবস্থায় চেষ্টা করিয়া লীলা স্মরণ করেন, ধ্যান করেন। তাহার পর আর চেষ্টা করিতে হয় না, আপনা হইতেই লীলার স্ফুরণ হয়। একজন ভক্ত লীলা দেখিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, একটি গাঢ় নীলবর্ণ শিশু, তাহার হাতে ক্ষীর ও সর, সে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া পলাইতেছে, আর যেন লুকাইবার জন্য একটা ভাল জায়গা

তাড়া করিয়াছে। ভক্ত তাহাকে দেখিয়া বলিতেছেন,—কে কে? ক্ষীর সর চুরি করিয়াছ? ভয়ে পলাইতেছ? তুমি কি লুকাইবার জায়গা চাও? আঁধার জায়গা চাও? তবে এস, আমার মনের মতো আঁধার জায়গা আর কোথায়ও নাই, তুমি আসিয়া আমার এই আঁধার মনে লুকাইয়া পড়।

ভারতের হিন্দু-সাহিত্যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্যলীলা সম্বন্ধে যে-সব কথা বা উপাদান আছে, তাহা বিশাল—অতীব বিশাল। এই বিশাল সাহিত্য চৌর্য্যলীলা-সম্বন্ধীয় ভক্তগণের অনুভব। এই অনুভবাত্মক সাহিত্যের সাহায্যে আমাদিগকে চৌর্য্যলীলার আস্বাদন করিতে হইবে ও তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। চৌর্য্যলীলা পড়িয়া বা শুনিয়া আমার বা আপনার মনে কি হয়, তাহা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। এই লীলা যাঁহাদের সাধনার বস্তু, তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাহারই পরিচয় লইতে হইবে। দেশের প্রতি যাঁহাদের মমতা বোধ আছে ও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিবেন।

কিন্তু এই দেশে জন্মাইয়াও যাহারা এ-দেশের নহে, পাশব বলে বলীয়ান্ হইয়া এই দেশকে অপমানিত করিয়া যাহারা লুণ্ঠন করে, তাহাদের লুণ্ঠনের দু'একটা কাণাকড়ি পাওয়ার জন্য যাহারা তাহাদের নিকট মাথা বিকাইয়াছে, তাহার উদাহরণটি অতিশয় সামান্য ; কিন্তু ইহাতে শিখিবার ও ভাবিবার কথা আছে। "সাপ খাব"—শুনিয়াই চমকিত হইতে নাই ; কিসের সাপ, চিনির সাপ না ক্ষীরের সাপ, অনুসন্ধান করিয়া জানা আবশ্যক।

আর একটা উদাহরণ। যে-ভাষার শব্দ, অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে, সেই ভাষার অভিধান দেখিতে হয়। এক ভাষার শব্দের অর্থ অন্য ভাষার অভিধানে দেখিতে গেলে বিড়ম্বনাই হয়। অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশানে মড়া লইয়া যাইতেছে, আর বলিতেছে "হরিবোল—হরিবোল।" একটি লোক ইংরাজী অভিধানে "হরিবোল" এর অর্থ বাহির করিলেন। Horrible অর্থাৎ 'ভয়ানক'। কথাটার অর্থও বুঝিলেন—একটা মীমাংসা করিয়া সান্ত্বনাও পাইলেন। এই অন্ধকার রাত্রিতে মড়া লইয়া শ্মশানে যাওয়া, সত্যই বড় ভয়ানক ব্যাপার, Horrible !

এই উদাহরণটিও সামান্য। এই উদাহরণ হইতে এইটিক ভাবিতে হইবে, ভক্ত ও

ভাবুক বলিয়া ভারতবর্ষে একদল ভাল লোক ছিলেন ও আছেন এবং থাকিবেন। এই ভাবুকভক্তগণের একপ্রকারের অনুভব এবং সেই অনুভব প্রকাশের একটা ভাষা আছে। এই ভাবুকভক্তেরাই দেখিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন বা বলিয়াছেন যে "শ্রীকৃষ্ণ চোর"। আমাকে যদি এই কথার অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে সেই ভাবুকদের অভিধানই দেখিতে হইবে। আমার অভিধানে, এই 'চোর' কথাটির যাহা অর্থ, তাহা এখানে প্রযুক্ত হইবে না।

ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক বা অপ্রাকৃত। ইহাকে 'তত্ত্বতঃ' বুঝিতে হইবে। এই 'তত্ত্বতঃ' বোঝা কি, তাহাই একটু ভাবা যাউক।

প্রত্যেক জিনিসের, প্রত্যেক ব্যাপারের, একটি প্রপঞ্চাতীত পূর্ব্বাবস্থা আছে, তাহার নাম—'তত্ত্ব' বা 'ভাব'। সংসারেরই মানুষ আমরা, কিন্তু আমাদের এমন একটি শক্তি আছে যে,আমরা সংসারের সমুদয় প্রয়োজন কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া সংসারের বাহিরে বসিয়া, সেই ভাব বা তত্ত্ব লইয়া একেবারে নিস্কাম ও নির্লিপ্তভাবে চিন্তা করিতে পারি। ইহারই নাম—'তত্ত্বচিন্তা'। "তত্ত্বতঃ চিন্তা" অর্থাৎ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই তত্ত্বের ভূমি হইতে বা সেই তত্ত্বের আলোচনা বা তত্ত্বের প্রকাশরূপে এই প্রপঞ্চের যাবতীয় ব্যাপার দেখা ও বোঝা, ইহা আবার তাহারও পরের অবস্থা। 'তত্ত্বচিন্তা'—দর্শনশাস্ত্র—Philosophy—Metaphysics আর অবশ্য এই পদ্ধতিতে আলোচনা করিবে না এবং করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা ইচ্ছা বলুক, আমরা ধীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে এই পদ্ধতির অনুবর্ত্তন করি।

প্রথম চাবি—'তত্ত্বতঃ'

লীলা সত্য, লীলাই সত্য। আমরা এখন যেখানে আছি, তাহার নাম 'ভব'। এই 'ভব' মিথ্যা নহে, কিন্তু নশ্বর। এই ভব হইতে লীলায় যাইতে হইবে। ঈশোপনিষদে আছে—হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এই সত্যই লীলা—

মঞ্জুষা বা প্যাট্‌রা খুলিতে হইবে। দুএকটি চাবি আমাদের হাতে আছে। একে একে সেই চাবিগুলি লাগাইয়া দেখিতে হইবে, কতখানি খুলিতে পারা যায়।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতেছেন, এবং শ্রীভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও আরাধনা করিতেছেন, তাঁহারাই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ চোর। আমরা সকলেই জানি, চুরি অতিশয় ঘৃণিত কর্ম্ম, যে চুরি করে সে অতিশয় নিন্দিত। যে চুরি করে সে ইহলোকে নিন্দিত হয়, দণ্ডিত হয়, পরলোকেও শাস্তি পায় এবং পরজন্মে এই অসৎকর্ম্মের ফলভোগ করে। ধর্ম্মের একটি বিশেষ লক্ষণ 'অস্তেয়'—অর্থাৎ চুরি না করা। এ-সম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ নাই। অথচ, লীলাবাদী ভক্ত বলিলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চোর। তাহা হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে, এই চোর আমাদের জগতের বা সমাজের সাধারণ চোর নহে।

উদাহরণ—একটা স্থূল উদাহরণ। আমাদের দেশে ভদ্রলোকে সাপ খায় না, ইহা সকলেই জানে। এক ভদ্রলোকের ছেলে তাহার বাবাকে বলিতেছে, বাবা দুটো পয়সা দাও সাপ খাব। ভদ্রলোক ছেলেকে পয়সা দিলেন, ছেলে খুসি হইয়া চলিয়া গেল। আর একজন ভদ্রলোক বিদেশী, তিনি সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, —"মহাশয়, পয়সা দিলেন কেন ?" "সাপ না কি খাবে মহাশয়, তাই এই অপব্যয়।" "সাপ কি খায় মহাশয় ?" "কেন ?" "সাপ খাবে ?" "কিসের সাপ ? চিনির সাপ, একটা লোক চিনি দিয়া সাপ তৈয়ার করে, আর ফেরি করিয়া বিক্রয় করে। ছেলেরা কেনে, কিছুক্ষণ খেলা করে, তাহার পর কুড়মুড় করিয়া চিবাইয়া খায়। এই হইল সাপ খাওয়া।"

"তত্ত্বতঃ চিন্তা' কবিতা বা poetry :

চোরকে বাদ দেওয়া যাউক ; চোর কদর্য্য ও ঘৃণ্য। কিন্তু সব জিনিসেরই পিছনে বা ভিতরে একটা 'নিত্য সত্য' বা 'তত্ত্ব' আছে, তাহা যখন নিত্য, তখন ভাবরূপে সত্য, শিব ও সুন্দর। সেই তত্ত্বটিকে ধরিতে হইবে। শ্রীবৃন্দাবনে সমুদয় লীলাই সেই তত্ত্ব-সমূহের খেলা, প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও শ্রীবৃন্দাবন ভাবরাজ্য ;—রসিক ও ভাবুক হইয়া

আমাদের সামাজিক জীবনের ভালমন্দ, সুবিধা অসুবিধা ভুলিয়া গিয়া আসুন চোরের 'তত্ত্ব' আলোচনা করা যাউক, ব্রজের সেই সুপ্রসিদ্ধ চোরকে ধরিবার চেষ্টা করা যাউক।

চোরের সংজ্ঞা ও বর্ণনা—The Definition and the Description—চোর কে? চোর কে, বুঝিতে হইলে গৃহস্থকে, তাহা বুঝিতে হইবে। গৃহস্থ না থাকিলে চোর থাকে না। চোর একটি সাপেক্ষ শব্দ (Relative term)। গৃহস্থ "আমি।" আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার জমি জমা, আমার টাকা কড়ি। আমার আমার, এসব আমার। আর কাহারও নহে, আমার। কেহ লইও না। আমি এ সব পাইয়াছি, আমার এ সব আছে, আমার, শুধু আমার,আর কাহারও নহে,—এই ভাবে সব আল্‌গাইয়া আট্‌কাইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে যে, তাহার নাম গৃহস্থ।

গৃহস্থ বলিতেছে, এসব আমার। এই টাকা কড়ি, এই সোনাদানা, এই কাপড় চোপড়, এই বাড়ী ঘর সব আমার, কেহ লইও না, সব আমার। কপাট বন্ধ করিতেছে, কুলুপ দিতেছে, কুলুপ লাগিল কিনা, টানিয়া টানিয়া দেখিতেছে। তাহার পর পাহারা বসাইতেছে, সারারাত্রি পাহারা দিবে, কেহ যেন কিছু লইতে না পারে। এক প্রস্থ দরজা জানালা বন্ধ হইল, কিন্তু তাহাতেও হইল না। আবার খিল দিতেছে, কুলুপ টানিয়া টানিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। এইবার ডালকুত্তা ছাড়িয়া দিতেছে, সারা রাত্রি পাহারা দিবে। তাহাতেও হইল না; এইবার তৃতীয় প্রস্থ; খিল পড়িল, কুলুপ পড়িল, কুলুপ দেখা হইল, এইবার নিজেই খাটিয়া লইয়া দরজায় শুইয়া পড়িল, সারারাত্রি ঘুম নাই, পাহারা দিতেছে। "অস্তি" ও "প্রাপ্তি"র অভিমান যুক্ত, এই আত্মরক্ষণশীল জীবটির নাম গৃহস্থ। চোরকে যদি চিনিতে চাহেন, ধরিতে চাহেন, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন তাহা হইলে, গৃহস্থকে চিনুন। গৃহস্থ হইতে হইবে না, কিন্তু গৃহস্থকে চিনিতে হইবে।

এইবার প্রশ্ন,—চোর কে? গৃহস্থের বুদ্ধির উপর যাহার বুদ্ধি খেলা করে, তাহার নাম "চোর।" গৃহস্থ এত সতর্ক, কিন্তু তথাপি সে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, চোর আসিয়া চুরি করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া যায়। যতই গর্ব্ব কর, তোমাদের এটা 'জগৎ', এটা 'সংসার'। এখানে কিছুই থাকে না, সবই চলিয়া যায়, সবই সরিয়া যায়। প্রাণপন চেষ্টা করিয়া কিছুই রাখিতে পারে না; কে লইয়া যায়? চোরে লইয়া যায়। চোরই

একজন ভক্ত বলিতেছেন, চোরের চোখ কি সব জায়গাতেই থাকে ? গৃহস্থ অতি-গোপনে তাহার ধনরত্ন লুকাইয়া রাখে ; তাহাও যখন চোরে লইয়া যায়, তখন আমরা বলিতে বাধ্য যে চোরের চোখ সব জায়গাতেই থাকে কথাটা ভাল—কিন্তু, তাহা হইলে কি চোরকে বলিব "বিশ্বতোচক্ষুঃ" "সর্ব্বতোচক্ষুঃ" ? দেখা যাউক, এই তো মোটে, চোর ধরিতে বাহির হ'লাম পথে, কোথায় গিয়া পৌঁছান যায়, ক্রমে দেখা যাইবে।

সংজ্ঞা একরকম হইল, এইবার চোরের কিঞ্চিৎ বর্ণনা। চোর-সম্বন্ধে প্রথম কথা, যাহা আমাদের মতো সামাজিক জীবের জানা দরকার, তাহা এই যে চোরের তুল্য ভদ্রলোক আর ত্রিসংসারে নাই। কথাটা শুনিয়া আপনারা বুঝি হাসিলেন ? হাসুন, ক্ষতি নাই ; কিন্তু রাগ করিবেন না, রাগ করিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া উঠিয়া যাইবেন না।

চোর ভদ্রলোক নয় ? আচ্ছা, সামাজিক মানুষ আপনি, একজন লোককে নিমন্ত্রণ করুন, আপনার চেয়ে একটু বড়লোক। সংসারে বড়, আর কত বড় ? এক আঙ্গুল, না হয় দু আঙ্গুল বড়। সে আর কি, এই চক্‌চকে ধূলো, নাম তার সোণা, কারও এক মুঠো বেশী, আর কারও এক মুঠো কম। ইহারই জন্য দু দিনের একটা মিথ্যা বড় আর ছোট। যাই হোক্‌, নিমন্ত্রণ করুন ; আপনার চেয়ে দু আঙ্গুল বড় একজন লোককে। কিসের নিমন্ত্রণ ? ছাপা চিঠির নিমন্ত্রণ ? উত্তরই দিবে না। দেখা হইলে বলিবে,—"ওঃ, নিমন্ত্রণের ছাপা চিঠি, প্রতিদিন কতই আসিতেছে, পড়ার সময় কোথা ? চিঠি খোলাই হয় না !" তাহার পর, ছেলে পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ ; তাহাতেও সাড়া নাই। তবে যদি আপনি নেহাত নাছোড়বান্দা হন ; তাহা হইলে তাঁহার দরজায় গিয়া ধন্না দিয়া বসিবেন, যুক্তকরে কাকুতি মিনতি ও স্তবস্তুতি করিবেন, সজল নয়নে বলিবেন,—"আপনি, আপনার ঐ শ্রীচরণ, আমার পৈতৃক বাস্তু ভিটায় পড়া চাই। তাহা না পড়িলে আমার পিতৃ-পুরুষেরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবে না।" এতদূর যদি করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দয়া করিয়া আপনার বাড়ীতে ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে দয়া করিয়া আসিবেন। কিন্তু, আসিলেও যে শান্তি নাই। বাড়ীতে আসিয়াই নাক টিপিয়া বলিয়া বসিবেন,—"কি দুর্গন্ধ, আলো নাই, বাতাস নাই, এ বাড়ীতে থাক কি করিয়া ? একটা ভাল বাড়ী করিতে পার না ?" অর্থাৎ যেন একটা ভাল বাড়ী করা, কেবল ইচ্ছা করি নাই বলিয়াই এতকাল করা হয় নাই, ইচ্ছা করিলেই হইয়া যাইত।

ইহাতেও শেষ নহে। মানুষ, আসিলে মানুষের বাড়ী, একটু হাসিখুসি কর, প্রাণে প্রাণে মেশামেশি কর। সে সব গেল কোথায়? এখন পাণ হইতে চুণ খসিলেও মহাপ্রলয়। এখন আপনি কাণ মলিতেছেন, আর নাক মলিতেছেন, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, যাহা হইবার হউক, পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার হউন আর না হউন, বড়লোককে আর নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী আনিব না। এই গেল সামাজিক বড়লোকের নমুনা। এইবার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন দেখি, চোর ভদ্রলোক কিনা?

এই যে চোর, শ্রীচোর, আপনার বাড়ী আসিবেন, সেজন্য তাঁহাকে কোনরূপ নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না, এমন কি খবরও পাঠাইতে হইবে না। বিনা-নিমন্ত্রণে, বিনা-আহ্বানে যিনি নিজগুণে আমার বাড়ী আসেন, তিনি ভদ্রলোক নহেন। ইহাই প্রথম কথা, বড়ই ভদ্রলোক এই চোর!

তাহার পর দেখুন, একজন ভদ্রলোক, বিশেষতঃ অপরিচিত বিদেশী ভদ্রলোক যদি আপনাকে বলেন, যে তিনি আপনার বাড়ী আসিবেন, তাহা হইলে আপনার কেমন উৎকণ্ঠা হয়। দরজা জানালা খুলিয়া, বাহিরের ঘরে বিছানা পাতিয়া, আলো জ্বালিয়া, গাড়ু গামছা রাখিয়া অপেক্ষা করিয়া পথের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কত রকম আয়োজন করিতে হয়—কি খাবেন, কোথায় শোবেন। কিন্তু, এই যে চোর, বিনা-নিমন্ত্রণে যিনি আপনার বাড়ী আসিবেন, তিনি আসিবেন বলিয়া আপনাকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না অপেক্ষা করিতে হইবে না, কোনরূপ আয়োজন করিতে হইবে না। আপনি দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারেন; উঠিতে হইবে না, জাগিতে হইবে না, আলো জ্বালিতে হইবে না, দুয়ার খুলিতে হইবে না, তুমি ঘুমাও নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমাও। নিজের পথ সে নিজেই করিয়া লইবে, নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করিয়া লইবে। এমন ভদ্রলোক কি আর হয়?

এই চোর ভগবানের সদ্‌গুণাবলীর কথা কত শুনিবেন? কথার শেষ নাই। 'দিগ্‌দরশন' করাইলাম। এখন ভাবিতে থাকুন, অনুভব করিতে থাকুন। ভাবুকগণের অনুভব-প্রণালীতে একবার অভ্যস্ত হইলেই বুঝিতে পারিবেন, তিলে তিলে নূতন হইতেছে। আরও দু একটা কথা শুনুন।

দেখি ! আমার ভিতর কেউটে সাপ লুকাইয়া আছে, সে সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে। আর এই অপ্রিয় কথা চিরকাল মনে করিয়া রাখিব। আপনি হয়ত ঘৃণা করিয়া বলেন নাই, হয়ত কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন, হয়ত সাময়িক উত্তেজনায় ভুল করিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু সে কথা ভাবে কে ? আমি চিরকালের মতো আপনার শত্রু হইলাম। আপনার বাড়ী যাইব না, আপনার সহিত কথা কহিব না। যখনই আপনার প্রসঙ্গ উঠিবে, আপনার নিন্দাই করিব। এই হইল, আমার প্রকৃতি। এইবার এই শ্রীচোরের কথা, এই চোর-ভদ্রলোকের কথা ভাবুন দেখি ! গালাগালি তো, সামান্য, অতি সামান্য ; যদি চাবুক মারিয়া পিঠ্ লাল করিয়া দেন, পিঠে দাগ পাড়িয়া দেন, তাহা হইলেও কাহাকে বলিবে না, কাহাকে দেখাইবে না এবং অভিমান করিয়া বলিবে না যে, ঐ ব্যক্তি আমার অপমান করিয়াছে বা আমাকে মারিয়াছে, আমি আর উহার বাড়ী যাইব না। এমনই ভদ্রলোক সে, যে যখনই সময় হইবে, সুবিধা হইবে এবং ইচ্ছা হইবে, তখনই সে আপনার বাড়ী আসিবে।

আবার দেখুন। আপনি বড়লোক, সদর রাস্তার উপর ফটক ওয়ালা, বাগানওয়ালা, বাগানে ফোয়ারা-ওয়ালা, পুতুল-ওয়ালা আপনার বাড়ী ; বড় বাড়ী, দুয়ারে পাহারা, কত আলো। আর আমি গরিব, গলির ভিতর অন্ধকারে ভাঙ্গা জুল্‌জুলে নেহাত ময়লা আমার বাড়ী। আপনি কি মনে করেন, এই শ্রীচোর, এই ভদ্রলোক বড়লোক বলিয়া আপনার বাড়ী আসিবেন, আর গরিব বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিবেন, মোটেই তাহা নয়, মোটেই তাহা নয়। তিনি আমার বাড়ীতেই আগে আসিবেন, আপনার বাড়ী পড়িয়া থাকিবে। ইহাতেও যদি অস্বীকার করেন, তিনি ভদ্রলোক, তাহা হইলে ভদ্রলোক কাহাকে বলে তাহাই আপনি জানেন না !

মনে করুন, আপনাকে আপনার গ্রামের লোকেরা সমাজে পতিত করিয়াছে ; যাহাকে "একঘরে" করা বলে। আপনার সব বন্ধ। নাপিত বন্ধ, ধোপা বন্ধ, হুঁকা বন্ধ। কেহ আপনার বাড়ী আসে না, কেহ ডাকে না, কেহ কথা কয় না ? আপনি কি মনে করিতেছেন, এই ভদ্রলোক—শ্রীচোর, ইনিও আপনাকে ঠেলিয়া দিয়াছেন মোটেই তাহা নয়, মোটেই তাহা নয়। আজ, যখন সকলেই আপনাকে ঘৃণা করিয়া পায়ে

বাড়ীতে তাঁহার আসার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ইহাতেও কি অস্বীকার করিবেন, তিনি ভদ্রলোক।

আর একটা কথা। তিনি যে খুব বড়দরের একজন ভদ্রলোক, তাহার প্রমাণ, নিজের সুখদুঃখের প্রতি তাঁহার মোটেই দৃষ্টি নাই। বর্ষাকাল, গভীর আঁধার, ঝড়-বৃষ্টি, পথ-দুর্গম, এক ঘরের লোক আর এক ঘরে যাইতে পারে না। পথে বাহির হয় কাহার সাধ্য। কিন্তু, দেখুন এই আঁধারে শ্রীচোর পথে পথে চলিয়াছেন। আর কত বলিব, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি—

ব্যাখ্যা করিবেন। এই ভাবগুলি হৃদয়ের পশ্চাতে স্পষ্টভাবে রাখিয়া একটু চিন্তা করুন, শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের নিকট যে চোর হইলেন, সে কোন্ স্তরের কথা। ভক্তেরই বা তখন অবস্থা কি, আর শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশেরই বা সে স্তরটি কি? ভক্ত ভগবানে যে-সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি প্রাচীন গ্রন্থে বেশ ভাল করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেগুলিও যে জানা দরকার। শ্রীভগবান্ চোর, কিন্তু কাহার নিকট চোর, সে কথা পরে বলিব, শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহা আছে, খুব সুস্পষ্ট ভাষাতেই আছে। কিন্তু, সে কথা পরে। এখন তিনটি স্তরের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম স্তর—শ্রীভগবান্ গীতায় এক উচ্চাঙ্গের অভয়বাণী শুনাইলেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥

"যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, হে কৌন্তেয়, সব আমাকে অর্পণ কর।" ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ। শ্রীকৃষ্ণ যেন দূরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া মানুষকে অভয় দিয়া ডাকিতেছেন,—"মানুষ, তুমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছ, তোমার দুঃখের সীমা নাই। আচ্ছা, আমি তোমার ভার লইলাম, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, তুমি এক কাজ কর, তোমার কর্ম্মফল আমাকে দাও।"

আজকাল গীতা সস্তা হইয়াছে, পকেটে পকেটে গীতা। লোকে ভাবিতেছে, তবে বুঝি নিষ্কাম কর্ম্মও সস্তা হইয়াছে। কিন্তু, ইহা যে মস্ত ভুল! শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ

সাধ্যই নাই, তাঁহাকে কর্ম্মার্পণ করে। কথাটা ঠিক্। আমার উন্নতি হইতেছে, সর্ব্বত্রই জয় জয়কার, যেখানে যাই সেইখানেই সম্মান, আর লাভ। সে-সময়ে যদি কেহ বলে—মহাশয় শ্রীভগবানের কৃপায় আপনার এই উন্নতি ও জয়জয়কার, তাহা হইলে মনে বড় রাগ হয়। মনে হয়—আমি খাটিয়া খুটিয়া, নিজের মাথার বুদ্ধি আর নিজের বাহুর বল খরচ করিয়া এই সব করিলাম, আর লোকটা কিনা বলে, ভগবানের দয়া। কি অন্যায়, কি মিথ্যা। তবে, যখন কোনদিকে কিছু হয় না, যেখানেই যাই, যাহাতেই হাত দিই, সেখানেই অপমান, তাহাতেই পরাজয়, তখন বরং মাথা নোয়াইয়া বলি,—"কি করিব বল ভাই, আমার তো হাত নাই, তবে ভগবানের ইচ্ছা, বাবা, ভগবানের ইচ্ছা।" এইত ভগবান্, আর এই তো মানুষের ভগবানে কর্ম্মফল দান। ইহাই প্রথম স্তর। দূরে দাঁড়াইয়া ভগবান বলিলেন,—কর্ম্মফল আমাকে প্রদান কর, ভবসাগরে তোমার পরিত্রাণের ভার আমিই লইলাম। কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না, কেহই কর্ম্মফল দিল না। ইহাই প্রথম স্তর।

এইবার দ্বিতীয় স্তর। দূরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া যখন পাইলেন না, তখন ভগবান্ দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। দুয়ারে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ভিখারীর মতো চাহিলেন, "দাও, আমাকে কিছু দাও ; হীরা নয়, মণিমাণিক্য নয়, যা' হয় কিছু দাও।"

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
"তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

একটি পত্র, একটি ফুল, একটি ফল, একটু জল, যা' হয় কিছু দাও ; তবে যাহা দিবে ভক্তি করিয়া দিও ভালবাসিয়া দিও। প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিয়া যাহা দিবে, তাহাই আমি খাইব। ইহাই দ্বিতীয় স্তর।

শ্রীবৃন্দাবন-লীলার একটি ঘটনায় এই দ্বিতীয় স্তরের ভিখারী ভগবানের অদৃষ্টে কি হয়, তাহা দেখা গিয়াছে। বেদবাদী ব্রাহ্মণেরা খুব সমারোহ করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন, নানা প্রকারের ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করাও হইয়া গিয়াছে। কত লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, তাহারা সব আসিবে, তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইবে। এদিকে ক্ষুধিত ও তৃষিত ভগবান্, অদূরে যমুনাতীরে নিদাঘের দ্বিপ্রহরে গাছের

পাঠাইয়া দিয়াছেন। কি হইল, অন্ন মিলিল না, কিছুই মিলিল না। মিলিল কেবল অপমান ও তিরস্কার। এই গেল দ্বিতীয় স্তর।

দূরে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া চাহিয়া পাওয়া গেল না, কাছে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ভিক্ষা করিয়াও পাওয়া গেল না।

এইবার তৃতীয় স্তর। একটু ভাবিতে হইবে। একটা ক্রিয়া, মানবের ভূমি হইতে দেখিলে তাহার নাম 'লওয়া'। মানুষের দেওয়া, ভগবানের লওয়া। আমার দেওয়া যেখানে শেষ, ঠিক্ সেইখানে ভগবানের লওয়া আরম্ভ। ভগবানের এই লওয়ার নামই স্বরূপের লীলা। চৌর্য্যলীলা ব্রজে, অতএব ইহা স্বরূপের লীলা।

এইবার তৃতীয় স্তরে ভক্ত ভাবিতেছেন। আমি তো তোমায় দিব না, দেওয়ার অভ্যাস আমার নাই, তোমাকে আসিয়া লইতে হইবে। কেমন করিয়া তুমি লইবে, চাহিয়া দেখিয়াছ, চাহিলে তুমি পাইবে না। অতএব চোর হইয়া তুমি এস।

আমি তো তোমায় করিব না নিমন্ত্রণ আমি তো তোমায় করিব না আবাহন। নিমন্ত্রণ করা কিম্বা আবাহন করা আমার অভ্যাস নাই। আমি তো দুয়ার খুলিয়া রাখিব না। তবে চোর হ'য়ে তুমি এস। সকল দুয়ার রুদ্ধ করিয়া আমি ঘুমাব যখন, সেই নিশীথের আঁধারে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে, চোর হ'য়ে তুমি এস। আপনার হাতে রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া আমি ঘুমাব যখন, সে সময় তুমি এস। চুপি চুপি চুপি, আমার এ আমিটার মাঝে করিও প্রবেশ; আমার, 'আমার বলা' যাহা কিছু আছে, সব চুরি করিয়া লইও, ভাঁড় ভাঙ্গিয়া দিও, ননি চুরি করিয়া খাইও, ইচ্ছা যদি হয়, জানালা খুলিয়া ননি সর ছানা সব বানরে বিলায়ে দিও, চোর হইয়া তুমি এস। আমার 'আমার-বলা' যাহা কিছু আছে, যাহা কিছুর সঙ্গে আমি, আমার এ আমিটাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পলে পলে রসাতলে ডুবিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া যাই, সব চুরি করিয়া লইয়া যাইও।

চোর আসিয়া সব লইয়া যাইবে, ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইবে। রাখিয়া যাইবে কি? তাহার চরণের মৃদু সুকুমার চিহ্নগুলি, আমার ঘরের মেজেতে আঁকিয়া রাখিয়া যাইবে। ঘুম ভাঙ্গিলে জাগিয়া উঠিব যখন, দেখিব তখন, চোর এসেছিল, চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে সব। এই চোরা চেনা চোর, নাম জানা চোর। যেমন দেখিব সব চুরি হইয়া গিয়'ছে,

চোর, সেই নন্দের নন্দন চোর, সেই গোবিন্দমাধব চোর, মুকুন্দ কেশব চোর, সেই হৃষীকেশ বনমালী চোর"—'গেছে, গেছে সব গেছে, চোরে সব নিয়ে গেছে'—এই বলিয়া রসনায় নাম, আর হৃদয়েতে রূপ, আর ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিব, যত গড়াগড়ি দিব, তাহার চরণচিহ্ন আমার সকল অঙ্গে মুদ্রিত হইয়া যাইবে। এই প্রকারে সে আমাকে রিক্ত করিবে, শূন্য করিবে, সকল বাঁধন-ছাড়া করিবে, ঘরের বাহির করিবে ঘরের বাহির হইয়া একবারে নিঃসঙ্গ একাকী নদীর কিনারে আসিয়া বসিব ; নদীর কিনারে বসিয়া নয়নের জলে ভাসিয়া শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিব—"চোর, আসিয়া আসিয়া যদি, সকলি লইয়া গিয়াছ,তবেএকা এই রিক্ত শূন্য আমিটারে কেন নদীর কিনারে রাখ বসাইয়া ! এস এস এস চোর, এস আজি কর্ণধাররূপে, এস এস এস চোর, চরণের তরী বহি এস আজ, এই রিক্ত শ্রান্ত 'আমিটারে' চরণের তরি 'পরে তুলিয়া লইয়া যাও, যেখানে তোমার ইচ্ছা, সেই আনন্দ-বন্দরে,—এই বলিয়া আপনার সেই রাঙ্গা চরণে ঢালিয়া দিব ; চোর হইয়া তুমি এস। এই তৃতীয় স্তর। ইহাই "তত্ত্বতঃ" চৌর্য্য-লীলা আস্বাদন।

দ্বিতীয় চাবি—'কুতকী'

শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের যে শ্লোক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম কথাটি 'কুতকিন্'। এই কথাটিকে আমরা দ্বিতীয় চাবিরূপে ব্যবহার করিতে পারি। মানবজাতি ভগবান্-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে এবং শ্রীভগবানের পরিচয় ও পাইয়াছে। এই পরিচয় এক প্রকারের নহে। এক এক শ্রেণীর সাধক এক এক প্রকারের পরিচয় পাইয়াছে। কেহ দেখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা বা বিশ্বকর্ম্মা—All Doer is He ; আবার কেহ দেখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞাতা—All Knower is He ; আবার কেহ দেখিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব-আস্বাদন কর্ত্তা—All Enjoyer is He. এই সব পরিচয়ের মূল পরিচয়—বেদের পুরুষবাদ। প্রথমে ধরা হইল, তিনিই পরমপুরুষ এবং ভূতভবিষ্যত বর্ত্তমানে যাহা কিছু, সকলই তাঁহার। এই এক প্রকারের অনুভব বা পরিচয়। আবার কেহ কেহ দেখিয়াছেন, তিনি রাজা ; তিনি বিধি, তিনি পিতা, তিনি মাতা, তিনি প্রিয়। এই পাঁচ প্রকারের পরিচয় বেদেই পাওয়া যায়. তিনি প্রিয়,

তাঁহার স্বরূপে আনন্দ-ছাড়া আর কিছুই নাই। আমরা তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাই নাই বা ধরিতে পারি না বলিয়াই মনে হয়, তিনি বুঝি ভবের বোঝা ঘাড়ে লইয়া সর্ব্বদাই বিব্রত ও বিপন্ন। একটা নির্দ্দিষ্ট অধিষ্ঠানভূমি (from a certain definite stand-point) হইতে দেখিলে এইরূপই মনে হয় এবং এইরূপ মনে করার দোষও নাই। "নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।" কিন্তু আমাদিগকে তটস্থ হইয়া (Unprejudiced and unbiassed) হইয়া বিচার করিতে হইবে। সংসারের বাবাগিরি, মা-গিরি, রাজাগিরি বা বিধাতাগিরি লইয়া যাহাকে ভাবিতে হয় ও সংগ্রাম করিতে হয়, তিনি তো একটা সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার প্রকৃতিতে একটা সীমার বন্ধন (a limitation) পড়িয়া গিয়াছে। এই সীমার বন্ধন সত্য, এই সীমার বাঁধনের ভিতর তাঁহাকে দেখুন, তাঁহার আরাধনা করুন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এই সব স্বেচ্ছাবৃত (self-imposed) সীমার বাহিরে তাঁহার যে-চিরমুক্ত একটা স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাও ত ভুলিলে চলিবে না। এই চিরমুক্ত স্বরূপই তাঁহার আনন্দরূপ, এইখানেই স্বরূপের লীলা, এইখানেই কৌতুকী ভগবান্। আপনি যদি ভগবানের পরিবর্ত্তে 'ভগবতী' বলেন, তাহাতে কোন ভদ্রলোকেরই কোনরূপ আপত্তি হইবে না। ইহাই ব্রজলীলা, ইহাই বৃন্দাবন। "কুতকী ভগবান্"। The sportive Divine—The Lord in His humour.

"কৌতুক" বা "হাস্যরস" কাব্য-সমালোচকেরও আলোচ্য। কাজেই এ-সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা বলা আবশ্যক। মানুষ চিন্তা করিতেছে, নানা বিষয়েই চিন্তা করিতেছে। একটি কোন বিষয় সম্বন্ধে নানারূপে চিন্তা করা যায়। বিষয়টার বাহিরে আসিয়া, বিষয়টার বহিঃপ্রকাশকে অগ্রাহ্য করিয়া, বিষয়টার অন্তরতম সারাংশে যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকুকে ধরিয়াও চিন্তা ও আলোচনা করা যায়। কল্পনাশক্তির বা চিন্তাশক্তির এই যে ক্রীড়াত্মক ব্যবহার (The sportive exercise of the imagination), ইহাই কৌতুকের প্রাণ। কিছুই গুরুতর নহে, কিছুই ভয়ঙ্কর নহে, সকলেরই প্রাণের মূলে আনন্দ বিরাজমান—The universe has a Divine soul of Delight. That delight is also the soul within the soul of man. সকল সময়ে ইহা

অশোভন বা অবৈধ তাহার ভিতরেও এক আনন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই কৌতুকের ভিতর আর একটা জিনিস আছে, তাহার নাম—প্রেম, ভালবাসা বা সানুভূতি। এই সানুভূতি বা প্রেম না থাকিলে 'কৌতুক' 'বিদ্রূপ' হইয়া যায়। আর এক কথা, 'কৌতুক' করিতে গেলে কোন জিনিসের বেশী ভিতরে প্রবেশ করিতে নাই, প্রত্যেক ব্যাপারকে তাহার বাহির হইতে দেখিতে হয়; একটা অনাসক্তির ভাব না থাকিলে, কোনরূপ স্বার্থবোধ বা মতলব থাকিলে, 'কৌতুক' 'বিদ্রূপ' হইয়া পড়ে।

আমাদের এই জীবন ও এই জগৎ, অতিশয় গুরুভার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দরকার ইহাকে লঘু করা। মানুষ আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। ইহাকে লঘু করিতে হইলে, 'কৌতুকী' ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

লীলা-আস্বাদন

(ক) বৎস-মোচন

শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় 'কুতুকিন্' বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি অসময়ে, অর্থাৎ অদোহনকালে (গোদোহন পর্য্যন্ত বাছুরগুলিকে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, দোহন হইয়া গেলে খুলিয়া দেওয়া হয়, ইহাই রীতি) আসিয়া আমাদের সব নষ্ট করিলে, গোদোহনের পূর্ব্বেই বাছুরগুলিকে খুলিয়া দিয়া আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিলে! শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে যে চৌর্য্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরূপ গোস্বামীর বর্ণনা ঠিক তাহারই অনুবর্ণন বা সংক্ষিপ্তসার। সেখানে আছে—"বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে"।

ভগবান্ ভদ্রলোক, তিনি আসিয়া এমন অন্যায় কার্য্য করিবেন কেন? আমাদের বাছুর খুলিয়া দিবেন কেন? বড় ভয়ানক প্রশ্ন। ইহার কি কোন উত্তর আছে? খুব সোজা উত্তর, অত্যন্ত সোজা, কিন্তু শুনিবে কি?

আমরা, এই মানুষেরা দল বাঁধিয়া নিজেদের এই সংসারের দুদিনের সুবিধার জন্য কতকগুলি রীতি বা আচার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। সেগুলি ন্যায্য কি অন্যায্য, সুন্দর কি কুৎসিৎ, হিংসামূলক, কি প্রেমমূলক, সে-সব কথা বলিবে না; যাহা চলিতেছে

অনন্ত ; তুমি সত্য, শিব, সুন্দর ; তুমি ন্যায়, তুমি প্রেম ; তুমি সকলের প্রাণ, তুমি সকলের সুখ। এই সব কথা মুখে বলিতেছি, কাঁদিতেছি, আর নাচিতেছি। নিরীহ ভদ্রলোক ভগবান্ নিশ্চেষ্টভাবে মন্দিরে বসিয়া নৈবেদ্য খাইতেছেন, বা না খাইয়া খাওয়ার ভান করিতেছেন। বেশ ভগবান্ ; দুনিয়ার সুবিধাভোগী বড় মানুষেরা এই প্রকারের পোষা (Conventionalized) ভগবান্ লইয়া বেশ নিরুদ্বেগে বসিয়া আছে। কিন্তু ভাই, বুকে হাত দিয়া বল দেখি,—একি ভগবান্, না ভগবানের মৃত কঙ্কাল ? ভগবান্ যখন ন্যায় ও প্রেম, তখন তোমাদের জীবনে ও জগতে যেখানে যত অন্যায় ও অপ্রেম আছে, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব অনুভূত হইবে। কি ভাবে কোথায় এই প্রভাব অনুভূত হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে অধিকারীভেদ জানা দরকার। কোন জায়গায় বজ্রাঘাত হইবে, কুরুক্ষেত্রের রক্তারক্তি হইবে,—এখানে ভীষণ ! আর কোন জায়গায় কৌতুক করিবেন,—এখানে মৃদু। সকলের সঙ্গে কৌতুক করা যায় না ; কৌতুক বা বিশুদ্ধ হাস্যরস সকলে বুঝিতে পারে না। Sense of Humour সকলের নাই। যাহাদের আছে তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক। ব্রজবাসীরা অধ্যাত্মরাজ্যে উন্নততম শ্রেণীর লোক—They stand on the highest rungs of spiritual evolution—তাহারা কংস শিশুপাল নহে, সুতরাং, সেখানে আর গদাচক্রের দরকার নাই, সেখানে কৌতুকের দ্বারাই সব কাজ হইবে। এই কৌতুকের এক প্রান্তে "চৌর্য্যলীলা", আর এক প্রান্তে "রাসলীলা"। "বস্ত্রহরণ"ও খুব বড় কৌতুক, কিন্তু উহা রাসলীলারই অঙ্গ। এই কৌতুকেই শ্রীভগবান্ 'চোর' ও 'লম্পট'। ভগবান্-সম্বন্ধে মানবজাতি যত কিছু ভাবিয়াছে, বা অনুভব করিয়াছে, তাহার চরম কথা এই দুইটি—"চোর" ও "লম্পট"।

শ্রীকৃষ্ণ অসময়ে বাছুর খুলিয়া দেন কেন, ইহা কি এখনও বুঝাইতে হইবে ? তোমরা বুঝিতে পার না, এমনি করিয়া বাছুরগুলিকে বাঁধিয়া রাখার ভিতরে একটা কত বড় অসামঞ্জস্য ও অবিধি রহিয়াছে ! কৌতুক কি ? আমোদ করিয়া খুব স্বতঃসিদ্ধ অবিধিটুকু দেখাইয়া দিলাম, আর কিছু বলিলাম না ; ধরিতে পার, বিশ্বপ্রেমে মত্ত হইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিবে, সুদীর্ঘকালের প্রস্তরস্তূপ যাহা হৃদয়ের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা সরিয়া যাইবে ; আর ধরিতে না পার, বঞ্চিত হইবে। Humour delights

(খ) হাসির তুফান

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন—"আক্রোশন-কৃত-হসিতাড়ম্বর", শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—"ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ"। চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছেন, গৃহস্থ বলিতেছে, এই চোর, ইহাকে ধর, ইহাকে মার, ইহাকে বাঁধ। গৃহস্থের রাগ কত! কিন্তু, কৃষ্ণের রাগ নাই। রাগের উত্তরে হাসি, হাসি নয়—হাসির তুফান। শ্রীরূপ গোস্বামী নিজেই টীকা করিতেছেন—"সাধু শিরোবতংসং মামেতাশ্চোরং বদন্তীতি হাসবিস্তারো যেন"—আমি সাধুদের শিরোভূষণ, ইহারা কি না আমাকে বলে চোর; এই বলিয়া শিশু কৃষ্ণ হাসিয়াই কুটি-কুটি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় এই হাসি-সম্বন্ধে বলেন,—"মহামাদক হাস্য-মধুপানবৈবশ্যেন জড়ীভূতাসু অস্মাসু পশ্যন্তীষু অপি নিষেদ্ধুম্ অপারয়ন্তীষু দধিপয়োঽত্তি।" শিশুচোরের ঐ হাসিতে এমন মাদক মধু আছে, আমরা যে তাহা পান করিয়া বিবশ হইয়া জড়ীভূত হইয়া পড়ি! তখন আমাদেরই চোখের উপর দধি দুগ্ধ খায়।

কি করিবেন? শ্রীমদ্ভাগবতে চৌর্য্যলীলায় "ধার্ষ্ট্য" এই কথাটি আছে। একজন প্রাচীন ভক্ত ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাহারই অনুবর্ত্তন করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ এক বাড়ীতে ননি চুরি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই চুরির একটা রহস্য এই যে তিনি ধরা পড়ার জন্যই চুরি করেন! অন্য চোরে চুরি করে, অতিশয় সাবধানে, চেষ্টা করে, যেন ধরা না পড়ি। কিন্তু কৃষ্ণ চোর চুরি করে ধরা পড়ার জন্য। এই চোরের প্রাণের দুঃখ এই, আমাকে কেহ ধরিল না, কেহ বাঁধিল না, কেহ ধরিয়া বাঁধিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিল না। এই খেদ তাঁহার অন্তরে। আজ ননী চুরি করিয়াছেন, গৃহস্থ তাঁহার বাম হাতে ধরিয়া বলিতেছে, "এই চোর"। গৃহস্থ যেমন বলিয়াছে—"এই চোর", আর অমনি শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ হাতের তর্জ্জনী তুলিয়া গৃহস্থ অপেক্ষা সাত গুণ জোরে বলিলেন—"ব্যাটা, আমি চোর, না তুই চোর"। যেমন এই কথা বলা, আর অমনি গৃহস্থ গোপ শ্রীকৃষ্ণের হাত ছাড়িয়া দিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে। চোরের তো পলায়ন! কিন্তু গৃহস্থের কাঁপুনি যে আর থামে না, পায়ের অঙ্গুল হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত ঝড়ের সময়কার কলাপাতার মতো থর থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

এ ঘর বাড়ী আমাদের নয় গো, আমি ও আমার নই, ওগো তুমিও আমার নও গো ; এসব অন্যের, আমরা নিজের বলিয়া চুরি করিয়া দখল করিয়া বসিয়া আছি।" এই যে কাঁপুনি ইহা কিছুক্ষণ নয়, কিছুদিনই থাকিয়া গেল !

এইবার ভাবুন ব্যাপারখানা কি ? কার দেওয়া আকাশে তলে, কার দেওয়া রবি শশির কিরণে, কার বায়ুমণ্ডলে, কার দেহেন্দ্রিয় মন লইয়া তুমি 'আমার, আমার' বলিয়া অভিমান করিতেছ ? কিন্তু, বুঝিতে যে পারি না। আমি চোর, তুমি চোর, আমরা সবাই চোর, এই সোজা কথাটা যে কিছুতেই বুঝিতে পারি না। মালিক আসিয়া একদিন তর্জ্জনী তুলিয়া তিরস্কার করিয়া যত্তপি সজোরে বুঝাইয়া দিয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিব, চোর কে ?

কংস চোর, দুর্য্যোধন চোর, তাহাদের শিক্ষা দিলেন 'ভীষণ' ভগবান্, আর পূর্ব্বের লীলা করিলেন—'মৃদু' ভগবান্ ; আর কেবল হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, ভাসাইয়া দিলেন যিনি, তিনি মৃদুতম 'কুতুকী' ভগবান্।

এই হাসির তুফানের সহিত আর একটা কথা আছে—"মুখপাটবকৃতলুণ্ঠনসম্বরঃ" —মুখপাটবেন শোভনমুখমুদ্রয়া কৃতো লুণ্ঠনসম্বরঃ স্বচৌর্য্যাচ্ছাদনং যেন" মুখের সুন্দর ভঙ্গী করিয়া ভুলাইয়া বুঝাইয়া দিলেন, চুরি করি নাই গো, চুরি করি নাই ; চুরি করিব কেন, তোমরা ডাকিয়াছ তাই আসিয়াছি, তোমাদের চোরাই মাল লইয়া তোমাদের নিস্কৃতি দিতে আসিয়াছি।

ক্রোধ করিলে তাহার উত্তরে তিনি আর কি করিবেন ? ঠিকই করিয়াছেন।

(গ) কপিকুলরঞ্জন

শিশুকৃষ্ণের ননিচুরির একটা উদ্দেশ্য—বানর-ভোজন। ছোট ছেলে নিজে আর কত খাইবেন ? মা যশোদা খুব যত্ন করিয়া সর্ব্বদাই খাওয়াইতেন, সুতরাং তাঁহার এই চুরির দ্বারা প্রধানরূপে বানর-ভোজনই হইত। যশোদার এক সখী যশোদার নিকট অভিযোগ করিলেন,—"দেখ সই, এই যে সব বানরগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়ায়, ইহাদের নজর সর্ব্বদাই তোমার ঐ ছেলেটির উপর। তুমি জান না ; তোমার ছেলে কখন্

ননি চুরি করার জন্য কাহারও ঘরে ঢুকিয়াছে, অমনি যত বানর চুপ্‌চাপ ঘরের বাহিরে চারিদিকে জানালার কাছে কাছে জমা হইয়াছে। আর তোমার ছেলে ঘরে গিয়া আগে দিল জানালাগুলি খুলিয়া। তার পর, ননি সর ছানা যাহা কিছু আছে, সব লইয়া ঐ জানালার বাহিরে ছুড়িয়া দিতে লাগিল, আর বানরেরা কুপ্‌কাপ্‌ করিয়া খাইতে লাগিল। আমি অনেক দিন দেখিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তোমার ঐ ছেলেটির সঙ্গে এই বানরদের নিশ্চয়ই কোন বন্দোবস্ত বা পরামর্শ আছে।”

তাই তো মনে হয়। কবে কোন সুদূর অতীতে, কোন্‌ সাগরের পারে ওগো, কোন্‌ রাক্ষসের দেশে! তোমার ছেলে বানর লইয়া লড়াই করিতে গিয়াছিল। সেদিন তোমার ছেলে ছিল গরীব বনবাসী। বানরদের খাটিয়েছিল খুবই, কিন্তু গরীব মানুষ খাইতে দিতে পারে নাই। তাই তাহাদের বলিয়া রাখিয়াছিল, সুযোগ যদি ঘটে কোন কালে, ভাল ভাল জিনিস খাওয়াব, সেজন্য চোরও যদি হইতে হয়, তাহাই আমি হইব। ব্রজগোপীরা কেহ কেহ এইরূপ স্বপ্ন দেখিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে চৌর্য্যলীলা-সম্বন্ধে পাঁচটি শ্লোক আছে। এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম দুইটি ভূমিকা, আর শেষ তিনটি লীলার বর্ণনা। আমরা প্রথমে শেষ তিনটির আলোচনা করিয়া পরে প্রথম দুইটির আলোচনা করিব।

> বৎসান্‌ মুঞ্চন্‌ ক্বচিদসময়ে ক্রোশ-সংজাতহাসঃ
> স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথদধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
> মর্কান্‌ ভোক্ষ্যান্‌ বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
> দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্‌॥২॥
> হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
> শ্ছিদ্রংহ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
> ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং

এবং ধার্ষ্ট্যান্যশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিত কৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়ন-শ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে-সব গোপীর বাড়ীতে চুরি করিয়াছেন, তাহারা যশোদার সখীস্থানীয়া, শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়া। তাঁহারা সকলে যশোদার নিকট আসিয়া বলিতেছেন।

সখি, যশোদে, তোমার ছেলের চুরি করার চতুরতা শোন। এই বাড়ীতে আজ চুরি করিতে হইবে মনে করিয়া আসিয়া দেখে ঘরে লোক রহিয়াছে। লোকগুলিকে সরানো দরকার। কি করিয়া সরানো যায়? বাছুরগুলির দড়ি খুলিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিল। বাছুরগুলি এদিক্ ওদিক্ পলাইল। ঘরের লোকেরা বাছুর ধরিবার জন্য যেমন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছে, অমনি আসিয়া ননি ছানা চুরি করিয়া পলাইয়া গেল।

যশোদা বলিতেছেন,—"তোমাদেরই তো ছেলে, তাড়না করিতে পার না; শাসন করিতে পার না?" আর একজন গোপী বলিতেছে—"ওগো তাড়না করিব কি? তাড়না করিলে যে-হাসি হাসে, তাহাতেই যে সব ভুলিয়া যাই।"

যশোদা বলিতেছেন,—"ছেলে তোমাদের, সে যদি এতই লোভী, দধি খাইতে এতই যদি ভালবাসে, তাহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াও না কেন? পেট ভরিয়া খাইলে আর চুরি করিবে না।" অন্য একজন গোপী বলিতেছে—"সই, তাহা নহে। চুরি করিতেই তাহাকে ভাল লাগে, সে দুই প্রকারে চুরি করে, পরোক্ষে আর অপরোক্ষে। বাছুর খুলিয়া দিয়া এক চুরি, আর হাসির দ্বারা ভুলাইয়া আর এক চুরি। চৌর্যার্জিত দধিদুগ্ধ তাহার রুচিকর, দত্তবস্তু রুচিকর নহে। চুরি করার জন্য কত রকমের বুদ্ধিই না আবিস্কার করে। নিজে খাওয়ার আগে বানরদের ভাগ করিয়া দেয়। একটিও বানর যদি না পায়, তাহা হইলে রাগ করিয়া খায় না, দধিপূর্ণ ভাঁড় ভাঙ্গিয়া দেয়।"

"সই, আবার দেখ; কোনদিন বাড়ীতে গিয়া যদি কিছু না পায়, তাহা হইলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মারে, তিরস্কার করে, আর বলে—আজ তোদের বাড়ী

আসিলে বলিস্। যদি আর একদিন এই রকম হয়, তাহা হইলে তোমাদের আর রক্ষা নাই। তোমাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া সব পোড়াইয়া ছাই করিয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দিব।" কি দাবী!

যশোদা বলিতেছেন—"ভারি তো ছোট ছেলে, উঁচু জায়গায় শিকায় ঝুলাইয়া জিনিসপত্র রাখিতে হয়। অন্ধকারে রাখিতে হয়।"

এক গোপী বলিতেছে—"সখি, তুমি বড় ভাল মানুষ, তুমি কিছুই জান না। তোমার ছেলের কত বুদ্ধি, আর সে কত রকমের কৌশল জানে, তার খবরই তুমি রাখ না। হাতে নাগাইল পায় না এমন জায়গায় রাখিলে, উদূখল ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেখানে লইয়া যাইবে, একটার উপর আর একটা চাপাইবে, তাহার পর সেই উদূখলের উপর উঠিয়া—বুঝিলে? আবার যদি শিকার উপর ভাঁড় থাকে, ভাঁড় দেখিয়াই বুঝিতে পারে, ভাঁড়ে কিছু আছে কি না। যদি ভাঁড়ের চিক্কণতা দেখিয়া বুঝিতে পারে কিছু আছে, শলা-দেওয়া লগুড়ের দ্বারা ভাঁড়ে ছিদ্র করিয়া হাঁ করিয়া নিজে কিছু খাইবে, আর সঙ্গীদের সব খাওয়াইবে। আর অন্ধকারে, তাহার অঙ্গের ছটাও আলো, আর গায়ের মনিগণও আলো। গোপীরা সব গৃহকার্য্যে ব্যগ্রচিত্তে থাকে, আর সেই সময়ে গোপনে স্বকার্য্য সাধন করে।

যদি কেহ বলে "চোর", সে বলে "তুই চোর, আমি বাড়ীর কর্ত্তা"। মার্জ্জিত গৃহে পুরীষোৎসর্গাদি করে। কমনীয়ে, সই যশোদে, চুরি বিদ্যাতেই তোমার ছেলে কৃতী, তোমার কাছে বেশ সাধুর ন্যায় থাকে।"

যশোদার নিকট পল্লীর গোপীরা আসিয়া বালকের এই সব কীর্ত্তিকথা বলিয়া অভিযোগ করিতেছেন। মা যশোদা স্নেহময়ী হইলেও ছেলেকে প্রহারও করেন, কখন কখন দড়ি দিয়া বাঁধিয়াও রাখেন। এখন আমাদের ভাবিতে হইবে, পাড়াতে যাহাদের যাহাদের বাড়ীতে এতদিন ধরিয়া দুষ্ট চোর ছেলে এত রকমের দৌরাত্মা করিয়াছে, আজ তাহারা দল বাঁধিয়া মা যশোদাকে সব কথা বলিবার জন্য উপস্থিত। আমাদের ভাবিতে হইবে, সে দুষ্ট ছেলে এখন কোথায়? স্বভাবতঃই আমাদের মনে হইবে, ছেলে কি আর এখন বাড়ীতে আছে? ভয় পাইয়া দুষ্ট ছেলে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে! কিন্তু,

সব কথা বলিতেছেন, আর তাঁহার সেই সভয়-নয়ন শ্রীমুখ দেখিতেছেন। যশোদা হাসিতেছেন, পুত্রকে দেখিয়া তিরস্কার করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না।

ভক্তিশাস্ত্রের একটা কথা, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগিদের হৃদয়েও থাকি না, আমার ভক্তেরা যেখানে আমার লীলা বা নাম গান করেন বা আলোচনা করেন, আমি সেইখানেই থাকি।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ ॥

এখানে যশোদাকে কেন্দ্রে রাখিয়া বাৎসল্যরসবতী ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্যলীলা কীর্ত্তন করিতেছেন, কাজেই ইচ্ছা করিলেও শ্রীকৃষ্ণের স্থানান্তরে যাইবার সাধ্য নাই; কাজেই তিনি কাছে কাছে রহিয়াছেন এবং সব কথা শুনিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলির আক্ষরিক অনুবাদ আর দেওয়া হইল না, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার তাৎপর্য্য দেওয়া হইল।

তৃতীয় চাবি—লীলার সাক্ষী

স্বরূপের লীলা আর বৈভবের লীলা, সাধারণতঃ লীলা এই দুই প্রকার। ইহাদের যথাক্রমে মাধুর্য্যলীলা ও ঐশ্বর্য্যলীলাও বলা হয়। বৈভবের লীলা বা ঐশ্বর্য্যলীলা বুঝিয়া উঠা কঠিন নহে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের রক্ষণ আর ধর্ম্ম-সংস্থাপন সকলেই বুঝে। স্বরূপের লীলা বুঝিতে হইলে একটু চেষ্টা দরকার, মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির কিছু অনুশীলন দরকার। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সৌভাগ্য, পূর্ব্বকালে এই অনুশীলন বিশেষরূপে হইয়া গিয়াছে। কাজেই যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যাত্মসম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব (The inheritance of the spiritual treasures of old) হইতে বঞ্চিত হন নাই, নিজের জাতীয় চিত্ত (Racial soul) যাঁহাদের অক্ষুণ্ণ আছে, তাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে শুনিলে বুঝিতে পারেন।

স্বরূপের লীলায় সন্দেহ হইলে, অথবা বিচার করিয়া বুঝিতে হইলে প্রশ্ন করিতে হয়,—এই যে লীলা বলা হইতেছে, ইহার সাক্ষী কে? Whose consciousness is

শ্রীমদ্ভাগবতে চৌর্য্যলীলার যে পাঁচটি শ্লোক আছে, তাহার প্রথম দুইটিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্মুদং ॥
কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলং।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥

শ্লোক দুইটির অর্থ। বক্তা শ্রীশুকদেব, শ্রোতা শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিত। "তাহার পর ভগবান্ কৃষ্ণ বলরামসহ বয়স্য ব্রজবালকগণকে লইয়া ব্রজনারীগণের আনন্দ উৎপাদন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্যচাপল্য অবলোকন করিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার জননীর সমক্ষে আসিয়া বলিতে লাগিলেন।" ইহার পরের তিনটি শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এইস্থলে সেই শ্লোক তিনটি স্মরণ করুন। তাহা হইলেই আমাদের বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণের এই চৌর্য্যলীলা, শ্রীশুকদেব মুখ্য বা প্রত্যক্ষভাবে (In the direct narration) বলেন নাই। গৌণ বা পরোক্ষভাবে (In the indirect narration) বলিয়াছেন। তাহার কারণ কি? কারণ, শ্রীশুকদেবের অনুভবও এই চৌর্য্যলীলার সাক্ষী নহে, এই চৌর্য্যলীলা তাহারও উপরের জিনিস। শ্রীকৃষ্ণ চোর, কিন্তু কাহার নিকট চোর? তোমার আমার নিকট তো নহেই, শ্রীশুকদেবের নিকটেও নহেন। কিন্তু, শ্রীশুকদেব পরম দয়ালু তিনি কোনরূপ কৌশল করিয়া আমাদিগকে এই পরম রমণীয় ও উপাদেয় চৌর্য্যলীলা শুনাইবেন। কি প্রকারে শুনাইবেন, তাহা পূর্ব্বের শ্লোক দুটিতেই পাওয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই নব নব মধুর ও সুন্দর খেলা করিতেছেন। সঙ্গে দাদা বলরাম আছেন, আর বয়স্য ব্রজবালকগণ আছেন। এই খেলার উদ্দেশ্য ব্রজনারীগণের আনন্দ উৎপাদন। ব্রজনারীগণের আনন্দের সীমা নাই। এই পর্য্যন্তই শ্রীশুকদেবের নিজের কথা। কি খেলা খেলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি সাধারণভাবে (in general) জানেন, বিশেষ কিছু (particulars in details) জানেন না। কারণ ইহা ঘরের

ব্রজে রসের খেলা হইতেছে। এই রসের ভিতর তিনটি প্রধান। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। এই রসের খেলায় প্রত্যেক রসের একটি আছে সমুদ্র, আর আর অনেকগুলি করিয়া আছে নদী, ও উপনদী। সখ্যে সুবল, বাৎসল্যে যশোদা, আর মধুরে শ্রীরাধা। পার্ব্বত্য দেশের নদীতে যখন বন্যা হয়, খুব বেশী জল হয়, তখন নদী পাগল হইয়া ছুটিয়া গিয়া সাগরে সেই জল ঢালিয়া তবে সোয়াস্তি পায়। যশোদারাণীর সখীরা সব বাৎসল্যরসের নদী। শ্রীকৃষ্ণ নব নব কৌতুকময় ক্রীড়ার দ্বারা এই সব ব্রজগোপীর হৃদয়ের আনন্দরস উচ্ছলিত করিয়াছেন। এখন তাঁহারা সকলে যশোদার নিকট উপস্থিত। যশোদার নিকট প্রাণের এই আনন্দরস নিবেদন না করিলে, যশোদাকে মনের কথা না বলিলে, তাঁহাদের আর তৃপ্তি হইতেছে না।

ব্যাপার এই। শ্রীশুকদেব বা শ্রীমদ্ভাগবত 'মধ্যস্থ' হইলেন। কৃপা করিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া লইলেন। বিশেষ কথা নিজে কিছু বলিবেন না। নিজের যাহা বলিবার সাধারণভাবে তাহা বলিলেন। এখন আমাদের বলিতেছেন, তোমরা কান পাতিয়া শোন, বড় রহস্যের কথা, বড় গোপনের কথা, বাৎসল্যরসবতী ব্রজরমণীগণের অন্তরতম ধন, এই রুচির মধুর চৌর্য্যলীলা-কথা গোবিন্দের। তোমরা ব্রজনারীগণের অনুগত হও, তাঁহাদের হৃদয় তোমাদের হৃদয় হোক্, তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের হোক্, তাঁহাদের অনুভব তোমাদের হোক্, তাহা হইলে চোরকে পাইবে, যেমন করিয়া তাঁহারা পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকদুইটিতে আর একটি কথা পাওয়া গেল। চৌর্য্যলীলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—ব্রজনারীগণের আনন্দবর্দ্ধনমাত্র ; তাঁহাদিগকে রসাস্বাদন করানই এই লীলার উদ্দেশ্য।

সমাপ্তি

লীলা নিত্য ; শেষ নাই, সমাপ্তি নাই। লীলা নিত্য, নিত্যই নব নব। কিন্তু মানুষের মন,সীমার মধ্যে ক্রিয়াম্বিত বলিয়া, একটা বিশ্রাম চায়, সমাপ্তির মতো একটা

শ্লোকেই তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন। ব্রজের চৌর্য্যলীলাবর্ণনার শ্লোকেও 'কুতুকী' কথাটি প্রথম শ্লোকের প্রথমেই দিয়াছেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও সেই 'কুতুকী' পদটি দেওয়া হইয়াছে, প্রথম শ্লোকেরই শেষে। ইহাই সন্ধান। শ্লোকটি এই—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা স্বয়মুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

এই শ্লোকটি যে চৌর্য্যলীলারই বন্দনা, তাহা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রণয়ীজনবৃন্দের (স্নিগ্ধভক্ত) মধ্যে কোন একজনের (ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার) অপার (অনির্ব্বচনীয় ও মধুর) রসস্তোম অপহরণ করিয়া শ্রীরাধারই কান্তি অঙ্গীকার করিয়া স্বীয়রূপ গোপন করিয়াছেন, (পাকা চোরে যেমন করিয়া থাকে) সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে সাতিশয় কৃপা করুন।

ননিচুরির ব্যাপারে যেমন নিজের খাওয়া তত নহে—বানর-ভোজনই যেন প্রধান, নদীয়া-লীলাতেও তেমনি শ্রীরাধার আস্বাদন জগতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। অতএব সেই চিরচোর, চিৎচোর জয়যুক্ত হউন।

ভূপেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসাহিত্য

এই প্রবন্ধটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ বরিশাল-হিতৈষী পত্রের গত কার্ত্তিক মাসের এক সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত। বাঙ্গালাদেশে মফঃস্বল হইতে যে দুচারিখানি ভাল কাগজ বাহির হয়, তাহার মধ্যে বরিশাল-হিতৈষী অন্যতম। এই পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন, স্বদেশী যুগের একজন নিগৃহীত ও চিহ্নিত দেশকর্ম্মী। নিলামী ইস্তাহার না লইয়া মফঃস্বলে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা যে কত বড় কঠিন ও মহৎ কার্য্য, ইঁহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দুর্গামোহন বাবুকে বাঙ্গালা-দেশের একজন প্রকৃত বড় লোক (ধনে নহে!) বলিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন। প্রথমাংশ, সেই দুর্গামোহন বাবুর মন্তব্য।

শান্তিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহার অভিভাষণটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। দেশের মধ্যে এই কথাগুলি কেবল প্রচারিত হইলেই হইবে না। এই কথানুসারে কিছু কর্ম্মের প্রবর্ত্তনাও প্রয়োজন; আর সেই কর্ম্মে ভূপেন্দ্র বাবুরই নেতা হওয়া আবশ্যক। কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশিত 'জাগরণ' নামক সুপরিচালিত সাপ্তাহিক হইতে দ্বিতীয় অংশটি উদ্ধৃত হইল। ইহা ভূপেন্দ্র বাবুরই কথা, সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ।

তৃতীয় অংশটি কিছুই নহে, আমাদের দুএকটি অকিঞ্চিৎকর কথা, অরণ্যে রোদন বলিলেও হয়।

"বাবু ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পূজার অব্যাবহিত পরে এ জিলায় আগমন করিয়াছেন এবং অনেক গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যুবকদের প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নলচিড়া, মাহিলারা, শোলক, কলসকাঠী প্রভৃতি গ্রামে তিনি গমন করিয়াছিলেন। ইহা অতীব আনন্দের কথা। ১৯০৭ সনে "যুগান্তর" সম্পাদকরূপে এক বৎসর কারাদণ্ড লাভ করিয়া সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর ইনি আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। আজও তিনি দেশকে ভুলেন নাই বা ত্যাগ করেন নাই। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতঃ কিভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাই তিনি বলিতে-ছেন। সত্যের অনুরোধে এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির জন্য দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হই-তেছি। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলির তীব্র নিন্দা প্রচার করিতেছেন—অথচ তাঁহার নিজের কোনও বিশেষ কর্ম্ম-পন্থা আছে বলিয়া বুঝা যায় না। বক্তৃতাগুলি একান্ত থাপ-

অবলম্ব করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাহার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি কি চান তাহা স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলা দরকার। ইহাতে হইবে না উহাতে হইবে না ইহা বলা সহজ, কিন্তু কিসে হইবে সে কথা না জানিতে পারিলে লোক কোন পথ অবলম্বন করিবে? এই কারণে কোনও জায়গায় শ্রোতৃবর্গও খুব খুসী হইতে পারে নাই—বরং যুগান্তরের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের বক্তৃতা-শক্তির প্রতিও লোকের অন্যরূপ ধারণা ছিল। যতটুকু অনুমান হয় তাহাতে কমুনিষ্ট মত প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেশে এ মত বেশী জনমতগ্রাহ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না—আর নিরক্ষর জনসাধারণও তাঁহার ভাব বুঝিতে সক্ষম হইতেছে না। আশাকরি এই কথাগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবেন।"

২

"আমি নিজে সাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইব কিনা জানি না, কিন্তু জগতের মৃত ও জীবিত কতিপয় ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকার জন্য সাহিত্য-বিষয়ে আমি নিতান্ত উদাসীন নহি এবং সেইজন্য আমি সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলিতে সাহস করি। সাহিত্য একটি জাতির সভ্যতা ও তজ্জন্য মানসিক বিবর্ত্তনের দর্পণস্বরূপ, অর্থাৎ একটি জাতির জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তনের সমস্ত চেষ্টা, তাহার সফলতা ও নিষ্ফলতা, জাতীয় জীবনের উন্নতির উচ্ছ্বাস ও অবনতির অবসাদ, ক্ষেদ ও ক্লেদ প্রভৃতি, সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যকে সমাজতত্ত্বের মাপকাটিতে মাপিয়া তাহা হইতে সেই জাতির সাময়িক ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি জাতির মনস্তত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণ বশতঃ সাহিত্য কেবল সাহিত্যিকের চর্চ্চার বস্তু নহে, বরং ইহা জাতি-তত্ত্ববিদ্, সমাজতত্ত্ববিদ্, মনস্তত্ত্ববিদেরও আলোচনার বস্তু।

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে বঙ্গসাহিত্য। পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার মধ্যে আমরা বঙ্গভাষীদের জাতীয় জীবনের গতির বেগ নিরীক্ষণ করিতে পারি। অতীত যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা আমাদের জাতীয় সামাজিক জীবনের অতীতের ইতিহাস কিছু বুঝিতে পারি। বর্ত্তমানের সাহিত্যের অবস্থা ও গতি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা উপস্থিত কালের জাতীয় মনস্তত্ত্বের অবস্থা নিরূপণ করিতে পারি। অতীত লইয়া আমাদের উপস্থিত ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু এবং তাহার আলোচনাই এক্ষেত্রের বাঞ্ছনীয়।

এই আলোচনার পূর্ব্বেই আমাদের সাহিত্যের অবস্থা নিরূপণের জন্য আমাদের জাতীয় সভ্যতার অবস্থা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। এই যুগে [illegible] উচ্ছ্বাস হ্রাস করিয়া অপক্ষপাতী

হইয়া স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের সভ্যতা এখনও উচ্চস্তরে উত্থিত হয় নাই, যদিচ চর্চ্চা দুইএক যায়গায় আন্তর্জাতিকচর্চ্চার উচ্ছ্বাসের অতি উচ্চশিখরে উপনীত হইয়াছে। এইস্থানে একটু পরিষ্কার বুঝা প্রয়োজন, চর্চ্চা ব্যক্তিগত বিস্তাতে আবদ্ধ এবং তাহা অত্যল্প লোকমণ্ডলী মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকে, কিন্তু সেই ব্যক্তিগত চর্চ্চার ফল যখন জনসাধারণের ভোগে আসিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করে, তখন সেই চর্চ্চা সভ্যতাতে পরিণত হয়। এইজন্য বলি যে-সভ্যতার মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য ও কোন কোন প্রাচ্য জাতির সভ্যতার সহিত তুলনা করিলে তাহাদের অপেক্ষা নিম্ন বলিয়াই গণ্য হইবে। ইহার জন্য আমরা সম্পূর্ণ দায়ী নহি, বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় আমরা জাতীয় জীবন যাপন করিতেছি তাহাই ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু আমাদের এই অবস্থা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতেছে, এই জন্যই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আমাদের মধ্যে বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।

তৎপর, বর্ত্তমানকালে সুসভ্য দেশ সমূহে যে বিস্তা শিক্ষা দেওয়া হয়, এদেশে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতেছি না, এই জন্য আমাদের মনও পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে না এবং চিন্তার ধারাও একদেশবর্ত্তী হইয়াছে। ইহার পর "গোদের উপর বিষ ফোড়ার" ন্যায় দলাদলির স্বার্থ সর্ব্বত্রই গঠিত হইতেছে। এই সব জন্য বঙ্গসাহিত্য আজ মানসিক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে; সাহিত্যে সর্ব্ব প্রকারের চর্চ্চার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার অবসর দেওয়া হইতেছে না। সাহিত্য স্ফূর্ত্তিলাভ করে, হয় পুস্তক দ্বারা না হয় পত্রিকা দ্বারা। প্রথমোক্ত উপায় তত সহজ নয়, কারণ আমাদের দেশের লেখকশ্রেণী সাধারণতঃ নির্ধন, কোন বিষয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত, তৎব্যতীত আমাদের দেশে শিক্ষিত শ্রেণীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিয়া পাঠকের সংখ্যাও অতি কম। এই সব কারণে নূতনভাব প্রথমে পুস্তক দ্বারা প্রচারিত করা ভাবুকের পক্ষে সব সময় সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাসমূহ মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ বিরাজ করে বলিয়া অনুমিত হয়। কোন চিন্তাশীল লেখক হয়ত এমন বিষয়ে গবেষণা করিয়া লিখিয়াছেন যাহা তিনি আর্থিক কারণ বশতঃ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অক্ষম। তৎপরিবর্ত্তে কোন এক বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত করিলে লেখকের পক্ষে সুবিধাজনক হয়; কিন্তু মতের দলাদলির জন্য অনেক সময়ে লেখকের পক্ষে সে সুবিধা ঘটে না, কারণ হয়ত ঐ সব মাসিক পত্রিকার সত্বাধিকারী বা সম্পাদক লেখকের মতাবলম্বী নহেন। এবম্প্রকারের ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই তাহা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা জানেন। এই সব কারণে বঙ্গসাহিত্যে রাজনীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের চর্চ্চা পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে না।

এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এদেশে তেমন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদ্‌ব্যতীত একটি অতি উচ্চ স্তরের পুস্তকাগারও এদেশে নাই, যথায় কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কোন চর্চ্চার অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইসব কারণ বশতঃ আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য দেশের সমশ্রেণীভুক্ত লোকাপেক্ষা কম শিক্ষিত। তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার সীমাবদ্ধ ও জগতের নূতন সংবাদও অনেক সময়ে তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে। অনেকস্থলে প্রতীচ্যের পুরাতন তথ্যগুলি তাঁহাদের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হয় এবং এদেশে তাহাই আগ্রহ-সহকারে গৃহীত হয়। পরে কেহ সেই সব বিষয়ের নূতন তথ্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলী মধ্যে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিলে উপরোক্ত কারণসমূহ বশতঃ বিঘ্নপ্রাপ্ত হন। বঙ্গভাষায় পরিচালিত পত্রিকা সমূহে সাহিত্যের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে এই উক্তির পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশিত করিবার স্থান বাংলা পত্রিকা সমূহে কমই পাওয়া যায়। ইহার পরিবর্ত্তে নিম্নপ্রকৃতির নিম্ন রুচির গল্প, প্রেমাভিনয়ের চিত্র, নভেল, অতি নিম্নদরের কবিতা প্রভৃতিতে আমাদের পত্রিকাসমূহ পরিপূর্ণ। জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত পরিচালকবর্গ বলিবেন, লোকের রুচি অনুযায়ী লেখা না প্রকাশ করিলে তাঁহাদের ব্যবসায় বিনষ্ট হইবে। কিন্তু এইস্থলে জিজ্ঞাস্য, লোকের রুচি সৃষ্টি করে কে বা কাহারা? সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা সমূহ কি তজ্জন্য বিশেষ দায়ী নহে? সংবাদপত্রাদি দ্বারা লোকমত ঠিক করা হয়, ইহারা যদি বিকৃত রুচির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে লোকের রুচিও ভিন্ন হয়। স্বীকার করি, আমাদের দেশে শিক্ষিত পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই হাল্কা সাহিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাহা বলিয়া সাহিত্যে আর কিছু ভাব প্রকাশ করিবার অবসর না দিয়া কেবল লঘু প্রকৃতির গল্প ও নভেলে তাহার কলেবর পরিপুষ্ট করিলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহা ব্যবসায়ের খাতির না বলিয়া জাতীয় চরিত্রের অবনতিরই ফলস্বরূপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

আজকাল একটা রব উঠিয়াছে যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অবনতি ঘটিয়াছে অর্থাৎ প্রখর চিন্তাশীল ব্যক্তি আর বাঙ্গালী সমাজে উদিত হইতেছেন না। ইহা বঙ্গভাষার শ্লাঘার কথা নহে। বস্তুতঃ বঙ্গ-ভাষার জীবনের সর্ব্বদিকে একটা অবসাদ আসিয়াছে; বাঙ্গালী সাহিত্যে আর নূতন কিছু দিতেছে না, সেইজন্য সাহিত্যও অপাঠ্য ও পঙ্কিল হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই দুরবস্থা ক্ষণিকের জন্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, জাতীয় জীবনের মুক্তির চেষ্টাকালে সেই দেশের সাহিত্যে এক অমিত তেজ আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎকালে নূতন প্রকারের

পণ্ডিতের দল তাঁহাদের গভীর স্বাধীন চিন্তার দ্বারা ফরাসী জন-সাধারণের মানসিক শৃঙ্খল শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। সাহিত্যিক ও কবিরা ভাষাতে নূতন উদ্দীপনার ভাব আনয়ন করিয়া সাধারণের মনের পঙ্কিলাবস্থা দূর করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক জার্ম্মাণী বিজিত হইলে ভাষার সাহায্যে সেই দেশের পণ্ডিতেরা জনবৃন্দকে জাগরিত করিয়াছিলেন। তৎ সময়ে গোয়েথে, সিলার জার্ম্মাণ সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করেন। জার্ম্মাণদের মধ্যে এক জাতীয়তা আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদের উদ্দীপনাময় লেখনী সেই "ঝটিকা ও বিপদের" সময়ে যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিল তাহা জার্ম্মাণ ভাষাতে আজ পর্য্যন্ত অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। আবার সেই সময়ে ফিক্টে উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্র ও রাজনীতি বিজ্ঞানের গবেষণা করেন এবং যোহানেস্ মুগার ইতিহাসের অনুসন্ধান করেন। এবম্প্রকারে, সেই যুগের জার্ম্মাণ সাহিত্যে সেই ঝঞ্ঝাবাতের সময়ের নিদর্শন অতি বিশিষ্ট প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপর নানাপ্রকারে প্রপীড়িত রুষজনবৃন্দও নিজেদের দুঃখের কাহিনী জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। গোগল, উক্রেনিয়ানদের গ্রাম্য কুসংস্কার ও জীবনী তাঁহার লেখনী মধ্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন; ডষ্টইভস্কি রুষীয় প্রথম বিপ্লবের নিস্ফলতার কারণ, বৈপ্লবিকদের মনস্তত্ত্ব, ধনীশ্রেণীর সামাজিক চিত্র লিখিয়া তাঁহার সাময়িক রুষীয় জীবন প্রদর্শন করিয়াছেন; টুরগেনিভ, ছাত্রদের প্রাচীনত্ব ত্যাগ করিয়া নূতন ভাব গ্রহণ কালে সর্ব্ববিষয়ে অবিশ্বাসী হওয়ায় তাহাদের "নিহিলিষ্ট" নামকরণ করিয়া রুষ সমাজের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবার চিত্র দেখাইয়াছেন; টলস্টয় সমাজের বৈষম্য ও অত্যাচার প্রদর্শন করিয়াছেন; ম্যাক্সিম গর্কি দরিদ্রশ্রেণীর জীবনের অসহনীয় অবস্থা দেখাইয়াছেন; চেরভিনস্কি, বাকুনিন প্রভৃতি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির গবেষণা করিয়া অন্ধলোকদের নূতন পথ দেখাইয়াছেন।

আমাদের বঙ্গভাষায় এবম্প্রকারের সাহিত্যের যুগ কোথায়? ইহার নিকটবর্ত্তী অবস্থা বঙ্গভঙ্গ জনিত ঝটিকা ও বিপদের সময়ে ঘটিয়াছিল এবং সেই ঝঞ্ঝাবাতের প্রবাহ তৎকালের সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহার পর যে সব জাতীয় আন্দোলন হইয়াছে তাহাতে কেহ কিছু নূতন দান করেন নাই। আর সে তেজ, সে উদ্দীপনা, সে নির্ভীক চিন্তা আমাদের পরিলক্ষিত হয় না। সবই নিবিয়া গিয়াছে; আজ সাহিত্য জাতীয় সংগ্রামে পরাজিতের চিহ্নস্বরূপ কুরুচি ও লঘুভাবের "ভুসোমালে" পরিপূর্ণ! আজ সাহিত্যে উচ্চভাব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রখর চিন্তা, গভীর গবেষণার নিদর্শন কোথায়? আজ কেবল প্রেমের গল্প, আর্টের নামে আঙ্গুরবালা ও ঘুঙুরবালার নাচের বর্ণনা! রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক শোষণ ও নির্য্যাতনদ্বারা নিস্পেষিত বুভুক্ষিত বাঙ্গালীর মুখে

হইবে। রুষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এবং জার্মানীতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এবম্প্রকারের অবস্থা আসিয়াছিল। বঙ্গপ্রদেশ উপর্য্যুপরি দুইটী জাতীয় আন্দোলনের কার্য্যে বিফলকাম হইয়াছে, সেইহেতু লোকের মনে একটা অবসাদ আসিয়াছে, তজ্জন্যই সাহিত্যের অবনতি ঘটিয়াছে।

আজ জাতীয় ভাঙ্গাগড়ার দিনে সাহিত্যে নূতন ভাব নূতন চিন্তাস্রোত প্রস্ফুটিত হইবার অবসর পাইতেছে না বটে, আজ শ্রেণী-স্বার্থের বেদীতে সাহিত্যকে বলি প্রদান করা হইতেছে বটে, আজ নূতন চিন্তা নূতন গবেষণাকে "চরম পন্থীয়" বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যিকেরা অপাংক্তেয় করিতেছেন বটে, কিন্তু সমাজের পরিবর্তনশীল গতি নীরবে শনৈঃ শনৈঃ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিতেছে। বঙ্গসাহিত্যে লোকের অজ্ঞাতসারে প্রাচীনের অগোচরে একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। আজ একটি নূতন সাহিত্যিক দল নীরবে গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের অনেকে আজও অজ্ঞাত ও অপাংক্তেয় রহিলেও, জীমূতমন্দ্রের নাদের ন্যায় তাহাদের ভাবের প্রতিধ্বনি দুই একজনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। এই দলেরই অগ্রদূত—বিদ্রোহী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইস্‌লাম।

এই নূতন দল আমাদের এই ভাঙ্গাগড়ার দিনের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা সমাজের যথার্থ চিত্র লোকসমাজে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ তাঁহাদের অনেকের লেখনী নামজাদা বড় মাসিক পত্রিকাতে স্থান পাইতে পারে না বটে, কিন্তু নূতন ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া তাহার দুন্দুভি-নিনাদ চলিতেছে। নূতনের প্রকট অবস্থা সময়াপেক্ষ মাত্র।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাহিত্যে জাতীয় মনস্তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়। আমাদের জাতীয় মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এতদিন আমরা "জাতি" অর্থে শিক্ষিত ও ধনশালী শ্রেণীকে বুঝিয়াছিলাম, সেইজন্য আমাদের সাহিত্যে তাহাদের জীবনী, চরিত্র, আচার ব্যবহার, নীতিগতি চিত্রিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, আমাদের সাহিত্য এতদিন সম্পত্তিশালী শ্রেণীর সামাজিক জীবন প্রতিবিম্বিত করিত। এইজন্যই জমিদার নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের জীবনী বিষবৃক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধনী শ্রীশচন্দ্রের ও তাহার স্ত্রীর প্রেমের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করা হইয়াছে; কিন্তু নিঃসহায় বিধবা কুন্দনন্দিনীর ও দরিদ্রা হীরার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তেমন প্রকারে হয় নাই। এই প্রকারে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ব্যাপার সাহিত্যকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু রোহিণীর জীবন কালিমালিপ্ত করা হইয়াছে ও তাহাকে এক শোচনীয় পরিণাম দিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। এইজন্যই ইন্দিরার স্বামীও তাহার বিসদৃশ অসামাজিক প্রেমলীলা "ধনীর কার্য্য" বলিয়া সাতখুন মাপ করা হইয়াছে। এই জন্যই পাপিষ্ঠ হরলালের হৃদয়বিহীনতা, "জমিদার" বলিয়া চাপা পড়িয়াছে ও তাহার বেস্থানকে সমাজে দণ্ডিত করিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে, আর তজ্জন্য গরীব প্রফুল্লের স্বামীগৃহে স্থান হয় নাই। এই জন্যই

হইয়াছেন. কিন্তু তাহার মধ্যে নিষ্পীড়িত, নির্য্যাতিত-গণশ্রেণীর সুখ দুঃখের কথার সংবাদ পাই নাই। এই জন্যই "বৃত্রাসুরে" কবি, মর্ত্ত্যলোকে লুক্কায়িতা শচীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহার মুখ হইতে বলাইয়াছেন,—"সখী এ মরতের মাটি পায়ে বাজে নিতি নিতি"; কিন্তু সুরলোকের অন্যান্য নগণ্যা স্ত্রীলোকদের অবস্থা কবি বর্ণনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এই জন্যই কবি, 'রাজা ও রাণী'তে রাণীর মুখ হইতে যুবক রাজার ছিন্ন মস্তককে "ধরণীর শ্রেষ্ঠ শির" বলাইয়াছেন। এবম্প্রকারে অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ইহার অর্থ, আমাদের সাহিত্যিকেরা এত দিন সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবনী লইয়াই সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছেন। ধনীশ্রেণীর নীতির আদর্শের মাপ কাটিতে সকলকে মাপিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহাদের সমাজ-চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান কেবল আমাদের সাহিত্যে সংঘটিত হয় নাই, এতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্ব সাহিত্যেই এই অনুষ্ঠান ঘটিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে প্রকার নূতন ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা গণশ্রেণীর উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইতেছে, তজ্জন্য অন্যান্য দেশে নূতন দলের সাহিত্যিকগণ গণশ্রেণীর সামাজিক জীবন জনসাধারণের সম্মুখে অঙ্কিত করিতেছেন, তদ্রূপ বঙ্গদেশেরও নূতন সাহিত্যিকগণ সমাজ-শরীরে নূতন ভাবতরঙ্গ, তাহার প্রতিক্রিয়া, গণশ্রেণীর সামাজিক জীবন, তাহাদের দুঃখ ও সুখ, অভাব ও অভিযোগ, অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা, মনস্তত্ত্ব, সমাজে জানাইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন।

ভারতীয় সমাজে নূতন শিক্ষা, নূতন অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রচলন জন্য সমাজে নূতন ভাবতরঙ্গ এবং তরুণের নূতন মানসিক অবস্থা উপনীত হইয়াছে। আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা, নূতন মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করিতেছে, তজ্জন্য অনেক বিভ্রাটও ঘটিতেছে। কিন্তু অন্তঃসলিলারূপে যাহা সমাজ মধ্যে বহিতেছে, তাহা অস্বীকার করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে। তদ্ব্যতীত, এই পরিবর্ত্তনের যুগে সমাজশরীরে যে সব ব্যাধি আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা অত্যাবশ্যক। এইজন্য চাই,—আমাদের একটি প্রবল নূতন সাহিত্যিকের দল, যাঁহারা সমাজশরীরের ব্যাধি সকল আবিষ্কার করিবেন ও অন্তঃসলিলা প্রবাহকে চক্ষুগোচর করাইবেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটি নূতন সাহিত্যিকদল নীরবে গড়িয়া উঠিতেছে। উপস্থিত তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প; তজ্জন্য আমাদের কর্ত্তব্য তাহাদের দলপুষ্ট করা, এই নূতন ভাবকে প্রকট করা, এবং সমাজকে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করা। প্রথমে চিরন্তন প্রথানুসারে নূতনের দল প্রাচীনদের নিকট উপেক্ষিত ও উপহসিত হইবেন, প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাসমূহে হয়ত তাঁহাদের ভাব প্রকাশ করিবার স্থান হইবে না। কিন্তু, ইহাই আমাদের আশু কর্ত্তব্য। ইহা আমাদের জাতীয় গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির ভাবসম্বন্ধীয় একটি বিশেষ অঙ্গ।

পদ্ধতি বা সনাতন প্রথা-বিরোধী, না হয় প্রাচীনের স্বার্থের বিরোধী। কিন্তু নূতন, পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়, সে অবস্থাকে অস্বীকার করিয়া নূতনানুযায়ী কার্য্য না করিলে ধ্বংসের মুখে নিশ্চিত পড়িতে হয়। প্রফুল্ল ও চন্দ্রমুখীর পতি-ভক্তি অতি প্রশংসনীয় হইতে পারে, যাহাদ্বারা স্ত্রীলোক ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু তাহা পুরাতন আদর্শ। অন্যদিকে নূতন সাহিত্যিক অভয়ার মুখ দিয়া যে সব কথা বাহির করিয়াছেন তাহা সমাজের ভাবিবার বস্তু, আর রাজলক্ষ্মী নিজ জীবনকে শেষভাগে যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাতে সমাজ তাহাকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিলে সমাজ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পণ্ডিত মহাশয় চাষা ছোট লোক হইলেও তিনি তাঁহার প্রতিবেশী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণাপেক্ষা মহৎ ব্যক্তি। তাঁহাকে 'ছোটলোক' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া নিম্নে চাপিয়া রাখিলে সমাজেরই অকল্যাণ হইবে। আর যে সমাজে বেণী ঘোষাল ও পরাণ হালদার সমাজপতি, সে সমাজের অবস্থা কি জঘন্য, তাহা লেখক দেখাইয়া স্বজাতির মঙ্গলেচ্ছুদের চক্ষু উন্মীলিত করাইয়াছেন। আবার, চন্দ্রনাথের খুল্লতাত যখন টাকার জোরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন,—"সমাজ অর্থে তুমি আর আমি, এখানে আর কেহ নাই, যার টাকা আছে তারই সমাজ"— তখন লেখক একটি অতি সত্য কথা বলিয়াছেন।

এতদিন সমাজ, ধনী-শ্রেণীর ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়া রহিয়াছে। সমাজের নির্ধনেরা ধনীদের নিপীড়ন, নির্য্যাতন ও শোষণের বস্তু। নূতন লেখক, তাই অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন। আবার এই নূতন ধারা ধরিয়া নূতন 'কবি কৃষাণের গানে' গাহিয়াছেন—

(আজ) চারিদিক হ'তে ধনিক বণিক
শোষণকারীর জাত,
(ও ভাই) জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত
কাড়ছে থালার ভাত।
(মার) বুকের কাছে মর্‌ছে খোকা
নাইক আমার হাত॥
(আজ) সতী মেয়ের বসন কেড়ে
খেল্‌ছে খেলা খল" ॥

আবার "শ্রমিকের গানে" নূতন কবি গাহিয়াছেন—

"যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা উজির মার্‌ছে মজা,

এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্‌বিরে আয় মজুর দল।
ধর হাতুড়ী, তোল কাঁধে শাবল” ॥

আবার দুন্দুভি নিনাদ করিয়া নূতন কবি, নূতন যুগের বারতা দিয়া গাহিতেছেন—

“গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছুই নাই,
নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ,
অভেদ ধর্ম্ম জাতি।
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে,
তিনি মানুষের জ্ঞাতি ॥
* * * *
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব
সেই মানুষের মেরে
* * * *
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল,
মূর্খরা সব শোনো।
মানুষ এনেছে গ্রন্থ,
গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।”

আবার কোন কোন নূতন লেখক, সমাজের বৈষম্য ও অত্যাচার গল্পাকারে প্রদর্শন করিতেছেন। এই দল আজও ক্ষমতাশালী হয় নাই বলিয়া সাহিত্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তজ্জন্য এখনও সমাজেও কোন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা নূতন ভাবের ভাবুক, তাঁহাদের সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া সমাজের কল্যাণের জন্য এই নূতন ভাবকে পুষ্ট করিতে হইবে।

এই সময়ে একটী বিষয়ে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি; “নূতন” অর্থে কেহ যেন পুরাতন প্রতীচ্যের আবর্জ্জনারাশিকে না বুঝেন। আজকাল এবম্প্রকারের আবর্জ্জনাকে বঙ্গভাষা অলঙ্কৃত করিয়া “নূতন” বলিয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচারিত করা হইতেছে। অনেক উদ্ভট ব্যাপারকেও

পড়িয়াছি, যাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম না, আমি কোন্ মহাদেশের অধিবাসীর চিত্র পড়িতেছি। এই পুস্তকের স্থান কলিকাতা—বালীগঞ্জ, নায়ক একজন বাঙ্গালী যুবক, বিলাত না যাইয়াই ঘরে বসিয়া "কালা ইংরেজ" সাজিয়াছেন, অবশ্য তাঁহার বাড়ীর সকলেই কালা ইংরেজ। তিনি তাঁহার বাড়ীর বন্ধু এক শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ প্রতিবেশীর কন্যার সহিত "লভে" পড়িয়াছেন ইত্যাদি। এই পুস্তকে ভারতবর্ষের পক্ষে এত অস্বাভাবিক ও অসামাজিক ঘটনার সমাবেশ করিয়া গল্প রচনা করা হইয়াছে যে, আমি লেখকের অজ্ঞতা পরিমাণ করিতে অপারগ। কথাটা এই,—বলীগঞ্জ হউক, বা দার্জ্জিলিং হউক, বা ইংলণ্ড হউক, কোথাও কালা ইংরেজ ও সাদা ইংরেজের সামাজিক মেশামিশি হয় না। এবম্প্রকারে উদ্ভট ও কাল্পনিক চিত্র, সমাজের সম্মুখে প্রদান করিলে তাহার অস্বাভাবিকত্বের জন্য সমাজের ক্ষতিই হয়। তৎপর একদল লেখক বাহির হইয়াছেন, যাঁহারা বিলাতীয় সমাজিক চিত্র বাঙ্গালীর ঘরে প্রয়োগ করিতেছেন। মিস্ এমেলী চ্যাটারটনের বা মিসেস আনা হপকিন্সের হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী, চালচলন, মতিগতি, কুমারী তারাসুন্দরী মিটর বা শ্রীমতি বিদ্যুৎলতা বটরচকের উৎকট ইঙ্গ-বঙ্গত্ব সত্ত্বেও তাহাদের উপর আরোপ করিলে, তাহা একটি জাতির মনস্তত্ত্বের বিধিবিরোধী হয়। সাহিত্য কাল্পনিক ব্যাপারের উপর গঠিত হইতে পারে না; প্রকৃত সাহিত্য সেই জাতির মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক হইবে। এই প্রকারে অস্বাভাবিক গল্প পাঠে অনেক তরুণের মনে ভ্রান্ত ধারণা প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনে ক্ষতি হইয়াছে। ৺বঙ্কিমচন্দ্রও এ দোষে মুক্ত ছিলেন না। তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রেমাভিনয় মধ্য-যুগের নৈষ্ঠিক হিন্দুর ঘরে অজ্ঞাত। "কি লো শিব সাক্ষাতে স্বয়ম্বরা হইনি না কি"?—বলিয়া লেখক "শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার ন্যায়" হিন্দু আকারে নায়িকার ফ্লার্টেশনকে আমাদের সম্মুখে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, স্বীকার করিতে হইবে ইহা বিজাতীয় ভাব; তাহা আমাদের তৎকালীন সমাজে অজ্ঞাত। যখন বাগদত্তা ডাক্তারকে বলিলেন,—"উঃ আপনি যে আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেন, মাথায় মাথায় ঢুঁ মারিলে শিং বেরোয়"—তখন এই প্রকারের নিরীহ ফ্লার্টেশন উক্ত গল্পে অশোভন হয় নাই, কারণ, আজকালিকার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে এবম্প্রকারের প্রথা অজ্ঞাত নহে। উক্ত গল্পের নায়ক নায়িকা আধুনিক বলিয়া, এই ফ্লার্টেশন তথায় সুন্দর মিলিয়াছে এবং আমাদের নূতন সাহিত্যিক বঙ্গীয় সমাজের একপার্শ্বে যে নূতন চালচলন প্রচলিত করিতেছেন, তাহার প্রতি এখন লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে।

পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইলেও এই স্থানে আবার বলি, আমরা "নূতন"কে দুই প্রকার কার্য্যের দ্বারা বুঝিব। প্রথমতঃ আমাদের এই পরিবর্ত্তনের যুগে, সমাজে যে সব নূতন রীতিনীতি চালচলন,

চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান যে, সমাজ সনাতন প্রথা বলিয়া প্রাচীনকে আর আঁকড়াইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় সনাতন আদর্শের দোহাই দিয়া অনেক আচার পদ্ধতি, যাহা বর্ত্তমান যুগে অযৌক্তিক ও অর্থশূন্য হইয়াছে, তাহার গলদ ও অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করিবার জন্য গণসমূহের দৈনন্দিন জীবনের সুখ ও দুঃখ, অভাব ও অভিযোগ, ন্যায্য দাবী প্রভৃতি সাহিত্যে চিত্রিত করিয়া লোক-সমাজে প্রকাশ করা। এই জন্য আমাদের সাহিত্যে গরকি, আনাটোল ফ্রান্স, আপটন সিনক্লেয়ার, জ্যাক লণ্ডন ওয়েলস্‌, বার্ণার্ড স-এর ন্যায় সামাজিক নক্সালেখক প্রয়োজন। ইহা হইল "নূতনের" ভাঙ্গনের দিক দিয়া কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, নূতন লেখকশ্রেণীকে গড়নের দিক দিয়াও কার্য্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমানযুগে গণসমূহকে উত্তোলিত করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা প্রকারের উপায় গৃহীত হইতেছে ও পদ্ধতি প্রচলিত করা হইতেছে; তন্মধ্যে তাহাদের মনস্তত্ত্ব-অনুযায়ী চর্চ্চার বিকাশের চেষ্টা একটি অন্যতম উপায়। পদদলিত গণশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা, আশা, স্বার্থ, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহাদের চর্চ্চা বিকশিত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং এই চর্চ্চানুযায়ী সাহিত্যও গঠিত হইয়া উঠিতেছে।

এতদিন সর্ব্বদেশেরই সাহিত্য কেবল ধনী-শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু আজ নূতন হাওয়া বহিতেছে, গণশ্রেণীও সাধারণ নির্ধনের উপর সামাজিক ন্যায় বিচার করার আয়োজন হইতেছে। আমাদের দেশেও গণশ্রেণীর মনস্তত্ত্বানুযায়ী চর্চ্চা সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের নির্ধন ও গণশ্রেণীর লোকদের আকাঙ্ক্ষা, আশা, স্বার্থের ভাবানুযায়ী চর্চ্চার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহার বাহনস্বরূপ সাহিত্যকে নিয়োজিত করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে নূতন ভাব সমূহ আনয়ন করিতে হইবে। গরীবের ও পতিতের অবস্থা ভাবিয়া তাহাদের জীবন কি প্রকারে সুখময় ও সফল হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। সাহিত্যে গরীবের কথা উত্থাপিত করিতে হইবে। নূতন জাতি ও সামাজিক আদর্শ সাহিত্যে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে। এইজন্যই চাই—আমাদের একদল নূতন ভাবের ভাবুক ও তাহাদের ভাবকে লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য সাহিত্যে নূতন ভাবতরঙ্গ।

আজকাল আমাদের মত সামান্য লোকেও বোঝে—দেশে কাজ অনেক, কিন্তু কর্ম্মী নাই; উপযুক্ত কর্ম্মীকে পালন করিবার মত সঙ্গতিও নাই। ভূপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা কথা সকলেই বলিবেন যে তিনি একজন বড় কর্ম্মী। দেশকে তাঁহার কিছু বলিবারও আছে, দেশে তাঁহার কিছু করিবারও আছে। সাহিত্য পরিষৎ নানাস্থানে নানা প্রকারে টাকা লইয়াছেন, এখনও লইতেছেন

নির্ভীক আত্মত্যাগের দ্বারা দেশে যে জাগরণ আসিয়াছিল, সেই জাগরণের সাহায্যে অনেক টাকা একত্র করিয়াছেন, এবং জাতীয় বা বিজাতীয় কর্ম্মে তাহার সদ্ব্যয় করিতেছেন। কংগ্রেসেরও অনেক কাজ,—যুবকদের মানুষ করা, পল্লীকে উদ্বোধিত করা প্রভৃতি ; টাকা উঠিয়াছিলও অনেক, এখন উঠিতেও পারে ; হিসাবের দায়িত্বও তেমন নাই। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেহ কি ভূপেন্দ্রনাথকে বা তাঁহার মত কর্ম্মীকে কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া দিতে পারেন না ? ভূপেন্দ্রনাথ চাহেন কিনা, জানি না ; জানার প্রয়োজনও নাই। একটা কথা জানা আছে,—প্রকৃত কর্ম্মী, আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-যুক্ত শক্তিশালী মানুষ দরখাস্ত করিবে না, মুরুব্বির বাড়ী বাড়ী সুপারিশ-পত্র হস্তে বেড়াইবে না। সুতরাং ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরা যদি আমলাতন্ত্রী না হ'ন, তাহা হইলে কিছুদিনের জন্ম পরীক্ষা করিয়া নিজেরাও দেখুন, দেশকেও দেখান, ভূপেন্দ্রনাথের দ্বারা কি হইতে পারে।

আমার বার্ষিকী

(২)

বেতিলা, মাণিকগঞ্জ ও হুগলী ঘুরিয়া ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৬, (২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩) সোমবার সকালে সিউড়ি আসিলাম। এই সময়কার সিউড়ির ঘটনা সম্বন্ধে দিনলিপিতে কিছু কিছু খবর লেখা আছে। যাহা লেখা আছে, তাহা প্রকাশ করার দরকার নাই। ব্যাপারটা কংগ্রেসের কাজ সম্বন্ধে। সারমর্ম্ম ;—ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল কংগ্রেস বা স্বরাজের পক্ষে বেশ সন্তোষজনক হওয়ায় অনেকের মনে ইচ্ছা হয়, বীরভূমে কংগ্রেসের কাজ বেশ ভাল করিয়া চালানো যাউক। সেই জন্ম এক প্রকাশ্য সভায় একটা সাময়িক (provisional) কমিটিও করা হয়। আমি আসিয়া দেখিলাম, সেই সাময়িক কমিটি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। আর কিছু না হউক, নূতন নূতন লোক চাঁদা দিয়া ও অঙ্গীকার-পত্রে সহি করিয়া সভ্য হইতেছে, আর কংগ্রেস সম্বন্ধে বেশ একটা আলোচনা

কে কি করিল, কেন করিল, তাহার আলোচনায় লাভ নাই, বরং লোকসান আছে। এই ঘটনার যাহা স্থায়ী শিক্ষা, তাহাও কিছুদিন পরেই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা এই—

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদনদীর অবস্থা, আর আমাদের অবস্থা ঠিক্ একরূপ। বৃষ্টি হইলে কিছুক্ষণ খুব জোরে বন্যা হয়, খুব জল ছোটে ;—কিন্তু মাত্র কয়দিন, অনেক সময়ে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তাহার পর আর জল নাই, একেবারে কিছুই নাই, শুষ্ক বালি ধূ-ধূ করিতেছে, মরুভূমি বলিলেই হয়!

এখন বীরভূমের বক্রেশ্বর নদে বাঁধ হইতেছে। বন্যার জল যাহাতে নিঃশেষে চলিয়া না যায়, অপব্যয় না হয়, জলটা যাহাতে থাকে এবং কাজে লাগে, তাহার ব্যবস্থার জন্য বাঁধ হইতেছে। বর্দ্ধমান জেলাতে দামোদরেও বাঁধ হইতেছে। আমাদের বক্রপ্রকৃতিতে ভাবের বন্যা যখন বিপুল ছোটে, তখন সেই ভাবের জলের সবটা না হউক, দরকার মত কতকটা ধরিয়া রাখা ও কাজে লাগানো দরকার।

সিউড়িতে কংগ্রেসের কাজ নষ্ট হইল ; তাহা হইত না, হইতে পারিত না, যদি বাঙ্গালাদেশে একটা সত্যকার জীবন্ত কেন্দ্র-সমিতি থাকিত। তাহা হইলে নূতন ও পুরাতন কর্ম্মীদের এই বিরোধের একটা সুমীমাংসা হইতে পারিত, কিন্তু মীমাংসা হইল না। পাকা বনিয়াদের উপর কংগ্রেসের কাজের পুনর্গঠন করিতে হইলে, এই সময়কার এই সামান্য ইতিহাস জানিয়া রাখায় উপকার আছে। এ প্রকারের ঘটনা যে বীরভূমেই ঘটিয়াছে তাহা নহে, প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ।

বীরভূম জেলার গ্রামের সহিত পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা চিরদিনই আছে, কিন্তু তেমন সুবিধা হয় না। চেষ্টাও করিয়াছি দুএকবার, কিন্তু সুবিধা করিতে পারি নাই। এবার একটু সুবিধা হইল। ১৭ই ডিসেম্বর 'হেতিয়া' নামক এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে আহূত হইয়া উপস্থিত হইলাম, বাঙ্গালা ২রা পৌষ। ৯ দিন সেই গ্রামে ছিলাম। গ্রামের লোকজন খুবই ভাল, কিন্তু জীবনের সাড়া নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা বলিলেই হয়। এই সব গ্রাম রক্ষা করিতে হইলে বাহিরের অর্থ ও সামর্থ্য প্রয়োজন।

১১ই পৌষ সিউড়ি আসিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার কথা শুনিলাম। গ্রামে থাকিতে খবর পাই নাই। ১২ই পৌষ বেলা তিনটার ট্রেণে বিক্রমপুর রওনা হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পরদিন লৌহজং পৌঁছিয়া অসুবিধায় পড়িলাম। লোক আসিবার কথা ছিল, ঝড় বৃষ্টিতে আসিতে পারে নাই। একা, নৌকায় যাওয়া নিরাপদ নহে। যাহা হউক, পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গ পাইলাম ও বেলা-শেষে বাহেরক পৌঁছিলাম। এইবার লইয়া বিক্রমপুর আসা হইল ছয়বার। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাহেরক হরিসভায় থাকিলাম—যেমন কাজ করি, করিলাম। একদিন শ্রদ্ধানন্দ-

আলোচনা করিয়াছিলাম, কতকগুলি নূতন ধরণের মন্তব্য বা Resolutionও লিখিয়া দিয়াছিলাম। সভার যিনি প্রধান উদ্যোগী, তিনি বক্তৃতার নোট লইয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলাম, ঢাকার কোন কাগজে বোধ হয়, তাহা বাহির হইবে। কিন্তু বাহির হয় নাই। কলিকাতা-কেন্দ্রের আদেশ বা Mandate না পাওয়ায় হয়ত তাঁহারা পাঠান নাই: অথবা, মামুলি কথা নহে বলিয়া ঢাকার কাগজ তাহা ছাপে নাই,—ঠিক্ বলিতে পারিলাম না।

(৩)

১লা জানুয়ারী ১৯২৭—দিবিরপার সত্যাশ্রমের নীচে নদীর ঘাটে সকালে নৌকায় উঠিলাম। সঙ্গে দুইটি যুবক, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক। রামনগর রিকাবীবাজার যাইতেছি। নৌকাযোগে মুন্সী-গঞ্জের নিকটবর্ত্তী হইলাম। খাল বন্ধ, আর নৌকা যাইবে না। পদব্রজে মুন্সীগঞ্জ ছাড়াইয়া খেয়াপার হইয়া, আরও অনেক পথ হাঁটিয়া গম্যস্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থানটি অর্থাৎ রিকাবীবাজার, মীরকাদিম, কমলাঘাট, আবদুল্লাপুর প্রভৃতি খুবই জনাকীর্ণ। পূর্ব্বে আর কখনো এ-গ্রামে আসি নাই। মুন্সীগঞ্জের ইদ্রাকপুর কেল্লা দেখিয়া গেলাম। এই রিকাবীবাজারেই চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন লইয়া হিন্দুমুসলমানের বিরোধ, শেষে গুপ্তহত্যার চেষ্টা প্রভৃতি খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। তিন দিন এখানে ছিলাম। ইচ্ছা ছিল, আরও দুএকদিন থাকি। কিন্তু হইয়া উঠিল না।

৩রা জানুয়ারী বন্ধুবর জিতেন কুশারি সহ সকালে সমগ্র রামপাল ভ্রমণ করিলাম। এমন উত্তম কৃষি, আর দেখি নাই। আক, মুলা, বেগুন প্রচুর। কৃষকেরা সকলেই মুসলমান। অতি বলবান সব লোক; কি বড় বড় বোঝা মাথায় লইয়া তাহারা যাইতেছে! বাবা আদমের মস্‌জিদ্ ও কবর দেখিলাম। বল্লালদিঘি, প্রাচীন রাজবাড়ীর পরিখা, ও বিখ্যাত গজারি গাছ দেখিলাম। গজারি গাছ মরিয়া গিয়াছে, তাহার মাথায় শকুনি বসে।

ময়মনসিং জেলার চাঁদোড়া গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। একজন গোস্বামী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সহিত ৪ঠা জানুয়ারী রওনা হইলাম। পূর্ব্ব হইতে যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না, এখন ব্যবস্থা করিতে গেলে সময়ও নষ্ট হয়, কাজেই রামামৃতগঞ্জ নামক রেলষ্টেশন হইতে পদব্রজেই ১২।১৪ মাইল গিয়া চন্দুড়া পৌঁছিলাম। এই গ্রামের গোস্বামী মহাশয়দের সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু আমার কাগজে বাহির হইয়াছে। পরে আরও অনেক কথা বলিবার থাকিল। ৮ই পর্য্যন্ত চান্দুড়া; ৯ই নন্দাইল, ১০ই হইতে ১২ই পর্যান্ত যশোদল। ১৩ই—২০শে কিশোরগঞ্জ। বলা বাহুল্য, কোন দিনই বিশ্রাম নাই। সন্ধ্যায় বক্তৃতা, আর সকালে বাদানুবাদ ও কথোপকথন, প্রত্যহই আছে। এবার

গোয়ালারা ক্ষত্রিয় হইয়াছে বলিয়া কোন কোন ব্রাহ্মণ তাহাদের দই ক্ষীর প্রভৃতি বন্ধ করিয়াছেন; কোন কোন ব্রাহ্মণ, জমিদারদের সাহায্য লইয়া তাহাদের শাসন করিতে চেষ্টাও করিতেছেন। তাঁহাদের বুঝাইলাম, এ-সব করিবেন না—তাহাতে কুফল হইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন বোঝানো যায়, সকলেই বোঝে, কিন্তু কাজের বেলায় বক্রপ্রকৃতি আবার যে বক্র হয়! যাহা হউক, সমাজের ভিতর যে উদারভাব আসিয়াছে, তাহার গতি অবরুদ্ধ হইবে না। ২১—২৩শে হুসেনপুর—ব্রহ্মপুত্রের তীরে; ২৪—২৮শে বাজিতপুর। ২৯শে জানুয়ারী—১লা ফেব্রুয়ারী আঠারবাড়ী। ২—৪ ফেব্রুয়ারী গৌরীপুর। ৫—৬ ফেব্রুয়ারী ময়মনসিং দুর্গাবাড়ী। ৭ই সকালেও বক্তৃতা হইল। তাহার পর রওনা হইলাম গৌহাটি। আসামে নূতন সংস্কৃত বোর্ড হইয়াছে, এইবার তাঁহাদের প্রথম কন্‌ভোকেশন্, আমাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ৮ই সেখানে পৌঁছিয়া, দুইদিন ধর্ম্মসভার ব্যবস্থায়, আর একদিন কন্‌ভোকেশন উপলক্ষে বক্তৃতা হইল।

এইবার নবদ্বীপের ধুলট ১২ই ফেব্রুয়ারী একাদশীর দিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ পৌঁছিলাম। এই ঠিক বার বৎসর নবদ্বীপের ধুলটে আসিতেছি। দশ দিন নবদ্বীপে ছিলাম। ২২শে ফেব্রুয়ারী সিউড়ি আসিয়া সাতদিন থাকিয়া ২রা মার্চ্চ রওনা হইয়া কলিকাতা, ও সেখান হইতে এক বড় উৎসবে গ্রাম-আমতা আসিলাম। মাণিকগঞ্জ হইয়া এই স্থানে যাইতে হয়। এই গ্রামের উৎসব খুবই ভাল লাগিল। আমতা ৫ দিন, দরগ্রাম ২ দিন, ধুলিয়া ২ দিন, মাণিকগঞ্জ ১ দিন থাকিয়া ১৬ই মার্চ্চ কলিকাতা, ও ১৮ই দোলযাত্রার দিন নবদ্বীপ আসিলাম। দোলের দিন বহুকাল নবদ্বীপ আসি নাই—বড়ই ইচ্ছা ছিল, ভগবান্ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। সিউড়িতে তিন দিন থাকিয়া বাঁকিপুর ৮ দিন। আবার সিউড়ি ৬ দিন। এইবার রাজসাহী নওগাঁ। নওগাঁএ ৪ দিন থাকিয়া, মাণিকগঞ্জ গেলাম। মাণিকগঞ্জ হরিসভার বার্ষিক উৎসব। ৬ দিন থাকিয়া ৫ই বৈশাখ কলিকাতা আসিলাম; ১০ই, ১১ই বৈশাখ সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার মাঠে বক্তৃতার কথা ছিল। হইল বটে, কিন্তু প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য খুব ব্যাঘাত হইল। এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ ভাল বলিয়াই মনে হয়, তবে Cultural side আছে কিনা, জানি না। এই সময়ে এক দিন ২৫শে এপ্রিল থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির হলে বক্তৃতা হইয়াছিল। কি বিষয়ে বলিয়াছিলাম, মনে নাই। ১৭ই বৈশাখ 'বেগড়ি' গ্রামে যাই। ইহা হাবড়া জেলায় এবং হাবড়া হইতে বেশী দূর নহে। এই গ্রামে অনেক ভক্ত আছেন, অনেক বৎসর হইতেই তাঁহারা বিশেষভাবে ডাকিতেছেন। ২।৩ বার প্রতিশ্রুত হইয়াও যাইতে পারি নাই। এবারে বেগড়ি আসিয়া ১১ দিন ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা হইল, বহুদূর হইতে লোকজন আসিতেন। বেশ আনন্দ পাইলাম।

একটি সামাজিক কার্য্যে মেদিনীপুর যাইতে হইল। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৭ দিন সেখানে

সেখানে যুবকেরা একটি সমিতি ও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন; তাঁহাদের উদ্যোগে ১০ দিন বক্তৃতা হইল। বগুড়া আসিলাম। ধর্ম্মসভার নূতন গৃহ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। চারদিন খোলা মাঠে বক্তৃতা হইল। বগুড়াজেলায় এই নূতন। উত্তরবঙ্গের ভক্তিভাব এখানেও বেশ আছে। তবে এই জেলায় হিন্দুর সমস্যা খুব কঠিন। সেরপুরে থাকার সময় প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আর আধুনিক মোহান্ত-সমস্যা লইয়া বেশ আলোচনা হইল। সেরপুর রঙ্গপুরের মতই মোহান্তের কেন্দ্র। ৫ই জুন কলিকাতা হইয়া সিউড়ি আসিলাম, ৮দিন থাকিয়া মালদহ যাত্রা করিলাম—রামকেলির উৎসবে কর্ত্তৃপক্ষ সভাপতি করিয়াছেন। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বিকালে মালদহ পৌছিলাম—সন্ধ্যায় ধর্ম্মশালায় বক্তৃতা হইল, তাহার পর দুইদিন রামকেলিতে থাকিলাম। মালদহে ৭ দিন বক্তৃতা হইল, কিন্তু উপযুক্ত আয়োজন না থাকায় ভাল লাগিল না। নুটুদাদাই এজন্য দায়ী। ১০ই আষাঢ় শিলাবাড়ী, ১১ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত ভোলাহাট। ১৭ই আষাঢ় কলিকাতা পৌছিয়া মেদিনীপুর যাত্রা করিলাম। মেদিনীপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইবে। ১০ দিন মেদিনীপুরে থাকিলাম। এই মন্দিরটিকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া পরিচালনার পরিকল্পনা হইয়াছে, কিন্তু বিঘ্ন অনেক, কতদূর কি হয়, বলা যায় না। ২৭শে আষাঢ় সিউড়ি আসিলাম। ২৫ দিন সিউড়িতে থাকিলাম। ২১শে শ্রাবণ কলিকাতা হইয়া বারুইপুর,—পদ্মপুকুর হরিসভার বার্ষিক অধিবেশন। ২২শে জয়নগর, দীনকুটিরের বার্ষিক। ২৩শে শ্রাবণ হইতে ১লা ভাদ্র পর্য্যন্ত কলিকাতা। ইহার মধ্যে বরাহনগর বাগানে একদিন ১৪ই আগষ্ট যজ্ঞ ও সমস্ত দিবসব্যাপী উৎসব হয় এবং আমাকেই তিনবার বক্তৃতা করিতে হয়। ঐ দিন আবার সন্ধ্যায় চাল্‌তা বাগানে বৈষ্ণব-সম্মিলনেও বক্তৃতা ছিল। ২রা ভাদ্র বরিশাল পৌছিলাম, ধর্ম্মসভার নিমন্ত্রণ। ৫ দিন বরিশালে থাকিয়া ৭ই ভাদ্র কলিকাতা আসিলাম। ৯ই ভাদ্র হইতে ৮ দিন ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে বক্তৃতা হইল। ১৭ই ভবানীপুর। ১৮ই হইতে ৬ দিন বরানগর। ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন বালি। ২রা আশ্বিন মেদিনীপুর যাই—আর ১০ই কলিকাতা হইয়া সিউড়ি আসি। মেদিনীপুরে থিয়সফি, সাহিত্য ও ধর্ম্মসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দিন, ভিন্ন স্থানে আলোচনা হয়।

মন্তব্য ও সংবাদ

বাহেরক সত্যাশ্রম। বিক্রমপুর পরগণায় বাহেরক একখানি ভদ্রপল্লী। এই পল্লীতে 'সত্যাশ্রম' নামক একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণ "বিক্রম-পুর জাতীয়-প্রদর্শনী" নাম দিয়া প্রদর্শনী বা এগ্‌জবিশন করিতেছেন। ১৩৩১ সালে প্রথম প্রদর্শনী হয়, এবারেও প্রদর্শনী হইয়া গেল। এবারের প্রদর্শনীতে আমি গিয়াছিলাম ও দুইদিন ছিলাম। এই 'সত্যাশ্রম' কি, কি প্রকারে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার উদ্দেশ্য কি, ইহাতে কি কি কাজ হইতেছে, তাহা জানা সকলেরই দরকার। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য, অন্ততঃপক্ষে এই নাগরিক প্রভাবের অতিব্যাপ্তির যুগে, একটি উদার ও উন্নতিমুখী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যতটুকু গ্রাম্য হওয়া সম্ভব, ইহা ততটুকু গ্রাম্য। জাতীয় আন্দোলন এবং বিপুল উচ্ছ্বাস ও ভাবুকতার পর এখন ইহা কার্য্যক্ষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কিভাবে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহার একটি সম্যক্ নিদর্শন। এই আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের কার্য্যের যে বিবরণী ছাপাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। উদ্ধৃত অংশ হইতেই, ঐতিহাসিক প্রণালীতে আশ্রমের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এখানে একটি কংগ্রেসশাখা ও তাহার পর ১৩২৭ সালের ১লা ফাল্গুন, "সিদ্ধেশ্বরী জাতীয় বিদ্যালয়" নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে কংগ্রেস আন্দোলনের জোর কমিয়া গেল, জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যাও কমিয়া গেল। "কংগ্রেসের সহিত দলাদলির সূত্রপাত হইল।" কর্ম্মীগণ নিরুপায় হইলেন, বাহিরের সাহায্যে বঞ্চিত হইলেন; কিন্তু ব্রতভ্রষ্ট হইলেন না। তাঁহারাই ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে 'সত্যাশ্রম' স্থাপনা করিলেন। জমি খরিদ হইয়াছে, কার্য্যোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কর্ম্মী সংখ্যা ১০ জন। দুইজন বিদ্যালয়ের কাজ করেন, তিনজন খদ্দরের কাজ করেন, প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ কুশারী অর্থ সংগ্রহ করেন, দুইজন কর্ম্মীকে অন্যস্থানে পড়িতে পাঠান হইয়াছে, আর দুইজন অসুস্থ। আশ্রমের একটি পুস্তকাগার হইয়াছে। নোয়াখালি নিবাসি ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু মহাশয় একখানি

উভরেষ্ট বাহেরকের অধিবাসী। শিক্ষাবিভাগ, খদ্দরবিভাগ, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগ, ও চিকিৎসাবিভাগ,—এই বিভাগগুলির কার্য্য হইতেছে।

আশ্রমের বিদ্যালয়ে চরকায় সূতা কাটা হয়। একটি বালক, এক ঘণ্টায় ৭০০ গজ সূতা কাটিতে পারে। এই আশ্রম হইতে মুন্সীগঞ্জের একটি খাদিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২৬শে বৈশাখ ১৩৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। প্রথমবারের প্রদর্শনীতে আচার্য্য শ্রীযুক্তপ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়, আর দ্বিতীয় বারে দেশপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন মহাশয় গিয়াছিলেন।

"সত্যাশ্রমের কর্ম্মীগণ সকলেই অহিংস অসহযোগনীতি এবং মহাত্মা গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্য-প্রণালীতে আস্থাবান্। সত্যাশ্রম বর্ত্তমানে জাতীয় শিক্ষা, খদ্দর, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, এবং হিন্দুমুসলমান ঐক্য—এই চারিটি বিষয় লইয়াই গঠন-কার্য্যের চেষ্টা করিতেছে।

আশ্রমের ত্যাগশীল ও একনিষ্ঠ সেবকগণ জাতীয় শিক্ষা ও খদ্দর সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। আমরা আগামী বারে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যাঁহারা দেশের কাজ করেন, বা দেশের খবর রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এই আশ্রমটির প্রতি আকৃষ্ট হউক।

হরনাথের শেষ সময়—ঠাকুর হরনাথের তিরোভাবের সংবাদ ও তাঁহার শেষ-পত্র বলিয়া মুদ্রিত একখানি ইংরাজী পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ, ইতঃপূর্ব্বে 'বীরভূমিতে' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ নামক একজন উকীল-কর্ত্তৃক লিখিত The Last Days of Haranath নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। ৫৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাশয়, এই পুস্তক প্রকাশের সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছেন। এই পুস্তক পড়িয়াই জানিতে পারিলাম—ঠাকুর যখনই কলিকাতা আসিতেন, এই শরৎবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় শেষের কথাটি সার সত্য, আমরাও তাহা লিখিয়াছিলাম। The Lord though invisible is still with us, so let us gird up our loins to complete the Prema Edifice of which the Lord has lain but the foundation stone with his own hands. He is watching over us. প্রভু অদৃশ্যভাবে এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি স্বহস্তে প্রেম-সৌধের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনা করিয়াছেন, আসুন আমরা ঐ সৌধ সম্পূর্ণ করি। তিনি আমাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

এই পুস্তকের দুইটি কথা সকলেরই জানা দরকার। ঠাকুর হরনাথকে তাঁহার ভক্তগণ কিভাবে দেখিতেন, অর্থাৎ ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তগণের ধারণা কি? আলোচ্য গ্রন্থ বলিতেছেন—To His *antaranga bhaktas* Haranath was omniscient, omnipotent and omnipresent.—

অবতার-রূপেই তাঁহার আবির্ভাব, এই নিত্যানন্দই শ্রীগৌরাঙ্গের উত্তরার্দ্ধ—better half. শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের দুইটি হেতু শ্রীরাধার ভাব লইয়া নিজের মাধুর্য্য-আস্বাদন, আর জীবের ভিতর কৃষ্ণ-স্মৃতির জাগরণ। প্রথম উদ্দেশ্যে তিনি এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় কার্য্য তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এই ভাবে চারিশত বৎসর গত হইলে কি কারণে জানা নাই, কাশ্মীরের বনে তিনি হরনাথরূপে বিচরণ করেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কথা, হরনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অসুর ও দানবের আবির্ভাব হয়। ঠাকুরের তিরোভাব-সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, তিনি সত্য করিয়া দেহত্যাগ করেন নাই, তিনি কিছুক্ষণের জন্য যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, আর সোণামুখীর লোকেরা—অসুর ও দানবেরা, সুযোগ পাইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিয়াছে। গ্রন্থের লেখক ও অন্যান্য ভক্ত স্বপ্নযোগে ইহা জানিতে পারিয়াছেন। মৃত্যু-সংবাদ তখনও কলিকাতায় আসে নাই, লেখক তাঁহার ত্রিতল গৃহে গোপাল-মন্দিরের সম্মুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময়ে একটি স্বপ্ন বা vision দেখেন। ঠাকুর এক পর্ব্বত গুহায় বসিয়া, তাঁহার মাথার উপর একটি পার্ব্বত্য প্রবাহ হইতে জল ঝরিতেছে, পাহাড়ের নীচে একটি সঙ্কীর্ণ নদী (সম্ভবতঃ বিরজা) বহিয়া যাইতেছে। লেখক দেখিলেন- ঠাকুরের দাঁড়ি গোঁফ্ নাই, আর মুখে অগ্নিদাহের চিহ্ন। ঠাকুর লেখককে বলিলেন—দেখ ভাই, ইহারা কি করিয়াছে! মেদিনীপুরের এক ভক্ত, কলকাতায় সওদাগরী আপিসে কাজ করেন, তিনি অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় বিছানায় শুইয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন—ঠাকুর আসিয়া বলিলেন,—বাছা, আমি আমার সোণামুখীর ঘরে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ১৯২৭, ২৬শে মে রাত্রে ৯টার সময় আমার নশ্বর দেহ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া যখন দেহে প্রবেশ করিব, তখন দেখি লোকে আমার দেহ আমার বাগান বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে, চিতার উপর রাখিয়াছে, চিতায় আগুন জ্বলিতেছে; দেখিলাম দেহের দক্ষিণাংশ পুড়িয়া গিয়াছে। বিকৃত দেহ লইয়া আর কি করিব, ঐ দেহ আগুনে পুড়িয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করিলাম। আমি দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেহ লইয়া চিতার উপরেই পদ্মাসনে বসিলাম।

এই গ্রন্থেই আছে, ঠাকুরের দেহ চিতার উপর আগুনের ভিতর পদ্মাসনে বসিয়াছিল। জনতার ভিতর যে সব অসুর ছিল, তাহারা ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল, আর সেই ভয় লুকাইবার জন্য জ্বলন্ত চিতা বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তনচ্ছলে আসুরিক নৃত্য করিয়াছিল;—began their infernal dance! শুধু তাহাই নহে, তাহারা বাজারে গিয়া গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য সেবন করিয়াছিল। ঠাকুর হরনাথের প্রেম-প্রচার তাঁহার ভক্তগণের জীবন ও সাধনার মধ্য দিয়া জয়যুক্ত হইক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এবং বাঙ্গালার বাহিরেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বেশ ভালরূপ আলোচনা হইতেছে। সত্যই, একটা যেন নবজীবনের সাড়া পড়িয়াছে। ইহা সুখের বিষয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সার কথা—সত্য, প্রেম ও সেবা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় কলহ রহিয়াছে। মতভেদ থাকিবে, তাহাতে ভয় নাই, কিন্তু কলহ যে দুর্ব্বলতা আনিবে। আমরা বলি, যাঁহারা মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার চাহেন, তাঁহারা বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া নির্দ্ধারণ করুন, তাঁহারা কতগুলি দলে বিভক্ত। এই কার্য্য করিতে হইলে দুইটি জিনিষ চাই, প্রথমতঃ নিজের মত বা মন জানা চাই, আর দ্বিতীয়তঃ নিজের মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করার সাহস চাই। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে, এই দুইটি দৈবীসম্পদের যদি একান্ত অভাব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কার্য্যটি প্রথম দরকার। আমি যদি বুঝিতে পারি, আপনার সহিত আর আমার গোল হইবে না। আপনার সহিত দেখা হইলে যে যে বিষয়ে আপনার সঙ্গে মেলে, কেবল সেই সেই বিষয়েই আলোচনা হইবে, যেখানে যেখানে মেলেনা, সে সে বিষয়ে আলোচনাই করিব না। তাহা হইলে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া একযোগে হিতকর কার্য্যও করা যায়।

হুগলী জেলার এরাটি নামে একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয়, দীর্ঘকাল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারকল্পে মাসিকপত্রের দ্বারা ও সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের দ্বারা যে-কার্য্য করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। কিছুদিন হইল, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস" নামক একখানি গ্রন্থ তিনি বাহির করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে 'বৈষ্ণব' বলিতে এখন একটি 'জাত' বা Casteকে বুঝায়। এই 'জাত'কে সংঘবদ্ধ ও উন্নত করা, তত্ত্ববাচস্পতিমহাশয়ের একটি উদ্দেশ্য। কাজটি ভাল। "গৌরাঙ্গ সেবক" পত্রে এই গ্রন্থের সমালোচনা বাহির হইয়াছে; আবার সেই সমালোচনা 'হিতবাদী' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয়ের উদ্দেশ্যের সমর্থন করি, কিন্তু পদ্ধতি-সম্বন্ধে আপত্তির কারণ রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সনাতনধর্ম্মের অন্যান্য শাখাকে, অর্থাৎ শাক্ত, শৈব বা যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে ধ্বংশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন? অথবা অন্যান্য শাখার সহিত মিত্রভাবে (এবং সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের নিকট সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোত্তম শাখারূপে) সনাতন ধর্ম্মরূপ বৈচিত্র্যময় অথচ এক মহাবৃক্ষে বিরাজ করিবেন? ইহাই প্রশ্ন। নিত্যধামগত কেদারনাথ দত্ত মহাশয়-কর্ত্তৃক আনীত অপ্রামাণিক গ্রন্থের দোহাই দিয়া, সমাজ-বিপ্লবের পথে চলিলে, আপাততঃ কাহারও কাহারও সাময়িক সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ঐ পথ পরিণামে ভয়াবহ। তত্ত্ববাচস্পতিমহাশয় বৈষ্ণবোচিত ঔদার্য্যগুণে আমাদের এই সামান্য কথাটি ভাবিবেন, আর তাঁহার সমালোচকগণও গ্রামে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া (সম্ভবতঃ বিবিধপ্রকার

কেদারবাবুর আনিত গ্রন্থ দুইখানির নাম—"সৎ-ক্রিয়াসারদীপিকা" ও "সংস্কার দীপিকা"। শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুকে গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্কলয়িতা বলা হয়, কিন্তু তাহা সত্য নহে। অতএব, এই গ্রন্থ দুখানির দোহাই দেওয়া অন্যায়।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

১৬। নরসিংহ রায়

[এই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তার একটি মাত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁর কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই]

১

কাহে তুহু নত বদনী রমণি-মণি রাধিকা
মিনতি হাম করই তুয়া আগে।
হামারি সঙে শ্যাম কত লুঠত মহীমণ্ডলে
তব চরণ শরণ অনুরাগে॥
ইহ দৈব জাত দোষ ক্ষেমহ বর মানিনী
কবহু নাহি করব ইহ কাজে।
তুয়া চরণ-পদ্ম-সুখ সব হাম তেজনু
অতএব হাম পাইএ বহু লাজে॥
জীবন বিনু তনু যেমন চন্দ্র বিনু যামিনী
বারি বিনু বিকল জনু মীনে।
ধনবিহীনে বিভব জনু বিভব বিনে যৈছেসুখ
তৈছে হাম হইএ তুয়াহীনে॥
জলদ বিনু চাতক জনু চকোর বিনু চন্দ্রিকা
মণি বিহীনে যেমন ফণিরাজে।
গন্ধ বিনু কুসুম জনু বুদ্ধি বিনু জীবগণে
ফল বিহীন বিটপী নাহি সাজে॥
মধুর মৃদু হাস পরকাশ কর ভামিনী
শীতল পদ কমল দলে শরণ দেহ সুন্দরী
স্মর-অনল জ্বলত হিয় মাহ॥
অধর বর পীযূষ রস বিতর বর মানিনী
বিরহ বিষ বহনে বহি ক্ষীণ।
দুঃখ-জলধি পতিত জনে পার করহ সুন্দরী
তবএ যশ ঘোষয়ে বহু দিন॥
কুসুম শর খর নিকর বরিখে ঘন অন্তরে
বিকল মতি তাপিত তনু তায়।
তবহি তনু তাপ সব মিটয়ে বর নাগরী
যদি সদয়ে দেহ চরণ ছায়॥
যদি করুণ-নয়নে মঝু বরণ নাহি হেরবি
ইহ জীবন রাখব কোন কামে।
তুয়া বিরহ-বিষ-জলধি- জলে জীবন তেজব
যতনে যপি তোহারি নিজ নামে॥
বহু বিনয় বাণী বলি বিকল ব্রজ বল্লভে
পড়ল হরি ধরণী ধরি মাথে।
রায় নরসিংহ ইহ রঙ্গ দেখি হাসই
হাসি ধনি ধরল তছু হাতে॥

ফাল্গুন, ১৩৩৪

নরলীলা

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

ভাগবতধর্ম্ম

প্রথম ভাগ

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন
প্রণীত

মূল্য এক টাকা মাত্র

সিউড়ী পোঃ—বীরভূম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার, এই গ্রন্থে ১১টী প্রবন্ধে, ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের নিত্যত্ব, ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুবক্তা ও সুলেখক। আলোচ্য বিষয়েও তিনি যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকার যে প্রণালীতে ভাগবতধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যে ভক্তগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ভাবে এই আলোচনা করিলে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যগণের নিকট বিষয়টী প্রীতিপ্রদ হয়, গ্রন্থকার তাহা জানেন। সুতরাং, গ্রন্থখানি এই সম্প্রদায়েরও প্রিয় হইবে। আমরা ইহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি

—হিতবাদী ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

নরলীলা

১ আত্মানং বিদ্ধি

"আত্মানং বিদ্ধি"—নিজেকে জান। কি করিয়া জানিব ?, অন্বেষণ কর, যথারীতি অন্বেষণ কর, ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে। তোমার নিজের ভিতর কি সত্য ও কি শক্তি লুকাইয়া আছে, ক্রমে ক্রমে তাহা আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইবে। তুমি নিজেই নিজেকে জানিবে ; যত জানিবে ততই বাড়িয়া উঠিবে,—শক্তিতে বাড়িয়া উঠিবে, জ্ঞানে বাড়িয়া উঠিবে, প্রেমে বাড়িয়া উঠিবে। যে যত নিজেকে জানিয়াছে, সে তত নিজেকে পাইয়াছে, সে তত ধন্য হইয়াছে, মহৎ হইয়াছে। আত্ম-অন্বেষণ, আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-দর্শন। ইহাই পথ, একমাত্র সনাতন পথ,—মহত্বের, গৌরবের ও অমৃতের পথ। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—ইহা ছাড়া আর অন্য পথ নাই।

এই উপদেশ মানুষের জন্য, বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য। মানুষের জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাকে ভাগ করিয়া ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায়, চারিটি জীবন একসঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে ; চারিটি জীবন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছে ; কে কাহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে! একটি জীবন জড়ের, আর একটি উদ্ভিদের, একটি পশুর, আর একটি প্রকৃত মানবের। এই চতুর্থ জীবনের, প্রকৃত মানবজীবনের বিজয়-যাত্রা তখনই আরম্ভ হয়, যখন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ও বিধিবদ্ধ-ভাবে মানুষ নিজেকে নিজে জানিবার জন্য, নিজেকে নিজে পাইবার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করে। তান্ত্রিক আচমনের প্রথম কথা—"আত্মতত্ত্বায় স্বাহা।"

আমি নিজেকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিব কেন? ইহার উত্তর, বিশ্বের বিধানই এই, যে মানুষ নিজেকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিবে। বিশ্ববিধান মানিয়া চলিতে সকলেই বাধ্য। স্বেচ্ছায় মানিয়া চল, জয়ী হইবে, সুখী হইবে। না মানো,

ঠকিবে, দুঃখ পাইবে এবং বিলম্বে একদিন বুঝিবে,—মানিয়া চলাই ঠিক্। অতএব, "আত্মানং বিদ্ধি।" নিজেকে অন্বেষণ কর, আবিষ্কার কর, জান; ইহাই বিশ্ববিধান; ইহাই বিশ্বনাথের লীলা।

২। জীবন—আবিষ্কার

জীবন চলিতেছে,—সবেগে প্রবাহরূপে চলিতেছে। এই গতি, এই পরিবর্ত্তন, এই ঘাত-প্রতিঘাত; ইহাতে লাভ কি? শেষ ফল কি? আবিষ্কার; ক্রমিক আবিষ্কার, আত্মতত্ত্বের আবিষ্কার। প্রেম ও আনন্দে, দুঃখে ও বেদনায়, পাপে বা পুণ্যে, জানিয়া বা না জানিয়া নিজেকেই খুঁজিতেছি, এবং ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু পাইতেছি। কেহ কম পায়, কেহ বেশী পায়, কেহ ঠিক্ পায়, কেহ ভুল পায়। কাহারও এ-জীবনে কিছু হইল না, ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় জীবন শেষ হইয়া গেল—"সেই পশু অতি দুরাচার"। দুরাচার বলিয়া নিন্দা করিও না, বল—সে শিশু, সে অজ্ঞান, সে দুর্ভাগা। কেহ পাইয়া গেল, জীবনের বহু বহু জটিল ও কঠোর সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল, মরণের অর্থও আবিষ্কৃত হইল। বাঁচিয়া থাকার অর্থ ই—অবিষ্কার করা, জীবনের তত্ত্ব আবিষ্কার করা।

আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনের সুখ দুঃখ ও পরীক্ষার দ্বারা নিজেকে আবিষ্কার করিতেছি, কখন পারিতেছি, কখন পারিতেছি না। দুঃখের শক্তিই অধিক। আমরা স্বভাবের প্রেরণায় দুঃখকে এড়াইতে চাহি, কিন্তু দুঃখই আমাদের বেশী শিক্ষা দেয়। দুঃখের মধ্যেই আমরা আমাদের জীবনের গভীরতর তত্ত্বের ও রহস্যের পরিচয় পাই। বীরত্বের সহিত সহ্য করিয়া ও শান্তভাবে সংগ্রাম করিয়া, আমরা যখন দুঃখকে অতিক্রম করি, তখন বেশ বুঝিতে পারি—শক্তি বাড়িয়াছে, জীবনস্রোতের বেগ ও গভীরতা বাড়িয়াছে, আমি মহৎ হইয়াছি, আমি জয়ী হইয়াছি। অতএব— আবিষ্কার, ক্রমিক আবিষ্কার, নিজের তত্ত্বের ও শক্তির আবিষ্কার, ইহাই জীবন।

৩। দুইটি পথ—ধর্ম্ম ও দর্শন

দর্শন শাস্ত্র, আর ধর্ম্মশাস্ত্র—Philosophy and Religion,—তন্ত্রশাস্ত্র ইহাদের

তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান—ইহারা উভয়ে আমাদের সাহায্য করিতেছে, যাহাতে আমরা জীবনের তত্ত্ব যথাযথ আবিষ্কার করিতে পারি, চরম ও পরম রহস্যের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

এই দর্শনশাস্ত্র (তত্ত্ববিদ্যা) ও ধর্ম্মশাস্ত্র কি? পূর্ব্বকালের মহাজনগণ এই জীবনগহনে বীরদর্পে পর্য্যটন করিয়াছেন, সংগ্রাম করিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন ও জয়লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই পথশ্রম, সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার কথাই শাস্ত্র,—তত্ত্বশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র। মহাজনগণের এই সব কথা, শ্রদ্ধার সহিত ও একাগ্রতার সহিত শুনিলে, স্মরণ কীর্ত্তন বা ধারণা ধ্যান করিলে, তাঁহাদের ভাব আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তাহাতে উপকার হয় অনেক—আমাদের সাহস ও শক্তি বাড়িয়া যায়, যাহা বহু বিলম্বে হইত, তাহা শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যায়!

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।

অতএব, কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রকে সম্মান কর, অনুসরণ কর—তবে অন্ধভাবে নহে, বুঝিয়া সুঝিয়া।

পৃথিবীতে দর্শনশাস্ত্রও অনেক, ধর্ম্মশাস্ত্রও অনেক। তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতের ঐক্য আছে, আবার অনেক বিষয়ে অনৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, এই অনৈক্যের বা মতভেদের মীমাংসা নাই; কিন্তু, আমরা বলিতেছি—মীমাংসা আছে, খুব সুন্দর মীমাংসা আছে। সেই মীমাংসাই বর্ত্তমান যুগের সাধ্য বিষয়। বাহির হইতে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে যে-সব ধর্ম্মশাস্ত্র ও তত্ত্বশাস্ত্র পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, সার বা মুখ্য বিষয়ে তাহাদের মতভেদ নাই। সত্য—পরমার্থ সত্য, এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন, বা সাধু মহাজনেরা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করিতেছেন। এই আবিষ্কার-কারকেরাই ঋষি। পৃথিবীর সকল দেশেই ঋষি জন্মিয়াছেন, সকল যুগেই ঋষি জন্মিয়াছেন। আমরা যেমন বলি,—বেলপাতা তুলসীপাতার বড় ছোট নাই, তেমনি এই ঋষিদের মধ্যে বড় ছোট নাই। যিনি যে-যুগের বা যে-দেশের ঋষি, তিনি সে-দেশের বা সে-যুগের অন্ধমণ্ডলীর মধ্যে দর্শনকর্ত্তা, নিদ্রিতদের মধ্যে প্রবুদ্ধ।

বর্ণ নাই, লিঙ্গ নাই, মত নাই, no race, no colour, no sex, no creed ; বিশ্বের যাবতীয় ঋষির চরণে প্রণাম !

জীবনের এক লক্ষ্য, চরম পরম লক্ষ্য—আত্ম-আবিষ্কার বা আত্ম-দর্শন ;—যাহাকে আমি 'আমি' বলি তাহার পরিচয়-লাভ। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। জগতে এক প্রকারের তত্ত্ব বা সত্য আছে, তাহাকে আমরা অবাস্তব বা কাল্পনিক (Abstract) বলি। সেই সব কথার সহিত আমাদের এই প্রত্যক্ষ, বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনের মোটেই কোন সম্বন্ধ নাই। যে-কথা, যে-তত্ত্ব বা যে-আলোচনা, আমার নিকট আমার জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য্য স্পষ্টভাবে ধরিয়া দেয়, বুঝাইয়া দেয়, সেই কথাই কথা ; আমরা সেই কথাই চাই। সুদূরের বা অনিশ্চিতের স্বপ্ন নয়, অজ্ঞাত ও কাল্পনিক ব্যাপারের আলোচনা লইয়া বৃথা বাক্যব্যয় নয় ; বাস্তব সত্য, যাহা আমাকে জানাইয়া দিবে আমি কি, আমার আছে কি, আমার হইবে কি, আমার অতীত কি, ভবিষ্যত কি ; তাহারই প্রয়োজন,—কেবল তাহারই প্রয়োজন। আজকাল যাহাকে সত্যজ্ঞান বা 'কাল্‌চার' (culture) বলি, তাহা এই 'বাস্তব আত্মজ্ঞান' ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই 'আত্ম-অন্বেষণ' ও 'আত্ম-আবিষ্কার' চলিতেছে। একটা অজানা নূতন দেশ আবিষ্কার করার সময় কোন পর্য্যটক পূর্ব্বদিক্ হইতে, কেহ পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ দিক্ হইতে, কেহ স্থলপথে, কেহ বা জলপথে যেমন সেই দেশে প্রবেশ করে, আর সেই দেশের এক এক অংশ এক একটা বিষয় বা ব্যাপার আবিষ্কার করে, এই আত্ম-আবিষ্কার বা আত্মদর্শনের সাধনও ঠিক্ সেই প্রকারেই হইয়াছে ও হইতেছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। মানব জাতির সমগ্র প্রগতি (progress) বা উন্নতিলাভচেষ্টা এই আত্ম-আবিষ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। রহস্য এই, বাহিরের বস্তু, বিষয় বা ব্যাপার বলিয়া যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে, তাহা বাহিরের নহে, ভিতরের ; অনাত্ম নহে, আত্ম ; ইদং নহে, অহং। আত্মজ্ঞানেই সকল জ্ঞানের পরিণতি ও পর্য্যবসান।

বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব—এই দুইটি পথে আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ ও আবিষ্কার চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের নাম তত্ত্বশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র (philosophy), আর ধর্ম্মশাস্ত্র

ঈশ্বর সম্বন্ধে, সমুদয় বস্তুর ও ব্যাপারের আদিকারণ বা সর্ব্বকারণ কারণ সম্বন্ধে, মানুষের স্বরূপ বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি-সম্বন্ধে, সমুদয় কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বশাস্ত্র সত্যসম্বন্ধে, সত্যলাভের উপায় সম্বন্ধে ও চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল যুগে এই দুইটি পথ, আর এই দুই শ্রেণীর শিক্ষা বা উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্র, এই দুই প্রকারের হইলেও, এই শাস্ত্র লইয়া অন্বেষণ ও আবিষ্কার করিবেন যিনি, তিনি এক, তিনি মানব। এই মানবের অনুভব ও অভিজ্ঞতার উপরেই এই উভয়বিধ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এই মানুষকে জানিলেই উভয়বিধ শাস্ত্রের একটা সমন্বয় বা সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের তাহাই প্রধান কাজ। এই মানুষই সাধক, এই মানুষই ভক্ত। প্রথমে ভক্তকে জান, তাহার পর ভগবান্ বা তত্ত্বজ্ঞান। ভক্তকে না জানিলে ভগবান্কে জানা যাইবে না। ইহাই যুগধর্ম্ম ও তাহার সাধন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব এই কথা খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবও এই কথা বলিয়াছেন—"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।" ভক্ত বলিতে মানুষকেই বুঝায়। পূর্ণবিকশিত মানুষই ভক্ত। এই মানুষ আগে, তাহার পর ভগবান্। সিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস এই মন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন —

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

এই মানুষই, মূল সত্য, সার সত্য ; অন্ততঃ পক্ষে মানুষের পক্ষে। এই মানুষের হৃদয় আছে, আর সেই হৃদয় আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্ আছেন। তুমি শ্রীভগবানকে খুঁজিতেছ! কোথায় খুঁজিতেছ? গোলোকে, বৈকুণ্ঠে, ক্ষীরোদ সাগরে, বৃন্দাবনে, মথুরায়, মন্দিরে, বিগ্রহে?—শুনিয়া রাখ পাইবে না। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম"। প্রথমে তাঁহাকে ভক্তহৃদয়ে অন্বেষণ কর ; ভক্ত-হৃদয়ে! ভক্ত সত্য, ভক্তের অনুভব ও আস্বাদন সত্য ; তাহার পর—ভগবান্ সত্য। ভগবানের উক্তি—"অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইহার অর্থ ইহাই।

বর্ত্তমান যুগের যাঁহারা সাধক, তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে মানুষকে মূল করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়াই যুগধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে প্রথমেই

আলোচনা চলিল, তিনি কেমন, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ। ইহাই হইল পুরাতন পদ্ধতি। এখনকার পদ্ধতি,—মানুষ লইয়া আলোচনা। এই যে মানুষ, আর এই মানুষের জ্ঞান; এই জ্ঞানের দ্বারা কি মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব বা বিশ্বতত্ত্ব জানিতে পারে? মানুষের ভিতর অনন্ত পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান রহিয়াছে, সেই অনন্তের জন্য যে পিপাসা রহিয়াছে, সেই পিপাসার সত্যতা, প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনা ও অনুসন্ধান করাই বর্ত্তমান যুগের সাধকগণের বিশেষ লক্ষণ।

মানুষের আত্ম অন্বেষণ, আত্ম-আবিষ্কার বা আত্ম-দর্শনের উপায়স্বরূপে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপায় করিয়াছেন, তাহার একটা মোটামুটি জ্ঞান আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগ মানবজাতির মহামিলনের যুগ, কাজেই তুলনামূলক আলোচনার যুগ।

প্রাচীন দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা,— এক ঈশ্বর ও বহুদেবতা। ভারতের সর্ব্বত্রই সনাতন ধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট বড় অনেক দেবতা—গাছের দেবতা, নদীর দেবতা, পাহাড় ও বনের দেবতা, গ্রামের দেবতা, ব্যাধির দেবতা। সংখ্যাহীন দেবদেবী, সকলেরই পূজা, সকলেরই সম্মাননা, সকলেরই প্রতি ভক্তি প্রদর্শন। বৃক্ষমূলে, নদীতীরে, শ্মশানে, বাজারে, গিরিচূড়ায়, প্রস্রবণের সন্নিকটে, সর্ব্বত্রই মন্দির, বেদী ও আসন। অনন্তরূপ ভগবানের বিভূতি নানামূর্ত্তিতে প্রকাশিত। বহু দেবদেবীর পূজা চলিতেছে; কিন্তু অতি সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুও জানে যে এই সমুদয় দেবদেবীর যিনি মুল ও কর্ত্তা, তিনিই পরমেশ্বর, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম"।

একেশ্বরবাদী খৃষ্টান জানে—এক ঈশ্বর, তিনি প্রেমময় পিতা; পতিত মানবের পরিত্রাণের জন্য, সেই প্রেমময় পিতা পুত্ররূপে নিজেকেই দান করিলেন। খৃষ্টীয় সাধনায় ছোট বড় প্রত্যেক মানুষের সহিত ভগবানের ঘনিষ্ঠতা খুব উজ্জ্বল, সম্বন্ধ খুব মধুর। "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে" মহাত্মা যীশুখৃষ্টের এই উপদেশের দ্বারা খৃষ্টানের ধর্ম্মবিশ্বাস নিজের মুক্তিসাধনার জন্য বিশ্বহিতমূলক সৎকর্ম্মে বিশেষভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের নিজের একটা মূল্য আছে; সেই মূল্যবোধের গৌরবে

পারসিক ধর্ম্মও একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্মেও বহু দেবদেবীর স্থান নাই। খৃষ্টানধর্ম্মে একটা ভাবুকতা আছে, এই ধর্ম্মে সেই ভাবুকতাও নাই। এই ধর্ম্মের উপদেশ, মানুষের চিত্তকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া কোন সুদূরবর্ত্তী ভবিষ্য জগতের অভিমুখী করে না। পারসিক ধর্ম্মে নানারূপ অনুষ্ঠান ও সংস্কার আছে; ঠিক্ হিন্দুধর্ম্মেরই মতো। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই মন্ত্রপূত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানযুক্ত; কিন্তু সমুদয় অনুষ্ঠানই মানুষকে এই ইহলোকের কর্ত্তব্যপালনে নিয়োজিত করে, পরলোকের প্রত্যাশায় উদ্বুদ্ধ করে না। সংসারে সংসারী হও, শ্রমপরায়ণ হও, সমৃদ্ধিশালী হও; সংসারের সুখ, যাহা মানব স্বভাবতঃ চাহে, তাহা ভোগ কর; আর সকল কর্ম্মের মধ্যে "অহুর মজ্‌দা"র ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ কর। ইহাই সার শিক্ষা। এই শিক্ষার ফলে পার্শিদের এত দান, সৎকর্ম্ম, সামাজিক একতা ও সকলের সহিত সদ্ভাব।

মুসলমান ধর্ম্ম একেশ্বরবাদী—পূর্ণ একেশ্বরবাদী। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা, আর মানবের পূর্ণাঙ্গ দাস্য—ইহাই মুসলমান ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত সারশিক্ষা। ঈশ্বর মঙ্গলময়, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত এই কথা মুসলমান যেমনভাবে মানিয়া লইয়াছে, আর কেহ তেমন করিয়া পারে নাই। 'ইস্‌লাম' কথার অর্থই ভগবদিচ্ছায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন। দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান মানুষকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছে এবং এখনও বুঝাইতেছেন, —ভগবান্ যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। কিন্তু, মুসলমানের এই বিশ্বাস ও এই বিশ্বাসের নিকট আত্মসমর্পণ একেবারে অতুলনীয়। মানুষ ও ভগবান্, ইহার মধ্যে মধ্যস্থরূপে কোন প্রতীক নাই, মূর্ত্তি নাই, অবতার নাই—এক রসুল, আর ভগবান। মুস্‌লেম্ যুক্তি চায় না, বিচার চায় না, কোন অলৌকিক প্রকাশ (Revelation) চায় না; পবিত্র ও উদ্বেগহীন প্রাণে আল্লার ইচ্ছায় বিশ্বাস করে। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এই ধর্ম্মের দ্বারা বহুল পরিমাণে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই। জাতি = Race, বর্ণ = caste; নানা জাতির লোক, নানারূপ তাহাদের আচার, পৃথিবীর নানাস্থানে দূর-দূরান্তরে তাহাদের বাড়ী, নানারূপ তাহাদের ভাষা, কিন্তু মুসলমানরূপে তাহারা যতটা এক, খৃষ্টানরূপে এসিয়া ও ইউরোপের লোকেরা ততটা এক নহে।

ধর্ম্মে জগতের শ্রষ্টা বা নিয়ন্তারূপী ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। ঈশ্বরবাদ না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা খুবই গভীর, পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম অপেক্ষা, আধ্যাত্মিকতায় কম নহে। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর নাই, কিন্তু ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্ম বলিতে বিধি বুঝায়, নিয়ম বুঝায়—বিশ্বব্যাপী মহানিয়মই ধর্ম্ম। সর্ব্বত্রই এই নিয়মের অপ্রতিরোধনীয় ও অক্ষুণ্ণ শাসন। সৎকর্ম্মের ফল সৎ,—মঙ্গল; অসতের ফল অমঙ্গল,—যাতনা। প্রত্যেক পরমাণুটি পর্য্যন্ত এই নিয়মের দ্বারা শাসিত, মহাশূন্যে প্রধাবিত চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, এই নিয়মের শাসনের অধীন। বৌদ্ধধর্ম্মে—মানিয়া লওয়া নাই, অহেতুক বিশ্বাস নাই; সম্যক্ জ্ঞান, Right understanding—ইহার প্রথম ও প্রধান কথা। এই ধর্ম্মের শিক্ষায় মানুষের দৃষ্টি ঈশ্বরের অভিমুখী হয় না, মানুষেরই অভিমুখী হয়। যত আলো চাই, যত শক্তি চাই, যত সান্ত্বনা চাই, সব আছে, এই মানুষের ভিতরই আছে,—যদি মানুষ ঠিক্‌-মত বুঝিতে পারে, আর ধর্ম্মানুসারে চলে।

এইবার প্রাচীন গ্রীক্‌জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখানে সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা, আর রূপের সাধনা। ঈশ্বরকে জান, তিনি সুন্দর; তরুপত্রের শোভার ভিতর, উচ্ছল প্রস্রবণের সুস্বচ্ছ বুকের উপর, সূর্য্যালোকিত তৃণশ্যাম প্রান্তরে, সাগরের চির-পরিবর্ত্তনীয় নব নব লাবণ্য-বিলাসে, সেই চির-সুন্দর ভগবান্‌কে ধরিতে চেষ্টা কর। সৎকাব্যের সৃষ্টির ভিতর অমরতা, সঙ্গীতের উল্লাসের ভিতর অমরতা: এই এক নবদৃষ্টি, নব অনুভব, —ইহাই গ্রীক্‌সাধনার দান।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, মানুষকে আত্ম-আবিষ্কারেরই বা আত্মজ্ঞানলাভেরই এই সব ভিন্ন ভিন্ন পন্থা দেখাইয়াছে। অনেক অনেক পথিক এই সব পথে চলিয়াছেন ও চলিতেছেন এবং অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এইবার দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করা যাউক। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য, প্রাচীন বা আধুনিক, যত দর্শনশাস্ত্র আছে, জগত-সম্বন্ধে মত প্রায় সকলেরই একরূপ। জগৎ, সংসার, প্রপঞ্চ; ইহা চলিয়া যাইতেছে, সরিয়া যাইতেছে, নিত্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ক্রমবিকাশবাদ, Evolution—এই নিত্য পরিবর্ত্তনেরই কথা। মানুষ, এই চঞ্চল সংসার-স্রোতে পড়িয়াছে, ইচ্ছা করুক, আর না করুক, মানুষ এই সংসার-স্রোতে অসহায়ভাবে বাহিত হইতেছে। ইহাই প্রথম কথা,

এই দুইয়ের মধ্যে মানুষই বড়। মানুষ তাহার ভাবনার দ্বারা জগৎ গড়িতেছে, মানুষের এই মহিমা মানুষকে বুঝিতে হইবে। মানুষ, তুমি ঠিক্‌মত ভাবিতে শিক্ষা কর, সঠিক্ ভাবনার দ্বারা জগৎকে জয় কর। দর্শনশাস্ত্রসমূহ এ বিষয়ে একমত। ঐ সঠিক্ বা সম্যক্ ভাবনার প্রকৃতি ও প্রণালী লইয়া তাহাদের মধ্যে যত মতভেদ। বৈদান্তিক মায়াবাদ, সাংখ্য, বৌদ্ধ, সকলেরই এক কথা। বর্ত্তমান সময়ের দার্শনিকেরা এই সব প্রাচীন কথাই বাড়াইয়া কমাইয়া নূতন ধরণে বলিতেছেন।

ধর্ম্মের কথা, দর্শনের কথা বলা হইল, মানুষের কথাও বলা হইল। এখন বর্ত্তমান যুগের একটি লক্ষণ ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে হইবে। প্রাচীন ধর্ম্ম সমূহের এবং দার্শনিক মতবাদ সমূহের প্রভাব এখন খুবই কম! ধর্ম্মের যুগ, দর্শনের যুগ যেন চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র এখন আর মানুষকে ও সমাজকে চালাইতে পারিতেছে না। মন্দির আছে, গির্জ্জা আছে, কিন্তু ধর্ম্মসাধন ব্যাপারটা একটা প্রাণহীন গতানুগতিকে পরিণত হইয়াছে, দর্শনশাস্ত্র অল্প-সংখ্যক পণ্ডিতের বাদানুবাদের বিষয় হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের লক্ষণ। চিন্তাশীল ও শান্ত-প্রকৃতি ধার্ম্মিক লোক দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কেন এমন হইল? উত্তরে বলিব—দুঃখের কারণও নাই, বিস্ময়ের কারণও নাই। ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই বিশ্বের ব্যবস্থা। ইহার নাম যুগান্তর। যুগান্তর সত্য ও স্বাভাবিক। এই কারণে যুগধর্ম্মও স্বাভাবিক। এখন ভাবিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, আলোচনা করিতে হইবে, এই যুগধর্ম্ম কি?

প্রথম কথা, যে-শক্তিতে সমগ্র বিশ্বব্যাপার চলিতেছে, তাহা অন্ধ জড়শক্তি নহে, তাহা জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি। The world-process is the manifestation of a great Will, full of conscious purpose, carrying out step by step a wonderful plan towards fulfilment. এই মহীয়সী, জ্ঞানময়ী এবং প্রেমময়ী ইচ্ছা, শক্তি ও ক্রিয়া—ইহাকে কি বলিবেন? ঈশ্বর বলিবেন বলুন, ক্রমবিকাশ বলিবেন বলুন, বিধি বলিবেন বলুন, নামে কি আসে যায়? আমরা বলিব—"লীলা।" যাহা বলুন, এই শক্তির ক্রিয়া বুঝিতে হইবে; জ্ঞাননেত্র, প্রেমনেত্র বা ভাবনেত্র বিকশিত করিয়া, এই লীলা দেখিতে হইবে। এই লীলাই সত্য, আর এই লীলাই ভগবান্।

অনুমানেও বুঝিতে পারি। কিন্তু, প্রকট লীলার বহির্ভূত, সেই অব্যক্ত স্বরূপের সহিত আমাদের বাস্তবজীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই। আমরা বলি—লীলাই ভগবান্ বা ভগবান্ নিত্য-লীলাময়।

এই লীলা বেশ করিয়া বুঝিবেন, ভাবিবেন; নিজের ভিতরে জীবনের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ উল্লাস, বিষাদ সংগ্রাম প্রভৃতি নিত্যসমুত্থিত তরঙ্গ-সমূহের উত্থান পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর অন্তর্য্যামীরূপে সেই লীলাময় অতন্দ্রিতভাবে জীবনকোরক ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছেন; আবার বাহিরে তিনি কেমন করিয়া ইতিহাসের মধ্য দিয়া মানবজাতির সৌভাগ্য-সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহা দেখিবেন, ভাবিবেন ও বুঝিবেন। The Great Architect within and outside। বাহ্য প্রকৃতিতে, আত্মায় ও ইতিহাসে, তাঁহার ত্রিবিধ প্রকাশ। এই লীলা শ্রীভগবানের আনন্দ-লীলা। আমাদের সকলের জীবনে সেই আনন্দলীলায় এখনও সাড়া দিতে পারিতেছে না, কিন্তু দিতে হইবে। এই আনন্দলীলায়, আনন্দ রসে উন্মত্ত ও বিহ্বল হইয়া শ্রীভগবান্ আমাদের প্রত্যেককে অন্বেষণ করিতেছেন। মানুষও তাঁহাকে খুঁজিতেছে, কেহ জানিয়া, কেহ না জানিয়া। এই দুই প্রবাহে লীলা; ভগবান্ মানুষকে খুঁজিতেছেন, আর মানুষ ভগবানকে খুঁজিতেছে। A reciprocal process. ভগবানের এই অন্বেষণের প্রকৃতি (The nature of His seeking) আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, শ্রীভগবান্ খোঁজেন, কিন্তু সব সময়ে ঠিক্ এক রকম করিয়া একপথে খোঁজেন না। পুরাণের অবতারলীলার ইহাই গভীর অর্থ। যুগবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার প্রভৃতির সহিত পরিচিত হওয়া এই জন্যই আবশ্যক। তিনি আমাকে খুঁজিতেছেন, তিনি তোমাকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু তোমাকে যে পথে বা যে ভাবে বা যে দিক্ দিয়া খুঁজিতেছেন, আমাকে ঠিক্ সে পথে, সেভাবে বা সেদিক্ দিয়া খুঁজিতেছেন না। এই কথাটা খুবই বড় কথা। ইহা একটা বিশেষ কথা, ব্যক্তিগত কথা। একথা এখন গোপনে থাকুক। কিন্তু, একটা যে সাধারণ কথা আছে। তিনি সত্যযুগে যে পথে খুঁজিয়াছিলেন, ত্রেতাযুগে সেপথে খোঁজেন নাই; অন্য একটা নূতন পথ ও নূতন ভাবের মধ্য দিয়া তাঁহার ইঙ্গিত ও আহ্বান আসিয়াছিল। আবার দ্বাপরে এক পথ,

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার আহ্বান ও অন্বেষণ-প্রণালী যেরূপ ছিল, এখন সেই বৈবস্বত মন্বন্তরে আর তাহা নাই ; এখন তাহা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া এই পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি। আরও বুঝিতে পারি, ইহাই শেষ নহে। কল্প আছে এবং কল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন কল্পের ভিতর যে পার্থক্য তাহা ধারণা করা অসম্ভব। সুতরাং সে কথা এখন থাকুক। আমরা বুঝিলাম, শ্রীভগবান্ ডাকেন ও খোঁজেন ; কিন্তু সকল সময়ে একভাবে ডাকেন না, একপথে ডাকেন না। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—এখন তিনি কোন্ পথে খুঁজিতেছেন, কোন্ ভাবে ডাকিতেছেন। শ্রীভগবানের আহ্বানের ও অন্বেষণের এই যে ভাব ও পথ, ইহার বর্ণনার নাম যুগধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—ব্রহ্মা নারদকে শ্রীভগবানের অবতারগণের নাম, কর্ম্ম, প্রয়োজন, গুণ প্রভৃতি বলিয়াছেন। প্রথমেই বলিয়াছেন—বরাহ ও সুযজ্ঞ। এই দুই অবতার, যজ্ঞের বা যজ্ঞ প্রবর্ত্তনের অবতার। শ্রীভগবান্ যজ্ঞের মধ্য দিয়া মানবকে প্রথম ডাক দিয়াছেন। যজ্ঞ কি ? সমগ্র বিশ্বে বিশাল ও ধারণাতীত মূর্ত্তি ধরিয়া যে ব্যবস্থা ক্রিয়া করিতেছে, সেই ব্যবস্থাকে ছোট আকারে উপলব্ধি করা ও নিত্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের দ্বারা আয়ত্ত করাই যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। অগ্নি জ্বলিলেন, ইনি হব্যবাহন। আলোক দিলেন, উত্তাপ দিলেন। এই অগ্নিই বিশ্ববিবর্ত্তনের প্রধান শক্তি গার্হপত্য অগ্নি, আহ্বনীয় অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি। বাহিরের এই অগ্নিতে যজ্ঞ হইতেছে। এই যজ্ঞই মূল সত্য। সমগ্র বিশ্ব একটি যজ্ঞ মাত্র। বরাহ ও সুযজ্ঞের পর আসিলেন কপিল। দ্রব্যযজ্ঞ এখন হইল জ্ঞানযজ্ঞ। সেই যজ্ঞই চলিতেছে, সেই হোমই হইতেছে, কিন্তু বাহিরে নয়, ভিতরে। কপিলের পর দত্তাত্রেয়। এবারেও যজ্ঞ, কিন্তু যোগযজ্ঞ। প্রাণায়াম যজ্ঞ। তাহার পর চতুঃসন, আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রকারে শ্রীভগবান ভিন্ন ভিন্ন অবতার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানবের নিকট আসিয়াছেন, বা মানব তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে যুগে যুগে দেখিয়াছে। কখন বিপুল যজ্ঞ-অনুষ্ঠান মাঝে, উৎসবে ও আনন্দ-উল্লাসে ; কখন বা নির্জ্জনে সুকঠোর তপস্যায় ; কখন কর্ম্মে, কখন জ্ঞানে ; মানুষ দেখিয়াছে ভগবান্‌কে। দেখিয়াছে আর ধন্য হইয়াছে। ইহাই

আসিতেছেন, কিন্তু সকল সময়ে ঠিক্ একরূপে একভাবে একপথে নয়। রাজা হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন ; পৃথু আদিরাজা, তিনি অবতার। শ্রীরামচন্দ্র রাজা, বনবাসী ভিখারী ও রাজা একাধারে দুই। শ্রীকৃষ্ণও রাজা। মানুষ রাজসিংহাসনে শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়াছে, তাঁহার প্রজা হইয়া ধন্য হইয়াছে। আবার প্রাপ্য রাজ্য পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া বনবাসী ত্যাগী যোগী কঠোর তপস্বীরূপে মানুষ সেই ভগবান্‌কেই দেখিয়াছে ; যেমন বুদ্ধ ; তাঁহারও পূর্ব্বে ঋষভ দেব। শ্রীভগবানের এই সব অবতারের ভিতর তাঁহার অন্বেষণের পথই পরিব্যক্ত হইয়াছে। আজ আমাদের বুঝিতে হইবে, কোন্ পথে তিনি আমাদের খুঁজিতেছেন ? আমরা বলিতে চাই, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদিত ধর্ম্মের আলোচনা করুন। সহজে তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হউন। তিনি এই ভাগবতধর্ম্মই নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে বুঝাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে, এই ভাগবতধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন না, তাহা হইলে মরিয়া যাইবেন, পচিয়া যাইবেন। হৃদয় মন জাগাইয়া, নয়ন মেলিয়া জগতের প্রতি চাহিয়া থাকুন, দেখুন, ভাবুন, বুঝুন। এই জগৎ ও এই মানব বসিয়া নাই, ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন করিয়া ছুটিয়াছিলেন, এই জগৎ, এই মানবজাতি ঠিক্ সেই প্রকারেই আজ ছুটিতেছে। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে যেমন করিয়া বৃন্দাবন খুঁজিয়াছিলেন, আজ সমগ্র জগৎ ঠিক্ সেই ভাবেই বৃন্দাবনই খুঁজিতেছে। "হাহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্র নন্দন, কাঁহা সেই বংশীবদন।" আজ প্রবুদ্ধ মানবজাতি বৃন্দাবন খুঁজিতেছে—ইহাই মানবের বিজয়যাত্রা, মহাসঙ্কীর্ত্তন। আমাদের এই বিজয়যাত্রায় বা মহাসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতে হইবে। পিছনে পড়িয়া থাকিলে ধর্ম্মহানি হইবে। মহাসঙ্কীর্ত্তন আর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, ইহাই যুগধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, তিনি সুন্দর, তিনি প্রেমিক, তিনি রসিক, তিনি নটবর। তিনি আসিবেন, গদাচক্র হস্তে নয়, বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে আসিবেন, শ্মশানে, রণক্ষেত্রে বা মহাপ্রলয়ে নয়, বসন্তের কুসুমিত নিকুঞ্জ কাননে, মলয় হিল্লোলে, আর বিহগের কলতানে, তিনি আসিবেন। তিনি আসিবেন, বার্দ্ধক্যের দুশ্চিন্তায় নয়, পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য্যে নয়, কৈশোরের খেলা ঘরে

সোহাগ-স্বপ্নে আসিবেন। তোমরা তাহার আয়োজন কর। পূর্ব্বে তিনি আসিয়াছিলেন, ছোট আকারে আসিয়াছিলেন। আবার আসিবেন, নিশ্চয়ই আসিবেন, কিন্তু তাঁহার সেই আগমনের জন্য জগৎকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কে জগৎকে প্রস্তুত করিবে? তুমি করিবে, আমি করিব। অতীতের নারায়ণীসেনা তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাঁহারই আদেশে। এখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে, প্রেমের বিজয়-পতাকা-হস্তে যুদ্ধ করিবে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে; আর বলা হইয়াছে যে এই সব শিক্ষা ও মতবাদ, বর্ত্তমান সময়ে মানুষের বাস্তব-জীবনের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। তাহার কারণ, শ্রীভগবান্ এখন এমন একটা কোন পথে মানুষকে খুঁজিতেছেন, যে পথের কথা, ঐসব ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই, অথবা থাকিলেও বেশ স্পষ্টভাবে নাই; অথবা থাকিলেও মানুষ বেশ বুঝিতে ও ধরিতে পারিতেছে না। প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন দর্শনের প্রভাব-হ্রাসের ইহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত হেতু। ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রাণহীন ও অর্থহীন বাহ্য আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে, তত্ত্বশাস্ত্র শুষ্ক তার্কিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। (Formalism and intellectualism.)

আজ যে-পথে শ্রীভগবান্ মানুষকে খুঁজিতেছেন,-সে-পথ যে একেবারেই নূতন তাহা নহে। এই পথের উল্লেখ সব ধর্ম্মের শিক্ষার মধ্যেই আছে; কিন্তু আচার্য্যগণ যেন সে-পথ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীব্যাপী সংস্কার চেষ্টার ইহাই হেতু। প্রত্যেক চেষ্টাই যে সত্যের অভিমুখী, তাহা না হইতেও পারে; কিন্তু সংস্কার-চেষ্টাসমূহের মূল প্রেরণা ইহাই। ধর্ম্ম বা পরমার্থের সহিত ইহলোকের বা অর্থের একটা অকারণ ও অন্যান্য ব্যবধান জন্মিয়াছে। এই ব্যবধানই অনর্থের হেতু। দৃষ্টের সহিত অ-দৃষ্টের একটা সংগ্রাম চলিতেছে—এই সংগ্রাম অন্যায্য। ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাঁহাদের শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পরলোককে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ ইহলোক যেন কিছুই নহে। ভগবান মরণের পরপারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, ইহলোক যেন কিছুই নহে পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা অবতারগণ এই প্রকারের কথা কখনই বলেন নাই। মানুষের একটা জগৎ, আর ভগবানের আর একটা জগৎ, এই প্রকারের বিচ্ছেদ বা বিরোধের কথা তাঁহারা কখনই বলেন নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ একই জগৎ, মানব

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্যাগের কথা আছে, কিন্তু সকলের জন্য নহে। আবার সেই ত্যাগ ত্যাগের জন্য নহে। মিথ্যা ভোগের শৃঙ্খল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সত্যভোগের পূর্ণতালাভের জন্যই এই ত্যাগ। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—এই উপদেশবাণীর ইহাই একমাত্র সদর্থ।

কর্ম্ম, নিস্কাম কর্ম্ম, লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের উপদেশ। এই উপদেশের শেষ কথা নরলীলা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আত্ম-আবিষ্কারই জীবনের লক্ষ্য। আত্ম-আবিষ্কারের প্রচেষ্টার দ্বারাই মানবাত্মার বিকাশ হইতেছে। আমি মানুষ, তুমিও মানুষ। আমিও অপূর্ণ, তুমিও অপূর্ণ। আমি যদি তোমাকে পাই, প্রেমে আপন করিয়া তোমাকে আমার প্রাণের ভিতর হৃদয়ের ভিতর, নিজ জন ও মনের মানুষ করিয়া যখন পাই, তখন আমি বড় হইয়া উঠি। তোমার ভিতরে আমি আমাকেই পাই। আত্মআবিষ্কারের ইহাই পথ। ইহাই সংঘ, ইহাই নরলীলা। আমার যেটা নিত্য আমি, আসল আমি, পূর্ণ আমি ; যাহা এখন আমার ভিতর অব্যক্ত ও অবিকশিত অবস্থায় রহিয়াছে, তোমরা সকলেই তাহার অংশ। আমি যদি তোমাদের সকলকে আপনার করিয়া পাই, তাহা হইলেই আমি আমার পূর্ণকে পাইব। ইহাই নরলীলা।

আজ, শ্রীভগবান মানুষের ভিতর হইতে মানুষকে ডাকিতেছেন, মানুষকে খুঁজিতেছেন। আজ মানুষই বড়। আজ প্রভুরূপে তিনি ডাকিতেছেন, তোমরা দাস হও ; তোমরা দাস্যরসের সাধন কর ; ভয়ের চাকর নহে, সে পশু ; লোভের চাকর নহে, সে পিশাচ। দাস্যরস, প্রেমের দাস হও। তিনি সখারূপে ডাকিতেছেন, তোমরা যে সঙ্কুচিত, তোমাদের যে প্রীতি নাই ; তোমরা ভীরু, তোমরা লোভী, কেমন করিয়া সখার সহিত মিশিবে ? সাধন কর, সখ্যরসের সাধন কর। তিনি পুত্ররূপে ডাকিতেছেন, মাতা হও, পিতা হও। তিনি নাগররূপে ডাকিতেছেন, তোমরা প্রিয়া হও, পূর্ব্বরাগবতী হও, অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা হও। যে-রসেরই সাধন কর, দাস্য সকলের মূল, দাস্য সকলের ভিত্তি। কিন্তু তোমরা যে এখন সেবা পাইবার জন্য চেষ্টিত, সেবা লইলেই মরিবে, নিজেকে হারাইবে, আত্মঘাতী হইবে। সেবা লইও না, সেবা কর ; সেব্য হইও না, সেবক হও। অধিকার ও সুবিধা খুঁজিও না, সেবা কর। ইহাই নরলীলা।

প্রত্যেক মানুষের আজ প্রয়োজন হইয়াছে অন্য সকল মানবের। আজ এমন যুগ আসিয়াছে যে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। বুদ্ধদেব বলিলেন—তোমার নিজের মুক্তি পৃথক্‌রূপে হইবে না, সকলকে লইয়াই তোমার মুক্তি। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পাপীর পাপের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে লইলেন। রন্তিদেব, রামানুজ, বাসুঘোষ, এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। মোক্ষাভিসন্ধি ত্যাগ কর, সেবা কর। ঈশ্বরের আরাধনা, সেই ঈশ্বর 'সর্ব্বজীবঃ' আর "সর্ব্বোত্তম নরলীলা।"

ভারতবর্ষ এই যুগধর্ম্ম বা নরলীলার বার্ত্তা বহুদিন পূর্ব্বেই আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-লীলাই সেই বার্ত্তা। সেদিনের নাগরিক ও সামরিক ভারতবর্ষ, সেদিনের সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সে বার্ত্তা শোনে নাই, শুনিতে পারে নাই। গোপপল্লীতে গোপগোপী তাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে মজিয়াছিল, ডুবিয়াছিল। উদ্ধত ও সমরপ্রিয়, বিবদমান ভারতবর্ষ সে বাণী শোনে নাই বলিয়া দুর্ব্বল হইয়াছিল, রণক্ষেত্রে ছিন্নভিন্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই বাণীর প্রথম কথা বলিয়া গেলেন, বুদ্ধদেব! আরও অনেকে বলিলেন। সেই কথাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা, এখনও অনেকে তাহা বলিতেছেন। এই যুগধর্ম্ম যখন ঘোষিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের এই ইচ্ছা বা এই অন্বেষণ-পথ যখন প্রকট হইয়াছে, তখন মানবকে ইহা লইতেই হইবে। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে না লইলে, দুঃখে ও বিপদে নিরুপায় হইয়া, ক্ষীণ ও অসহায় হইয়া ইহা লইতে হইবে। নিস্তার নাই। "নাছোড়বান্দা ভগবান"—The agressive Divine।

পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা পৃথিবী জুড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; এতদিন যাহারা দলিত হইয়া নীরবে পড়িয়াছিল, তাহারা সদর্পে ও নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। মূক আজ বাচাল হইতেছে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতেছে, যাহা কেহ ভাবে নাই, তাহা হইতেছে; স্বপ্নের এই সফলতা, যুগধর্ম্মের প্রভাব ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আজ মিলন চাই, সমগ্রমানবজাতির মহামিলন চাই। প্রতিযোগিতায়, ঈর্ষ্যায় শক্তি ক্ষয় হইতেছে, আজ সহযোগিতা চাই। দেশে দেশে আছে ভাইবোন, দেশে দেশে আছে পিতামাতা, দেশে দেশে আছে সখাসখী, আজ তাহাদের চিনিয়া লইতে হইবে। প্রভেদের

দুন্দুভি বাজিয়াছে, বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশি, মদনমোহন-লীলা, কামের পরাজয়, প্রেমের বিজয়। ইহাই যুগধর্ম্ম, ইহাই নরলীলা।

মীমাংসা হইয়া গেল। এই নরলীলাই আদর্শ, এই নরলীলাই তুলাদণ্ড, এই নরলীলাই কষ্টিপাথর। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র একত্র কর, একালের সৎসাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস—তাহাদেরও একত্র কর। যাহা এই নরলীলার সহায়ক ও অনুকূল তাহাই যুগধর্ম্ম, তাহাই গ্রহনীয় ; আর যাহা পরিপন্থী বা প্রতিকূল, তাহা বর্জ্জনীয়, উপেক্ষনীয়।

জীবনে রস আছে, মধু আছে ; জীবন একটা সঙ্গীত। এই আনন্দ ব্রহ্ম, মধু ব্রহ্ম, প্রিয় ব্রহ্ম, ও রসব্রহ্মকে এইখানে এই নদীতীরে, বিপিনে গোষ্ঠে, কুঞ্জে, গৃহাঙ্গনে, সখাসখীর মিলনে, কৈশোরের খেলাঘরে, যৌবনের প্রেমস্বপ্নে, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরে, তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

রাজমন্ত্রী এমনভাবে রাজ্য চালনা করিবেন,রাজ্যের এমন সুব্যবস্থা হইবে,যেরাজ্যের মধ্যে কেহই দুঃখী ও দুঃস্থ থাকিবে না, কেহ অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া উৎপীড়িত হইবে না। যাহা কিছু সৎকার্য্য, লোকহিতকর, তাহার জন্য অর্থের বা লোকের অভাব হইবে না। প্রত্যেক নরনারী শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসী, প্রত্যেক মানবাত্মার একটা অসীম মর্য্যাদা রহিয়াছে। কাহারও এই মর্য্যাদা উপেক্ষিত হইবে না, কেহ অবহেলায় পড়িয়া থাকিবে না। সকলেই জ্ঞানে, শক্তিতে ও প্রেমে বিকশিত হইবে।

এই শুভদিন আসিতেছে। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র আসে তোমরা প্রত্যেকে তাহার জন্য, যে যাহা পার কর ; ইহাই নবযুগের সাধনা। অলস কল্পনার দুঃস্বপ্নে ডুবিয়া নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করিও না। প্রেমের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তোমাদের যাহার যাহা আছে, তাহাই দিয়া সাহায্য কর। তোমাদের কি নাই ? তোমাদের সবই আছে। তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা জগতের আলো, তোমরা জগতের শক্তি। নিজেকে ভুলিও না। তুমি আমার, তোমাতে আমাতে এক ; বন্ধুরূপে ভালবাস, তখন যেমন এক, শত্রুরূপে ঘৃণাকর, তখন তেমনি এক। কলসীর কাণা মারিলেও প্রেম দিতে ছাড়িবে না, এই নিত্যানন্দবাণীই নরলীলা ও যুগধর্ম্ম। তুমি আমার, তোমাতে আমাতে

ক্রীড়া কর তখন যেমন, রুগ্ন রোগশয্যা'পরে তখনও তেমন। এই সত্য, ইহাই নরলীলা।

সুখ খুঁজিয়া দুঃখ পাইয়াছ, আজ দুঃখকে মিত্র বলিয়া সানন্দে বীরের মতো মাথা পাতিয়া লও, জগতে যেখানে যাহার যত দুঃখ আছে, সব তোমার হউক। ইহা অভিশাপ নহে—আশীর্ব্বাদ। সম্মান পাইয়াছ অনেক, আজ শ্যামের জন্য কলঙ্কের ডালা সগৌরবে বহন কর। বাঁচিবার ভুল রাস্তা ধরিয়া কেবল মরিয়াছ, আজ মরণের ঠিক রাস্তা ধরিয়া অমর হও। কুন্তীদেবী দুঃখ চাহিয়াছিলেন, আর শ্রীরাধা কেবল দুঃখই পাইয়াছিলেন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদি ও অন্ত। ব্রজগোপীর ভাগ্যই, তোমাদের ভাগ্য হউক। ইহাই নরলীলা।

উপাসিকা—হেলেন

ভূমিকা

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে মানুষের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্মভাব জাগাইবার জন্য যতপ্রকারের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন আছে, তাহার মধ্যে "থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটি" খুব বড়। আমরা আমাদের ভাষায় এই সোসাইটিকে 'পরাবিদ্যা সমিতি' বলি। কেহ কেহ "ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি"ও বলেন। এই পরাবিদ্যা সমিতিতে এখন সভ্য-সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজার এবং প্রত্যহই নূতন নূতন লোক ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। এই বিয়াল্লিশ হাজার সভ্য বাজে লোক নহেন। ইঁহাদের ভিতর বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিক, কবি, শিক্ষক, লোকহিতৈষী প্রভৃতি আছেন। শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত এখন এই সমিতির নেত্রী। য়্যানি বেসান্তের নেতৃত্বাধীনে নাই, অথচ পরাবিদ্যা সমিতির শিক্ষা ও উপদেশ অনুসারে চলেন, এমন লোকও অনেক আছেন; আবার তাঁহাদের অনেক ছোট বড় সমিতিও আছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাঁহার জীবন-কথা বলা হইবে, তিনি এই পরাবিদ্যা-সমিতির স্থাপয়িত্রী। তাঁহার নাম হেলেনা পেট্রোভেনা ব্লাভাস্কি। সংক্ষেপে বলা হয় এইচ, পি, বি। তাঁহার গুরুদত্ত নাম—উপাসিকা। আমরা তাহা হইতেই প্রবন্ধের নামকরণ করিলাম। উপাসিকার জীবন-কথা উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ। আমরা ভারতবর্ষের লোক; কিন্তু কালের প্রভাবে সকলকেই গোটা পৃথিবীর মানবজাতির সহিত মিশিতে হইয়াছে। সকল দেশের মানুষের সঙ্গে মিশিয়া চলিতে হইবে, ইহাই যুগধর্ম্ম। ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমরা অসভ্য ও বর্ব্বর হইয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইব। অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া উন্নতির পথে চলিতে হইলে, পৃথিবীতে যে-সকল লোকহিতকর চিন্তা ও চেষ্টা চলিতেছে, তাহার সহিত পরিচিত হওয়া এবং তাহার ভিতর যে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য আছে, তাহা নিজের জন্য ও নিজের দেশের জন্য আহরণ করা আবশ্যক। পরাবিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্য—সমগ্র মানবজাতির ভিতর মৈত্রী ও প্রীতি-স্থাপনা—Universal Brotherhood. অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা, মানুষের ধর্ম্মজীবনকে সুবিকশিত ও সুনিয়মিত করিয়া তাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন। আমাদের দেশে একদল প্রতিভাশালী ও ধর্ম্মপরায়ণ যুবক চাই, যাঁহারা এই পরাবিদ্যা সমিতির সমুদয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর মধ্যে তাহা বিকীর্ণ করিবেন। সমিতির সভ্য হইয়া চাঁদা দিলেই হইবে না, ঐ বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া, তাহার সাহায্যে আমাদের স্বদেশের প্রত্যেক নরনারীর জীবনকে উন্নত ও উদার করিতে হইবে। এতদিন বাঙ্গালা ভাষায় ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কির কোনও জীবনী-গ্রন্থ ছিল না। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ মহাশয় সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম—"উপাসিকা-চরিত"। বড় গ্রন্থ—৫১১ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে,—সকলেই বুঝিতে পারেন, ও মনে রাখিতে পারেন, এমন ভাবে এই অদ্ভুত জীবন-কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কির লিখিত দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ, অত্যন্ত অদ্ভুত। তাহাতে যে সব তত্ত্বকথা আছে, তাহা আর কোন গ্রন্থে নাই। এই দুই গ্রন্থের কথাগুলিও আমাদের দেশে বেশ ভাল করিয়া প্রচার করা দরকার। সকলেই একমতাবলম্বী হইবে না, মতভেদ চিরকালই আছে এবং থাকিবে। পরাবিদ্যা-সমিতি-সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। আজ বায়ান্ন বৎসর হইল, এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। এখন এই সমিতি পৃথিবীব্যাপী যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ভাল লোকই ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতবর্ষেও ইহার প্রভাব নিতান্ত কম নহে; সুতরাং তাঁহারা কি বলেন, তাহা প্রত্যেকেরই শোনা উচিত ও ভাবা উচিত। আমরা এবারে সংক্ষেপে এই জীবন-কথা বাহির করিলাম, ইহার পর উপাসিকার লিখিত গ্রন্থে যে-সব তত্ত্বকথা আছে, তাহার আলোচনা করিব। উপাসিকার জীবন কথা
... তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত 'উপাসিকা চরিত' গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

প্রথম পর্ব্ব—(১৮৩১—১৮৪৮)

রুশিয়াদেশের একঘর বড়লোক, তাঁদের উপাধি হ্যান্। তাঁরা প্রথমে ছিলেন জার্ম্মান দেশের লোক, তারপর বাস করেন রুশিয়ায়। এই বাড়ীতে একটি মেয়ের জন্ম হয়—১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, এখন হইতে ছেয়ানব্বই বছর আগে। মেয়েটি বড় রোগা, বাঁচে কিনা সন্দেহ। খৃষ্টানদের অনেকের বিশ্বাস, খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষা হওয়ার আগেই যদি কোন ছেলে মারা যায়, নরকে তার ভারি দুর্গতি হয়। কাজেই এই রোগা মেয়েটির দীক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। দীক্ষার উৎসবে অনেক পাদ্রি এসেচে, অন্যান্য লোকও এসেচে, সবারই হাতে এক একটা জ্বলন্ত বাতি। একটা ছোট মেয়ে জ্বলন্ত বাতি হাতে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুমের ঘোরে ঢুলে পড়ে গেল। বাতির আগুন, লেগে গেল এক পাদ্রি সাহেবের কাপড়ে; পাদ্রি সাহেবের লম্বা জামা জ্বলে উঠ্‌ল ধু ধু করে। পাদ্রি বাঁচলেন বটে, কিন্তু পুড়ে গেলেন, কষ্ট পেলেন। ঘটনাটা অশুভ; লোকে বল্লে—মেয়েটা যদি বাঁচে, সারাজীবন কেবল কষ্ট পাবে।

এক এক দেশের লোকের একএক রকম সংস্কার। রুশদেশের লোক বলে—'দামোভাই'ব'লে এক উপদেবতা আছেন—তিনি বাস্তুদেবতা। গৃহস্থবাড়ীর লোকজন সব রাত্রে যখন ঘুমায়,এই 'দামোভাই' তখন বাড়ীতে পাহারা দেন, গরুবাছুর সব রক্ষা করেন। দেবতাটি খুব ভাল, তবে বছরে একদিন তাঁর মেজাজ বড় খারাপ হ'য়ে পড়ে। সে হচ্চে ৩১শে মার্চ্চ। সেদিন তিনি গরু ঘোড়াদের মারেন, বাড়ীর জিনিসপত্র সব ওলটপালট করে দেন। আর একটা সংস্কার আছে। ৩০শে জুলাই দুপুর রাতের পর যে ছেলে মেয়ে জন্মায়, সেই ছেলেমেয়ে 'দামোভাই'কে শাসন কর্ত্তে পারে। এই মেয়েটি ঐ সময়েই জন্মায়। জুলাই মাস বছরের সপ্তম মাস, এই মাসে জন্ম ব'লে লোকে এই মেয়েটিকে "সেদ্‌মিচকা" বল্‌ত। কথাটার মানে 'সাতের লোক'। ৩১শে মার্চ্চ, যেদিন রাত্রে 'দামোভাই' দুষ্টামি করে, সেইদিন 'হ্যান্'দের বাড়ীর লোকেরা এই মেয়েটিকে কোলে ক'রে গোয়ালে, আস্তাবলে, ভাঁড়ারঘরে সব জায়গায় ঘুরত, তার হাতে জল দিয়ে, সেই জল সব জায়গায় ছড়াত। লোকের বিশ্বাস—'দামোভাই' আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না।

এই যে রোগা মেয়েটি, তার বাপের নাম কর্ণেল পিটার হ্যান্। তিনি সৈন্যদলে বড় চাকুরী কর্ত্তেন। তার যে মা, তিনি উপন্যাস লিখ্‌তেন। তার মা কম বয়সে, পঁচিশ বছরে মারা যান। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল উপন্যাস লেখেন। রুশিয়াদেশে ইনিই প্রথম স্ত্রীলোক উপন্যাস-লেখক।

রোগা মেয়েটি, যার কথা বল্‌চি, তার নাম হেলেনা পেক্রোভেনা; বাপের বংশের উপাধি হ্যান্। সতর বছরে বিয়ে হয়, তার স্বামীর উপাধি ব্ল্যাভাস্কি। সেইজন্য লোকে তাঁকে ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কি

বলে জানে। স্বামীবংশের উপাধি হ'ল ব্লাভাস্কি, আর সাহেবদের দেশে ভদ্রস্ত্রীলোককে বলে ম্যাডাম্। গোটা নাম হল—হেলেনা পেত্রোভেনা ব্লাভাস্কি, এই তিন্‌টে কথার ইংরাজী আদি অক্ষর এইচ, পি, বি। অনেকে তাঁকে 'এইচ পি, বি'ও বলে। আমরা কিন্তু 'হেলেন নামটিই নিচ্চি। তাঁর যে ছিলেন গুরুদেব, তিনি তাঁকে নাম দিয়েছিলেন 'উপাসিকা'—কাজেই আমরা নাম দিচ্চি উপাসিকা হেলেন। এই নামটি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সহজে মনে রাখ্‌তে পার্ব্বে।

হেলেনের মা মারা গেলে, তাঁর বাবা আবার বিবাহ কল্লেন। হেলেনের বয়স যখন নয় বছর, তখন থেকে দুবছর হেলেন তার বাবার কাছে সৈন্যদের সঙ্গে থাক্‌ত। সৈন্যদের সঙ্গে মিশ্‌ত, ঘোড়ায় চড়্‌ত; ফলে, পুরুষ মানুষের মত সাহসী হ'য়ে উঠ্‌ল। এগার বছর বয়সের সময় হেলেনা এলেন, তাঁর মাতামহীর বাড়ী। মাতামহীও খুব বড় মানুষ। বড়লোকেরা শীতকালে সহরে থাকে, গ্রীষ্মকালে যায় গ্রামে। হেলেনও মাতামহ মাতামহীর সঙ্গে এক পাড়াগাঁয়ে ছিলেন। এই মেয়েটি যে মোটেই সাধারণ মেয়ের মতো নয়, সে যে এক আজ্‌গুবি ধরণের মানুষ, সেটা এই পাড়াগাঁয়ে থাকার সময়েই বেশ ভাল ক'রে বোঝা গেল। সে সময়ে সে কি কর্ত্ত, সে সব কথা, তার এক বোনের কাছে পাওয়া গেছে।

ঐ পাড়াগাঁয়ে হেলেনের মাতামহ একখানা পুরাণো বাড়ী কিনেছিলেন। বাড়ীখানা সে-কালের একটা গড়—জমিদারের বাড়ী। এই বাড়ীতে আগে আগে অনেক রকম কাণ্ড হ'য়ে গেছে; প্রজার উপর অত্যাচার হয়েচে, মানুষ খুন হয়েচে। সেই বাড়ীতে ছিল একটা পাতালঘর, খুব আঁধার। ভিতরে যে তার কি ছিল, কেউ তা জান্‌ত না। লোকে বল্‌ত—কত মরা মানুষের হাড় মাথা এই পাতাল ঘরে আছে, আর সেই মানুষগুলো সব ভূত হ'য়ে আছে, মাঝে মাঝে দেখ্‌তেও পাওয়া যায়। বাড়ীর কাছেই বন ছিল, পাহাড় ছিল। এই বাড়ীতে ছিলেন একটি বুড়ী, তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। এই বুড়ী, এই বাড়ীতে অনেকদিন আছেন, আগেকার মালিকদের আমলেও ছিলেন। তিনি এই বাড়ীর পুরাণো কালের নানারকম গল্প—ছেলেমেয়েদের বল্‌তেন। ছেলেমেয়েরা সেই সব গল্প শুনে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে যেত, তারা কেউ সাহস করে, একা দিনের বেলাতেও কোন নির্জ্জন জায়গায় যেত না। কিন্তু হেলেন ছিল অন্যরকম। ভয় ত তার ছিলই না; এই সব গল্প শুনে সে একা একা এখান-ওখান ঘুর্‌ত;—মতলব, যদি ঐ সব ভূতপ্রেতের সঙ্গে দেখা শুনা হয়, তা' হ'লে খুব মজা হবে। ঐ যে অন্ধকার পাতাল ঘরটার কথা বলা হ'ল, হেলেন একা গিয়ে সেই ঘরে চুপ্ করে বসে থাক্‌ত, আর তার ছিল একখানা ভূতপ্রেতের গল্পের বই, সেইখানে বসে বসে একমনে সেই বইখানা পড়্‌ত। বাড়ীর লোকে খুঁজে পেতনা, পাগল মেয়েটা কোথা গেল! শেষে অনেকদিন পরে তারা জানতে পারলে সে পাতাল ঘরে বসে থাকে। হেলেন বল্লে—আমি তো সেখানে একা থাকি না;

সেখানে আমার সব খেলার সাথী আছে, তার মধ্যে একজন কুঁজো। আমি পাতাল ঘরে বসে বসে তাদের সঙ্গে গল্প করি, তাদের সঙ্গে খেলা করি। ছেলেমেয়েরা এই সব কথা শুনে ভয়ে কাঁপত, আর বয়স্ক লোকে ভাব্‌ত—মেয়েটা কিছু পাগল।

হেলেনের আর এক ব্যাপার ছিল, তার নাম 'স্বপ্ন-সঞ্চরণ'। অনেক লোকে সেটাকে বলে ব্যারাম; কিন্তু তার ভেতরের কথা এখনও খুব কম লোকেই জানে। হেলেন্ ঘুমের ঘোরে উঠে চলে গেল, দুয়ার যেমন বন্ধ তেম্‌নি বন্ধই আছে, অথচ হেলেন্ বাহিরে গেছে। কি করে' গেল? বারান্দায় বেড়াচ্চে, আর কার সঙ্গে যেন কথা কচ্চে। আর এক ব্যাপার, হেলেন নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বল্‌ত। বাড়ীতে যাদুঘর ছিল, সেখানে নানাদেশের নানারকম জীবজন্তুর কঙ্কাল থাক্‌ত। এই সব কঙ্কাল দেখে, কঙ্কালদের পূর্ব্বজন্মের কথা এমন গম্ভীরভাবে বল্‌ত, যেন সে সবই জানে। একটা ফ্লেমিঙ্গো পাখীর কঙ্কাল দেখে বল্‌লে, এটা আর জন্মে মানুষ ছিল, অনেক পাপ করেছিল, মানুষ খুন করেছিল, সেই পাপে পাখী হল। এই সব কথা যারা শুন্‌ত, তারা অবাক্ হ'য়ে যেত, বিশ্বাস কর্ত্ত, আর ভয় পেত।

সেই দেশে, হেলেনের মাতামহের বাড়ী থেকে একটু দূরে বনের ভিতর নির্জ্জনে এক বৃদ্ধ বাস কর্ত্ত, বয়স তার একশ বছর; সে ছিল যাদুকর। সে ভাল লোকের ব্যায়ারাম সারিয়ে দিত, আর মন্দ-লোকাকে ব্যায়ারাম ধরিয়ে দিত। সে মৌমাছি পুষ্‌ত। লোকে বল্‌ত, সে জীবজন্তুর কথা বোঝে, তাদের সঙ্গে কথা কয়। সবাই তাকে ভয় কর্ত্ত, কেউ তার কাছে যেত না। হেলেনের সঙ্গে কিন্তু তার ভারি ভাব, হেলেন তার কাছে যেত, বসে বসে গল্প কর্ত্ত, তার সব কাজ কর্ম্ম দেখ্‌ত, আর তাকে বল্‌ত, তোমার ঐ সব বিদ্যা আমাকে শেখাও।

একবার একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়েছিল। হেলেন তখন নেহাত ছেলেমানুষ; ঠেলাগাড়ীতে চড়ে' বেড়ায়, একটা চাকর গাড়ী ঠেলে, আর সঙ্গে একজন দাসী থাকে। নীপর নদীর ধারে, এইরকম একদিন ঠেলাগাড়ীতে হেলেন যাচ্চে। যে চাকরটা গাড়ী টান্‌চে সেটা বড় অবাধ্য, হেলেনের কথা শোনে না। হেলেন খুব রাগ করে' তাকে বল্লে, দাঁড়া তোকে দেখাচ্চি, "আয় ত ভূত"! এই কথা যেই বলা, আর অম্‌নি চাকরটা গাড়ী ফেলে দে দৌড়—দৌড়, দৌড়! চাকরটা ভয় পেয়ে কোথা যে গেল, আর খবর নাই। শেষে জানা গেল, চাকরটা এক খালে পড়ে' মরে গেছে। পুলিশ বল্লে, আকস্মিক মৃত্যু। হেলেন বল্লে, তা' কেন; আমার সব ভূত আছে, আমি তাদের ডেকে ওকে তাড়া দিয়েছিলাম, তাইতে ও মারা গেছে।

হেলেন মেয়েটি এই রকমের মেয়ে। বড়লোকের মেয়ে, কারও কথা শোনে না, নিজের খেয়ালে

তাদের সঙ্গেই মেশামেশি, ভালবাসাবাসি। তাকে পড়াবার জন্য নানাদেশ থেকে ভাল ভাল শিক্ষয়িত্রী আনা হ'ল, কিন্তু কেউ তাকে কায়দা কর্ত্তে পাল্লে না। হেলেনের এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, সব সময়ে সেটা দেখা যেত না, মাঝে মাঝে দেখা যেত। একদিন একজায়গায় বালির উপর হেলেন তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে গল্প কচ্চে। সমুদ্রের কথা বল্‌চে। বল্‌তে বল্‌তে বল্‌চে, ঐ এল বড় বড় ঢেউ তুলে, সমুদ্র এল, এই দিলে, একেবারে ডুবিয়ে দিলে। কথাগুলো যেমন বলা, ছেলে-মেয়েগুলো ভয়ে একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌ল—তাদের মনে হ'ল, সত্যই সমুদ্র আস্‌চে!

হেলেনের বয়স যখন ১৪, তাঁর বাপ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিসহর, আর ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন। লণ্ডনে হেলেন কিছু গান বাজনা শেখেন। লণ্ডনে গিয়ে হেলেন বলে, ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব। বাপ বলেন, লোকে নিন্দা কর্ব্বে। মেয়ে কিন্তু শুন্‌বে না, সে কোন লোকাচারের ধার ধার্ত্ত না। বাপের সঙ্গে মেয়ের একটু ঝগড়ার মতই হয়। শৈশবকাল এইভাবে কেটে গেল। লেখাপড়া তেমন কিছু হয়নি।

অনেক জায়গা থেকেই বিয়ের কথা আসে, মেয়ে বলে বিয়ে কর্ব্বনা। একগুঁয়ে মেয়ে, কাজেই বিবাহ আর হয় না। একজন শিক্ষয়ত্রী ছিলেন, তিনি একদিন হেলেনকে ঠাট্টা করে খুব রাগালেন, আর বল্লেন, তোকে কেউ বিয়ে কর্ব্বে না। হেলেন রাগের মাথায় বল্লে—না, কর্ব্বে না! আমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে কর্ত্তে পারি। শিক্ষয়ত্রী ঠাট্টা করে বল্লে—আচ্ছা, কর দেখি, ঐ বুড়ো ব্লাভাস্কিকে বিয়ে কর দেখি, সে বুড়োর তো বউ মারা গেছে। হেলেন বল্লে—হাঁ কর্ব্ব, তাকেই বিয়ে কর্ব্ব।

আশ্চর্য্য ব্যাপার। পরের দিন প্রস্তাব এল, ব্লাভাস্কি হেলেনকে বিয়ে কর্ত্তে চান। হেলেনের বয়স সতর, আর ব্লাভাস্কির বয়স সত্তোর। হেলেন বিবাহে রাজি হ'ল। রাজী হওয়ার পর, মনে হ'ল—তাইত, না বুঝে রাগের মাথায় একি কাণ্ড কর্ল্লাম। বিয়ের পর একমাসের মধ্যেই স্বামী ছেড়ে হেলেন হলেন নিরুদ্দেশ। কেবল নামের শেষের উপাধিটা বদ্‌লে গেল। স্বামীর সঙ্গে জীবনে আর কখন কোন সম্বন্ধ হয়নি।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—(১৮৪৮—৫৮)

স্বামীর সঙ্গ ছেড়ে হেলেন এলেন তিফ্‌লিশ্‌ সহরে, তাঁর মাতামহের বাড়ী। সর্ব্বনাশ; এমন কাজ কি ভদ্রঘরের সেয়ানা মেয়ে করে! মাতামহ নাত্‌নিকে জানেন, কাজেই দাসদাসী সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তার বাপের কাছে। সে অনেক দূর। পথে হেলেন কল্লেন কি? জাহাজের কাপ্তেনকে টাকা দিয়ে বশ করে, দাসদাসীকে পথের মধ্যে ফেলে রেখে, একেবারে একা চলে গেলেন ষ্টাম্বুল সহর, তুরস্ক দেশের রাজধানী। পথে তাকে ধরার জন্য চেষ্টা হ'ল, কিন্তু ধর্ত্তে পাল্লে না। জাহাজের

কয়লা-দেওয়া চাকরের পোষাক পরে' লুকিয়ে ছিল হেলেন। স্তাম্বুলে এসে আগেকার চেনা, রুশদেশের এক ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে হেলেনের দেখা হ'ল। এই মেয়েটির নাম কাউন্টেস্ কেসেলফ্। হেলেন তাঁর সঙ্গে মিশরদেশ, গ্রীস্‌দেশ ঘুর্‌লেন। তারপর তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল; হেলেন হলেন একা। দেশে দেশে ঘুর্‌চেন, কমবয়সী ভদ্রঘরের মেয়ে, ধন্য বুকের পাটা! এই রকমে দশ বৎসর কাটালেন। মাঝে মাঝে বাপকে চিঠি লিখে টাকা নিতেন। বাপ বুঝলেন—এ মেয়েকে পারা যাবে না; মাতৃহীনা মেয়ে, বিদেশে বেঘোরে না খেয়ে মারা পড়ে, তাই টাকা কড়ি পাঠাতেন। এই সময়ে হেলেন কি কর্ত্তেন, তার কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়।

মিশর দেশে একজন মুসলমান যাদুকর ছিলেন। তাঁর ভারি সম্মান, রাজার হালে থাক্‌তেন। হেলেন কিছুদিন, তাঁর কাছে যাতায়াত কর্ল্লেন, যদি কিছু বিদ্যা তাঁর কাছে আদায় করা যায়! ব্যাপারটা কি? হেলেনের কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি ছেলেবেলা থেকেই ছিল, কিন্তু হেলেন তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। সূক্ষ্ম, অদৃষ্ট-জগতের যে-সব ব্যাপার হেলেন দেখ্‌তেন, সে-সব ব্যাপারের একটা বিজ্ঞান আছে, সেই বিজ্ঞানটা শেখার জন্য হেলেনের ছিল ব্যাকুলতা। মিশরী যাদুকরের কাছে, যাতায়াত কর্ল্লেন, হয়ত কিছু পেলেনও, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তখন হেলেন গেলেন ফরাসীদেশে। সেখানকার পণ্ডিতমহলে খুব মেশামেশি কর্ল্লেন। ফরাসীদেশে একজন নাম জাদা সম্মোহন-বিদ্যাবিৎ ছিলেন। তিনি হেলেনকে দেখেই বুঝ্‌লেন, হেলেন খুব ভাল 'মাধ্যমিক'। সম্মোহন বিদ্যার কাজের জন্য ভাল মাধ্যমিক দরকার। এই লোকটি চেষ্টা কর্ল্লেন, হেলেনকে হাতে রাখ্‌তে। কিন্তু সে কি সোজা কথা? হেলেন যে অন্য-কিছু চায়! কি যে সে চায় তা' সে নিজেই জানে না। হেলেন এলেন লণ্ডন; লণ্ডনে এই দ্বিতীয় বার।

এইখানে এক কাণ্ড হ'য়ে গেল। হেলেন ছেলেবেলা থেকেই মাঝে মাঝে দেখ্‌তেন, আর অনুভব কর্ত্তেন, একজন সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষ তাঁর কাছে আসেন। এই মহাপুরুষ যেন হেলেনকে বড় ভালবাসেন, বিপদে আপদে রক্ষা করেন। মহাপুরুষের ছায়ামূর্ত্তি হেলেন মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখ্‌তেন। এই মহাপুরুষের জন্য হেলেনের প্রাণের ভিতর খুব বেশী রকমের একটা টানও ছিল, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পার্ত্তেন না; এটা স্বপ্ন না সত্য? একদিন লণ্ডন সহরে দিনের আলোতে পথের জনতায় হেলেন দেখেন, ঠিক্ সেই মহাপুরুষ, ভারতবর্ষের জনকতক রাজার সঙ্গে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে, চিন্‌তে পেরে, হেলেন একেবারে পাগল হয়ে ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে আর কি! মহাপুরুষ তার ভাব দেখে ইসারা ক'রে বারণ কল্লেন। মহাপুরুষের এমনি শক্তি, হেলেন আর যেতে পার্ল্লেন না।

এই যে দেখা, তারপর হ'তে কেবল সেই মহাপুরুষের কথাই মনে হচ্ছে। তার পরদিন, লণ্ডনের

কথাই ভাবছেন। এমন সময় দেখেন, সত্যই সেই মহাপুরুষ একেবারে সশরীরে হেলেনের সম্মুখে উপস্থিত! মহাপুরুষ বেশী কথা কইলেন না, সংক্ষেপে গোটাকতক কথা। তিনি হেলেনকে বল্লেন, —আমার অনেক কাজ আছে, তোমার দ্বারা সেই সব কাজ হবে। তোমাকে দুঃখ পেতে হবে অনেক, কঠোর পরীক্ষা। কাজ করার আগে তোমাকে তিন বছর তিব্বতদেশে হিমালয় পর্ব্বতের উপর আশ্রমে থাক্তে হবে। আর কিছু না বলে' মহাপুরুষ চলে গেলেন। হেলেনের মন খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল, কোথা যাই, কি করি? এই সময়ে তিনি একখানা উপন্যাস পড়্লেন। উপন্যাস পড়ে' খেয়াল হ'ল, মার্কিন দেশে যাই। সেখানকার অসভ্য জাতিরা অনেক মন্ত্র তন্ত্র যাদুবিদ্যা জানে। চল্, চল্, হেলেন গিয়ে কানাডায় উপস্থিত। সেখানকার সব বন্য জাতিদের সঙ্গে মেলামেশা কর্ত্তে লাগ্লেন। নিউঅর্লিয়েন্স্ গেলেন, সেখানে 'ভুডু' বলে একটা বুনো জাত আছে, তারা অনেক ঔষধ-পত্র জানে, ইন্দ্রজাল জানে। সাধ আর মেটে না, যা' চাই তা' মেলে না। হেলেন গেলেন মেক্সিকো। প্রাণটা কাঁদ্চে, ভারতবর্ষ, তিব্বত আর সেই মহাপুরুষ। এই সময়ে তাঁর এক ধর্ম্ম-মা মারা গেলেন, হেলেন অনেকগুলি টাকা পেলেন। তিনি টাকা রাখ্তেন না, টাকা প্রায় উড়ে গেল, লোকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে নিলে। এক ইংরাজের সঙ্গে দুবছর আগে জার্ম্মান দেশে হেলেনের আলাপ হয়েছিল, সে লোকটাও হেলেনের মতো মহাপুরুষের খোঁজে দেশে দেশে ঘোরে। হেলেন এসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে সেই লোকটার সঙ্গে মিল্লেন, আর একজন লোকও জুটে গেল। তিনজনেরই মতলব একরকম জাহাজে চড়ে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে লঙ্কাদ্বীপ, সেখান থেকে বোম্বাই এসে তিনজনে উপস্থিত—১৮৫২ খৃষ্টাব্দের শেষ অংশ। এইখানে তিনজনে ছাড়াছাড়ি হ'ল, প্রত্যেকে নিজনিজ পথে গেলেন। হেলেন এলেন নেপাল, যাবার ইচ্ছা তিব্বত। ইংরাজ প্রতিনিধি বাধা দিলেন, যাওয়া হল না। ফির্লেন; দক্ষিণভারত, জাভা, সিঙ্গাপুর হয়ে গেলেন ইংলণ্ড। তখন ক্রিমিয়া-যুদ্ধের আয়োজন হচ্চে; ইংরাজে রুশে ঝগড়া। হেলেনের ইংলণ্ডে থাকা হল না, গেলেন আমেরিকা। নিউইয়র্ক আর সানফ্রান্সিস্কোয়, দুবছর কেটে গেল। মনে সর্ব্বদাই জাগ্চে ভারতবর্ষ, আর তিব্বত, আর মহাপুরুষ। আবার বেরুলেন, আমেরিকা থেকে এলেন জাপান, জাপান থেকে কলিকাতা (১৮৫৫), সেখান থেকে লাহোর।

এক জার্ম্মান্ ভদ্রলোক, হেলেনের বাপের বন্ধু। তিনিও যোগবিদ্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, মহাপুরুষ, এই সকলের খোঁজে পূর্ব্বদেশে ঘুরে বেড়ান। হেলেনের বাবা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, আমার মেয়েও ঐ সব খোঁজে, আপনি তার সন্ধান কর্বেন। লাহোরে তাঁর সঙ্গে হেলেনের হ'ল দেখা। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও দুজন ছিলেন। হেলেনকে নিয়ে হলেন তাঁরা চারজন। অনেক ঘুর্লেন।

লোকটি বৌদ্ধযোগী। এই সামনের সঙ্গে তাঁরা কাশ্মীর রাজ্য ছাড়িয়ে এলেন একটা জায়গায়—তার নাম লেদি। সেখানে এক বৌদ্ধমন্দিরে সামন অনেক যোগের কাণ্ড দেখালেন। হেলেনের সঙ্গে যে আর তিনজন ছিলেন, তাঁরা এই পর্য্যন্ত এসে আর যেতে পারলেন না। হেলেন একা, এই তাতারী ফকিরের সঙ্গে চল্লেন—তিব্বত। ছদ্মবেশে সীমান্ত পার হয়ে তিব্বতে ঢুক্লেন। এইবার আর এক আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'ল।

এই তাতারীর বামবাহুতে ছিল একটি কবচ। হেলেন তাকে প্রায়ই মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কর্তেন—ওটা কি, ওটাতে কি হয়? সামন্ বড় ধরা ছোঁয়া দিত না—কেবল বল্ত—একদিন জান্তে পার্বে, ও নিজেই বল্বে এখন।

পাহাড়, কেবল পাহাড়, উঁচু উঁচু পাহাড়। মানুষ নাই, সব শূন্য, ভয়ানক দেশ। সেইখানে এক তাঁবুতে দুইজন, হেলেন আর সামন্। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্চে। সেখান থেকে এক ক্রোশ দূরে একখানা গ্রাম আছে—সেই গ্রামে একজন লামা ভূত নামাচ্চে! হেলেন আজ সামন্‌কে ধরে' বস্লেন, তোমাকে আজ বলতেই হবে—ও জিনিসটা কি? সামন্ তাঁবুর বাইরে গিয়ে একটা খুঁটি পুঁতল, খুঁটির ওপর রাখ্লে একটা শুক্নো শিং-ওয়ালা মরা ছাগলের মাথা; ভেতরে এসে বল্লে, এটা দেখ্লে কেউ ভেতরে আস্বে না। তারপর সামন্ তাঁবুর পর্দ্দা দিল টেনে। তাঁবুর ভেতর মাটির ওপর চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে, কবচের ভেতর থেকে আখ্‌রোটের মত কি একটা জিনিষ বের করে', সামন্ সেটা মুখের ভেতর নিয়ে যেন গিল্তে চেষ্টা কর্তে লাগ্ল। দেখতে দেখ্তে মনে হ'ল লোকটা বুঝি মরে গেছে। চোখ উল্টে গেছে, শরীর ঠাণ্ডা, নিশ্বাস নাই। কিছুক্ষণ পরে একটা ভয়ানক গম্ভীর আওয়াজ বেরুল—

"মাহাত্ম, তোমার ভাল হোক্, আমাকে কি কর্তে হবে"

হেলেন এসব ব্যাপার কিছু কিছু বোঝে ত! কাজেই ভয় না পেয়ে বল্লে—"আমার বন্ধু শ্রীমতী—র কাছে যাও।"

উত্তর হ'ল—এসেচি

তিনি কি কর্চেন?

তিনি বাগানে বসে' চশমা চোখে দিয়ে একখানা চিঠি পড়্‌চেন।

চিঠি-তে কি লেখা আছে, বল। চিঠিখানা রুমানিয়া দেশের ভাষায় লেখা, আস্তে আস্তে ফকিরই অজ্ঞান অবস্থায় যা' লেখা আছে বলে' যাচ্চে, আর হেলেন অন্য ভাষায় লিখে নিচ্চে। চিঠি লেখা হয়ে গেল। তার পর হেলেন দেখে, তার সেই সুদূরবর্ত্তি বন্ধু শ্রীমতীরই যেন ছায়ামূর্ত্তি, কথা

এই ঘটনার দশ মাস পরে হেলেন তাঁর সেই মহিলাবন্ধুকে পত্র লিখে সব খবর নিলেন। সে সময়ে বাগানে বসে চশমা চো'খে তাঁর চিঠি পড়া ঠিক; আবার চিঠির নকল যা' হেলেন পাঠিয়েচে তাও ঠিক। তাঁহার মহিলাবন্ধু হেলেনকে আরও জানালেন, সেদিন সেই সময়ে বাগানে বসে' ঐ চিঠি পড়তে পড়তে হঠাৎ কেমন ঘুম এল, আর স্বপ্নে দেখ্লাম এক ভয়ানক দেশে পাহাড়ের মধ্যে তুমি এক তাঁবুতে আছ বসে, আর তোমার সম্মুখে একটা অসভ্য লোক মরে' পড়ে আছে।

তার পর এক জায়গায় খবর গেল, সেখান থেকে লোক এল, সৈন্য এল, হেলেনকে সেখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল। এবার এই পর্য্যন্ত।

তৃতীয় পর্ব্ব—(১৮৫০—৬৬)

তিব্বত হ'তে বে'রিয়ে, ফকিরের সঙ্গ ছেড়ে, কোথা হতে কোথায় যে গেলেন, ঠিক জানা নাই। তবে এই আট বছর যে তিনি আত্মীয়দের সঙ্গে দেশে ছিলেন, তার বেশ ভাল খবর পাওয়া যায়। টিফ্লিস্, ককাসস্, ক্রিমিয়া, মীনগ্রেলিয়া, সবই রুশ দেশে; এই সব জায়গায় আত্মীয়দের সঙ্গে এর পরের আট বছর তিনি ছিলেন। এই সময়কার ব্যাপার সব জানা যায়। হেলেন নিজের কথা নিজে বড় একটা বল্তেনও না, কিছু লিখেও রাখ্তেন না হেলেনের আত্মীয়েরা বড়লোক, আবার তাঁদের মধ্যে অনেক ভাল লেখক লেখিকাও ছিলেন। এই সময়কার কথা তাঁরাই সব লিখেচেন। শুধু লিখেচেন নয়, রুশদেশের বড় বড় খবরের কাগজে সে সব বেরিয়েচে, তার পর আবার বই হ'য়েও বেরিয়েচে। এই সব কথা বড় মজাদার।

হেলেন আছেন ঘরের ভেতর বসে', আরও অনেক লোক, ভাল ভাল লোক, বড় বড় লোক, বড়লোকের বাড়ীর বৈটকখানা, আবার তার উপর ভোজের নিমন্ত্রণ; কত আলো জ্বলচে। হেলেন্ চুপ্ করে', এক জায়গায় বসে আছেন। ঘরের ভেতর ক্রমাগত শব্দ হচ্চে—"ঠুক্ ঠুক্ টুং টুং ঝুন্ ঝুন্"; মনে হচ্চে, ঘরের ভেতর এখানে ওখানে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কচ্চে, আর চলাফেরা কচ্চে; আর সব জিনিষপত্র নাড়চাড়া কচ্চে;—দেয়ালে, জানালায়, বিছানায়, আয়নায়, টেবিলে, সব জায়গায় এই রকম। হেলেনকে জিজ্ঞাসা কর্লে কিছু বলে না, হাসে আর আমোদ করে। শেষে, হেলেনের দিদি,—যাঁর বাড়ী, তিনি হেলেনকে খুব জোরে ধরে বস্লেন। এই দিদির নাম জেলিহোভাস্কি। তাঁর জেদাজিদিতে হেলেন বল্লেন, এ আর কি, এত ইচ্ছাশক্তির কাজ। আমি ইচ্ছা কর্লে এখনি বন্ধ কর্ত্তে পারি। অমনি সব বন্ধ হ'য়ে গেল। হেলেনের এই শক্তির কথা চারিদিকে প্রচার হ'য়ে গেল। অনেক রকমের লোক আস্তে লাগ্ল, ক্রমশঃ একটা আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। অনেকে তামাসা কর্ত্তে এসে অপদস্থ হলেন। হেলেন কারও মনের কথা বলে দেয়, কারও খুব কঠিন

রোগের ঔষধ লাতিনভাষায় লিখে দেয়, কারও গুপ্তকথা বলে দেয়; আবার ইচ্ছামত কোন জিনিসকে ভারি করে, আবার পাতলা করে; হঠাৎ অজানা লোকের হাতের লেখা চিঠি আসে, তাতে কোন লোকের কোন একটা প্রশ্নের জবাব লেখা; কখন কোন নূতন জিনিষ আসে, কখন খুব ভাল বাজনা শোনা যায়; অথচ কোথায়, কি প্রকারে, কার দ্বারা যে এই সব হচ্চে কিছুই বোঝা যায় না। এই সব কাণ্ড চল্‌তে লাগ্‌ল।

হেলেনের ভাইএর নাম লিওনিদ্। সে খুব বলবান্, লেখাপড়াও জানে খুব। বড়লোকের ছেলে, খুবই গম্ভীর। তিনি একটু দূরে দূরে থাকেন। শোনেন সব, জানেন সব, কিছুই বলেন না, মেশামেশিও করেন না। একদিন হেলেন বল্‌চে—ভারি জিনিসকে পাতলা করা যায়, পাতলা জিনিসকে ভারি করা যায়, কেন যাবে না? এ আর কঠিন কি?

লিওনিদ্ বল্‌চে—তুমি পার নাকি?

হেলেন—হাঁ পারি

কর দেখি

একখানা পাতলা টেবিল ছিল। হেলেন দূরে বসে সেই টেবিলের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌ল। লিওনিদ্ প্রাণপণে চেষ্টা কর্লেন, কিন্তু টেবিলখানাকে কিছুতেই তুল্‌তে পার্লেন না। তার পর হেলেন বল্লে, অচ্ছা, এইবার তোলো। লিওনিদ্ দেখে, টেবিলখানা পালকের মতো পাতলা!

হেলেনের বাবা পণ্ডিত লোক, বৈজ্ঞানিক, তবে নাস্তিকগোছের। অলৌকিক ব্যাপার কিছু মান্‌তেন না। কিন্তু, তাঁকেও মান্‌তে হল। একদিন তাঁর মনের কথা, তাঁর কোন্ কালের এক ঘোড়ার আজগুবি নাম হেলেন ব'লে দিলে। তারপর হেলেন এক অতি কঠিন কাজ কল্লেন। হেলেনের বাপের বংশ, হ্যান্-বংশ, খুব প্রাচীন। ইউরোপের অনেক দেশেই তার শাখা আছে। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনেক অংশ নষ্ট হয়ে যায়। বাপের অনুরোধে হেলেন সেই ইতিহাস উদ্ধার করে দিলেন। এই ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ অন্য জায়গায়, অন্যদেশে অন্য লোকের বাড়ীতে ছিল, আবার অন্য বংশের সঙ্গে যোগাযোগের কথা অন্যবংশের পারিবারিক ইতিহাসে কিছু কিছু ছিল, এই সব খবরের সঙ্গে পরে মিল করে দেখা গেছে, হেলেন যা বলেচে, সব বর্ণে বর্ণে সত্য। লোকে অবাক হয়ে গেল, কি করে' করে?

একজন পুলিশের বড় কর্ম্মচারী খুনী আসামী ধর্ত্তে এসে ধর্ত্তে পারেনি। সে ভদ্রলোক অলৌকিক কিছু মান্‌তেন না—একালের বৈজ্ঞানিক সংশয়ী লোক। হেলেন তাঁকে এই আসামীর সন্ধান সব বলে' দিলে, তিনি তো অবাক্। তাঁর মত বদ্‌লে গেল।

মাজিক ছিলেন, তাঁদের অনেক লোকের প্রেতদেহ হেলেন দেখ্‌তে পেতেন, আর তাদের কথা বল্‌তেন। সেই সব প্রেতদেহের যে রকমের বর্ণনা, হেলেন দিতেন, সেই বাড়ীর পুরাতন চাকরদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেছে, ঠিক ঠিক সেই রকমের সব লোক ঐ বাড়ীতে ছিলেন, আর ঐ বাড়ীতে মারাও গেছেন। হেলেন কিন্তু সে বাড়ীর আগের খবর কিছুই জান্‌তেন না।

এই আট বছরের শেষ সময়ে হেলেনের ভয়ানক ব্যায়রাম হয়। ডাক্তারে ব্যায়রাম বোঝে না, আশা নাই এমনি অবস্থা। তাঁর বুকের ভেতর হয়েছিল একটা ঘা। চিকিৎসক বোঝেন না, কি ঔষধ দিবেন? একদিন ডাক্তার ঘরের ভেতর এসে দেখেন, কে যেন একখানা কালো হাত বুকের ওপর বুলিয়ে দিচ্চে। মানুষটা কে, দেখা যাচ্চে না, কেবল দেখা গেল হাতখানা। ডাক্তার কিছু বুঝলেন না, কেবল অবাক হলেন; রোগ তারপর সেরে গেল।

ঈশিদো নামক একজন বুড়ো পাদ্‌রি ছিলেন, হেলেন তাঁকে কিছু কিছু শক্তির ক্রিয়া দেখান। ঈশিদো লোকটি ভাল, তিনি হেলেনকে খুব আশীর্ব্বাদ করেন, আর বলেন তোমার দ্বারা জগতের অনেক কাজ হবে।

আবার একবার ব্যায়রাম হ'ল। এ ব্যায়রাম আরও কঠিন। সব সময়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাক্‌তেন, ব্যায়রাম যে কি, কেউ বুঝত না। অনেকদিন কেটে গেল, স্থানান্তর করা হল। শেষে একদিন তাঁর মাসী দেখেন, এক ছায়ামূর্ত্তি মহাপুরুষ হেলেনের সঙ্গে কথা কইচেন। তারপর রোগ সেরে গেল। এই আট বছরে এই রকমের আরও অনেক কাণ্ড হয়, আর রুশদেশে এ-সম্বন্ধে খুব আলোচনাও হয়। অনেক লোকের মতও বদ্‌লে যায়। একবার হেলেন এক ষ্টেশন-মাষ্টারকে তার মৃত স্ত্রীর কথা বলে তাকে অবাক করে দেন।

চতুর্থ পর্ব্ব—(১৮৬৬—৭২)

হেলেন আবার বেরুলেন। প্রথমে ইতালি দেশে যান, তারপর যে কোথায় গেলেন, কি কর্লেন, কিছুই জানা যায় না। হেলেন নিজের সব কথা কাকেও বল্‌তেন না। আর এ সময়কার রোজ্‌নামচাও রাখেন নি। ১৮৬৭ হতে ১৮৭০, এই যে তিন বৎসর, একেবারে অজ্ঞাতবাস। ভাল প্রমাণে জানা গেছে, এই সময়টা তিনি তিব্বতে, তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে ছিলেন। তিব্বতে সিগা টুসি নামে এক সহর আছে, তার কাছে এক গ্রাম, নাম তার কলাপ। সেখানে এক মহাপুরুষ আছেন, নাম তাঁর মরু। তিনি আগে ছিলেন একজন রাজপুত রাজা, এখন সাধু। আর একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি এই মহাত্মা মরুর বন্ধু, তাঁর নাম কুথুমি, ইনি আগে ছিলেন একজন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। প্রথম মহাত্মাই হেলেনের গুরুদেব। ...

তিব্বত হতে এসে জাহাজে হেলেন ইউরোপ যাচ্ছেন। তখন সবে যুদ্ধ থাম হয়েছে। জাহাজে ছিল বারুদ, তাতে লেগে গেল আগুন। অনেক লোক মারা গেল, জাহাজ নষ্ট হল। হেলেন বাঁচলেন। একেবারে নিঃসম্বল, মিশরের আলেক্জান্দ্রিয়া সহরে এসে উপস্থিত হলেন।

হেলেনের উপর এখন একটা খুব বড় কাজের ভার পড়েছে। তাঁর গুরুদেব তাঁকে প্রস্তুত করে এখন এই কাজের ভার দিয়েছেন। কাজটা এই। প্রাচীন কালের শাস্ত্রগ্রন্থে যোগবিদ্যার কথা আছে, এখনকার লোকে সেটা মানে না, জানে না। সে-বিদ্যা না-মানায়, না-জানায় জগতের খুব ক্ষতি হচ্ছে। মহাত্মারা বুঝলেন—এখন এই যোগবিদ্যা প্রচার করার সময় হয়েছে। তাই হেলেনকে ভার দিলেন। গুরু বলেছেন, কর্ত্তে হবে; কি করে' হবে, তা'ত আর বলেন নি। মিশরে এসে হেলেন ভাবলেন, এইখান থেকে কাজ আরম্ভ করি। কি করে করা যায়? তখন প্রেততত্ত্ব নিয়ে দেশে দেশে খুবই আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। প্রেততত্ত্বের আলোচনা যেভাবে হয়, সেটা যে খুব ভাল তা' নয়। তাতে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই হয় বেশী। কিন্তু লোকে তা'তো জানে না। তারা ঐ সব নিয়ে আলোচনা করে। হেলেন সেই প্রেততাত্ত্বিকদের সঙ্গে মিশে কাজ করার চেষ্টা কর্লেন। হেলেন ভাবলেন, এই সব লোক যারা প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কর্চ্চে, এরা অলৌকিক ব্যাপার, জড়াতীত শক্তির খেলা দেখচে, আর সেই সব নিয়ে আলোচনা কর্চ্চে। আলোচনা কর্চ্চে বটে কিন্তু, ভেতরের রহস্য ঠিক্‌তো ধর্ত্তে পার্চ্চে না। ব্যাপারগুলো হচ্ছে, তারা দেখ্‌চে, কিন্তু কি করে' কি হচ্ছে সেটা তারা কেউ জানে না। হেলেন ভাবলেন, এদের যদি সব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে এরা সাধনার পথে আস্‌বে, ক্রমশঃ এদের চিত্ত শুদ্ধ হবে, এরা যোগী হবে, আর সব বুঝ্‌তে পার্ব্বে। এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু, এরা তো সত্যান্বেষী নয়, এরা ব্যবসাদার, অনেকে জুয়াচোর, আবার অহঙ্কারও আছে। কাজেই এদের দলে মেশাতে হিতে বিপরীত হ'ল। হেলেনের সাংসারিক জ্ঞান খুবই কমই ছিল, ছিলনা বল্লেই হয়। নিজে যেমন সরল, কেবল সত্যই খুঁজ্‌তেন, মনে কর্ত্তেন পৃথিবীর আর সব লোকও বুঝি তেমনি সরল, তারাও সত্য খোঁজে। মিশরে আসল কাজ কিছুই হল না। কেবল দুএকজন ভাল লোক হেলেনের শক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁদের মন্তব্য পাওয়া গেছে। এইখানে 'কুলম্' বলে একটা লোক, আর তার স্ত্রীর সঙ্গে হেলেনের আলাপ হয়। এরা বড় গরিব ছিল। হেলেন তাদের অনেক উপকার করেন। শেষে অনেকদিন পরে এরা হেলেনের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে অত্যন্ত ভয়ানক। সে কথা পরে জানা যাবে।

মিশরে কাজ হল না। হেলেন চলে গেলেন ওডেসা; আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাৎ হল। এখন, কেবল ভাবনা হচ্ছে, গুরুদেবের কাজ কি ক'রে করা যায়? অলৌকিক

আনা যায় কি করে', সিদ্ধগুরুর দেখা পাওয়ার জন্য লোককে চেষ্টান্বিত করা যায় কি করে', এই হ'ল তাঁর চিন্তা। দেশে থাকা হ'ল না। হেলেন এলেন প্যারীসহর (১৮৭৩) দুমাস সেখানে ছিলেন। গুরুদেবের আদেশ এল, আমেরিকা যাও, হেলেন চল্লেন আমেরিকা। জাহাজ ঘাটে জাহাজে উঠ্‌বেন, দেখেন এক গরিব মেয়ে, তার ছোট ছেলে নিয়ে বসে বসে কাঁদ্‌চে। ব্যাপার কি! সে মেয়েটি যাবে ঐ জাহাজে আমেরিকা, এক জুয়াচোরে তাকে এক জাল টিকিট বিক্রি করেচে। সে টিকিট চল্‌বে না, আবার যে নূতন টিকিট কিন্‌বে সে পয়সাও তার নাই। তাই সে মেয়েটি বিদেশে নিরুপায় হ'য়ে মনের দুঃখে কাঁদ্‌চে। হেলেন জাহাজের কর্ত্তাদের সব কথা বল্লেন, তারা বল্লে উপায় নাই, নূতন টিকিট না কিন্‌লে এ-জাহাজে যাওয়া হবে না। হেলেনের কাছেও বেশী পয়সা নাই। হেলেনের নিজের প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল, সেই টিকিট খানা তিনি বেচ্‌লেন, আর দুজনের দুখানা ডেকের টিকিট কিনে, সেই গরিব মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা গেলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই হেলেন এসে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে পৌঁছলেন।

পঞ্চম পর্ব্ব—(১৮৭৩—৭৮)

হাতে পয়সা নাই। এখন হেলেন করেন ছুঁচের কাজ, একজন ইয়ুদি সে সব কেনে, তাতেই কোন রকমে গরিবানা চা'লে কষ্টেসৃষ্টে চলে। এই ইয়ুদির কাছে হেলেন, চিরকাল কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনমাস পরে হেলেনের বাপ মারা গেলেন। তিনি হেলেনের জন্য অনেকগুলি টাকা রেখে যান। সেই টাকা পেয়ে হেলেনের অবস্থা ফিরে গেল। হেলেন কখনই টাকা রাখতে জান্‌তেন না; সে শিক্ষা তাঁর আর এজীবনে হ'ল না। তাঁর দয়া ছিল বেশী, অভাব জানিয়ে কেউ চাইলেই তাকে টাকা দিতেন। জুয়াচোরেই টাকা পেত, কঠিন সংসার।

এইবার গুরুদেবের কাজ আরম্ভ হ'ল। হেলেনের শক্তির কথা অল্পে অল্পে প্রচার হচ্চে, দুএকজন করে' লোক আস্‌চে। ১৮৭৪ অব্দের প্রথমে একজন এলেন, তাঁর নাম 'জজ্‌', তিনি আয়র্লণ্ড দেশের লোক। হেলেন তাঁর মনের কথা তাঁকে বলে' দিলেন, তিনি হ'লেন একজন ভক্ত। এইভাবে অনেকে এলেন, কিন্তু সব থেকে বড় কথা, কর্ণেল অল্‌কটের সঙ্গে দেখা। এই অল্‌কট তখন মার্কিন দেশের একজন সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোক; আর তত্ত্বান্বেষী লোক; তাঁকে পেয়ে হেলেনের কাজ সিদ্ধ হ'ল।

চিতেনডাম্ গ্রামে এক কৃষকের বাড়ীতে ভূতুড়েকাণ্ড হচ্ছে। অনেক লোক সেখানে যাচ্চে, আর মরা মানুষের দেখা পাচ্চে। চারিদিকে হুলস্থুল; কর্ণেল অল্‌কটের এই সব ব্যাপারে ঝোঁক ছিল, তিনিও দেখতে গেছেন। তিনি দেখ্‌চেন, আর 'গ্র্যাফিক্‌' কাগজে ছবি পাঠাচ্চেন, বিবরণী

পাঠাচ্ছেন। আর কাগজের কি বিক্রী! কাগজ যায় ফুরিয়ে, তখন চারগুণ আটগুণ দাম দিয়ে লোকে কাগজ কেনে। কাগজে খবর পেয়ে হেলেন সেখানে গেলেন। মার্কিনদেশের লোকেরা এসব ব্যাপারের ভেতরের খবর কিছু জানে না তারা মরা মানুষের ছায়ামূর্ত্তি দেখে, মনে করে সত্যই বুঝি মরা মানুষ এসেচে। কিন্তু আসল কথা তা' নয়। যে মানুষ মরেচে, সে চলে গেছে, তার ইথরের শরীরখানা এখনও আছে, সেই শরীরটা দেখা যায়। অজ্ঞান লোকে ভাবে মানুষটাই বুঝি আসে। এই যে মরা মানুষের ছায়ামূর্ত্তি দেখা, তাতে আর এক রকমের ফাঁকি আছে। একটা লোক থাকে, তাকে বলে মাধ্যমিক। সেই মাধ্যমিকের শরীরের ইথর, বাইরে হাওয়ায় ভাসে। একজন লোক তার একজন মৃত আত্মীয়কে দেখার ইচ্ছা কর্চ্চে। সে যখন ইচ্ছা কর্চ্চে, তখন সেই আত্মীয়ের ছবি তার মনে জাগ্‌বে। এই যে মনের ছবি, এই ছবির দ্বারা ঐ ইথরে একটা অস্পষ্টমূর্ত্তি হয়ে গেল, লোকটা মনে কর্চ্চে আমার সেই মৃত আত্মীয়ই বুঝি ছায়ামূর্ত্তিতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই ফাঁকি। এই রকমের সব নকল ভূতপ্রেত নিয়ে আমেরিকাতে খুব হৈ-চৈ হচ্চে। হেলেন এসব জানেন। কিন্তু, তবু তিনি এদের সঙ্গে মিশ্‌লেন। কতকগুলো লোক প্রেততাত্ত্বিকের ব্যবসায় কর্ত্ত, তারা কিন্তু একেবারে জুয়াচুরি কর্ত্ত। তারা ধরা পড়ে গেল। লোকে তখন বল্‌তে লাগ্‌ল, এ ব্যাপার আগাগোড়াই মিথ্যা জুয়াচুরি। হেলেন সে সময়ে আর থাক্‌তে পাল্লেন না, তিনি খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে, প্রেততাত্ত্বিকদের সাহায্য কল্লেন। হেলেন ভাব্‌লেন, ব্যাপারটাতো একটা কিছু বটে, এতেও যদি লোকের মনে পরলোকের চিন্তা একটু জাগে, তা' হ'লে তারা যোগবিদ্যার আলোচনা কর্ত্তে পারে।

যাই হোক্‌ এই চিতেন্‌ডামে অল্‌কটের সঙ্গে হেলেনের পরিচয় ও বন্ধুতা। হেলেন অল্‌কট্‌কে দেখেই বুঝ্‌লেন, মার্কিন মুলুকে এই একজন মানুষের মতো মানুষ। হেলেনের সঙ্গে মিশে অল্‌কট অল্পদিনে অনেক জিনিস শিখ্‌লেন, একখানা বই লিখ্‌লেন –'পরলোকের মানুষ'। শেষে অল্‌কট্‌ হিমালয়ের মহাপুরুষেরও কৃপা পেলেন। এই সময়ে হেলেন আবার এক কাণ্ড কল্লেন। 'বিবাহ'—নামমাত্র, কিছুই নয়। এক সওদাগর তাঁর সঙ্গে ভাব করে, তাঁর সঙ্গে মিশে বলে, তুমি আমায় বিবাহ কর, নতুবা আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব—তাই এই বিবাহের অভিনয়!

এখন, অল্‌কট্‌ আর হেলেন প্রকৃত কাজে লাগ্‌লেন। ভাল ভাল পণ্ডিত লোকদের জোটাবার জন্য প্রথমে কল্লেন এক সভা, নাম তার মিরাকল ক্লাব্‌, সেটাতে কিছু হল না। তারপর এসে জুটলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম ফেল্ট্‌। মিশরদেশে যে সব তান্ত্রিক যন্ত্র আছে, সেই সব যন্ত্রের দ্বারা ভূতপ্রেত আনা যায়। ফেল্ট্‌ সাহেব এক প্রবন্ধ পড়্‌লেন, বল্লেন তিনি পরীক্ষা করে' এই সব যন্ত্রের শক্তি বুঝেচেন। এই প্রবন্ধ শুনে অনেক লোকের খুব আগ্রহ হ'ল। প্রস্তাব হ'ল, একটা সভা

করে এই সব ব্যাপারের আলোচনা করা যাক্। আচ্ছা, সভা কর। এই সভার নাম হ'ল থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটি—ব্রহ্মবিদ্যাসমিতি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর সভাপতিরূপে কর্ণেল অল্কট্ প্রথম বক্তৃতা কল্লেন, অন্যান্য ব্যবস্থা সব তার আগেই হয়েছিল।

এইবার হেলেন লিখ্তে বস্‌লেন। প্রথম বইখানার নাম নিগূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশ Isis Unveiled। অলৌকিক উপায়ে হিমালয়ের সেই গুরু মহাপুরুষের প্রেরণায় ও সাহায্যে এই বই লেখা হ'ল। বই বেরুতেই অনেক ভাল ভাল লোক আকৃষ্ট হলেন, গোটা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গেল। তারপর গুরুদেবের আদেশ এল, ভারতবর্ষে যাও। আমেরিকার সভা থাকুক। অল্কট্, হেলেন, আর দুজন সাহেব মেম রওনা হলেন। পথে পনর দিন লণ্ডনে থেকে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা বোম্বাই এলেন।

ষষ্ঠ পর্ব্ব—(১৮৭৯—৮৪)

আগেই ভারতে অনেকে সমিতির সভ্য হয়েচেন। ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতি কি, কি কর্ত্তে চান, সে কথা ভারতের অনেকেই আগে শুনেচেন, আবার হেলেনের যোগশক্তির কথা প্রচারিত হয়েচে। কাজেই ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত ও পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের খুব অভ্যর্থনা কল্লেন, কিন্তু সাহেবরা অনেকে, বিশেষতঃ পাদ্রিরা বিরুদ্ধতা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। প্রথম প্রথম পুলিশও এদের পিছনে লাগ্‌ল। তারপর ক্রমে ক্রমে সাহেবদের দু একজন লোক আকৃষ্ট হলেন। এঁদের ভেতর একজন সিনেট্ সাহেব, পাওনিয়ার্ কাগজের সম্পাদক; আর একজন হিউম্ সাহেব, বড়লাটের দপ্তরের বড় কর্ম্মচারী। আবার এই হিউম্ সাহেবই, আমাদের ভারতের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা। হিউম্ সাহেবও মহাপুরুষদের পরিচয় পেলেন।

ভারতবর্ষে একটা খুব বড় জিনিস আছে, তার নাম আর্য্যসমাজ। শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরে এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যে-সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, প্রায় সেই সময়ে ভারতবর্ষে এই সমাজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। মহাপুরুষের প্রেরণায় এই সমাজও হয়েছিল। হিন্দুধর্ম্মের আর হিন্দুসমাজের সংস্কার করা, হিন্দুজাতির আগেকার গৌরব ফিরিয়ে আনা, এই সমিতির উদ্দেশ্য। হেলেন আর অল্কট্, যখন ভারতে আসেন, তখন এই আর্য্যসমাজের সভ্যেরা তাঁদের খুবই সাহায্য করেন। কিছুদিন এই দুই সমিতি একযোগে ভারতে কাজ করেন, তারপর মতভেদ হয়, ছড়াছড়ি হয়।

ভারতবর্ষে এসে বোম্বাই-এ কেন্দ্র করে দুজনায় প্রচার কর্ত্তে বেরুলেন। এলাহাবাদ, কাণপুর,

প্রথম দেখা। স্বামিজী ইংরাজী জান্‌তেন না, দ্বিভাষীর মধ্যস্থতায় কথাবার্ত্তা হয়। তাঁদের মধ্যে বেশ ভাল রকম বোঝা-পড়া হয়নি, বলে' মনে হয়; কারণ তা' হ'লে শেষে এরকম মতভেদ হবে কেন? স্বামিজী স্বীকার করেন—হেলেনের যোগশক্তি সত্য, আর বলেন—আমাদের উদ্দেশ্য একই। সাহারানপুর হতে, মিরাট্ হ'য়ে তাঁরা বোম্বাই ফিরে আসেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর 'থিয়সফিষ্ট্' কাগজ বেরুল। এক বৎসর ভারতে কাজ করে, ১৮৮০, মে মাসে দুজনে সিংহল গেলেন।

সিংহলে পাদ্রিসাহেবদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা খুবই খারাপ, একেবারে মরে গেছে বল্লেও হয়। তাঁরা বৌদ্ধদের জাগালেন, খুব উল্লাস, উৎসাহ। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা খুব আদর কর্ল্লেন, বৌদ্ধ-সমাজে এক নূতন জীবন এল। অল্‌কট্ আর হেলেন, দুজনেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম যে সকল ধর্ম্মের সার; যারা তা' জানে না, তারা বল্লে, এরা বৌদ্ধ হয় কেন?

১৮৮০, আগষ্ট, অল্‌কট্ ও হেলেন, গেলেন শিমলা পাহাড়। পাওনিয়ার কাগজের সম্পাদক সিনেট্ সাহেব, আগেই এঁদের দলভুক্ত হয়েছিলেন, তিনিই এঁদের শিমলা পাহাড় নিয়ে গেলেন। শিমলা যাবার সময় পথে মিরাটে নেমে আবার শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করে' যান। শিমলায় হেলেন অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখালেন। লর্ড রিপন তখন বড়লাট। শিমলা হ'তে অমৃতসর, লাহোর, কাণপুর, এলাহাবাদ, কাশী। কাশীর পণ্ডিতেরা খুব সম্মান দেখালেন, অভ্যর্থনা কর্ল্লেন। অল্‌কট্ তাঁদের বল্লেন আপনারা খুব চেষ্টা করুন, যাতে সংস্কৃত শিক্ষার খুব উন্নতি হয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অল্‌কট্ আবার গেলেন সিংহল, হেলেন থাক্‌লেন বোম্বাইএ। ১৮৮২, অল্‌কট্ এলেন বাঙ্গালা। প্রথমে বহরমপুর, তারপর কলিকাতা, তারপর মান্দ্রাজ।

১৮৮২, জুলাই মাসে অল্‌কট্ আবার সিংহলে গেলেন। হেলেন বোম্বাইএ থাক্‌লেন। এই সময়ে হেলেনের আবার ব্যায়রাম হয়। অসুস্থ অবস্থায় হেলেন গেলেন শিকিম। সেখানে তাঁর গুরুদেব ও অন্যান্য মহাপুরুষের সঙ্গে হেলেনের দেখা হয়। তারপর তাঁরা মান্দ্রাজ যান, মান্দ্রাজ খুব পছন্দ হয়। আবার অল্‌কট্ বাঙ্গালায় এলেন, অনেক জায়গায় গেলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দুজনে ইউরোপ গেলেন। "নিগূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশ" বইখানি হেলেন জাহাজে যেতে যেতে ফরাসী ভাষায় তর্জ্জমা করেন। প্রথমে গেলেন প্যারি, তারপর লণ্ডন। অল্‌কট্ ভারতে ফির্‌লেন, হেলেন ইউরোপে থাক্‌লেন, কিছু কাজ সেরে পরে আস্‌বেন। এই সময়ে ভারতে পাদ্রিরা, ঐ কুলম্ আর তার স্ত্রীকে নিজেদের দলে এনে, হেলেনের বিরুদ্ধে খুব নিন্দা প্রচার করে।—৮৪

হেলেনের ওপর যে শ্রদ্ধা, তা' মোটেই কমেনি, বরং বেড়ে গেছে। ভারতের লোকেরা তাঁকে খুব সম্মান কল্লে।

১৮৮৫ অব্দে হেলেনের আবার অসুখ হল। অল্‌কট্‌ তখন ব্রহ্মদেশে। ১৮৮৫, এপ্রিল মাসে আবার ইউরোপ গেলেন। এই সময়ে তিনি 'গুপ্তবিদ্যা' বা Secret Doctrine বই লেখেন। হেলেন ভারত ছেড়ে গেলেন, কাজেই তিনি ভারতে যে যোগশক্তির কেন্দ্র করেছিলেন, সে কেন্দ্র পশ্চিমদেশে চলে গেল। কর্ণেল অল্‌কট্‌ খুব বড় দরের কর্ম্মী ছিলেন, যোগীও ছিলেন, কিন্তু হেলেনের মতো তাঁর যোগশক্তি ছিল না। ওয়ার্জবুর্গ আর অষ্টেণ্ড-এ হেলেন যখন ছিলেন, তখন এক বড় ঘরের মেয়ে এসে তাঁর সঙ্গে জুট্‌লেন, তাঁর নাম কাউণ্টেস্ ব্যাক্‌মিষ্টার। তিনি বরাবর হেলেনের সঙ্গে ছিলেন। হেলেনের শরীর খুব খারাপ, চিকিৎসাও চল্‌চে, Secret Doctrine বইও লেখা চল্‌চে। ১৮৮৭তে হেলেন এসে লণ্ডনে বস্‌লেন। প্রথম বাসা ছিল নর্‌উড্‌, তার পর ১৭ ল্যান্সডাউন্ রোড। এই শেষ জায়গায় যখন তাঁর বাসা, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে বেসান্তের মিলন হয়। ১৮৮৯ অব্দের ২১শে মে বেসান্ত ব্রহ্মবিদ্যার সমিতির সভ্য হন। মিড্‌ সাহেব প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত লোক সমিতিতে এসে পড়েন। লণ্ডন-শাখার সভাপতি ছিলেন—সিনেট্ সাহেব। তাঁর মত ছিল বড়লোকের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার কর, ক্রমে সমাজের নীচের স্তরে আপনা আপনি প্রচার হবে। হেলেন বল্‌তেন তা' নয়, গরিবদের মধ্যে বেশীরকম প্রচার কর। এই মতভেদের জন্য লণ্ডনে আর একটা নূতন শাখা হল। তার নাম হ'ল হেলেনের নামে, ব্লাভাস্কি লজ্। ম্যাবেল্ কলিন্স এসে জুট্‌লেন। তাঁর লেখা দুখানা বই খুবই ভাল। বেসান্ত যোগ দেওয়ায় খুব জোরে কাজ আরম্ভ হ'ল। এই সময়ে, হেলেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন।

কল কারখানা

(মহাত্মা গান্ধীর মত)

প্রশ্ন—আপনি ইউরোপ, আমেরিকা বা পশ্চিম দেশের সভ্যতা আমাদের দেশ হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে চাহেন। তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চাহেন, কলকারখানায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই ?

উত্তর—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার প্রাণের ব্যথা বাড়াইয়া দিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতবর্ষের 'অর্থনৈতিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থ পড়িয়া আমি কাঁদিয়াছিলাম এবং সে কথা ভাবিলে আমার মনে বড়ই দুঃখ হয়। কলকারখানার ফলেই ভারতবর্ষ গরীব হইয়া পড়িয়াছে। মানচেষ্টার যে আমাদের কত ক্ষতি করিয়াছে, তাহার সীমা নাই এবং মানচেষ্টারের জন্তই ভারতবর্ষের হস্তশিল্প নষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু মানচেষ্টারের দোষ কি ? আমরা মানচেষ্টারের কাপড় পরি বলিয়াই, মানচেষ্টার কলের কাপড় যোগায়। বাঙ্গালীদের সাহসের কথা খবরের কাগজে পড়িয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালাদেশে একটীও কাপড়ের কল পাই। এই প্রবন্ধ যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গলক্ষ্মী কল প্রভৃতি হয় নাই। সেইজন্য বাঙ্গালীরা প্রাচীন কালের হাতে-বোনা কাপড়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। কথাটা অবশ্য ষোল আনা সত্য নহে। বোম্বাইএর কলের কাপড় বাঙ্গালার টানেই চলে। বাঙ্গালীরা যদি একেবারে সব রকমের কলের কাপড় ব্যবহার করা বন্ধ করিত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত।

কলকারখানার প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইউরোপের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইংরাজও এই কল-কারখানার জন্ত নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনায় বিব্রত হইয়াছে। কলকারখানা বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান লক্ষণ; কিন্তু এই কলকারখানাকে মহাপাতকের প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও হয়।

বোম্বাইএর কলের মজুরগণ একেবারে ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। কলে যে সকল স্ত্রীলোক কাজ করে, তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। যখন কল এদেশে হয় নাই, তখন তাহারা অনাহারে থাকিত না। যদি কলকারখানা করিবার নেশা আমাদের দেশে আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে এদেশ আর পূর্ব্বের ন্যায় সুখের দেশ থাকিবে না। আমি বলি যে, ভারতে কলের বৃদ্ধি না করিয়া যদি আমরা মানচেষ্টারে টাকা পাঠাইয়া দিই এবং উহার সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করি, তাহা হইলে উহা

মন্দের ভাল। অবশ্য, আমার এই কথায় সকলে অবাক্ হইবে। মানচেষ্টারের কাপড় ব্যবহার করিয়া আমরা কেবল আমাদের অর্থ ই নষ্ট করিয়া থাকি। কিন্তু ভারতে কলকারখানা বাড়াইলে আমাদের যে সকলদিকে সর্ব্বনাশ হইবে—আমাদের নৈতিক দুর্গতিরও সীমা থাকিবে না! কল-ওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করিলেই আমার কথা যে সত্য, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাহারা কলকারখানা করিয়া ধনী হইয়াছে তাহারা, অন্য উপায়ে যাহারা ধনী হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যে ভাল লোক তাহা নহে। আমেরিকা নিবাসী মহাধনী রক্‌ফেলারের ন্যায় কোন ভারতবর্ষীয় ধনী যে ভাল লোক হইবে, একথা মনে করা ঠিক হইবে না। দরিদ্র ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ যদি অসদুপায়ে ধনবান্ হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতা লাভ বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে। আমি বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি; কিন্তু ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ধনী ব্যক্তিরাই ইংরাজ শাসনের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, কারণ বৃটিস্‌রাজ্যের স্থায়ীত্বের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। অর্থ ই লোককে অসহায় করিয়া তোলে। উহা কামিনীর ন্যায়ই অনিষ্টকারক এবং পরিত্যাজ্য। কামিনী কাঞ্চন উভয়ই বিষ। সর্পদংশন উহাদের অপেক্ষা কম বিষাক্ত, কারণ সর্প-দংশনে কেবলমাত্র দেহই বিনষ্ট হয়; কিন্তু কামিনী কাঞ্চন দ্বারা আমাদের দেহ, মন এবং আত্মা এই তিনই বিনষ্ট হয়। সুতরাং কলকারখানা দেখিয়া আমাদের সন্তুষ্ট হইবার কোনো কারণ নাই।

প্রশ্ন—তাহা হইলে আপনি কি বলেন যে কলগুলি একেবারে বন্ধ করা হউক?

উত্তর—তাহা বলা বড় কঠিন। প্রতিষ্ঠিত জিনিষকে একেবারে উচ্ছেদ করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। সেইজন্য বলি—কোন মন্দ কাজ আরম্ভ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা কল-ওয়ালাদিগকে ঘৃণা করিতে পারি না, তাঁহারা কৃপার পাত্র। তাঁহারা যে কল উঠাইয়া দিবেন, ইহা তাঁহাদিগের নিকট আশা করা যায় না। তবে আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি যে, যেন তাঁহারা আর কলের বৃদ্ধি না করেন। যদি তাঁহারা সাধু হন, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাঁহারা তাঁহাদের কল কমাইতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা লোকের বাড়ী বাড়ী সেকালের মত হাজার হাজার তাঁত বসাইয়া, সেই সব তাঁতের কাপড় লইয়া ব্যবসায় করিতে পারেন। কলওয়ালারা ইহা করুন বা না করুন, দেশের সাধারণ লোকে কলের তৈয়ারী জিনিষ ব্যবহার করা অনায়াসেই বন্ধ করিতে পারে।

প্রশ্ন—আপনি এতক্ষণ কেবল কাপড় সম্বন্ধেই বলিলেন; কিন্তু কলের তৈয়ারী অন্যান্য জিনিষও অনেক আছে। হয়, আমাদিগকে ঐ সকল জিনিষ আমদানী করিতে হয়, নতুবা উহার জন্য এদেশে কলের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

উত্তর—সত্য কথা। আমাদের পূজার ঠাকুরও জার্ম্মানীতে প্রস্তুত হয়। দেশলাই, কাঁটা বা কাচের দ্রব্যের তো কথাই নাই। আমি কেবল একটি কথা বলি—ঐ সকল জিনিস পূর্ব্বে যখন

বিদেশ হইতে আসিত না, তখন আমরা কি করিতাম ? তখন যাহা করিতাম, এখনও ঠিক্ তাহাই করিব। যতদিন আমরা বিনা কলে আল্‌পিন্ প্রস্তুত করিতে না পারি, ততদিন আমরা আল্‌পিন ব্যবহার করিব না। কাচের জিনিষের বাহ্য চাক্‌চিক্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বাড়ীতে উৎপন্ন তুলার পলিতা প্রস্তুত করিব, প্রদীপের জন্য হাতের তৈরী মাটীর সরা ব্যবহার করিব। উহাতে আমাদের চোখও বাঁচিবে, টাকাও বাঁচিবে। স্বদেশী শিল্পের সাহায্যও হইবে এবং স্বরাজও পাইব।

সকলেই যে একদিনে এইভাবে বলিবে, বা কতগুলি লোক একেবারে সবরকমের কলের জিনিষ ব্যবহার করা পরিত্যাগ করিবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য ও সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমরা প্রথমে ঠিক্ করিব—কি কি জিনিষ আমরা সহজে ছাড়িতে পারি এবং ক্রমশঃ সেই সব জিনিষ ত্যাগ করিব। অল্প সংখ্যক লোকে যাহা করে, অপরে তাহার অনুকরণ করিবে এবং এইরূপে এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিবে। নেতৃগণ যাহা করিবে, সাধারণে সানন্দে তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। এই ব্যাপার কঠিন বা জটিল নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অপরকে সঙ্গে লইতে না পারি, ততক্ষণ আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া অপেক্ষা করা উচিত নয়। যাহারা ইহা করিবে না, তাহারা ভুগিবে এবং যাহারা সত্য তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াও আচরণ করিবে না, তাহারা ভীরু বলিয়া পরিচিত হইবে।

প্রশ্ন—তাহা হইলে ট্রামগাড়ী ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে কি বলেন ?

উত্তর—এখন আর এ প্রশ্ন কেন ? এ প্রশ্ন যে অর্থহীন। যদি আমরা রেলগাড়ী না হইলে কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে ট্রামগাড়ী না হইলেও পারিব। কলকারখানা সাপের গর্ত্তের ন্যায় ; ইহাতে একটী সাপও থাকিতে পারে, হাজার সাপও থাকিতে পারে। যেখানেই কলকারখানা, সেইখানেই বড় সহর এবং যেখানেই বড় সহর, সেইখানেই ট্রামগাড়ী এবং রেলগাড়ী আছে ; আর সেইখানেই বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আছে। ইংলণ্ডের গ্রামে এই সকল জিনিষ নাই। সৎচিকিৎসক মাত্রেই বলিবেন যে, যেখানে কৃত্রিম গমনাগমনের ব্যবস্থা আছে, সেখানকার লোকের স্বাস্থ্য খারাপ। আমার স্মরণ হয়, ইউরোপের কোন গ্রামে যখন একবার অর্থের অনাটন হয়, তখন ট্রামকোম্পানী, উকিল এবং ডাক্তারদের ব্যবসা কমিয়া যায় এবং ফলে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। কলকারখানার স্বপক্ষে কোন ভাল যুক্তি আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহার অপকারিতা দেখাইয়া বড় বড় বই লেখা যায়।

প্রশ্ন—কিন্তু, ভাল মন্দ, আপনি যাহাই বলুন, ছাপাখানার আপনার কথা ছাপা হইবে। আর

উত্তর—কখন কখন বিষে বিষক্ষয় হয়, ইহা তাহারই একটা প্রমাণ। সুতরাং ইহাও কলকারখানার স্বপক্ষে সৎযুক্তি নহে। যতই ইহা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, ততই কলকারখানা যেন আমাদিগকে বলে,—"সাবধান হও এবং আমাকে পরিত্যাগ কর। আমার নিকট হইতে তোমরা কোনও উপকার পাইবে না। যাহারা কলকারখানার বাহ্যাড়ম্বরে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারাই কেবল মুদ্রাযন্ত্রের নিকট উপকার পাইবে।" সুতরাং আসল কথা ভুলিও না। কলকারখানা যে অপকারী, তাহা জানা দরকার। তাহা হইলেই আমরা উহা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে পারিব। প্রকৃতি আমাদিগকে এমন পথ দেন নাই, যাহার সাহায্যে আমরা সহসা কোন ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারি। যদি আমরা কলকারখানাকে ইষ্টরূপে না লইয়া বরং অনিষ্টরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে উহা অবশেষে আপনিই চলিয়া যাইবে।

শ্রীরাধাসুন্দর দাস

[প্রবন্ধটি মহাত্মা গান্ধির ইংরাজী রচনার অনুবাদ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা নভেম্বর তারিখের মহাত্মাজির ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে বিশ্বহিতৈষী শ্রীযুক্ত য্যানড্রুজ মহোদয়ের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটির নাম, "কলের লাঙ্গলের ব্যবহার" The Use of Tractors। উত্তর বঙ্গে বন্যার সময়, সাহায্যদাতাগণ মাটি ভাঙ্গিবার জন্য ফোর্ডের ট্র্যাক্টার ব্যবহার করিয়াছিলেন। বন্যার পরেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল, অন্য সময়ে ইহার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাও বলা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধির একজন ভক্ত শ্রীমান্ নাদকর্ণি য্যানড্রুজকে লিখিয়াছেন, বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সময়েও ঐ কল ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। যে-কলের দ্বারা মানুষের পরিশ্রম কমিয়া যায় (Labour-saving Machinery) তাহার ব্যবহার স্বভাবের বা স্বাভাবিক জীবনের যখন বিরোধী, তখন কোন অবস্থাতেই উহার ব্যবহার সঙ্গত নহে।

কথাটা ঠিক্। একবার যদি কলের ব্যবহার অনুমোদন করা যায়, তাহা হইলে কতদূর পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইবে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থল বিশেষে কলের ব্যবহার, অবশ্য যথাযোগ্য ব্যবহার, আবশ্যক বলিয়াই মনে করি। যেমন মহীশূর রাজ্যে জল তুলিবার জন্য বিদ্যুতের কলের ব্যবহার খুবই হিতকর হইয়াছে। চরকাও কল, ইহার আরও খুব উন্নতি দরকার। কলের ব্যবহার মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণের অনুকূল হউক। যেখানে মানুষের অহিত হয়, সেখানে কল থাকিবে না।

কলের ব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মত ও রবীন্দ্রনাথের মত, ইহার ভিতর কোনরূপ মৌলিক প্রভেদ নাই। প্রভেদ, কেবল পরিমাণ লইয়া। ভারতের গ্রামরক্ষা করার একমাত্র আশার স্থল চরকা।

আসিতেছে, ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডেরও এই অবস্থা হইয়াছিল। তাহারই ফলে আজ শ্রমিক-বিপ্লবের এই বিভীষিকা।

উড়িষ্যার দরিদ্র গ্রামবাসী দলে দলে কলিকাতা আসিতেছে। এই নৈতিক দুর্গতির প্রতিকার কি? উড়িষ্যা সুন্দর দেশ, তাহাকে কি করিয়া রক্ষা করা যায়? মহানদীর উপরাংশে (Upper reaches) যদি হাইড্রো-ইলেকট্রিক্ কল বসানো যায়, আর চিল্কাহ্রদের মোহনা খুলিয়া রাখার জন্য যদি শক্তিশালী বাষ্পীয় মাটিকাটা কল (Steam Dredger) বসানো যায়, তাহা হইলে উড়িষ্যার গ্রামগুলিকে এখনও রক্ষা করা যাইতে পারে।

ইহাই অ্যান্ড্রুজ সাহেবের মত। যন্ত্রবিজ্ঞানের বিপুল উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে, উহাকে একেবারে বর্জ্জন না করিয়া, খুব পরিমিতভাবে হিসাব করিয়া, বিশেষ বিশেষ স্থলে উহার সাহায্য লইতে হইবে। তিনি বলেন—

"The use of machines according to my estimation, must always be subordinated to the true welfare of humanity."

"where humanity can be shown clearly to be sacrificed to the machine, I would obviously prefer to keep the humanity and scrap the machinery."

—সম্পাদক]

মন্তব্য ও সংবাদ

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের স্বর্গারোহণ—১লা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার মুখডোবা গ্রামে ১২৫৭ সালের ৭ই পৌষ তাঁহার জন্ম হয়। ঐ গ্রাম পদ্মায় ভাঙ্গিয়া গেলে, তাঁহার পিতা ৺হলধর বিদ্যামণি মহাশয় প্রাণপুরগ্রামে বাস করেন। হিন্দু-পুনরুত্থানের প্রথম স্তরে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। হিন্দুধর্ম্মের আচার ও অনুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই তাঁহার কৃতিত্ব।

'বঙ্গবাসী' কাগজ প্রথমাবস্থায় হিন্দু-সংরক্ষণের কাজ ছিল না, পুনরুত্থান জোর ধরিলে তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসীর সহিত সংশ্লিষ্ট হন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর ভিতর হিন্দু-পুনরুত্থানের দুইটি উপকরণই ছিল—অভিজাত হিন্দুর আত্মরক্ষা ও জনসাধারণের ধর্ম্মোন্নতি। দ্বিতীয় উপকরণটিই তাঁহাতে অধিক পরিমাণে ছিল। তর্কচূড়ামণিতে প্রথম উপকরণই ছিল, দ্বিতীয়টি ছিলনা বলিলেও হয়। পরিব্রাজক মহাশয় কলঙ্কের টীকা লইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, 'বঙ্গবাসী' শেষ সময়ে তাঁহার বিপক্ষেই ছিলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের যুগ অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। গত ৩৬ বৎসর তিনি কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরেই ছিলেন। ধনী ও বদান্য অভিজাত হিন্দুর সাহায্যে তিনি সসম্মানে জীবনের শেষাংশ যাপন করিয়াছেন। তিনি যে-যুগের কর্ম্মী, হিন্দু-পুনরুত্থানের সেই যুগকে উপহাস করিয়া অনেকে "ইলেকট্রিক্ যুগ" নাম দিয়াছেন। আমরা ইহাকে আচার ও কর্ম্মকাণ্ডের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যুগ বলিতে পারি। থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির ভাল সভ্যের সঙ্গ করার সুযোগ তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিশেষরূপে পাইয়াছিলেন।

তর্কচূড়ামণি-মহাশয়ের জীবনের অনেক কথাই সাধারণের জানা নাই। সুবিখ্যাত প্রাচীন সন্ন্যাসী ভাষ্যকার, 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের ভ্রাতা যাদবানন্দের বংশধর বলিয়া তিনি নিজের পরিচয় দিতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়, "ধর্ম্মব্যাখ্যা", "সাধন-প্রদীপ", "দুর্গোৎসব-পঞ্চক বা ভক্তিসুধালহরী", "গীতার বঙ্গানুবাদ" ও "শ্রাদ্ধান্ন-বিবেক" (সংস্কৃত) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের কোন চিন্তাশীল হিন্দু তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া কোনরূপ প্রেরণা পাইবেন না—কিন্তু, হিন্দু-পুনরুত্থানের প্রথম স্তরের একটি দিকের প্রকৃষ্ট নিদর্শন-রূপে তাঁহার গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অবিসম্বাদিত এবং তাঁহার যুগে হিন্দুর আত্মরক্ষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, সেজন্য বঙ্গবাসী হিন্দু তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে চিরকালই কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিবে।—সিউড়ি ৯ই ফাল্গুন, ১৩৩৪।

হিন্দুর আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রসারণ—হিন্দু সংগঠনই এখনকার যুগধর্ম্ম। আর্য্যসমাজ হইতেই ইহার আরম্ভ। বাঙ্গালাদেশে আসিয়া এই আন্দোলনের রূপান্তর হইয়াছে। "হিন্দুমিশন" নামক পাক্ষিক পত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নের অংশগুলির সাহায্যে এই রূপান্তরের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে।

১

"বর্ত্তমান সংগঠন আন্দোলন যদি ভদ্রসমাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া শুকাইয়া মরিয়া যাইতে না দেওয়াই ইচ্ছা হয়, তবে যাহারা সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, যাহারা যুগ যুগান্তর হইতে

ঘৃণিত, অবমানিত, অবহেলিত হইয়া একেবারে মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই প্রথম কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত। নতুবা সংগঠন, কথায় পর্য্যবসিত হইবে।

এই নিম্নশ্রেণীর নিকট পৌঁছিতে হইলে, কোন বাণী দ্বারা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে হইলে, বা কোন কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ, তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সমগ্র অনুন্নতশ্রেণী, এমন কি উচ্চশ্রেণীর অনেকাংশও বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সংগঠন কার্য্য কল্পনা করা যায় না।

* * * * * *

এই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী নিদ্রিত, নিপীড়িত; জনসঙ্ঘের প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎস হইতে সঞ্জিবনী সুধা পান করাইতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়েই ইহাদের অভ্যুদয় সম্ভব হইবে। এমন কি, বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্যা ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অন্তত চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহার যথোপযুক্ত মীমাংসা করিয়াছিল।

এক ব্রহ্ম এক বেদ জীবে জীবে নাহি ভেদ
নাহি উচ্চ নাহি নীচ সবি একাকার
এ অমূল্য মহানীতি বিশ্বপ্রেমে মহাগীতি
চৈতন্য প্রভাবে ভবে হইল প্রচার।

জগৎ যখন সত্যানুসন্ধিৎসার অসীম উন্মুক্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক তার্কিকতায় সীমাবদ্ধ, কর্ম্ম যখন ব্যক্তির জন্মগত গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া স্ফূর্ত্তিহীন ও তেজহীন, প্রেম যখন আভিজাত্য অহঙ্কারে কলুষিত, স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি মানব হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম, মানুষের স্পর্শ বাঁচাইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাই যখন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত, নীচ জাতিদের ঘৃণায় অবহেলায় দূরে দূরে রাখিয়া জাতি যখন আত্মঘাতী হইবার উপক্রম—এমন সময় ঘৃণা বিদ্বেষের অগ্নিপ্রস্রবনের মধ্য হইতে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি মানবকুলের সুখ, শান্তি, মুক্তির জন্য আপনার পারিবারিক সুখ বিসর্জ্জন দিলেন, প্রিয়তমা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শোকসাগরে ভাসাইলেন, বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য নিজেকে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিলেন। তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রেম-কীর্ত্তনে বঙ্গবাসী উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল, জগৎ মুগ্ধ হইল। সেই সংকীর্ত্তনে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, বিভেদ ভুলিয়া যোগ দিলেন। খোল করতালের মধুর ঝঙ্কারে ...

আলোড়িত হইল। সাম্যভাবের বন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত হইল। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার ভাসিয়া গেল। প্রভু জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে সকলকেই আলিঙ্গন দিলেন।

"মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়,
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরস গায়.
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল,
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।"

আজ আবার সেই দিন উপস্থিত। আগামী ২২শে ফাল্গুন দোল পূর্ণিমার দিন, সেই মহাপুরুষের জন্মদিন। আসুন, আমরা মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে আবার ভেদাভেদ ভুলিয়া প্রেম-কীর্ত্তনে যোগ দিই। গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, খোল করতালের মধুর ঝঙ্কার উত্থিত হইয়া সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করুক। আমারা আবার প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিই। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার চিরতরে নিস্তব্ধ করিয়া দিই। হিন্দু আবার উঠুক, আবার জাগুক, আবার প্রাচীন গৌরব লাভ করুক।"

২

"বাংলাদেশে হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অনেক মনিষীই আজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজসংস্কারকগণ, এই ধ্বংশোন্মুখ জাতির রক্ষা কল্পে স্ব-স্ব শক্তি, সামর্থ্য ও বুদ্ধি অনুসারে নানাভাবে নানাবিধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই শুভ মুহূর্ত্তে জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে—বাংলার সাধনা, বাংলার ভাব, বাংলার বৈশিষ্ট্য ও বাংলার মর্ম্ম-কথা। তাই আমরা বাঙ্গালীকে, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতে বলি—মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের দিকে চাহিতে বলি; ৪০০ চারি শত বৎসর পূর্ব্বের সেই বিরাট হিন্দু জাগরণের দৃশ্য দেখিতে বলি—তাহার গূঢ় সত্য অনুধাবন করিতে বলি।

শুদ্ধি, সংগঠনের জন্য, বাঙ্গালীকে স্বামী দয়ানন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আদর্শের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। বাংলার ঘরের প্রেমাবতার গৌরাঙ্গই এ বিষয়ে তাহার শিক্ষক। শুদ্ধি ও সংগঠনের যে ধারা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—যে মন্ত্র, যে পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—তাহাই আজও বাঙ্গালীর পথের আলোক, জাগরণের সম্বল। তাহাই হিন্দুর আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের একমাত্র উপায়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

তাই আজ সময় আসিয়াছে—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে বুঝিবার। আমরা দেশের সমুদয় হিন্দু নরনারীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন আগামী ২২শে ফাল্গুন দোলপূর্ণিমার দিন মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপযুক্ত

সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে হিন্দুগণ ঐদিন তাঁহাদের সকল বিষয়-কর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া কীর্ত্তন, মহোৎসব, কথা ও বক্তৃতার সাহায্যে মহাপ্রভুর জন্ম ও কর্ম্মকাহিনী দেশবাসীর হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া তুলেন। সে দিন আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, দোকানপাট সব বন্ধ রাখিয়া সকল নরনারী যেন মহাপ্রভুর মহাশিক্ষার আলোচনায় দিন যাপন করেন।

এই শুভদিন হইতে যেন বাংলার এক নূতন যুগের আরম্ভ হয়, যেন প্রেমের গঙ্গা, শুদ্ধির গঙ্গা, মিলনের গঙ্গা, প্রবাহিত হয়। আর তাহাতে অবগাহন করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদে জাতি শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত হইবে।—"

এই রূপান্তর চিরদিনই আমাদের কাম্য ছিল। ইহার সহিত আর একটি জিনিস দরকার। বুদ্ধদেবকে ভারতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বৌদ্ধ বিচার Rationalism, বৌদ্ধনীতি, আর শ্রীচৈতন্যের নরলীলা (Humanity), ভাবুকতা (Mysticism), এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। ইহাদের মিলনই হিন্দুস্থানের আসন্ন ভবিষ্যতের ধর্ম্ম।

বৰ্দ্ধমান বিবরণ—বীরভূম হেতমপুরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থসাহায্যে 'বীরভূম বিবরণ' নামক পুস্তকের তিনখণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহা একটি খুব ভাল কাজ। এই কাজটি হওয়ায় মহারাজ-কুমার, ও বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রাহক ও লেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় যশস্বী হইয়াছেন।

সম্প্রতি বৰ্দ্ধমান জেলার এইরূপ ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চেষ্টা করিতেছেন। বৰ্দ্ধমানের প্রশংসনীয় সাপ্তাহিক পত্র "শক্তি"তে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল বাহির হইতেছে। তাঁহার লেখা হইতে আমরা নিম্নের সংবাদগুলি সঙ্কলন করিলাম।

১। "মন্তেশ্বর থানার অধীন কাইগ্রামে শ্রীশ্রীবরাহ গোপাল দেবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এই দেববিগ্রহ পূর্ব্বে রাইগ্রামে ছিলেন। আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের ভিতর ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের পুত্র বরাহ, এই রাইগ্রাম রাজার নিকট দান পাইয়াছিলেন। রাইগ্রামের বরাহগোপাল দেব আদিশূর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে, বঙ্গবিজয়ের পর কতকগুলি মুসলমান রাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকাযোগে যাইতেছিল। বরাহগোপাল দেবের মন্দিরের মাথায় একখানি পাথর ছিল, অস্তাচলগামী সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সেই পাথরে এমনভাবে পড়িয়াছিল, যে মুসলমানেরা সেই প্রতিবিম্বকেই সূর্য্য মনে করিয়া পূর্ব্বমুখে নমাজ পড়িয়া ফেলেন।

ব্যবস্থা করার জন্য, মন্দিরটিও ধ্বংশ করিলেন, মুল্যবান প্রস্তরখানিও লইয়া গেলেন। মন্দির আক্রান্ত হইলে সেবাইত বিগ্রহটি লইয়া কাইগ্রামে পলাইয়া যান। বর্ত্তমান সময়ে কাইগ্রামে যে-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ আছেন, সেই মন্দির ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত ;—খোদিত লিপি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। এই মন্দির যে-স্থানে অবস্থিত, ঠিক্ সেই স্থানেই পূর্ব্বে আর একটি মন্দির ছিল, উহা জীর্ণ হইলে বা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইলে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। রাইগ্রামে এখন আর হিন্দুর বাস নাই, সবই মুসলমান। বরাহগোপাল দেবের মন্দির যেখানে ছিল, সে স্থানটি সমতল ভূমি হইতে ১০।১২ হাত উচ্চ। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরাজার প্রতিষ্ঠিত হিন্দুযুগের গৌরবময় সেই অতুলনীয় দেবমন্দির এখন কালস্রোতে ভাসিয়া ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে, রাশিকৃত ইষ্টকস্তূপসমন্বিত উচ্চ ভূখণ্ডটি এখন সেই গৌরবময় অতীত যুগের সাক্ষ্য দিবার জন্তই পড়িয়া রহিয়াছে। আর আছে—কয়েকটি ভগ্ন স্তম্ভ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।"

২। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'শূরনগর' নামক স্থানে আদিশূর রাজার রাজধানী ছিল। তাঁহার গড়, গোশালা, বন্দীশালা, প্রভৃতির নিদর্শন আছে। শূরনগর এখন নানা অংশে বিভক্ত। 'শূউয়ো' নামক গ্রামটি যে স্থানে আছে, সেই স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল। রাউৎ গ্রামে আদিশূরের শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলা দেবী এখনও রহিয়াছেন। "গড় সোণাডাঙ্গা" নামক স্থানে আদিশূর রাজার গড় ও ধনাগার ছিল। সেন-বংশের রাজারা যখন নবদ্বীপ অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতেই শূরনগরের অবস্থা মলিন হইতে থাকে।

শূরনগরের বিবরণ পড়িয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আদিশূর দুইজন। একজন রাঢ়ে, আর একজন গৌড়ে রাজা ছিলেন। রাঢ়ীয়গণ রাঢ়ের শূরবংশের রাজাদের আনীত ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রগণ গৌড়ের শূররাজগণের আনীত ব্রাহ্মণ, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বিক্রমপুরের রাজা শ্যামল বর্ম্মের আনীত, শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রগণ কালোসোনার রাজা শশাঙ্কের আনীত, ত্রিপুরার বৈদিকগণ ত্রিপুরার রাজার আনীত, আসামের ব্রাহ্মণগণ আসামরাজ ভাস্কর বর্ম্মার আনীত। যিনি যখন বড় রাজা হইয়াছেন, একদল ব্রাহ্মণ আনিয়া বাঙ্গালায় নব নব ব্রাহ্মণশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩। রাজার পোতাডাঙ্গা—এই বিবরণও "শক্তি" পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। লেখক, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বর্দ্ধমান জেলায় লুপ লাইনের ভেদিয়া ষ্টেশনের ঠিক ৫ মাইল পশ্চিমে "পাণ্ডুক" নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামের উত্তর পশ্চিমে একটী উচ্চ ভূভাগ আছে। গ্রামের লোক উক্ত ভূভাগকে "রাজার পোতাডাঙ্গা" বলিয়া থাকে। এ স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল, ইহাই জনশ্রুতি। এই ভূভাগ

প্রায় লম্বায় দুই মাইল, তবে সর্ব্বত্রই উচ্চ নয়; মধ্যে মধ্যে লোকের বসবাস আছে এবং কতকাংশ ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পাণ্ডুক গ্রামের এক ক্রোশ পশ্চিমে 'খটনগর' গ্রামে, 'বারাসত' নামে এক সমতল ভূভাগ আছে; জনশ্রুতি এই যে এখানে রাজার ধর্ম্মাধিকরণ, কার্য্যালয় ও সৈন্যবাস ছিল। এই ডাঙ্গার পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং তাহা দেখিলেই মনে হয় যে এ সকল কোনও রাজার কীর্ত্তি।

রাজার পোতা ডাঙ্গার প্রায় সকল অংশই প্রাচীন ইষ্টকপূর্ণ। এগুলির আকৃতি প্রায় এক হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও দেড় ইঞ্চি পুরু। পাণ্ডুক গ্রামবাসী অনেকেই উক্ত ডাঙ্গা হইতে ইষ্টক লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ডাঙ্গার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানেই অধিক পরিমাণে ইষ্টক পাওয়া যায় এবং তথায় সজ্জিত ইষ্টকাদি দেখিলে সহজেই মনে হয় যে উক্ত স্থানে পূর্ব্বে কোনও ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল।

সন ১৩১৮ সালে অজয় নদের বন্যায় রাজার পোতার অনেক অংশ স্খলিত হয় এবং সেই সময় পাণ্ডুক গ্রামস্থ কোনও কোনও ব্যক্তি তথায় সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। বর্দ্ধমানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় একজন গ্রামবাসীর নিকট হইতে ২১৲ টাকা মূল্যে একটি সুবর্ণমুদ্রা ক্রয় করেন এবং সেটি সন ১৩২১ সালে বর্দ্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সময় প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দান করেন। মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও পরপৃষ্ঠে লক্ষ্মী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। রাখালবাবু রাজমূর্ত্তি নিম্নস্থ গুপ্তাক্ষর পাঠ করিয়া বলেন যে ইহাতে "বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্ত" এই নাম লিখিত আছে। সুরেন্দ্রবাবু উক্ত সাহিত্য সম্মিলনীতে রাজপোতা ডাঙ্গা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করেন নাই।

মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করিলে, ডাঙ্গার সর্ব্বত্রই নানা আকৃতিবিশিষ্ট বহু বর্ণের বিচিত্রিত প্রস্তরের দানা পাওয়া যায়। কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রামবাসী ঐ সকল দানা সংগ্রহ করিয়া মাল্যাকারে গলে ধারণ করিতেছেন।

রাজার পোতার পূর্ব্বদিকে এক পাষাণময়ী মূর্ত্তির নিম্নাংশ এক বৃক্ষতলে স্থাপিত আছে। ঊর্দ্ধাংশ পাণ্ডুক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বটীতে আছে। কথিত আছে যে কালাপাহাড় ঐ দেবীমূর্ত্তি দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। উক্ত দেবীমূর্ত্তি গ্রামে 'বারাহীচণ্ডী' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রতিদিন মূর্ত্তির পূজা হয় ও প্রতি বৎসর শারদীয় মহানবমীর দিন বহু ছাগ ও একটী মহিষ বলি হয়। কথিত আছে, মহানুভব বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্ "বারাহী চণ্ডীর" সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিষ্কর ভূমির উপযুক্ত সনন্দ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান মহারাজ কর্ত্তৃক দেবীর পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট ভূমি আছে।

কথিত আছে পাণ্ডুক গ্রামে পাণ্ড নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহারই নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম পাণ্ডুক হইয়াছে। পাণ্ড রাজার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তবে বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের নাম পাওয়া যায়। ইনি মগধের গুপ্ত রাজ বংশের সপ্তম রাজা ছিলেন। ৪৭০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুত্র দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত ৪৭২ খৃষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহন করেন। বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রা বাঙ্গালার অনেক স্থানেই পাওয়া গিয়াছে—ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় কালিঘাটে কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যায়, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে কতকগুলি পাওয়া যায়; এবং বীরভূম জেলায় নান্নুর গ্রামেও কতকগুলি সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ তাঁহার তাম্রশাসনাদি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। আমার মনে হয়,পাণ্ডুক গ্রামে রাজার পোতায় বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের কোনও বৃহৎ দেবালয় ছিল এবং তিনি মধ্যে মধ্যে পাণ্ডুকে আসিয়া দেবাদি দর্শন করিতেন। আমার ধারণা মূল্যহীন হইতে পারে; সেই কারণ যদি কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবিষয়ে মনোযোগ দেন এবং রাজপোতাডাঙ্গা কিছু খনন করাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্ত সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত বিষয় জানা যাইতে পারে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সাহেব মুরুব্বি—

দেশের একটি চালাক ছেলে, দেশের একজন ধর্ম্মভীরু মানুষকে ভুলাইয়া তাহার নিকট টাকা আদায় করিয়া বিলাত চলিয়া গেল। নানাদেশ ঘুরিয়া আসিল, কি সে করিল, কি যে শিখিল, তাহা দেশের লোক বোঝেও না, বুঝিতে চাহেও না। বিদেশে অনেকদিন ছিল, অতএব পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ছেলেটি মুরুব্বি হইয়া বলিতেছে, চীনের লোক জাপানের লোক ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় কৃতী হইতে পারে না, সে বিষয়ে ভারতবর্ষ খুব উন্নত। চাকুরী-পারমার্থিকের দলে কথাটা বে-পরোয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কথাটা চলিয়া গেল না। একজন বিশেষজ্ঞ তাহাকে বলিয়া দিলেন, বাবু লোক ঠকাইয়া খাও, চীন জাপানের কিছুই তুমি জান না; তাহারা ইতিহাসেরও চর্চ্চা করে, প্রত্নতত্ত্বেরও চর্চ্চা করে, কিন্তু ভারতবাসীর সঙ্গে তাহাদের কাজের তফাৎ আছে। তাহারা যাহা করে, দেশের লোকের জন্ম দেশী ভাষায় করে। আর তোমরা চাকুরীয়া ভারতবাসীরা যাহা কর, তাহা বিদেশীয়দের জন্ম, বিদেশীয় ভাষায় কর। এই প্রভেদটা আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

প্রত্নতত্ত্বের বা প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনার দ্বারা যে কোন কাজ হয় নাই, তাহা আমরা বলি নাই; তবে এই বিভাগের দেশীয় চাকুরীয়ারা নিজেদের যাহা মনে করে, বা চাকুরী প্রত্যাশীরা

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সার্ উইলিয়ম্ জোন্স কর্ত্তৃক বাঙ্গালার এসিয়াটিক্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব্বদেশীয় প্রাচীন বিদ্যার অভিনব আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় ইতিহাস একেবারে অজ্ঞাত ছিল। তাহার অনেক তথ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উইলকিন্স্, কোলব্রুক্, জোন্স্, ইঁহারা পথ-প্রদর্শক। ইংলণ্ডে প্রিন্সেপ্, ম্যাক্স্ মুলার, ফরাসীদেশে বার্নুফ্, জার্ম্মানীতে বুলার, বেবার প্রভৃতি অনেক বড় বড় পণ্ডিত বহু পরিশ্রমের ফলে বহু কার্য্যই করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনোভাব সব সময়ে বুঝিতে পারা যায় না।

ম্যাক্ডোনেল্ সাহেব খুবই পরিচিত লোক। 'ভারতের অতীত' India's Past বলিয়া সম্প্রতি তাঁহার একখানি বই বাহির হইয়াছে। ইদানীং প্রাচীন ভারতের তিনটি জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছে; ভাস কবির নাটক, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, আর সার্ জন্ মার্শাল কর্ত্তৃক পঞ্জাবের ভূগর্ভ খননের আবিষ্কার। ভাস কবির নাটক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পাওয়া যায়। সে-সম্বন্ধে বহু বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ম্যাক্ডোনেল্ বলিতেছেন, প্রমাণ যথেষ্ট নহে। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহার মত আরও ভয়ানক। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ছিলেন রাজা, আর চাণক্য ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী। চাণক্যকে এখনকার ইংরাজীনবিশেরা বলে ভারতীয় ম্যাকিয়াভেলি। ভারতের অতীতের ইতিহাসের উপকরণরূপে এই চাণক্যের লিখিত একখানি রাজনীতিক গ্রন্থের মূল্য খুবই বেশী। ম্যাক্ডোনেল্ এই গ্রন্থখানিকে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বলেন মেগেস্থিনিসের কথার সহিত মেলে না; আরও বলেন, যে-সব ঐতিহাসিক মৌর্য্যদের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা কৌটিল্য-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি বলেন—কৌটিল্য বলিয়া কোন লোকই ছিল না। উহা একটি উপাধি—not a man, but a type.

দ্রাবিড়ির জাতি-সম্বন্ধে ম্যাক্ডোনেল্ বলেন, উহারাও উত্তর-পশ্চিমের পথে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল উত্তর ভারতে ছিল, তার পর আর্য্যগণ আসিয়া উহাদের দক্ষিণে ঠেলিয়া দিয়াছে। অথর্ব্ববেদে অনেক মন্ত্র ও ইন্দ্রজাল আছে, প্রাচীন ঋক্ হইতে উহা খুবই পৃথক্; এই অথর্ব্ববেদে দ্রাবিড়ির প্রভাব বিদ্যমান। ম্যাক্ডোনেল্ সাহেবের মতের সহিত মত না মিলিলে সুবিধা হইবে না, অতএব অনেককেই চাকুরীর খাতিরে মত বদ্লাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীরাধারমণ সাধনাশ্রম—জানিপুর পোঃ শ্রীরাজপুর, নদীয়া, কর্ম্মীগণ ভিক্ষার্থী হইয়া নিম্নের আবেদনপত্র ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বথা সাহায্য করা উচিত, সহরের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় লোকে সর্ব্বদাই নানারূপ অপব্যয় করিয়া থাকেন, এই অপব্যয়িত অর্থের কিয়দংশ পাইলে, অনেক গ্রাম্য কর্ম্মী, দেশের ও দশের নানারূপ উপকার করিতে পারেন। এই আবেদন পত্রে ভিক্ষার্থীরূপে চারজন ভদ্রলোকের

নাম আছে; কিন্তু সাহায্য কাহার নিকট যাইবে, তাহার উল্লেখ নাই। যাহা হউক, আশ্রম যখন হইয়াছে, তখন আশ্রমের নামেই পাঠাইলে হইতে পারে। আশা করি, আশ্রমটি স্থায়ী হইবে। যে-মহাপুরুষের আদেশে আশ্রম হইয়াছে, আশ্রম স্থায়ী না হইলে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন, সুতরাং তাঁহারা প্রাণপনে চেষ্টা করুন। "ভরসা রাখিস্, হইবেই হবে। যদি পণ করে থাকিস্ সে পণ তোমার রবেই রবে। হবেই হবে।"

"নদীয়া জেলার অন্তর্গত খোক্‌সা রেল ষ্টেসন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে পুণ্যতোয়া গৌরী নদীর তীরদেশে "জাবন্‌বা" নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে আমাদের অখণ্ডধ্যানের বস্তু পরমাদ্ভুত আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীমৎ রাধারমণ সরস্বতী বিদ্যাভূষণ মহোদয় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অলৌকিক ও অভূতপূর্ব্ব সমন্বয়স্থাপনকারিণী ও জগৎ কল্যাণবিধায়িনী সাধনাদ্বারা এবং পূজ্যপাদ সত্যদ্রষ্টা ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ প্রচারদ্বারা দেশবাসীর প্রাণে নবীন আলোক প্রদান পূর্ব্বক নিস্তেজ মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ করিয়া মহৎ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনার ফলস্বরূপ "সাধক" নামক সঙ্গীত গ্রন্থ ও অনেকগুলি অপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। গৌরী নদী ও হাওড় নামক ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গমস্থলে পবিত্র শ্মশানক্ষেত্রে তাঁহার সাধনার স্থান অবস্থিত আছে। তিনি উহার সন্নিহিত স্থানে কয়েক বিঘা জমি লইয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠানপূর্ব্বক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং দুঃস্থ পীড়িতদের চিকিৎসার্থ একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিবার আদেশ তাঁহার কতিপয় দীন শিষ্যের প্রতি প্রদান করিয়া বিগত ১৩৩১ সালের শুভ মাকরী সপ্তমী তিথিতে মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। এক্ষণে, তাঁহার শিষ্যগণ আমরা, তাঁহার সেই লোককল্যাণকর আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য এবং এতদ্দেশে তাঁহার অভিলষিত কর্ম্মের অভাব ও আবশ্যকতা বোধ করিয়া অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপদেশানুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্মশানক্ষেত্রের নিকটে কয়েক বিঘা জমি সংগ্রহ পূর্ব্বক সেখানে যথাসম্ভব গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে, উহার পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য ভিক্ষাপাত্রহস্তে আপনাদের দ্বারদেশে উপস্থিত। হে ধর্ম্মপ্রাণ দেশভক্ত মহানুভবগণ,—এই মহানুষ্ঠানে লোকহিতার্থ আপনারা যথাশক্তি অর্থসাহায্য করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।"

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৮—১২

চৈত্র, ১৩৩৪

বেদান্ত ও লীলাবাদ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

ভাগবতধর্ম্ম

প্রথম ভাগ

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন
প্রণীত

মূল্য এক টাকা মাত্র

সিউড়ী পোঃ—বীরভূম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার, এই গ্রন্থে ১১টী প্রবন্ধে, ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মের নিতাত্ব, ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুবক্তা ও সুলেখক। আলোচ্য বিষয়েও তিনি যথেস্ট অন্তর্দৃষ্টি ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাঁহার যথেস্ট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকার যে প্রণালীতে ভাগবতধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যে ভক্তগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে যে ভাবে এই আলোচনা করিলে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যগণের নিকট বিষয়টী প্রীতিপ্রদ হয়, গ্রন্থকার তাহা জানেন। সুতরাং, গ্রন্থখানি এই সম্প্রদায়েরও প্রিয় হইবে। আমরা ইহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি

—হিতবাদী ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

বেদান্ত ও লীলাবাদ

বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবত। বেদকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ভারতে কালে কালে যত প্রকারের দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার সমুদয়গুলিরই আলোচনা আছে। এই সমুদয় মতের ভিতর লীলাবাদই শ্রেষ্ঠ। এই লীলাবাদে আসিয়াই অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ, পরিণতি ও সাফল্য লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই লীলাবাদ আশ্রয় করিয়াই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদিগকে ধীরভাবে এই লীলাবাদের আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের যে-কয়েকটি স্থান বিশেষরূপে আলোচ্য, তাহার মধ্যে প্রকাশানন্দের সহিত বিচার অন্যতম। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, কাশীক্ষেত্রে যিনি সর্ব্বপ্রধান বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ছিলেন, সেই প্রকাশানন্দও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম ছিল প্রকাশানন্দ; সেই নাম বদ্‌লাইয়া তিনি নাম লইলেন—প্রবোধানন্দ। প্রকাশ ও প্রবোধ, এই দুইটি কথার ভিতরেই সমুদয় রহস্য লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে-কথার আলোচনা হইবে পরে। প্রথমে আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এই দুইখানি প্রামাণিক মহাগ্রন্থে প্রকাশানন্দের মত-পরিবর্ত্তনের কথা, যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতেছি।

১। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে প্রকাশানন্দের কথা

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে বড়ই ভালবাসিতেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে নদীয়া-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখে আমরা দুইবার প্রকাশানন্দের কথা শুনিতে পাই।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থে এই দুইটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের তৃতীয় ও বিংশ অধ্যায়ে প্রকাশানন্দের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। দুইটি প্রসঙ্গই একরূপ। উভয়স্থানেই মুরারিগুপ্ত শ্রোতা। মুরারিগুপ্তের সহিত প্রকাশানন্দের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে। সে-আলোচনাও পরে হইবে। এখন প্রসঙ্গ দুইটি দেখা যাউক।

ক

শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর একদিন শ্রীভগবানের বরাহ-লীলার শ্লোক শুনিয়া বরাহভাবে আবিষ্ট। গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের বাড়ীতে উপস্থিত। মুরারিগুপ্ত সসম্ভ্রমে মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা করিলেন। ভাবাবেশে 'শূকর, শূকর' বলিতে বলিতে মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের বিষ্ণুমন্দিরে উপস্থিত। মন্দিরের ভিতরে একটি জলপূর্ণ গাড়ু ছিল, দন্তের দ্বারা সেই গাড়ুটি তুলিয়া মহাপ্রভু যজ্ঞ-বরাহ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন. মুরারি-গুপ্ত সেই সময়ে তাঁহার চারিখানি ক্ষুর দেখিতে পাইলেন। এই অবস্থায় মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে আদেশ করিলেন, "মুরারি, আমার স্তব পাঠ কর। আমি তোমাকে অভয় দিলাম। তুমি এতদিন বুঝিতে পার নাই, আমি এইখানে রহিয়াছি।" মুরারিগুপ্ত কাঁপিতে কাঁপিতে স্তব পাঠ করিলেন। মুরারি গুপ্ত বলিলেন—"তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই—বেদ তোমার সমুদয় তত্ত্ব জানে না।"

মুরারি গুপ্তের বাক্যে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন ও বেদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বেদ আমায় বিড়ম্বিত করিয়াছে; বলিয়াছে আমার হাত, পা, মুখ, চোখ নাই। বেটা প্রকাশানন্দ কাশীতে পড়ায়, সে আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে। সে বেদের ব্যাখ্যা করে, আমার বিগ্রহ মানে না; তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু সে জানে না, আমার অঙ্গ পবিত্র ও সর্ব্বযজ্ঞময়; ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি আমার সেই অঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করেন। আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলে লোকে পুণ্য হয়, পবিত্র হয়। বেটা প্রকাশানন্দের কি সাহস, আমার সেই বিগ্রহকে মিথ্যা বলে!"

হস্ত পাদ মুখ মোর নাহিক লোচন। বেদ মোরে এই মত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥

সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র। অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥

২।

মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চর্চ্চিত তাম্বূল খাইয়া আবিষ্ট হইয়াছেন। মহাপ্রভু কৌতুক করিয়া মুরারিকে বলিলেন,—'মুরারি, হাত ধোও'। মুরারি হাত না ধুইয়া মাথায় হাত মুছিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভুরও 'ঈশ্বর-আবেশ' হইল। সেই আবেশে মহাপ্রভু বলিতেছেন—"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ কাশীতে থাকে। সে বেশ ভাল করিয়া আমাকে খণ্ড খণ্ড করে। বেদান্ত পড়ায়, আর বিগ্রহ মানে না। তাহার শরীরে আমি কুষ্ঠব্যাধি দিয়াছি। তবুও তাহার বোধ হইল না। আমার অঙ্গে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বসতি, আর প্রকাশানন্দ সাহস করিয়া বলে আমার অঙ্গ মিথ্যা! মুরারি, সত্য বল; তুমি আমার দাস; আমার অঙ্গ যে না মানে, সে নষ্ট হইবে। ব্রহ্মা, শিব পরমানন্দে আমার বিগ্রহের সেবা করিতেছেন, সমুদয় দেবতা প্রাণের বস্তু করিয়া তাহার পূজা করিতেছেন, সেই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সকলে পুণ্য ও পবিত্র হইতেছে। প্রকাশানন্দ কোন্ সাহসে বলে, সেই বিগ্রহ মিথ্যা! মুরারি, তোমার নিকট আমি এই সত্য প্রকাশ করিতেছি। আমি সত্য, আমার দাস সত্য, আমার দাসের দাস সত্য, আমার লীলাকর্ম্ম সত্য, আমার স্থান সত্য। প্রকাশানন্দ এই সকলকে মিথ্যা বলিয়া আমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। আমার যশঃ শ্রবণে আদি অবিদ্যার বিনাশ হয়। পাপী অধ্যাপক সেই বিলাসকে মিথ্যা বলে। আমার লীলা-শ্রবণের আনন্দে বিহ্বল হইয়া মহাদেব দিগম্বর, মহীধর অনন্ত সেই লীলা গান করেন। শুক নারদ প্রভৃতি তাহাতেই মত্ত, চারি বেদই আমার সেই মহিমা কীর্ত্তন করে, সেই পুণ্যকীর্ত্তিতে যাহার অনাদর সে আমার অবতার-তত্ত্ব জানে না।"

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পড়ায়ে বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে। কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তভু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥

অঙ্গ ভবানন্দ মাঝে বিগ্রহ যে সেবে। যে বিগ্রহ প্রাণ ভরি পুজে সর্ব্বদেবে ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে ॥
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ। সত্য মুঞি, সত্য মোর দাস, তার দাস ॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান। ইহা মিথ্যা বোলে মোরে করে খান খান ॥
যে-যশ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ। পাপী অধ্যাপকে বোলে মিথ্যা সে বিলাস ॥
যে-যশ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর। যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর ॥
যে-যশ-শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত। চারিবেদে বাখানে যে-যশের মহত্ত্ব ॥
হেন পুণ্য-কীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার। সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥

২। তত্ত্ব-ব্যাখ্যা

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভাষা অতিশয় সরল হইলেও অর্থ বড়ই গভীর। যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মমত সমূহের ইতিহাস জানা আবশ্যক। আমরা কোনরূপ জটিল বিতণ্ডার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পূর্ব্বের কথাগুলির সার মর্ম্ম নিবেদন করিতেছি। আমি মানুষ, আমার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া দুইটি জিনিস বা বস্তু রহিয়াছে,—বাহিরে বিশ্বসংসার, প্রতিক্ষণ অনুভূয়মান; আর ভিতরে ঈশ্বর, যিনি একদিকে নিখিল কল্যাণগুণময়, আর একদিকে যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যের উৎস। এই তিনটিতে কারবার চলিতেছে। একদল লোক বলিত এই বিশ্বসংসার মিথ্যা, স্বপ্নবৎ, ইন্দ্রজালবৎ, রজ্জুসর্পবৎ, শুক্তিরজতবৎ, মরুমরীচিকাবৎ; তাহারা সন্ন্যাসী সাজিয়া গৃহস্থের মাথায় পা চাপাইয়া আরামে দিন যাপন করিত। আর একদল গৃহস্থ, পণ্ডিত হইয়াও ঐ সন্ন্যাসীদিগেরই অনুগত, তাহারা প্রচার করিত—সংসার মিথ্যা, ঈশ্বরও মিথ্যা, জীবও মিথ্যা। বড়ই ভয়ানক কথা। শ্রুতিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা রহিয়াছে, সূত্রেও তাহার বিচার আছে, ইতিহাস পুরাণে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। যাহা মিথ্যা বা অ-বস্তু, তাহার সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের বর্ণনায় ঋষিগণের এত আগ্রহ কেন? সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম বা ভগবান্ এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি নিত্যই একরূপ, তাহা অপরিনামিনী,

তিনিই বিশ্বের উপাদান কারণ। জগৎ, ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের শক্তি-বিশেষ। চন্দ্রের যেমন জ্যোৎস্না, অগ্নির যেমন ছটা, ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রস্থ বা কূটস্থ ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের প্রসারিণী শক্তিই এই জগৎ। অতএব, ধর্ম্মের নামে তোমরা কোথায় যাইতেছ? ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মশক্তি সত্য; জগৎ সেই ব্রহ্মশক্তিরই পরিণাম, অতএব উহাও সত্য। এই মূল কথাটি বুঝিলে, বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীভগবানের বিগ্রহ, ধাম, পরিকর ও অবতার সত্য। এ-সম্বন্ধে দার্শনিকেরা অনেক বিচার করিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে উদ্ধৃত অংশ দুইটি সুবোধ্য ও সরল কবিতায় লিখিত হইলেও উহার ভিতরে যে সুগভীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, সেইটুকু জানাইবার জন্য আমরা সংক্ষেপে এইটুকু আলোচনা করিলাম।

৩। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রকাশানন্দের কথা

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু দুইবার কাশী গিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবারেই কিছুদিন করিয়া কাশীতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন বর্ণিত হইয়াছে। সেই বর্ণনা এইরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছেন, মধ্যপথে কাশী। তিনি কাশীতে রহিলেন, মায়াবাদিগণ তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। নিন্দার কারণ, মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়াও নাচ গান করেন, বেদান্ত-পাঠ করেন না, সঙ্কীর্ত্তন করেন। সন্ন্যাসীরা চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন, লোকটি মূর্খ; সন্ন্যাসী হইয়াছে, কিন্তু জানে না সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কি! সন্ন্যাসীদের এই সব নিন্দার কথা মহাপ্রভুরও কাণে পৌঁছায়, তিনি কেবল মনে মনে হাসেন। এ-যাত্রায় তিনি কাশীতে কিছু না করিয়া মথুরা চলিয়া গেলেন।

এই যাত্রায় মহাপ্রভু দশদিন কাশীতে ছিলেন, তাহাও ইচ্ছা করিয়া নহে, দুইজন পুরাতন ভক্তের একান্ত অনুরোধে, বাধ্য হইয়া। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এই সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই স্থানেই তাহা সংযোজিত করিলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। মধ্যাহ্নকালে মহাপ্রভু কাশী আসিয়া

মণিকর্ণিকায় স্নান করিতেছেন। মহাপ্রভুর একজন ভক্ত, তাঁহার নাম তপন মিশ্র; তিনি মহাপ্রভুরই আদেশে দেশ ছাড়িয়া এখন কাশীবাসী। তপন মিশ্রও ঠিক্ সেই সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে, দৈবের ঘটনা! মহাপ্রভুকে দেখিয়া তপন মিশ্রের বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা নাই। চন্দ্রশেখর নামক একজন বৈদ্যজাতীয় ভদ্রলোক মহাপ্রভুর ভক্ত, তিনিও কাশীবাসী। তাঁহারও আনন্দের সীমা নাই। মহাপ্রভু তপন মিশ্রের গৃহে রহিলেন।

চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—প্রভু, আমাদের প্রারব্ধের ফলে আমরা কাশীবাসী। কি বলিব, মায়া আর ব্রহ্ম-ছাড়া এখানে অন্য কথা নাই। এখানে কেবল দর্শন-শাস্ত্রেরই বিচার চলিতেছে। মিশ্র-মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে কৃষ্ণকথা শুনান; আমরা দুইজনে এখানে বসিয়া কেবল আপনারই চরণ-চিন্তা করিতেছি।

এই সময়ে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন, তিনি মহাপ্রভুর নিকট যাতায়াত করেন, আর তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত ও আনন্দিত। লোকের মুখে মুখে মহাপ্রভুর কথা কাশীধামে কিছু কিছু প্রচারিত হইল। অনেকে দেখিয়া গেলেন, কেহ কেহ আসিয়া নিমন্ত্রণ করেন। মহাপ্রভু কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। সন্ন্যাসীদের সহিত পাছে দেখা হয় এই ভয়েই তিনি এ-যাত্রায় নিমন্ত্রণ লইলেন না।

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের বহু শিষ্য, তিনি বেদান্তের অধ্যাপক। একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি একদিন প্রকাশানন্দের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—শ্রীপাদ, জগন্নাথ হইতে সম্প্রতি এখানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও প্রভাব বর্ণনাতীত; প্রকাণ্ড শরীর, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, কমল নয়ন। তাঁহার দেহে ঈশ্বরের যাবতীয় লক্ষণ বিদ্যমান। তাঁহার সকলই অদ্ভুত। মনে হয়, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাঁহাকে যিনিই দেখেন, তিনিই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে মহা ভাগবতের যে-সব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাতে সেই সব লক্ষণ অতিশয় উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত। জিহ্বায় সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম, চক্ষুদুটিতে গঙ্গাধারার ন্যায় প্রেমাশ্রু, কখন নাচেন, কখন হাসেন, কখন কাঁদেন। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

প্রকাশানন্দ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন, ও উপহাস করিয়া বলিলেন

শুনিয়াছি, এই গৌড়দেশীয় সন্ন্যাসী একজন ভাবুক, কেশব ভারতীর শিষ্য ; এ ব্যক্তি প্রতারক। এ ব্যক্তি ভাবুক লইয়া দেশে দেশে নাচিয়া ও গান করিয়া বেড়ায়। এ ব্যক্তি মোহন-বিদ্যা জানে, যে তাহাকে দেখে, সেই মুগ্ধ হইয়া বলে—ইনিই ঈশ্বর। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত পাগল হইয়াছে। এ ব্যক্তি নামমাত্র সন্ন্যাসী, আসলে একজন বড় দরের ঐন্দ্রজালিক। কিন্তু কাশীতে তাহার ভাবকালী বিকাইবে না। বেদান্ত শ্রবণ কর, তাহার নিকট যাইও না, এই সব উচ্ছৃঙ্খল লোকের নিকট গেলে ইহলোক পরলোক দুইই নষ্ট হইবে।

প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিয়া উঠিয়া গেলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের মন শুদ্ধ হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর নিকট সমুদয় ব্যাপার জানাইয়া একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ তিনবার আপনার নাম উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু তিনবারই চৈতন্য বলিলেন, 'কৃষ্ণ' তাঁহার মুখে বাহির হইল না।

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। ব্রহ্ম, চৈতন্য, আত্মা—এই কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে নিজ বশ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥
এহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে। আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে। মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্মুখে॥

তাহার পর মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন,—ভাবকালী বেচিতে কাশীপুরে আসিয়াছি। গ্রাহক না পাই, বিক্রয় না হয়, ঘরে লইয়া যাইব। কিন্তু, বোঝা যে ভারি, কেমন করিয়া লইয়া যাইব? অতএব অল্প স্বল্প মূল্য যাহা পাই, তাহাতেই বিক্রয় করিব।

মথুরা হইতে ফিরিবার সময় মহাপ্রভু আবার কাশী আসিলেন। চন্দ্রশেখরের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি পুঁথিলেখা প্রভৃতি সামান্য কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। সে-যুগে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী বৈদ্যের বাড়ীতেও থাকিতেন না। মহাপ্রভু সব সময়ে প্রচলিত লোকাচার মানিয়া চলিতেন না, তিনি নিজে যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহাই করিতেন। তপন মিশ্র মহাপ্রভুর আর একজন ভক্ত, মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে আহারাদি করিতেন।

ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থেরা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিতেন, সন্ন্যাসীরা গৃহস্থ বাড়ীতে আহার করিতেন। মহাপ্রভুকেও সন্ন্যাসী বলিয়া অনেকে নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু তিনি একেবারেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে থাকিতে থাকিতেই, রাজমন্ত্রী সনাতন সংসার ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভু দুইমাস সনাতন গোস্বামীকে নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাবতীয় কথা সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন।

কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বেরই মত নিন্দা করিতেছে। চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত। এই সব নিন্দার কথা তাঁহারাও শোনেন, শুনিয়া কষ্ট পান। এই নিন্দা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা দুইজন একদিন মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া বলিলেন,—'প্রভু, তোমার নিন্দা আর শুনিতে পারি না, কাণ ফাটিয়া যাইতেছে, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি ইহার প্রতিকার করুন।' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলেন। ঠিক্ এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত, তিনি মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতেছেন—'প্রভু, আমাকে কৃপা করুন। আমি জানি, আপনি কাহারও বাড়ী যান না, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। কিন্তু, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে, আমার বাড়ী যাইতে হইবে। আমি কাশীর সমুদর সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনাকে যাইতেই হইবে।' মহাপ্রভু এই পরিচিত ও অনুগত ব্রাহ্মণ ভক্তের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

আসিয়াছেন, মূল্যবান্ আসনে সভা করিয়া বসিয়া আছেন। মহাপ্রভু যথারীতি সন্ন্যাসী-সভায় নমস্কার করিয়া অতীব বিনীতভাবে চরণ ধৌত করার জায়গায় গেলেন এবং পদ ধৌত করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। এই স্থানে বসিয়া মহাপ্রভু কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসীরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন,—কি মূর্ত্তি, মহা তেজোময় শরীর, যেন কোটি সূর্য্যাভাস! সন্ন্যাসীদের মন আকৃষ্ট হইল, তাঁহারা সকলেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি, তিনি সম্মান করিয়া মহাপ্রভুকে বলিতেছেন,—"একি, একি, আপনি ওখানে বসিয়া কেন? শ্রীপাদ এখানে আসুন, সভায় আসুন, আমাদের কাছে আসুন, আপনি অপবিত্র স্থানে বসিলেন কেন?" মহাপ্রভু বলিলেন—"আমি হীন সম্প্রদায়ের লোক, আমি আপনাদের সভায় বসিবার যোগ্য নই।" প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর কথার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তিনি নিজে আসিয়া হাতে ধরিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া লইয়া গেলেন ও সভায় বসাইলেন। এইবার মহাপ্রভুর সহিত প্রকাশানন্দের কথোপকথন।

প্রকাশানন্দ বলিতেছেন—আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য, আপনি ধন্য। আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, আপনি এই গ্রামে রহিয়াছেন, আপনি আমাদের সহিত দেখা করেন না কেন? আবার শুনি, আপনি নাচ গান করেন, ভাবুকদের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করেন। আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, বেদান্ত পাঠ করিবেন, ধ্যান করিবেন; তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভাবুকের কাজ করেন কেন? আপনার প্রভাব দেখিয়া বুঝিতেছি, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তবে হীনাচার করেন কেন?

মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন—আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলি সত্য। আমি অত্যন্ত মূর্খ, তাই আমার গুরু আমাকে বলিলেন, তুমি মূর্খ, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর, এই মন্ত্রই সার। কৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসার মোচন হইবে, কৃষ্ণ নাম হইতে কৃষ্ণের চরণ পাইবে। নাম বিনা কলিকালে অন্য ধর্ম্ম নাই, শাস্ত্রের মর্ম্ম, নামই সকল মন্ত্রের সার, এই বলিয়া গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক শিখাইলেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

আর বলিয়া দিলেন, এই শ্লোকটি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিয়া বিচার করিও। গুরুদেবের আজ্ঞায় আমি সর্ব্বদাই নাম লইয়া থাকি, নাম লইতে লইতে আমার মন ভ্রান্ত হইল,

---

* বৃহন্নারদীয় পুরাণের সুবিখ্যাত শ্লোক। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার ১৭শ পরিচ্ছেদে, এই শ্লোকের নিম্নরূপ অর্থ ও সাধন দেওয়া হইয়াছে।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ। জ্ঞানযোগ কর্ম্মতপ আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার। নাই, নাই, নাই, তিন, তিন 'এব'কার ॥
তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম। আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব। তাড়নে ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিব ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব। অযাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব ॥
সদা নাম লৈব যথা-লাভেতে সন্তোষ। এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক। নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥

উদ্ধৃত অংশের শেষভাগে নামের সাধন-সম্বন্ধে যে কয়েকটি সারবান্ অমূল্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ঠিক্ সেইগুলিই পুনরায় অন্ত্যলীলার বিংশ ররিচ্ছেদে পাওয়া যায়।

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥
যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজায়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥
উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
কাটিলেহ তরু যথা কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যে যাহা মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হইয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়। শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥

ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না, উন্মত্ত হইলাম, কখন হাসি, কখন কাঁদি, কখন নাচি, কখন গান করি। যখন একটু ধীর হইলাম, তখন বিচার করিয়া বুঝিলাম, কৃষ্ণনামে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়াছে, ধৈর্য্য নাই, আমি পাগল হইয়াছি। গুরুদেবের চরণে সকল কথা নিবেদন করিলাম ; তাঁহাকে বলিলাম—"গোঁসাই, আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, মন্ত্রের কি বল, জপিতে জপিতে আমি যে পাগল হইলাম। তোমার মন্ত্র আমাকে কখন হাসায়, কখন নাচায়, আবার কখন কাঁদায়।" গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের ইহাই স্বভাব, এই মন্ত্র যে জপ করে তাহার কৃষ্ণে ভাব জন্মায়। এই ভাবই প্রেম ; কৃষ্ণ এই প্রেমের বিষয়। এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ ; ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,—এই চারিটি পুরুষার্থ তাহার নিকট তৃণতুল্য। সকল শাস্ত্রেই এই কথা আছে। কৃষ্ণনামের ফলই প্রেম। তোমার পরম সৌভাগ্য, তাই প্রেমের উদয় হইয়াছে। প্রেমের স্বভাবে চিত্তের ও দেহের ক্ষোভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তির জন্য লোভ হয়। প্রেমের স্বভাবেই ভক্ত হাসে, কাঁদে, গান করে, উন্মত্ত হইয়া নাচে, এখানে সেখানে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, স্বেদ হয়, কম্প হয় ; রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদগদ, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য —এই সব অবস্থা হইয়া থাকে। প্রেম, এই ভাবেই ভক্তগণকে নাচায় এবং কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসাইয়া থাকে। ভালই হইয়াছে, তুমি পরম পুরুষার্থ পাইয়াছ, তোমার এই প্রেমলাভে আমিও কৃতার্থ হইলাম। এখন আর তুমি কি করিবে? নাচো, গাও, ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন কর, কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়া সকল জীবকে উদ্ধার কর। এই বলিয়া গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক শিখাইলেন, আর বার বার বলিয়া দিলেন এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের সার।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥*

---

* নিমিরাজার যজ্ঞসভায় ঋষভদেবের পুত্র পরমার্থনিরূপক কবি এই শ্লোকটি প্রথম বলিয়াছিলেন। তাহার পর দেবর্ষি নারদ বসুদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আছে। পূর্ব্বের শ্লোকসহ ইহার অনুবাদ এইরূপ। চক্রপাণি শ্রীভগবানের মঙ্গলবার জন্ম, কর্ম্মকথা ও নাম শুনিয়া এবং তাহা গান

গুরুদেবের এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আমি সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকি, আমি আপন ইচ্ছায় কিছুই করি না, নাচিও না গানও করি না, কৃষ্ণনামেই আমাকে নাচায় ও গান করায়। কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধুর আস্বাদন হয়, ব্রহ্মানন্দ তাহার তুলনায় জোনাকি পোকার ন্যায় নিতান্তই তুচ্ছ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখের এই সব মিষ্ট কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীদিগের চিত্ত ফিরিয়া গেল। তাঁহারা বলিলেন,—আপনার কথা সবই সত্য, যাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। আপনার কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া আমরা সকলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু, আপনি বেদান্ত শোনেন না কেন? বেদান্তের দোষ কি?

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি দুঃখিত না হন, তাহা হইলে কিছু নিবেদন করি।

সন্ন্যাসীরা বলিলেন—আপনাকে আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ মনে করিতেছি, আপনার কথায় কান জুড়াইতেছে, আপনার মাধুর্য্যে নয়ন জুড়াইতেছে, আপনার প্রভাবে আমাদের মন আনন্দিত, আপনার বাক্য কখনই অসঙ্গত হইবে না।

মহাপ্রভু বলিলেন—বেদান্তের সূত্রগুলি ঈশ্বরের বাক্য। শ্রীনারায়ণ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহা বলিয়াছেন। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব, এই সব দোষ ঈশ্বরের বাক্যে নাই। উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্র যাহা বলেন তাহা অতীব মহৎ, তাহার মুখ্যবৃত্তি বা স্পষ্টার্থই লইতে হইবে। শঙ্করাচার্য্য গৌণবৃত্তির সাহায্যে যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা শুনিলে সমুদয় কার্য্য নষ্ট হয়। আচার্য্যের ইহাতে দোষ নাই। তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া মুখ্যার্থ গোপন করিয়াছেন। ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ ভগবান্, তিনি চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। তাঁহার উপরেও কেহ নাই তাঁহার সমানও কেহ নাই। তাঁহার বিভূতি ও দেহ সবই চিদাকার। তাঁহার এই চিন্ময় বিভূতি গোপন করিয়া

করিয়া নিস্পৃহহৃদয়ে ও নির্লজ্জভাবে বিচরণ করিবে। "এইরূপে নিজের প্রিয় নাম কীর্ত্তনের দ্বারা অনুরাগ জন্মিবে, চিত্ত বিগলিত হইবে। তখন ভক্ত উচ্চে হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন চীৎকার করেন, গান করেন ও নৃত্য করেন। বাহিরের কে কি বলিবে, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য থাকে না।"

তাঁহাকে নিরাকার বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম বা ভগবান্, তাঁহার স্থান, তাঁহার পরিবার, সকলই চিদানন্দ। আচার্য্য বলিয়াছেন, এই সমুদয় প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার। আচার্য্যের দোষ নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞায় তিনি ইহা করিয়াছেন। যে-ব্যক্তি ইহা শুনে তাহার সর্ব্বনাশ হয়। বিষ্ণুর দেহকে প্রাকৃত বলা অপেক্ষা বিষ্ণুর আর বেশী নিন্দা কি হইতে পারে? ঈশ্বর জ্বলিত অগ্নি, আর জীব তাহার স্ফুলিঙ্গের কণা। কৃষ্ণ শক্তিমান্, আর জীব তাঁহার শক্তি ; গীতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার প্রমাণ আছে। আচার্য্য এই জীবতত্ত্বকে পরতত্ত্ব করিয়া ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মহত্ব গোপন করিয়াছেন। ব্যাসসূত্রে পরিণাম-বাদই প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরিণামবাদই সত্য। "পরিণামবাদ সত্য হইলে ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়েন" এই আপত্তি তুলিয়া আচার্য্য ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন এবং বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা করিয়াছেন। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্ত্তবাদের ভিত্তি। শ্রীভগবান অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত, তিনি ইচ্ছায় জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য, জগৎরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়াও তিনি অবিকারী। প্রাকৃত জগতে চিন্তামণির উদাহরণের দ্বারাই ইহা বুঝা যায়। চিন্তামণি হইতে নানাবিধ রত্নরাশি হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তামণি তাহার স্বরূপে অবিকৃত অবস্থাতেই থাকে। চিন্তামণি প্রাকৃত বস্তু, তাহাতেই যদি এইরূপ শক্তি থাকিতে পারে, তাহা হইলে অচিন্ত্য শক্তিময় ঈশ্বরের এই কার্য্যে বিস্মিত হওয়ায় কারণ কি? প্রণবই মহাকাব্য এবং বেদের নিদান। আচার্য্য তাহা গোপন করিয়া 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যকে মহাকাব্য বলিয়া স্থাপনা করিয়াছেন। সমুদয় বেদসূত্রে শ্রীকৃষ্ণের অভিধান আছে, কিন্তু আচার্য্য মুখ্যবৃত্তি ছাড়িয়া লক্ষণার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে বেদসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদ স্বতঃ প্রমাণ ও প্রমাণের শিরোমণি, লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলে স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। প্রত্যেক সূত্রেরই সহজ অর্থ ছাড়িয়া কল্পনার সাহায্যে গৌণার্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।" মহাপ্রভু এই প্রকারে প্রত্যেক সূত্রেরই আচার্য্যকৃত অর্থের দোষ দেখাইলেন। সন্ন্যাসীরা চমৎকৃত হইয়া বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য ; তাহাতে কোনরূপ বিবাদ নাই। আমরাও জানি আচার্য্যের অর্থ কল্পিত, কিন্তু সম্প্রদায়ের অনুরোধে তাহা মানিয়া চলিতেছি।

এইবার সন্ন্যাসীরা মুখ্যার্থের দ্বারা বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য শ্রীমন্মহা-

অর্থ বৃহদ্বস্তু, তিনি শ্রীভগবান্। তিনি ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এবং তিনি পরতত্ত্বধাম। তাঁহার ঐশ্বর্য্য মায়িক নহে, ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বরূপেরই অন্তর্গত। সমুদয় বেদের সম্বন্ধ সেই ভগবান্। তাঁহাকে যদি নির্ব্বিশেষ বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহার চিচ্ছক্তি অস্বীকার করা হয়। এই প্রকারে স্বরূপের অর্দ্ধেক অস্বীকার করিলে পূর্ণতার হানি হইয়া থাকে। এই ভগবান্‌কে পাইতে হইলে শ্রবণাদি ভক্তির পথ আশ্রয় করিতে হইবে। এই সব উপায়ই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়। ইহার নাম অভিধেয়। সকল বেদেরই এই মত। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেমের উদ্গম হয়। কৃষ্ণের চরণে অনুরাগ হইলে কৃষ্ণব্যতীত অন্যস্থানে কোনরূপ বাসনা থাকে না। প্রেমই মহাধন ও পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রেমের দ্বারাই কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের আস্বাদন হইয়া থাকে। প্রেমের জন্যই কৃষ্ণ ভক্তের বশ, প্রেমের দ্বারাই কৃষ্ণের সেবাসুখরস পাওয়া যায়। বেদান্তের সমুদয় সূত্রেই এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন কথিত হইয়াছে।

সূত্র-সমুহের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্ন্যাসীরা বিনীতভাবে বলিলেন— আপনি বেদময় মূর্ত্তি, আপনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ, পূর্ব্বে আপনার নিন্দা করিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন। সন্ন্যাসীগণের মন ফিরিয়া গেল, তাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সকলকে ক্ষমা করিয়া মহাপ্রভু প্রসন্নচিত্তে কৃষ্ণনাম দিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দ উদ্ধারের কথা পুনর্ব্বার বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সব কথা বলা হইয়াছে, এখানেও ঠিক্ সেই সব কথাই আছে। দু একটি নূতন কথা যাহা আছে, তাহাই আমরা বলিতেছি।

প্রকাশানন্দের একজন শিষ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত ও উপদেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া প্রকাশানন্দকে বলিলেন — শ্রীচৈতন্য গোঁসাই যাহা বলেন, তাহাই ঠিক্, তাঁহার মতই সার।

প্রকাশানন্দ ইহার উত্তরে বলিলেন—আচার্য্য শঙ্করের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ; তিনি অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি অন্য রীতিতে সূত্র-সমূহের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবত্তা স্বীকার করিলে অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা হয় না, কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্যান্য মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে। যিনি নিজের একটি বিশিষ্ট মত স্থাপনা করিতে চাহেন, তাঁহার নিকট কখনই শাস্ত্রের সহজ অর্থ পাওয়া

যায় না। মীমাংসক বলেন—ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ, সাংখ্য বলেন—প্রকৃতি জগতের কারণ, ন্যায় বলেন—পরমাণু হইতে বিশ্ব হইয়াছে. মায়াবাদী বলেন—নির্বিবশেষ ব্রহ্মই হেতু; পাতঞ্জল বলেন—ঈশ্বর স্বরূপ-জ্ঞান; বেদ বলেন—তিনি স্বয়ং ভগবান্। ছয় জনের ছয় প্রকার মত। ব্যাসদেব সমুদয় মতেরই আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রে এই সব আলোচনা আছে। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার, তিনি নির্গুণ নহেন তিনি সগুণ। ঈশ্বরই পরম কারণ, কিন্তু সকলে তাহা মানে না। প্রত্যেকেই অপরের মত খণ্ডন করিয়া নিজের মত স্থাপনা করিতেছেন। কাজেই ষড়্‌দর্শন হইতে তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। অতএব, মহাজনের কথাই সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার। তেঁহো যে কহেন বস্তু সেই তত্ত্ব সার।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এই সব কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। মহাপ্রভু তখন পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শনে চলিয়াছেন। তিনি সব কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না, কেবলমাত্র ঈষৎ হাসিলেন। বিন্দুমাধবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট, অঙ্গনে আসিয়া নাচিতেছেন। চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপনমিশ্র ও সনাতন, এই চারিজন তাঁহার সঙ্গে। সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে—

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

অনেক লোক জমিয়াছে, সকলেই হরিধ্বনি করিতেছেন। প্রকাশানন্দও শিষ্য-বৃন্দসহ তথায় উপস্থিত। তাঁহারাও হরিধ্বনি করিতেছেন।

ক্রমশঃ প্রকাশানন্দের দেহে কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, হর্ষ, দৈন্য ও চাপল্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবসকলের উদয় হইতে লাগিল। মহাপ্রভু স্বয়ং ভাব সম্বরণ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। সঙ্কীর্ত্তন থামিলে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণে ধরিলেন। মহাপ্রভু বলেন—একি, আপনি জগদ্‌গুরু, আমি আপনার শিষ্যের শিষ্য। প্রকাশানন্দ বলেন,—আপনি নারায়ণ। মহাপ্রভু বলেন—বিষ্ণু, বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব।

এইবার প্রকাশানন্দ বলিলেন—আপনি মায়াবাদের যে-সব দোষ বলিয়াছেন, আমরা তাহা জানি এবং আরও জানি যে আচার্য্যের অর্থ কল্পিত। আপনি বেদান্তসূত্রের যে মুখ্যার্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি ঈশ্বর, আপনি সর্বব-

মহাপ্রভু বলিলেন—আমি জীব, আমার জ্ঞান অতিশয় তুচ্ছ। ব্যাসসূত্রের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর। ব্যাস ভগবান্, কোন জীবই তাঁহার সূত্রের অর্থ জানে না। এইজন্য তিনি নিজেই নিজের সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়াই লোকে তাহা বুঝিতে পারে। প্রণবের যাহা অর্থ, গায়ত্রীরও ঠিক্ তাহাই অর্থ। চতুঃশ্লোকী ভাগবতেও ঠিক্ সেই অর্থই বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বর স্বয়ং ব্রহ্মাকে এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলিয়াছেন। ব্রহ্মা তাহা নারদকে উপদেশ করেন। সেই অর্থ নারদ ব্যাসকে বলেন। নারদের নিকট সেই অর্থ পাইয়া ব্যাসদেব বিচার করিলেন, ইহাই আমার সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা। এই কারণে ব্যাসদেব সূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। চারিবেদে ও উপনিষদে যাহা আছে, ব্যাসদেবের সূত্রেও ঠিক্ তাহাই আছে, ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতেও ঠিক্ তাহাই আছে অতএব শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের ও উপনিষদের, একই অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, চতুঃশ্লোকীতে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। চতুঃশ্লোকীতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ভগবান্‌ই সম্বন্ধতত্ত্ব, আমার জ্ঞানবিজ্ঞান অর্থাৎ আমাকে পাইবার জন্য যে সাধন-ভক্তি তাহাই অভিধেয়; আর সাধনের ফল যে প্রেম, তাহাই প্রয়োজন; সেই প্রেমই শ্রীভগবানের সেবন এবং জীব সেই প্রেম লাভ করে।

চতুঃশ্লোকী ও অন্যান্য শ্লোক প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য।

৪। বেদান্তসূত্রের চারিটি ভাষ্য

পরিণামবাদ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা যে অতিশয় সঙ্গত সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের উপরেই মানবের প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা, তাহাতে সন্দেহ করিবার অনুমাত্রও কারণ নাই। বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি সূত্রের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের কৃত ভাষ্যের আলোচনা করিলে এ-সম্বন্ধে আর কখনও কোনরূপ সন্দেহ হইবে না। ১ম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ২৬শ সূত্রটি প্রথমে আলোচনা করা যাউক। সূত্রটি এই—

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ

সম্প্রদায় বৈদান্তিক এই সূত্রটিকে দুইটি সূত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। শঙ্করভাষ্যে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাকে দুইটি সূত্রই বলা হউক, আর একটি সূত্রই বলা হউক, অর্থের ব্যতিক্রম হইবে না। সূত্রের অর্থ এতই পরিস্কার যে আচার্য্য শঙ্করও পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

ক। রামানুজাচার্য্যের ভাষ্য

'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি সিসৃক্ষুত্বেন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি সৃষ্টেঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রতীয়তে, ইত্যাত্মন এব বহুত্বকরণাৎ তস্যৈব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ প্রতীয়তে। অবিভক্তনামরূপ আত্মা কর্ত্তা, স এব বিভক্তনামরূপঃ কার্য্যম্, ইতি কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োর্ন বিরোধঃ। স্বয়মেবাত্মনং তথা অকুরুতেতি নিমিত্তমুপাদানঞ্চ॥

"তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব" তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দবল্লীতে এই শ্রুতি আছে। তিনি সৃষ্টির জন্য ইচ্ছুক হইয়া নিজেই নিজেকে বহুরূপ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রতীত হইতেছে। নিজেকে নিজেই যখন বহু করিলেন, তখন তিনিই নিমিত্ত, আবার তিনিই উপাদান। আত্মা যখন 'অবিভক্ত-নাম-রূপ' তখন তিনি কর্ত্তা, আর যখন এই নামরূপ বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন তিনি কার্য্য। সুতরাং, সেই একেরই কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বে কোন বিরোধ নাই। 'আপনিই আপনাকে সেইরূপ করিলেন' অতএব তিনিই নিমিত্ত, তিনিই উপাদান।

খ। নিম্বার্কভাষ্য

ব্রহ্মৈব নিমিত্তউপাদানঞ্চ। কুতঃ? "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মকৃতেঃ। ননু কর্ত্তুঃ কতঃ কৃতিবিষয়ত্বম্? পরিণামাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপণ জগদাকারঃ স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি।

ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান। শ্রুতি বলেন, তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কর্ত্তাই আবার কর্ম্ম হইলেন কিরূপে? উত্তর, 'পরিণামাৎ',—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বশক্তি বিক্ষেপপূর্ব্বক নিজেকেই জগদাকারে পরিণমিত করেন, আবার অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

গ। গোবিন্দভাষ্য

সোঽকাময়তেতি সৃষ্টিকামত্বেন প্রকৃতঃ পরমাত্মৈব তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি সৃষ্টেঃ কর্ত্তৃভূতঃ

কর্ম্মভূতশ্চ শ্রূয়তে অতস্তস্যৈব তত্তদুভয়রূপত্বং। ননু কথমেকস্যৈব পূর্ব্বসিদ্ধস্য কর্ত্তৃতয়া স্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং। তত্রাহ, পরিণামাদিতি। কূটস্থস্যাস্যবিরোধিপরিণামবিশেষসম্ভবাদবিরুদ্ধং তস্য তৎ। ইদমত্র তত্ত্বং। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি শ্রুতেস্ত্রিশক্তি ব্রহ্ম।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্য নিমিত্তত্ব-মুপাদানত্বং চাভিধীয়তে। তত্রাদ্যং পরাখ্যশক্তি মদ্রূপেণ। দ্বিতীয়ন্তু, তদন্যশক্তিদ্বয়দ্বারৈব। সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ। য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদিত্যাদি শ্রবণাচ্চ। এবঞ্চ নিমিত্তং কূটস্থমুপাদানং তু পরিণামীতি সূক্ষ্ম প্রকৃতিকং কর্ত্তৃস্থূলপ্রকৃতিকং কর্ম্ম। ইত্যেকস্যৈব তত্তচ্চ সিদ্ধং মৃৎপিণ্ডাদিদৃষ্টান্তশ্রবণাৎ। পরিণামাদিতি সূত্রাক্ষরাচ্চ। ভ্রান্ত্যধ্যাস-পর্য্যায়োঽতাত্ত্বিকান্যথাভাবাত্মা বিবর্ত্তঃ পরিহৃতঃ। ন চ শুক্ত্যাদিবদ্ ব্রহ্মণ্যধ্যাসঃ সম্ভবতি। তদ্বত্তস্য পুরোনিহিতত্বাভাবাৎ। ন চাকাশবত্তত্র সঃ তদ্বত্তস্য গম্যত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ। অন্যথাভাবোঽন্যথাভানমেব। তচ্চ না বৃত্তিমন্তরেণ এবমপি কচিত্তদুক্তির্বিরাগয়ৈবেতি তত্ত্ববিদঃ। ইতরথা সম্ভবেৎ আবৃত্তিস্ত ব্রহ্মেতরত্বাদ্বিবর্ত্তান্তঃপতেদিত্যনবস্থৈব। তন্মাত্রভূতাদীনাং ন্যূনতাতিরেকো বা শ্রূয়ন্তে ভ্রান্তেরনিয়তস্বভাবানাং বস্তূনাং ভাব বিনিময়শ্চ দৃশ্যতে তস্মাত্তাত্ত্বিকান্যথাভাবাত্মা পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ।

বেদে আছে, 'তিনি কামনা করিলেন' ইত্যাদি। সৃষ্টিকামনাযুক্ত পরমাত্মাই তখন নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পরমাত্মাই সৃষ্টির কর্ত্তৃভূত ও কর্ম্মভূত। অতএব এই উভয়রূপ তাঁহারই। তিনি এক, পূর্ব্বসিদ্ধ ও কর্ত্তৃরূপে স্থিত, তাঁহার ক্রিয়মাণত্ব কিরূপে হইবে? উত্তর,—পরিণাম-বশতঃ। তিনি কূটস্থ, তাঁহাতে অবিরোধি পরিণাম বিশেষের সম্ভবনা আছে, সুতরাং বিরোধ কোথায়? শ্রুতিতে আছে, ইঁহার শক্তি বিবিধ, পরা, ক্ষেত্রজ্ঞ পতি, গুণেশ। অতএব ব্রহ্মের তিন শক্তি। স্মৃতিতে আছে, বিষ্ণুশক্তি পরা, অপরার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা, তৃতীয় শক্তির নাম—অবিদ্যা ও কর্ম্ম। অতএব তাঁহার নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব অভিহিত হইয়াছে। পরাশক্তির দ্বারা নিমিত্ত, আর অন্য দুই শক্তির দ্বারা উপাদান। বিধি এই,—বিশেষণযুক্ত বস্তুতে বিধি ও নিষেধ প্রযুক্ত হইবে। শ্রুতি আছে, তিনি এক ও অবর্ণ, কিন্তু শক্তিদ্বারা বহুরূপ। এই কারণে, নিমিত্ত, কূটস্থ, উপাদান, পরিণামী, সূক্ষ্মপ্রকৃতিক কর্ত্তা, স্থূলপ্রকৃতিক কর্ম্ম, এইগুলি

বুঝিতে পারা যাইতেছে। ভ্রান্তির দ্বারা ব্রহ্মে বিশ্বের অধ্যাস বা প্রতীতিমাত্র হয়,—এই যে মত, ইহার নাম 'বিবর্ত্ত'। এই মত অতাত্ত্বিক ও অসম্ভব, কারণ ইহাতে অভাবকে হেতু করা হইতেছে। শুক্তিতে যেমন রৌপ্যের জ্ঞান হয়, ব্রহ্মে সেইরূপ অধ্যাস অসম্ভব। শুক্তির ন্যায় ব্রহ্মের পুরোনিহিতত্ব নাই। আকাশে যেমন অধ্যাস হয়, সেরূপও অসম্ভব। আকাশের ন্যায় তিনি গম্য নহেন। ভাবান্তর না হইলে, প্রতীতির পরিবর্ত্তন হয় না। আবৃত্তি-ব্যতীত তাহা হয় না। [ইহার অর্থ মূলে ব্রহ্মশক্তি না থাকিলে, বিশ্ব আছে এরূপ মনে হইবে কি করিয়া?] বিবর্ত্তের কথা কোন কোন স্থানে আছে, কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ঐ সব কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম-ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন বিবর্ত্তের অন্তঃপাতী আবৃত্তি কি? অর্থাৎ, তাহার মূলে যে কিছুই নাই! ইহাতে অনবস্থা-দোষ হইল। ভ্রান্তিই যদি বিশ্বের মূল হয়, তাহা হইলে তন্মাত্র ও ভূতাদির ন্যূনতাও অতিরেক হইত, অর্থাৎ, তাহাদের ভিতরে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের শাসন থাকিত না, কারণ ভ্রান্তি নিয়মবদ্ধ হয় না। তাহা হইলে, নিয়তস্বভাব বস্তুসমূহের সর্ব্বদাই ভাববিনিময় হইত; কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং, পরিণামবাদই শাস্ত্রসঙ্গত।

ঘ। শঙ্কর ভাষ্য

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম। যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়ঃ "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মানত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম্? পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মানা পরিনাময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিযুপলব্ধম্। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে।

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি—তাহা প্রতিপন্ন হইল। ইহার অন্য কারণ এই। ব্রহ্ম-প্রক্রিয়ায় শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তিনি আত্মাকে স্বয়ং করিলেন"। ইহাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব দেখা যাইতেছে। 'আত্মাকে' ইহাতে কর্ম্মত্ব, আর 'স্বয়ং করিলেন' ইহাতে কর্ত্তৃত্ব। যিনি পূর্ব্বসিদ্ধ, সৎস্বরূপ, ও কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত, তাঁহার আবার ক্রিয়মাণত্ব সাধিত হয় কি করিয়া? তাই বলিলেন—"পরিণামাৎ"। পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও আত্মা বিশেষরূপ বিকারাত্মা দ্বারা আপনাকে পরিণামিত করেন। বিকারাত্মক পরিণাম মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রকৃতিতে

উপলব্ধ হয়। 'স্বয়ম্' এই বিশেষণটির দ্বারা বুঝা যায়, অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা করেন না।

পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই ভাষ্যে বুঝিতে পারা যায়, তিনি ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব সুস্পষ্টরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। চারিটি ভাষ্য উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইল। সূত্রের মুখ্যার্থ বা স্পষ্টার্থের সাহায্যেই এই পরিণামবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং, সূত্রকার ব্যাসদেবের ইহাই মত। বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে এই তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্ট করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই সব দার্শনিক আলোচনা কিরূপ গভীর ও যুক্তিযুক্ত এবং এই আলোচনায় প্রামাণিক আচার্য্যগণের ভাষ্যসমূহ কিরূপ নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ব্রহ্ম বিশ্বাতীত, বিশ্বানুগ, জগতের বাহিরে তাঁহার স্বরূপ আছে ; কিন্তু, জগৎও উপেক্ষণীয় নহে, জগৎ তাঁহার রূপ, যজ্ঞই প্রকৃত জগৎ, এই যজ্ঞের মধ্যেই দেখা যায়—জগৎ তাঁহার রূপ। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া, অন্যত্র তাহা অস্বীকার করিয়াছেন, পণ্ডিতগণের তাহা আলোচনা করা উচিত। বেদান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ১৪শ সূত্রে আচার্য্যের এই প্রত্যাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় ; সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

এই পরিণামবাদ স্বীকার করিলে, মানুষের ধর্ম্মজীবন কিরূপ হইবে, এইবার তাহারই আলোচনা করা যাউক।

৫। পৌরাণিকের স্বীকৃত বিষয়

প্রাচীন ভারতে অসংখ্য বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত ও তত্ত্ববিৎ সিদ্ধপুরুষ জন্মিয়াছেন। তাঁহারা কেবল ভারতের নহে, সমগ্র মানব-জাতির চির-নমস্য। এই সব তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পুরাণ-সমূহকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই, বৈদিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সর্ব্বদাই পুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা নিজেদের পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, অথবা লোকে যাঁহাদের পণ্ডিত বলে, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই, পুরাণের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করেন। ইহার কারণ কি, বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধেরই

আপাততঃ ইহাই বলিতে চাই, যে আমরা আমাদের প্রাচীন চিত্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি, অতীতের অবদান-পরম্পরার দ্বারা গঠিত সেই চিত্তের সহজ ও স্বাভাবিক অনুভবের মধ্যে, পুরাণের রহস্য-দ্বার উদঘাটিত করিবার যে চাবি ছিল, ঐ চিত্তের সহিত সেই চাবিটিও হারাইয়া গিয়াছে। আমরা আবার সে চাবি না পাইতেও পারি। যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও পুরাণ নষ্ট হইবে না। ভারতের সাধনা ও সভ্যতা যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে পুরাণও থাকিবে ; তবে এমন হইতে পারে, নব বেদব্যাস আসিয়া পুরাণকে অবার অভিনব মূর্ত্তিদান করিয়া পুনরায় উজ্জীবিত করিতে পারেন।

পরিণামবাদ-নামক দার্শনিক মত, যাহা আলোচিত হইল, তাহার সহিত বেদোক্ত পুরুষবাদের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এই দুইটি মতের দ্বারাই পৌরাণিক লীলাবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরাণের কয়েকটি প্রাথমিক স্বীকৃত বিষয় সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। এই কয়টি কথাই এই বেদপন্থী প্রাচীন সমাজের ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিস্বরূপ। পরিণাম-বাদ হইতে এই কথা কয়টি স্বতঃই সিদ্ধ হয়।

(ক) এই বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার ভিতর হইতে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। দেবতা, ঋষি, মনু, মনুপুত্র প্রভৃতি মিথ্যারূপক-মাত্র নহে ; তাঁহার সূক্ষ্মদেহে বিদ্যমান থাকিয়া নিজেদের শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা, বিশ্বনাথের আদেশ পালন করিতেছেন।

(খ) ভগবৎ শক্তি অবতার-রূপে জগতের কার্য্যসাধনের জন্য প্রকট হইয়া থাকেন। এই শক্তিকে প্রকট করার জন্য রীতিমত ব্যবস্থা আছে।

(গ) সত্যের ও ন্যায়ের জয় হইবেই হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই "নারায়ণ নিদ্রাগত নয়, রে দানব, নারায়ণ নিদ্রাগত নয়। চক্রে তাঁর হয়নি ভোঁতা, গদার তাঁর হয়নি শক্তিক্ষয়। নারায়ণ নিদ্রাগত নয়॥" আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না, এবং বুঝিতে না পারায় কষ্ট পাই। কিন্তু চরম ও পরম সত্য, এই বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা সত্যের, ন্যায়ের ও প্রেমের বিজয়ের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বনাথের ব্যস্ততা নাই, কিন্তু আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি ; সেই জন্যই আমাদের দুঃখ।

(ঘ) ভিতর হইতে বিশ্বের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কি প্রকারে হইতেছে, আমরা তাহা জানিনা ও বুঝি না বলিয়াই ব্যস্তভাবে বাহিরের সংস্কার অন্বেষণ করি। কিন্তু তাহাতে

দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাহিরের সংস্কার চাই—কিন্তু এই হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সহায়ক-রূপে।

(ঙ) এই বিশ্বলীলায় বিশ্বনাথ আমাকে যখন পাঠাইয়াছেন, তখন তিনি আমার নিকট কিছু চাহেন। তিনি কি চাহেন, আমাকে প্রতিদিন নিয়মিত-ভাবে ও শুদ্ধচিত্তে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, তিনি কি চাহেন। বিশ্বনাথ সত্যকাম ও সর্ব্বকাম; তাঁহার কামনা-পূরণই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। "পূরয় মধুরিপুকামং"।

(চ) আমি একটা কল্পিত 'আমির' সুখ খুঁজিতেছি, কিন্তু পাইতেছি না। জানিতে ও বুঝিতে হইবে, ইহা কখনই পাইব না। আত্মসুখান্বেষণ ছাড়িয়া কর্ত্তব্যপালনে বা প্রেমসেবায় দীক্ষিত হইতে হইবে।

(ছ) বিশ্বনাথের দাসরূপে, লীলাময়ের লীলার সহায়ক-রূপে বড় বড় ঋষি ও দেবতা, এই বিশ্বব্যবস্থা পরিচালন করিতেছেন। অসৎ হইতে সতের অভিমুখে, মৃত্যু হইতে অমৃতের অভিমুখে, অন্ধকার হইতে আলোকের অভিমুখে, অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের অভিমুখে, তাঁহারা এই বিশ্ব-ব্যাপার পরিচালনা করিতেছেন। দেব ঋষিগণের এই কার্য্য অতিশয় সত্য। মানবের ধর্ম্মসাধনার মূলে এই মহাসত্য চিরদিনই নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই কথা বলিয়াছেন। এই কথা বিজ্ঞান-সঙ্গত এবং সুনিশ্চিত সত্য।

(জ) শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী লীলাশক্তি যাবতীয় ব্যাপারের পশ্চাতে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিতেছে। এই শক্তি সকলকেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে লইয়া যাইবে। এই শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ইহার আনুগত্য কর। ভয়ের বা দুর্ভাবনার কোনই কারণ নাই। এই শক্তিই বর্ত্তমান-বিজ্ঞানের "ক্রমবিকাশ-শক্তি"। পুরাণে ইহার নাম—"পোষণ"।

(ঝ) শ্রীভগবানের এই শক্তি বা "অনুগ্রহ" [পোষণন্তদনুগ্রহঃ] আমাদের ভিতরে ও বাহিরে ক্রিয়া করিতেছে। নৌকাকে যেমন স্রোতে আনিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, আমাদের প্রত্যেককেও তেমনি সেই স্রোতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই শক্তি আমাদেরও ভিতর দিয়া জগতে ক্রিয়া করিবে। সেই ঐশীশক্তির উপযুক্ত বাহন হওয়াই জীবনের চরম সার্থকতা।

অসৎকে বাধা দিবার, ও সৎকর্ম্ম সফল করিবার অমিত ও অজেয় শক্তি মানুষ অনায়াসেই পাইতে পারে, যদি বিশ্বাসের সহিত আত্মসমর্পণ করিতে পারে।

(ঞ) পরমেশ্বরই গুরু, তিনিই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষ। তাঁহার কৃপাশক্তি, সুপ্রবল চৌম্বকশক্তির মত সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বস্থানে ক্রিয়া করিতেছে। তিনিই শ্রীবৃন্দাবনে [এবং পরে নদীয়ায়] লীলা করিয়াছেন। যেরূপে লীলা করিয়াছেন, এখনও সেই রূপে যে-কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তির নিকট তিনি প্রকট হইবেন—যদি বিশ্বাস-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হওয়া যায়।

(ট) যুগ্ম-ত্রিভুজ একটি সুপবিত্র চিহ্ন ; ইহা বিশ্বের ও বিশ্বনাথের, ত্রিগুণের ও সচ্চিদানন্দের নিত্যমিলন বা নিত্যযুগল। উপরের ত্রিভুজ চৈতন্যময় পরমপুরুষ বা সচ্চিদানন্দ, আর নীচের ত্রিভুজ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা বিশ্ব। ইহার অর্থ, বিশ্বে,—জড়ে বা প্রকৃতিতে প্রকট না হইলে, আমরা চৈতন্যের তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারি না, আবার আত্মারূপে চৈতন্যের অনুপ্রবেশ ব্যতীত জড়েরও প্রাকট্য হয় না।

৭। সঙ্কর্ষণ ও নিত্যানন্দ

পরিণাম-বাদ-প্রসঙ্গে এইবার একটি অতিশয় গূঢ় ও কঠিন কথার আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। কথাটি অনেকের নিকট খুব নূতন বলিয়া মনে হইবে। অনুরোধ, তাঁহারা যেন চিন্তা করেন। কথাটি আপাততঃ খুব সংক্ষেপেই বলা হইবে। কথাটির সহিত সাধন-রাজ্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাশয় পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াও শেষে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরিণামবাদের পরিবর্ত্তে বিবর্ত্তবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে আর একটি কার্য্য করিতে হইয়াছে,—তিনি পঞ্চরাত্র-মত বা ভাগবত মতও খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩৯ হইতে ৪২ পর্য্যন্ত, এই চারিটি সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি পঞ্চরাত্র-মত বা সাত্বতমত যে অবৈদিক, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য আবার শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়া পঞ্চরাত্র-মতই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিম্বার্ক ও বলদেব এই চারিটি সূত্রের একেবারে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পঞ্চরাত্র মতের [illegible]

চারিটি সূত্রের মোটেই অভিপ্রায় নহে, এই চারিটি সূত্রে 'শক্তিবাদ' নামক মতের আলোচনাও খণ্ডন হইয়াছে। আচার্য্যগণের মধ্যে মৌলিক ব্যাপারেই এইরূপ মতভেদ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যাহা হউক্, পঞ্চরাত্র-মতে পরিণামবাদেরই সুবিকশিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভাষ্যে এই পঞ্চরাত্র-মত এইরূপে কথিত হইয়াছে।

"পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে" ইতি হি ভাগবত প্রক্রিয়া।

পরমকারণ পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীব, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মন, তাহা হইতে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কার জন্মগ্রহণ করে; ইহাই ভাগবতদিগের সিদ্ধান্ত প্রণালী।

শঙ্কর বলেন, জীব জন্মেও না, মরেও না (ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ)। আবার বেদে আছে, পরব্রহ্ম হইতে মনের উৎপত্তি হয়। অতএব, পঞ্চরাত্র-মত বেদবিরুদ্ধ।

শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, পরব্রহ্মস্বরূপ। আশ্রিত-বৎসল পরব্রহ্ম আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয় দানের জন্য নিজেকেই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহত্রয় পরব্রহ্মের স্বেচ্ছাকৃত শরীর-স্বরূপ। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যূহত্রয় জীব, মনঃ ও অহঙ্কার নামক তিনটি তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা। জীবের যে উৎপত্তি নাই, ইহাও পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, পঞ্চরাত্র-মত অবৈদিক নহে। যাঁহারা পঞ্চরাত্র-মত কি, তাহা উত্তমরূপে জানেন না, তাঁহারাই ইহাকে অবৈদিক বলেন। ইহাই রামানুজাচার্য্যের মত।

আমাদের বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণব মত এই যে, এই সঙ্কর্ষণ বা মূলসঙ্কর্ষণই শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ। মূল-সঙ্কর্ষণ কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। রামানুজ ভাষ্যেই আছে, চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেব-ব্যতীত ষড়্‌বিধ গুণময় দেহধারী বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম আছেন।

সর্ব্বজ্ঞ তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥

যেমন মূল-বাসুদেব, ঠিক্ সেইরূপই মূল-সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী, ও শেষ, এই মূল সঙ্কর্ষণের অংশ ও কলা। ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ। আচার্য্য শঙ্কর যেমন তাঁহার শারীরক ভাষ্যে পঞ্চরাত্র-মত ও সঙ্কর্ষণাদি তত্ত্বকে উড়াইয়া দিয়াছেন, ঠিক্ সেইরূপ শ্রীচৈতন্য-লীলায় একদল লোক শ্রীনিত্যানন্দকে বুঝিতে পারেন নাই এবং অস্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার সুবিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অস্বীকার করাতেই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী কৃষ্ণদাস, মনের দুঃখে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং অচিরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করেন।

পরিণামবাদের বা লীলাবাদের আলোচনায় বা সাধনায়, এই শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক, ইহাই প্রথম প্রয়োজন। সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের তাৎপর্য্য, জীবের একটি নিত্যরূপ আছে। মহাপ্রলয়ে সেই নিত্যরূপ যাঁহার আশ্রয়ে থাকেন, তিনিই মূল-সঙ্কর্ষণ, তিনি সূক্ষ্ম বা মূল বাসুদেব হইতে অভিন্ন। জীবও আনন্দ-স্বরূপ। অতএব জীবের প্রত্যেক আনন্দের বা অনুভবের একটি নিত্যরূপ আছে। চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, কবিতায়, সঙ্গীতে বা নৃত্যকলায় জীবের আনন্দের এই নিত্যরূপকে ধরিবার একটি প্রয়াস আছে। শ্রীনিত্যানন্দই এই সমুদয় বিদ্যার অধিষ্ঠাতা ও পরিচালক। এই তত্ত্ব যাহারা জানেনা তাহারা মনে করে, ধার্ম্মিক লোকের সহিত নৃত্যগীত, কবিতা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির সম্বন্ধ নাই। সংসারের মায়ামুগ্ধ বিষয়ী বদ্ধ জীবেরা, অথবা ভোগাসক্ত বিলাসী জীবেরা এইসব ব্যাপারের অনুশীলন করে। আমরা সাধুলোক, ধার্ম্মিক লোক, পরমার্থপথের পথিক আমরা, আমাদের এই সব পার্থিব ও ইন্দ্রিয়জ ব্যাপার পরিহার করাই কর্ত্তব্য। এই সব রসহীন ও ভাবহীন, শুষ্কপ্রাণ ধার্ম্মিকেরা মুখ মলিন করিয়া বিষণ্ণ-চিত্তে বসিয়া আছে, ইহারা হাসিবে না, নাচিবে না, গাহিবে না, গলিবে না, মজিবে না, মাতিবে না। ইহাদের লইয়া মানবের বড়ই বিপদ। ইহাদের আর কি বলিব? প্রার্থনা করি, শ্রীনিত্যানন্দ ইহাদের কৃপা করুন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে ইহারা বুঝিবে--নাচিয়া গাহিয়া শ্রীভগবান্‌কে যত শীঘ্র ও যত অনায়াসে পাওয়া যায়, অন্য উপায়ে তাহা হয় না। আমরা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিলাম, সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ, নাচগান করার জন্য কেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে দোষ দিয়াছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বের মর্ম্মকথা, প্রত্যেক আনন্দের একটি নিত্যরূপ আছে। আমরা এই আনন্দের নিত্যরূপকে ধরিতে পারি না, তাই অনিরুদ্ধের হাতে পড়িয়া শোণিতপুরে বা দেহে বন্দী হইয়া থাকি। এই দেহেন্দ্রিয়ের পর মন, তাহার পর প্রকৃত জীব। ইহাই শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে এই তত্ত্ব কিভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে; আর চিত্রবিদ্যা ভাস্কর্য্য সঙ্গীত প্রভৃতির উৎপত্তিই বা কিরূপে হইল সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি—ইহা হইতে নিত্যানন্দতত্ত্বের অনুভব প্রণালী পাওয়া যাইবে। নিম্নের অংশটুকু অন্য প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল, প্রয়োজনবোধে এই স্থানে সংযোজিত হইল। ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত, ইহাকে অনেকে বাড়াইয়া লইতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের টীকার ভূমিকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—ভাগবতসম্প্রদায়ের সম্প্রবৃত্তি দুইটি বিভিন্ন সাধন-ধারার সম্মেলনের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এই দুইটি ধারা মূল ধারা। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের ও বর্ষের যে আরাধনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, কালে কালে অসংখ্য সাধন-ধারার মিলন হইয়াছে। এই অসংখ্য ধারা পরিশেষে দুইটি প্রধান বা মূল ধারা। শ্রীধর স্বামীর মতে, ইহাদের নাম 'নারায়ণী ধারা' ও 'সঙ্কর্ষণী ধারা'। নারদ, ব্যাস ও শুকদেবের মধ্য দিয়া যে-ধারা আসিয়াছে, তাহার নাম 'নারায়ণী ধারা', ইহা বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণ হইতে আসিয়াছে। আর পাতাল তলে অধিষ্ঠিত সঙ্কর্ষণ হইতে সাংখ্যায়ন, পরাশর, মৈত্রেয়, বিদুর প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে-ধারা আসিয়াছে, তাহার নাম 'সঙ্কর্ষণী ধারা'। একটি উপরে, লক্ষ্যরূপে নিজের শক্তি বিস্তার করিয়া লুব্ধ করিতেছে, আর একটি ভিতর হইতে বা পিছন হইতে ঠেলিতেছে।

এই দুইটি ধারার পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়ই ভাগবত-ধর্ম্ম ও নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম। ইহাই নদীয়া-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের মিলন। নদীয়া-লীলায় বহুভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বুঝিতে পারেন নাই, হয়ত এখনও বোঝেন নাই। কিন্তু, বুঝিতে হইবে—এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। ইহাই নরলীলার ধর্ম্ম, ইহাই যুগ ধর্ম্ম। পূর্ব্বের কথাগুলি বর্ত্তমান যুগের চিন্তার সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

কত জাতি, কত মহাজাতি, কালের সাগরবুকে তরঙ্গমালার ন্যায় জাগিয়াছে, উঠিয়াছে, নাচিয়াছে, ছুটিয়াছে, বিবিধ প্রকারের খেলা খেলিয়াছে। আজ, প্রত্যক্ষতঃ

তাহারা সকলে নাই। কাহারও কাহারও স্মৃতি আছে, তাহাদের কৃতকর্ম্মের নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহারা নাই। অনেকের স্মৃতি পর্য্যন্ত নাই! কিন্তু, যাহারা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহারা সত্য সত্য চলিয়া যায় নাই; তাহারা আছে,—ভাবরূপে আছে। কেবল যে আছে, তাহা নহে; আমাদের উপর সর্ব্বদাই প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আমাদের কথায়, কাজে, চিন্তায়, আশায়, কল্পনায়, অনুভবে ও উপভোগে, ক্রিয়া করিতেছে। তাহারা যে-গতি লাভ করিয়াছে, আমরাও একদিন সেই গতি লাভ করিব, আমরাও ভাবে পরিসমাপ্ত হইব। কিন্তু, এই সমাপ্তি মৃত্যু নহে, ধ্বংশ নহে। আজিকার ভাবজগৎ আরও প্রসারিত হইবে, আমরা তাহাতে নিত্যতা লাভ করিব। ইহাই নিত্যানন্দে অমৃতলাভ। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, কল্পের পর কল্প, ভাবজগতের পুষ্টি হইতেছে। ভব ভাবের দিকে যাইতেছে, ভাব ভবকে আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণ সঙ্কর্ষণের শক্তি।

চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতের তত্ত্ব আলোচনা করিলে এই সঙ্কর্ষণ ও নিত্যানন্দতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা এখন যেখানে বাস করি, তাহার নাম সংসার। সকলই চঞ্চল, —চলিয়া যাইতেছে, ভাসিয়া যাইতেছে, ভাঙিয়া যাইতেছে; কিছুই থাকে না। বসন্ত আসে, ফুল ফোটে, মলয় বাতাস পাগল হইয়া কুসুম সৌরভ লুণ্ঠন করিয়া বনে বনে নাচিয়া নাচিয়া, সকলকে নাচাইয়া নাচাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু, থাকে না,—চলিয়া যায়। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে একটা প্রচুরতার বন্যা আসে, কৈশোরের সুখ-স্বপ্ন আসে, যৌবনের আনন্দ-বিলাস আসে,—আসে, কিন্তু থাকে না, চলিয়া যায়। থাকে কেবল স্মৃতি, আর স্মৃতির ব্যথা। সকলই অনিত্য। চলিয়া যাওয়াই ইহাদের ধর্ম্ম, না থাকাই ইহাদের কাজ! কিন্তু, মানুষের ভিতর এমন একজন আছে, যে দেখিয়াও মানিতে চাহে না, ইহারা একেবারে চলিয়া যাইবে। অনিত্যের এই প্রবাহের ভিতর কে যেন লুকাইয়া আছে, সে যাইয়াও যায় না, চলিয়া গিয়াও থাকে। এই নিত্যের বা 'নিত্যার আদেশ' বা আকর্ষণ 'সহজ'; ইহা মানুষকে পাগল করে, বিহ্বল করে। এই বিহ্বলতা মানুষকে আর একটা চক্ষু দেয়, আর একটা দৃষ্টি দেয়, এই চক্ষু 'বিশাল', অল্প নহে,—ভূমা। এই বিহ্বলতা মানুষকে কবি করে, শিল্পী করে।

বনের একটা হরিণ নাচিতে নাচিতে আসিল, আনন্দময় স্বচ্ছন্দতার মূর্ত্তি!

সুশ্যামল পাতায় ভরা ছায়াশীতল বনের পথে আসিয়া ঢলঢল নয়নে চাহিয়া চলিয়া গেল। নিমেষের দেখা,—শুধু একবার। আর সে আসিবে না। তাহার ঐ আসা যাওয়ার ভিতর, তাহার ঐ করুণ কাতর চাউনির ভিতর কি যেন অব্যক্ত একটা কিছু লুকাইয়া ছিল। সেই অব্যক্তকে দেখিয়াছি ও দেখি নাই, বুঝিয়াছি ও বুঝি নাই। সে চলিয়া গিয়াও আছে। ভাবিয়া ভাবিয়া বিস্ময়রসে ডুবিয়া যাইতেছি। "তিলে তিলে নূতন হোয়।"

একজন অসভ্য বন্য মানুষ এক গাছের গায়ে গোটাকতক দাগ কাটিয়া ঐ হরিণের চোখদুটি, আর বাঁকা পায়ে চলাটুকু আঁকিয়া রাখিল। এই চিত্রাঙ্কণ কিছুই নহে, নিতান্ত ছেলে-খেলা। কিন্তু, যে আঁকিল সে শিশু, যাহারা দেখিল এবং বুঝিল, তাহারাও শিশু। শিশু শিশুর খেলা খেলিবে। এই দাগটি যে কাটিয়াছে, সে যখনই ঐ দাগ দেখিয়াছে, কেবল সেই হাতের কাটা দাগ দেখে নাই, ঐ দাগের ভিতর সেদিনের সেই হরিণ-শিশুকে দেখিয়াছে। যে হরিণ-শিশু আসিয়াই চলিয়া গিয়াছে, কোন অজানা অচেনা দেশ হইতে বিদ্যুৎ বিকাশসম আমার আঁধার প্রাণে নিমেষের জন্য একটা আনন্দের আলো জ্বালিয়া দিয়া আবার সেই চির-অচেনা দেশেই চলিয়া গিয়াছে, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না, যে অনন্তের কোলে হারাইয়া গিয়াছে, সে ঐ সামান্য দাগটার ভিতর বাঁধা পড়িয়াছে। ইহাই সঙ্কর্ষণের প্রভাব, ইহাই নিত্যানন্দের করুণা। কেবল যে আঁকিয়াছে, সেই নহে; অনেকেই দেখিয়া গেল, সেই হরিণ শিশুটিই তো, তার সেই চলনটি, তার সেই চাউনিটি, ঠিক্‌ঠাক্‌,—স্পষ্ট এবং পরিষ্কার,—ঐ দাগকয়টির ভিতরেই রহিয়াছে। কতদিন, কতলোক আসিয়া বিস্ফারিত নয়নে দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ইহাই সঙ্কর্ষণের আরাধনা, নাগবধূগণ মুগ্ধ হৃদয়ে ইহা করিয়াছেন। সাংখ্যায়ন, নারদ প্রভৃতি ইহার গুরু। ব্রহ্মা ইহা প্রথমে বুঝেন নাই। কেন বুঝিবেন? ইহার সহিত যে এক নূতন সৃষ্টি রহিয়াছে। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যাহা নাই বলিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি নিন্দিত হইল, এ-সৃষ্টিতে যে তাহা আছে। এই জন্যই—"বেদে গুপ্ত"।

চোখের দেখার পথ বলা হইল, এইবার কানে শোনার পথ। পাতা কাঁপিতেছে, পাতায় পাতায় ঠোকাঠুকি হইতেছে; পাশে বসিয়া ফুলগুলি নাচিতেছে, হাসিতেছে, মাথা নাড়িতেছে; একটি ভ্রমর ফুলের চারিদিকে গুঞ্জন করিয়া ঘুরিতেছে; পাখীটি মাঝে শিস দিতেছে, ঝরণার জল নীচে পাথরের উপর পড়িতেছে।

বিমিশ্র ও অব্যক্ত শব্দ হইতেছে, শুনিলাম, মুগ্ধ হইলাম, নিজেকে হারাইলাম। বেশ লাগিল। কিন্তু কতক্ষণ? সে শব্দটি থাকিল না। পাখী উড়িয়া গেল, আলোর সাগরে সাঁতার দিয়া রঙিন্ পাখীটি অনন্তের কোলে হারাইয়া গেল। ভিতর হইতে কে বলিল,—যাবে আর কোথায়, আছে সব আছে, আমাতেই আছে। সবই থাকিবে, চিরকালই থাকিবে, আমারই ভিতরে থাকিবে, ভয় নাই, ভাবনা নাই। ইহাই সঙ্কর্ষণের বাণী,—ইহাই নিত্যানন্দের অভয় দান। কথাটা আসিল আমার ভিতর হইতে, তাহা হইলে সে আমার ভিতরে আছে, এই পুরে সে বাস করে—সে পুরুষ।

এই বাণী শুনিয়া যে মাতিয়া উঠিল, আপনা আপনি তাহার গলা হইতে একটা নূতন রকমের, আশ্চর্য্য রকমের আওয়াজ বা সুর বাহির হইল। ঐ রঙিন্ পাখীর কূজন রোল, ঐ ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি, পাতার কাঁপুনির শব্দ, জলের পতন শব্দ, সবগুলি এক জায়গায় এক সঙ্গে ঐ মানুষটার সুরের ভিতর, শুনিতে পাওয়া গেল। সে-রকমের শব্দ, সে-মানুষটা আর কখন করে নাই। আজ কে যেন ভিতর হইতে তাহাকে ঐ শব্দটা করাইল। এই সুর অভ্যাস হইয়া গেল। যতবারই ঐ সুরটা শুনি, ততবারই আগেকার সেই শব্দগুলি শুনিতে পাই। যাহারা চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে, আর কখন আসিবে না এমনভাবে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা ঐ সুরের ভিতর বন্দী হইয়া নিত্য হইয়া গেল। সুরের ভিতর নিত্যানন্দ বাঁধা পড়িয়া গেলেন। গন্ধর্ব্ব লোকের এই পূজা।

নরলোকে এইরূপে কবিতার জন্ম হইয়াছে। ইহাতে শব্দ আছে, অর্থ আছে, ছন্দঃ আছে, রস আছে। গোটা মানুষটাই আছে, তাহার সমগ্র অনুভব ও আস্বাদন লইয়াই আছে। কত অশান্ত হৃদয়ের দুর্জ্জয় মান, অভিমান ও সুঃখ দুঃখ, ঐ ভাষায় ও ঐ সুরে চিরবন্দী হইয়াছে। কত ভঙ্গ, কত ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, প্রত্যনুধ্বনি; কত জন্ম মৃত্যু, হাসি কান্না; কত বসন্ত ও শরৎ, কত শীত ও বর্ষা! স্বভাবের তাড়নায় ইহা হইয়াছে, ইহা 'সহজ' ও সরল। ইহাই সঙ্কর্ষণ, ইহাই নিত্যানন্দ। সংসারের মধ্যে ভগবান্, সংসারের সকল রকমের ব্যাপারের ভিতরে ভগবান্, বিষণ্ণ নহেন, নিত্যানন্দ ভগবান্, সকলকেই টানিয়া আত্মসাৎ করার জন্য ভগবান্, সঙ্কর্ষণ ভগবান্। সব করেন, কিছুই করেন না, এমন ভগবান্ ইনি বলরাম ভগবান্।

আর আছেন দূরে, বাহিরে, নিজের মত্ততার বিহ্বল অনন্ত সিন্ধুর তীরে ত্রিগুণের পারে ভগবান্। কিন্তু, অভিন্ন দুইজন। কে বুঝাইবে, কে বা বুঝাইবে?

৮। নবযুগের প্রয়োজন

চারিশত বর্ষপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগের যাহা যুগধর্ম্ম তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মমত একেবারে যে একটা নূতন কিছু, তাহা নহে। এই ধর্ম্মের নাম—ভাগবত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সনাতন, কলিযুগের প্রারম্ভে যুগোপযোগী করিয়া নারদের উপদেশে ও প্রেরণায় ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার চারি হাজার বৎসর পরে আবার কিছু নূতন আকারে তাহার ঘোষণা প্রয়োজন হইয়াছিল, বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

তাহার পর চারিশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে; চিন্তাশীল ও সাধনশীল সাধু ও সুধীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি,—চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভাগ্যবান পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই ভাগবত-ধর্ম্ম যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন বা বুঝাইয়াছিলেন, আজও কি ঠিক্ সেইভাবে বুঝা বা বুঝান সম্ভব? যাঁহারা বেদও মানেন, পুরাণও মানেন, এবং বিবেচনা করেন, পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ 'পূরণ' হইয়াছে এবং ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাঁহারা অর্থাৎ বেদপন্থী পৌরাণিক বা নিত্য-লীলাবাদীরা বলিবেন,—লীলা যখন নিত্য, পরিবর্ত্তন যখন সত্য ও অবশ্যম্ভাবী, তখন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা সত্য হইলেও, মীমাংসা-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাহাকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিতে হইবে। অতএব, বর্ত্তমানকে অস্বীকার করিও না, বর্ত্তমানের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সনাতনকে বুঝিয়া লও। যাঁহারা যুগধর্ম্মরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা জগতের মহদুপকার করিতেছেন, তাঁহাদের চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, বর্ত্তমানের মনোভাব ও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার আলোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা জগতের সম্মুখ ধরিতে চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে মতভেদ নাই।

যাঁহারা লীলাবাদী, 'স্থান' ও 'পোষণ' এই দুইটি তত্ত্বে এবং অবতার-লীলায়, বিশেষতঃ অসংখ্য অবতারে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, পূর্ব্বের মত তাঁহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য।

৯। মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, তাহার সংবাদ লইবেন। ভগবানও এক, সত্যও এক। অধিকার ভেদে অনুষ্ঠানভেদ থাকিলেও ধর্ম্ম এক। মহাত্মা গান্ধী যাহা বলেন, অন্ধভাবে তাহাই যে মানিয়া লইবেন তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার মধ্য দিয়া যুগবাণী আসিতেছে। কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র মানবজাতির এ যুগের প্রয়োজন কি, আশা ও সান্ত্বনা কি, শক্তি বা ভরসাই বা কোথায়, এই সব কথা মহাত্মার মধ্য দিয়া জগতে আসিতেছে, সুতরাং নিজেদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের শিক্ষা ও উপদেশসমূহের যুগোচিত তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মহাত্মার কথাগুলিও ধীরভাবে অন্তর্মুখী হইয়া ভাবিবেন। তাহাতে আনন্দ পাইবেন, আলোক পাইবেন, শক্তি পাইবেন।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে মহাত্মাজীর একদিনের একটি উক্তির মূল ইংরাজী, নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যাঁহারা ইংরাজী না জানেন, তাঁহাদের জন্য উহার বাঙ্গালা অনুবাদও দেওয়া হইল। এই অংশটুকু সকলে আলোচনা করুন। আমি বলিতেছি, শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ও প্রাচীনকালের আর্য্যগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ ও মহাকাল" নামক পুস্তকে আমরা শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের ব্যাখ্যার নমুনা দিয়াছি, তাহাতে দেখিবেন, তিনি কিরূপভাবে "শ্রুতি" বা "শাশ্বত সত্য" এর প্রাধান্য রক্ষা করিয়া তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভিতরে যাহারা প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের মনে হইবে পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় বুঝি অন্ধভাবে শাস্ত্রবাক্যেরই অনুসরণ করিতেছেন, কিন্তু তাহা মোটেই সত্য নহে, তিনি আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায় "স্বানুভব"কেই বড় করিয়াছেন।

এইবার মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

Many of us make the very serious mistake of taking literally

what is accepted as scriptures, forgetting that the letter killeth and the spirit giveth life. The Mahabharata and the Puranas are neither history nor simple religious maxims. They appear to me to be wonderfully designed to illustrate the religious history of man in a variety of ways. The heroes described therein are all imperfect mortals, even as we are—the difference being one of degree only. Their alleged actions are not infallible guides for us. The Mahabharata sums up its teachings by declaring emphatically that truth outweighs everything else on earth.

But I do not seek to justify everything written under the name of scriptures. I take, as all to be true must take, the sum total of the effect produced on me by a prayerful reading of such books. * * Surely there must come a time in the life of a very religiously minded man when his faith must be self-sustained.

M. K. Gandhi.

Young India 15-12-27.

অনুবাদ ও আমাদের মন্তব্য—(বন্ধনীর মধ্যে আমাদের মন্তব্য) আমাদের মধ্যে অনেকেই একটা ভয়ানক ভুল করেন। শাস্ত্র বলিয়া যাহা স্বীকৃত তাঁহারা তাহাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান অক্ষর বিনাশ করে, ভাব জীবন দেয়। [শেষ বাক্যটি খৃষ্টীয় শাস্ত্রের। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন, "রসিক ও ভাবুক হইয়া ভাগবতরস পান কর" শ্রীধর স্বামী বলিলেন—"অন্তদৃষ্টির সাহায্যে ইহা শোন"। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—"আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য, তত্ত্বতঃ ইহা বুঝিবে।" এই সব কথা'ও ইহাই অর্থ।] মহাভারত এবং পুরাণ সমূহ ইতিহাসও নহে, সুবোধ্য ধর্ম্ম উপদেশও নহে। [এখানে ইতিহাস বলিতে বর্ত্তমান যুগ যাহাকে ইতিহাস বলে, তাহাই বুঝিতে হইবে। সেকালে যাহাকে ইতিহাস বলিত,

"ঈশ্বরগণের বাক্য সত্য, আচরিত ক্বচিৎ সত্য' এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে।] আমার মনে হয়, ইতিহাস ও পুরাণাদি অতি অদ্ভুত কৌশলে কল্পিত সামগ্রী, মানবের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস নানারূপ পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থে যে-সব বীর বা নায়কের কথা আছে, তাহারা আমাদেরই মত অপূর্ণ মানব ; আমাদের সঙ্গে তাহাদের প্রভেদ প্রকৃতি-মূলক নহে, পরিমাণমূলক। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে অভ্রান্ত উদাহরণ নহে। মহাভারতের যত শিক্ষা, তাহা একত্র করিয়া মহাভারত সজোরে ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন— পৃথিবীর অন্য যাহা কিছু, সকলের মধ্যে সত্যই বড়। [শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই "সত্যং পরং ধীমহি "]

শাস্ত্র নামে পরিচিত গ্রন্থ-সমূহে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহার সবই সঙ্গত, ইহা আমি কখনই দেখাইতে চাহি না। আমি বেশ ভগবদ্-প্রার্থনার ভাব হৃদয়ে লইয়া এই গ্রন্থগুলি পাঠ করি, সমগ্র গ্রন্থ পাঠের ফলে আমার মনে একটা কিছু ক্রিয়া হয়, আমি তাহাই গ্রহণ করি, আর মনে করি যাঁহারা শাস্ত্রের নিকট সত্য চাহেন, তাঁহারাও এইভাবে শাস্ত্র পড়িবেন। ['শ্রীমদ্ভাগবতের ধারণা ও ধ্যান', নামক গ্রন্থে আমরা এই কথাটি বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।] * * আর একটি কথা সুনিশ্চয়,— যাহারা খুব বেশী রকম ধর্ম্মচিন্তা করেন, তাঁহাদের জীবনে এমন একটা দিন আসিবে, যখন তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বাহিরের কোন আশ্রয় খুঁজিবে না, সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। [বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা ইহাকেই 'রাগ-মার্গ' বলেন ; তন্ত্রে এবং বেদান্তে এরূপ অবস্থার বর্ণনা আছে।]

পুরাণের ব্যাখ্যা—অক্ষরে অক্ষরে সত্য, বা বাহিরের অর্থই সত্য, এভাবে প্রাচীনতম আচার্য্যেরাও পুরাণের ব্যাখ্যা করেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপে কুমারিল ভট্টের নাম করা যাইতে পারে। ইন্দ্রের অহল্যাগমন, ব্রহ্মার কন্যাগমন প্রভৃতি ঘটনা কতকগুলি প্রাকৃতিক সত্য বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন

"সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বর নিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণ হেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদনেন * * অহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী ব্যাভিচারাৎ।"

সমুদয় তেজের আধার সূর্য্য। পরম ঐশ্বর্য্যনিবন্ধন ইন্দ্রশব্দবাচ্য। অহঃ ন অর্থাৎ দিনে

লয় হয় বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র বা সবিতাকে অহল্যাজার বলে—ব্যাভিচার জন্য নহে।

পুরাণের অনেক ঘটনা এই প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইবে, কিন্তু সমুদয় ঘটনা নহে। ইহার নাম রূপক-ব্যাখ্যা। প্রাচীন নিরুক্ত গ্রন্থে চারি প্রকারের ব্যাখ্যার কথা আছে। ঐতিহাসিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। এখনকার কালের যে-সব ভাল লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের পুরাণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহারা Historical, Allegorical, Symbolical ও Mystical, প্রথমতঃ এই চারি-প্রকার পদ্ধতির কথা বলিতেছেন। তাহা ছাড়া আরও কৌশল আছে। প্রচলিত শাস্ত্রের পক্ষে ওকালতী করার জন্য যাঁহারা আগাগোড়া রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। আবার এই রূপক-ব্যাখ্যাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া বাজারে চালাইয়া দেওয়ায় খুব অন্যায় কাজই হইয়াছে। রূপক-ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে; উহার ইংরাজী নাম Allegorical. Mystical কে আধ্যাত্মিক বলা যায়। সে বড় কঠিন; নিজে সাধক না হইলে তাহাতে প্রবেশ করা যায় না। মহাত্মা গান্ধি সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছেন।

—o—

আমাদের ধর্ম্ম ও উৎসব

১। সত্য ও এক

মানবজাতির আদিগুরু ভারতের বৈদিক ঋষি জগৎকে কয়েকটি চিরন্তন মহাসত্য শিখাইয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষাগুলি চিরদিনই নূতন ও তুল্যরূপে ফলপ্রদ। "সত্যমেব জয়তে" এই মন্ত্রটি সেই শ্রেণীর। আবার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহাও সেই শ্রেণীর মহামন্ত্র। এই দুইটি মহামন্ত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, প্রথম মন্ত্রটি গৃহীত ও উপাসিত হইলে, ক্রমশঃ আপনা হইতেই দ্বিতীয়টিতে লইয়া যাইবে, ইহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ 'সত্য'। সত্যের দ্বারাই আমাদের জয় হইবে। মানুষ মাত্রেই সত্যকে চায়। আমাদের মধ্যে এমন হতভাগা লোক আছে যাহার নিজের জীবন আগাগোড়াই মিথ্যা, সে মিথ্যার ব্যবসায়ী। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার,—এই মিথ্যা-ব্যবসায়ীও চাহে যে অন্যে তাহার সহিত সত্য ব্যবহার করুক। নিজে মিথ্যা-ব্যবসায়ী হইয়াও মানুষ যখন সত্য চাহে এবং সত্যকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তখন সত্যই যে মানুষের সর্ব্ব-প্রধান প্রার্থনীয় বস্তু, মানুষের জীবন যে সত্যের জন্যই স্বভাবতঃ ব্যাকুল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

সত্যের সাধনা আমাদিগকে সেই এক ও অদ্বিতীয়ের সহিত পরিচিত করিবে। সেই 'এক' ও 'অদ্বিতীয়'ই সত্য, পরমার্থ সত্য। তাঁহার সত্যতায় অন্য যাহা কিছু সব সত্য হইয়াছে।

সত্যান্বেষী যে এক ও অদ্বিতীয়কেই খুঁজিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জড়বিজ্ঞানের গতি দেখুন, বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলীভূত একের আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র চেষ্টা। বৈজ্ঞানিক যতই সেই এক ও অদ্বিতীয়ের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, বিজ্ঞানের ততই উন্নতি হইতেছে। পরমাণুকেই একদিন সেই এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এখন আর পরমাণু নাই, পরমাণু জড়, সে উড়িয়া গিয়াছে, এখন শক্তিকেই সেই এক ও অদ্বিতীয় বলা হইতেছে। এই মহাশক্তি জ্ঞানময়ী কিম্বা জড়া, এইসব চিন্তাও জাগিয়া উঠিতেছে। নব নব আবিষ্কার, নব নব সিদ্ধান্ত! প্রকৃতির একটির পর আর একটি আবরণ উদ্ঘাটিত হইতেছে, নব নব রহস্য বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের যাবতীয় চেষ্টা সত্যের আবিষ্কার, আর এই সত্য যতই আবিষ্কৃত হইতেছে, সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ততই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন।

২। একের স্বরূপ

বৈদিক ঋষি বলিলেন, সেই একই সত্য। মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ আমরা, আমাদের অমৃতের প্রয়োজন। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই আমাদের অমৃত। অজ্ঞানের অন্ধকারে পথহারা মানুষ আমরা, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই আমাদের আলোক। এখন প্রশ্ন, সেই এক কেমন? ঋষি বলিলেন—"একো সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সেই সত্য এক, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ববিৎ, তাঁহারা তাঁহাকে বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই মন্ত্রটি আমাদিগকে বলিতেছেন, পরমার্থ সত্যের বিবিধপ্রকার প্রকাশ। তোমার নিকট একরূপে, আমার নিকট একরূপে, আবার অন্যের নিকট অন্যরূপে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রকাশ লইয়া বিরোধ করিও না। এই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের এই বেদপন্থী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণ যেমনভাবে বুঝিয়াছেন, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা তেমন করিয়া বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কথাটা এইরূপ। একটাই গাছ, একটাই তাহার বীজ বা মূল। সেই গাছে একশত শাখা, দুইশত প্রশাখা, তিনশত ফুল, চারিশত ফল আর পাঁচশত পাতা। এই যে বহু, ইহাদের সংখ্যা পনর শত, ইহারা নানা ভাগে বিভক্ত—শাখা প্রশাখা ফুল ফল পত্র। ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটিকে ধরা যাউক। একটি পত্র। এই পত্রটিকে ধরিয়া যদি আলোচনা আরম্ভ করি, ইহার মূল কি, ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে কে, ইহাকে চালায় কে, এইসব ব্যাপারের যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সেই মূলে বা বীজে গিয়া আমাদের চিন্তা আপনা হইতেই উপস্থিত হইবে। যতক্ষণ না সেই মূলে যাইতেছি, ততক্ষণ মীমাংসা হইবে না। আবার যদি একটি ফুল বা ফলকে ধরিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করা যায়, তাহার মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলেও এক মূলে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। আবার দেখা যাইতেছে, সেই মূলের সহিত একীভূত হইয়া আছে বলিয়াই এই শাখা প্রশাখা ফুল ফল ও পত্র আছে, সত্য হইয়া আছে। মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আর তাহারা নাই। এই প্রকারের যাহা কিছু আছে, সেই এক পারমার্থিক সত্যের অধিষ্ঠান সত্তায় সত্য হইয়া আছে। একের এই তত্ত্ব সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। বৈচিত্র্য বা বহুকে বাদ দিয়া এক নাই, বহুকে লইয়া, বহুকে সম্ভব করিয়া সেই এক আছেন।

এই মূল সত্যটিকে আমাদের ধর্ম্মসাধনায় প্রয়োগ করা যাউক। আমাদের সমাজে নানা সম্প্রদায়ের উপাসক রহিয়াছেন, গানপত্য, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব; আবার জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত। আমরা যদি প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মী হই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই সম্প্রদায়ভেদ বা

তখন ইহারা সকলেই সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকেই সেই পরমার্থই অন্বেষণ করিতেছে।

৩। রুচি ও অধিকার

কেন এমন হইল? এই হিন্দুস্থানে এত মতভেদ ও উপাস্যভেদ কেন হইল? উত্তর,—ইহাই স্বাভাবিক। সংসারে মানুষে মানুষে রুচিভেদ এবং অধিকারভেদ এই দুইটি যখন স্বাভাবিক, তখন সেই পরমার্থবস্তু এক হইলেও তাঁহাকে রুচিভেদ ও অধিকারভেদ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে না বুঝিয়া পারে না। রুচিভেদ যে সর্ব্বত্রই। কেহ মিষ্ট ভালবাসে, কেহ ঝাল ভালবাসে, কেহ তিক্ত ভালবাসে, কেহ অম্বল ভালবাসে—স্বাভাবিক। কেহ পিতাকে বেশী ভালবাসে, কেহ মাতাকে বেশী ভালবাসে, কেহ পুত্রকে বেশী ভালবাসে, কেহ স্ত্রীকে বেশী ভালবাসে। এই কারণেই মতভেদ, স্বাভাবিক মতভেদ। এই ভেদের মধ্যে কিন্তু অভেদ রহিয়াছে, সেই অভেদকে মনে রাখিয়া ভেদগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিব-মহিম্নস্তোত্রে এই রুচিভেদের কথাই বলিয়াছেন। সেখানে বলিয়াছেন, কেহ যাগযজ্ঞ করিতেছেন, ইহার নাম ত্রয়ী। আবার কেহ বলিতেছেন, বাহিরে এই যজ্ঞের আড়ম্বর, ইহা অকারণ, অন্তর্যাগ কর; জ্ঞানের অনুশীলন কর; ইহার নাম সাংখ্য। আবার একজন বলিতেছেন, জ্ঞানই তো চাই কিন্তু প্রাণও চঞ্চল, মনও চঞ্চল, জ্ঞানের চর্চ্চা করিবে কি করিয়া? যোগাভ্যাস কর। আসন কর, প্রাণায়াম কর। ইহার নাম যোগ। আবার একজন বলিতেছেন—আমি করিব, আমি করিব বলিয়া বৃথা অহঙ্কার করিও না, কিছুই হইবে না। অহঙ্কার ছাড়িয়া মাথা নত কর, যোগ জ্ঞান যজ্ঞ সকলই অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাই ভক্তি পথ। শৈবমত, বৈষ্ণব মত, এই ভক্তি পথ।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ"—মানুষে মানুষে রুচিভেদ স্বাভাবিক বলিয়াই স্বভাবতঃ এই মতভেদ হইয়াছে। ইহার জন্য যদি বিরোধ কর, তাহা হইলে সত্য জান না। এই সব পথের মধ্যে কোনটা সোজা, কোনটা বাঁকা—ঋজু ও কুটিল। কিন্তু, কে বলিবে কোন্টা সোজা, কোন্টা বাঁকা। আপনার নিকট যাহা সোজা, আমার নিকট তাহা বাঁকা, আবার আপনার নিকট যাহা বাঁকা, আমার নিকট তাহা সোজা। সুতরাং এ সম্বন্ধেও কিছু বলা যায় না। কোনরূপ মত দেওয়া উচিত নহে। নদীগুলি নানা পথে চলিতেছে, সোজা এবং বাঁকা। কিন্তু, ইহারা প্রত্যেকেই এক মহাসমুদ্রেই যাইবে এবং পরিণতি লাভ করিবে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনার পথগুলিও উপাসককে একই গম্যস্থানে লইয়া যাইবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমমিদমদঃ পথ্যমিতি চ
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই অন্যভাবে বলিয়াছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
আমি সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

আবার ঐ গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

আমি এই জগতের, পিতা, মাতা ও পিতামহ। আবার

গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥

আমি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। এই সব ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক; ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজ নিজ রুচি অনুসারে এই সব ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের সাহায্যে সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমতত্ত্বের অভিমুখী হইতেছে। সুতরাং বিরোধ কোথায়?

৪। আমাদের উৎসব

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত, এই ছয় ঋতুর আবর্ত্তনে বাহিরের প্রকৃতির রূপ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রকৃতির রূপের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও হৃদয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, নব নব ভাবের জাগরণ হইতেছে, নব নব রসের আস্বাদন হইতেছে। আবার এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন, এক এক জায়গায় এক এক রকম। পার্ব্বত্য প্রদেশে একরূপ, সমুদ্রতীরে একরূপ, মরুপ্রদেশে একরূপ, নদীপ্রধান দেশে একরূপ। আকাশ বাতাস বদ্‌লাইতেছে, নদীবন প্রান্তর বদ্‌লাইতেছে, মানুষের কাজও বদ্‌লাইতেছে, ভাবও বদ্‌লাইতেছে। কত তরুলতা জন্মিতেছে, মরিতেছে। কত রংএর কত গন্ধের ফুল ফল আসিতেছে, যাইতেছে। কত রংএর পাখী, কত রকমের সুর, আর কত রকমের গান!

এই যে পরিবর্ত্তন, ইহার মধ্যেও মানবের চির-উপাস্য সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্বেরও

ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রকাশ হইতেছে। আমাদের বর্ষব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের ইহাই ভিতরের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উপলব্ধি প্রয়োজন। কেবল গতানুগতিক লইয়া পড়িয়া থাকিলে হইবে না, এই উৎসবগুলিকে জীবিত ও প্রাণময় করিতে হইবে, এই সব উৎসবের দ্বারা আমাদিগকেও জীবিত ও প্রাণময় হইতে হইবে।

বর্ষা গেল, শরৎ আসিল। প্রভাতে হরিদ্রাভ রৌদ্রকরে শরতের স্বচ্ছসুন্দর হাসির রাশি সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিল, উথলিয়া উঠিল। বাঙ্গালায় আগমনীর গান নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিয়া রণিয়া উঠিল। মেনকা মায়ের অন্তরে অতীতের এক সুখের স্মৃতির দারুণ ব্যথা! প্রাণের নন্দিনী, এইখানেই ছিল, কিন্তু আজ নাই, কোথায় দূরে চলিয়া গিয়াছে। শরৎ আসিয়াছে, সে কি আসিবে না? মেনকা মা' কাঁদিতেছেন। কন্যা বলিয়া স্নেহের কাতরতায় যাঁহার উদ্বোধন, জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহামায়া তিনি, দশভুজা মহিষাসুরনাশিনী, সিংহবাহিনী তিনি। এই এক উৎসব। মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তির এই এক প্রকাশ; এই তাঁহার এক প্রকারের অনুভব। মহানবমীর দিন, উৎসবের শেষ; পুরোহিত হোমানল জ্বালিলেন, তোমরা সকলে হৃদয়ে এই অনল গ্রহণ কর, প্রাণে এই আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ কর; এই আলোক ও উত্তাপ লইয়া তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে যাও, সম্বৎসর যুদ্ধ কর। মা আসিয়াছিলেন, চলিয়া গিয়াছেন। মিলনআশার আগমনীর সুর বিসর্জ্জনের বিদায়বাদ্যের অবসাদে ডুবিয়া গেল। কিন্তু এই বিরহ, চিরবিরহ নহে, মিলনকে মধুরতর সুন্দরতর করিবার জন্যই এই বিরহ। আবার আসিবেন—

সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।

বৎসরের পরে আবার আসিবেন। কে বলিল, মা চলিয়া গিয়াছেন? "কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়"। মা চলিয়া যান নাই, আড়ালে দাঁড়াইয়া মা দেখিতেছেন, তোমরা সব মায়ের ছেলে মেয়ে। মাকে হারাইয়া তোমরা কি কর, মাকে ভুলিয়া "আমি আমি" করিয়া দ্বন্দ্ব কর, কি 'মা মা' বলিয়া নয়নজলে নয়নজল মিশাইয়া বিগলিত হৃদয়ের সহিত বিগলিত হৃদয় মিশাইয়া একপ্রাণ ও সমচিত্ত হও। তাহাই দেখিবার জন্য মায়ের এই পরীক্ষা। তোমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মায়ের উপযুক্ত ছেলে মেয়ে হও। মা আবার আসিবেন—আর তোমাদের সঙ্কল্প পূর্ণ হইবে—

রামেন যথৈব হতো দশাস্যঃ

দেবাসুরের সংগ্রামে তোমরা জয়ী হইবে, নিশ্চয়; নিশ্চয় তোমরা চিরবিজয় লাভ করিবে। শরতের উৎসব, এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদ্যাশক্তির প্রকাশ, সমগ্র বিশ্বের মিলন। মায়ের স্নান, মহাস্নান কি বিরাট, কি সুন্দর, কি মহিমাময়! কেহই বাদ যায় নাই! সকলেই যে মায়ের ছেলে মেয়ে। নারদাদি ঋষি আসিয়াছিলেন, যক্ষ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর, বটুক, বেতাল আসিয়াছিলেন; অষ্ট

দিক্‌পাল আসিয়াছিলেন, শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু আসিয়াছিলেন। প্রভা জয়া বিজয়া আসিয়াছিলেন, মাতৃগণ আসিয়াছিলেন। ভূত প্রেত পিশাচ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, লোক-লোকান্তরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যিনি যেথানে আছেন, আসিয়াছিলেন—আমার মায়ের সন্তান সন্ততি সকলেই; সকলেই আসিয়াছিলেন। মা গিয়াছেন, তাঁহারাও গিয়াছেন, কর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন, ভাব, শক্তি ও প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন। আবার আসিবেন, বলিয়া গিয়াছেন। ইহাই মহামায়ার মহাপূজার মহাপ্রেরণা, অতীত ভবিষ্য বর্ত্তমানের মহামিলন, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম্মের মহামিলন,—এই মহাসত্যই মহামায়ার আগমন—শরতের মহামহোৎসব, কলিযুগের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

পূর্ণিমায় আসিলেন মহালক্ষ্মী। তাহার পর আঁধার। আলোকের পর আঁধার, ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা, ভয় পাইও না। অমানিশা আসিতেছে, শ্মশানের বিভীষিকা, উলঙ্গিনী এলোকেশী নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গখর্পর-ধারিণীর তাণ্ডব নৃত্য আসিতেছে,— ভয় পাইও না, বীরসাধক! তুলা রাশিস্থে ভাস্করে অমানিশার অন্ধকারে মহামায়া আদ্যাশক্তির এই এক প্রকাশ। একদিকে তাঁর খড়্গামুণ্ড, আর একদিকে বরাভয়; গোপনে, আঁধারে, শ্মশানে।

আঁধার গেল, আবার আলো। নবমীতে জগদ্ধাত্রী পূজা—সিংহবাহিনী মা আবার আসিলেন। তাহার পর উত্থান-একাদশী, বিষ্ণুর জাগরণ। এইবার রাস—এও এক মহা মহোৎসব। নাচ গান, রঙ্গের ছড়াছড়ি।

এখনও বাকি আছে। হেমন্তের শেষ, শীত আসিতেছে, জড়তা আসিতেছে। কিন্তু সে আর কয়দিন! বসন্তের উষ্ণশ্বাসে নবজীবনের উল্লাসতরঙ্গ লইয়া মলয়হিল্লোলে নাচিয়া উঠিবে—নবসৃষ্টির নবীন উষা প্রথম প্রকাশ বাক্‌—শ্রীপঞ্চমী, মাকরী পঞ্চমী বাগ্‌বাদিনী দেবী সরস্বতীর পূজা, "বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে। ভগবতী ভারতি দেবি নমস্তে।"

বসন্তের পূর্ণিমা, বসন্তের পূর্ণতা, এ আবার আর এক পূর্ণ-প্রকাশ। কোজাগরী পূর্ণিমায় এক প্রকারের পূর্ণতা, রাস-পূর্ণিমায় আর এক পূর্ণতা, দোল পূর্ণিমায় আর এক পূর্ণতা। এই প্রকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই মহাসত্য আসিতেছে। বাহিরের প্রকৃতির বুকেও যেমন তাহার প্রকাশ, নরনারীর হৃদয়েও তাহার সেইরূপ প্রকাশ। আমাদের ভিতর বাহির এক হউক, সেই এক যিনি ভিতরে ও বাহিরে তুলারূপে লীলায়িত, তিনি আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন।*

---

* কলিকাতা, শিমলা কাঁসারিপাড়ায় যুবকগণের একটি সমিতি হইয়াছে, তাহার নাম শ্রীচৈতন্য-সাধনাশ্রম। তাঁহারা আমাকে ধরিয়াছিলেন, বক্তৃতা করার জন্য। কলিকাতায় ধর্ম্মসভা, শুনিলেই ভয় হয়। তবে যুবকেরা করিয়াছে, এইটুকু আশা। গত রাসের সময় ৪দিন বক্তৃতা করি। যুবকেরা কিভাবে ধর্ম্ম বুঝিবে তাহা জানি না, মোটেই বুঝিবে কি না তাহাও জানি না। ভগবান্ তাহাদের মঙ্গল করুন, প্রথম দিনের বক্তৃতার ভূমিকায় পূর্ব্বের অংশটুকু বলা হইয়াছিল। সম্পাদক।

মন্তব্য ও সংবাদ

বেদ ও বিধি—আমরা বালককাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—"বেদবিধি-ছাড়া, যা বৈরাগী-পাড়া"। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজের যাঁহারা গুরু ও আচার্য্য, তাঁহারাও অনেকে ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিয়া এই কথা বলিতেন। বৈষ্ণব সমাজের ব্রাহ্মণ নেতৃবর্গ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে ধর্ম্ম যাজন করেন ও প্রচার করেন, তাহা বৈদিক ও বৈধ, আর বৈরাগীরা যাহার অনুসরণ করে তাহা অবৈদিক ও অবৈধ। পূর্ব্বে ইহাই জানিতাম। ক্রমশঃ দেখিলাম বৈরাগীদিগের ভিতর দুইটি দল আছে। একদল নিজেদের অভ্যাগত-সম্প্রদায় বলেন এবং দাবী করেন যে তাঁহারাও বৈদিক বা বৈধ সদাচারের অনুবর্ত্তী। ইঁহারা অপর দলকে অনাচারী, যথেচ্ছাচার, যোষিৎ সঙ্গী প্রভৃতি বলেন ও ঘৃণা করেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের আলোচনার সময় সর্ব্বদাই মনে হয়, এই ধর্ম্মের সহিত বেদ ও বিধির সম্পর্ক কি? ব্রাহ্মণ আচার্য্যেরা তর্কস্থলে অস্বীকার করিতে পারেন না যে এই ধর্ম্মের দুইটি মূর্ত্তি আছে; একটি বৈধ, আর একটি রাগানুগ। এই দ্বিবিধ মূর্ত্তির মধ্যে রাগানুগই উচ্চ। বৈধ অনুষ্ঠানের ভিতর যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে এই রাগমার্গে আসিতে চেষ্টা করিবেন, ইহাই ব্যবস্থা ও উপদেশ।

মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—বেদ তোমার সমুদয় তত্ত্ব জানেন না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন--"বেদ মোরে করে বিড়ম্বন"। মুরারি গুপ্ত একদিন মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট বা প্রসাদী পান হাতে করিয়া লইয়া খাইলেন, হাত ধুইলেন না, মাথায় হাত মুছিলেন। কাজটি অবৈধ, কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কথা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—আপনি সন্ন্যাসী হইয়া নাচগান করেন, ইহা অবৈধ, ইহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, ইহা **হীনাচার**। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,—আমি ইচ্ছা করিয়া নাচগান করি না, শ্রীকৃষ্ণের নামেই আমায় নাচায়। সন্ন্যাসীরা মহাপ্রভুর মত মানিয়া লইলেন। ইহাতে বিধি-লঙ্ঘনের বা **হীনাচারের** শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইল।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বেদকে যেমন খর্ব্ব করা হইয়াছে, আবার তেমনই বেদের গৌরবও রক্ষা করা হইয়াছে। বেদের প্রচলিত অর্থের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু, প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্যরূপ অর্থও আছে, মহাপ্রভু সেই অর্থ প্রকাশিত করিলেন। ভগবদ্গীতাও বেদ-সম্বন্ধে

এই প্রকারের দুইরূপ কথা বলিয়াছেন। বেদ-সম্বন্ধে মীমাংসা হইয়া গেল, কিন্তু বিধি-সম্বন্ধে কোনরূপ সুস্পষ্ট মীমাংসা নাই।

বিধি ও মানুষ—বর্ত্তমান যুগে পৃথিবী জুড়িয়া যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সংবাদ লওয়া আবশ্যক। এই সব আন্দোলনের একটি লক্ষণ বেশ সুস্পষ্ট। বর্ত্তমান পৃথিবীর তরুণ-সম্প্রদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের আদিষ্ট শাসন মানিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা যুক্তি চায়। ভগবানের প্রেমে বা মরণের ভয়ে, স্বর্গের আশায় বা নরকের আশঙ্কায় তাহারা বর্ত্তমানের ভোগসুখ ছাড়িতে চাহিতেছে না। তাহাদিগকে গালাগালি করিয়া কোনই লাভ নাই। এই মনোভাব পৃথিবীব্যাপী। ইহা বর্ত্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পৃথিবীতে যে-সব ধর্ম্ম রহিয়াছে, ইহার প্রত্যেকটিই বাহিরের একজন কর্ত্তার শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের শাসন, কোন মহাপুরুষের শাসন, কোন মণ্ডলীর শাসন বা কোন গ্রন্থের শাসন; কিন্তু সবই বাহিরের শাসন। বাহিরের শাসন অচল হইয়া আসিতেছে। তাই বলিয়া কি ধর্ম্ম থাকিবে না? ধর্ম্ম থাকিবেই, ধর্ম্ম কখন নষ্ট হইতে পারে না। ধর্ম্ম আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, বাঁধিয়া রাখে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের, এখন তাঁহাকে ভুলিয়া দুঃখ পাইতেছি। ধর্ম্ম আমাদিগকে আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত করিয়া দিবে। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, তিনি বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বাশ্রয়। এই ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম, ইহা নষ্ট হইবে না। বর্ত্তমানযুগে অনেক ভাল লোক নাস্তিক বা অজ্ঞেয়তাবাদী। কিন্তু, তাহাদেরও একটা সিদ্ধান্ত বা নীতি আছে এবং তাহারাও সেই নীতি-অনুসারে চলিতে চায়। সুতরাং কে বলে তাহারা সকলেই ধর্ম্মহীন? পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থা বদলাইতেছে, আমরা এক নবজগতে যাইতেছি। সে জগতে প্রতিযোগিতা থাকিবে না, সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হইবে। বহিঃস্থ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ-অনুসারে চলার জন্যই প্রতিযোগিতার জন্ম হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অর্থই দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, সংগ্রাম,—কুরুক্ষেত্র। বাহিরের কর্ত্তার হুকুম অন্ধভাবে জড়বস্তুর মতো মানিয়া লওয়াতেই এই কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। একশ্রেণীর লোক বড় হইয়া, কর্ত্তা হইয়া শাসক হইয়া, মালিক হইয়া থাকিতে চায়। ফলে স্বার্থ-সংঘর্ষ ও সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। একদল মালিক হইতে চাহিলেই আর একদল বিদ্রোহী হইবে। আমি নিজে জীবনে যে-সুখ, সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা চাই, অন্য সকলেরও সেই সুখ সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতায় তুল্যরূপ অধিকার আছে, ইহা যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে আর গোল থাকে না। ব্যক্তিমাত্রেই স্বাধীনতা না পাইলে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা হইতেই পারে না। ইহাই যুগলক্ষণ। সুতরাং বাহিরের ঈশ্বর, বাহিরের বেদ, বাহিরের গুরু, ইঁহাদের শাসনের যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভয়ে বা লোভে ইঁহাদের নিকট আর কেহ মাথা নোয়াইবে না। কিন্তু, তাই বলিয়া, ঈশ্বর, বেদ বা গুরু কি থাকিবেন না? খুব থাকিবেন, খুব ভাল করিয়া সত্য-রূপেই থাকিবেন। কিন্তু, এই ঈশ্বর, এই বেদ ও এই গুরু, মূলে অন্তরের বস্তু, প্রেমের

বস্তু। গদাচক্রের ভয় নহে, বাঁশির প্রেমরস। ইহাই গীতা ও ভাগবতের ধর্ম্ম, ইহাই নববৃন্দাবনের বার্ত্তা—ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শিক্ষা।

এই আলোকে আলোচনা করুন বেদ ও বিধির মর্ম্ম বুঝিবেন।

মানুষ বড়, না বেদবিধি বড়? একদিন মানুষ ভাবিত বেদ-বিধিই বড়। সেদিন মানুষ নিজেকে চিনিত না। শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বোত্তম নরলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া মানুষকে শিখাইলেন, মানুষই বড়। ইহাই যুগধর্ম্মের মর্ম্মবাণী। "সবার উপরে মানুষ, তাহার উপরে নাই।"

অসুর মানুষ—বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে, প্রায় সকল দেশেই একদল লোকের ভিতর একটি অতি ভয়ানক ও সর্ব্বনাশকর মত আছে। এই দলের লোকেরা বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক চিরকালই দরিদ্র হইয়া অভাবে ও দুর্দ্দশায় পড়িয়া থাকিবে। আমাদের দেশে যাঁহারা এই মতের লোক, তাঁহারা কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অর্থাৎ লীলাবাদীরা এই মতে বিশ্বাস করি না। আমরা সকলে সংঘবদ্ধ হইয়া সাজারে ঘোষণা করিতে চাই, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী জুড়িয়া মানুষে মানুষে যে প্রতিযোগিতা বা পাল্লাপাল্লি, ধ্বস্তাধ্বস্তি ও কাড়াকাড়ি চলিতেছে, ইহা শ্রীভগবানের বিধান নহে। ইহা মানুষের সৃষ্টি, আসুরভাবের প্রেরণায় মানুষেই ইহা করিয়াছে। হইতে পারে অতীতে মানব-সমাজের অভ্যুদয়ের জন্য এই প্রতিযোগিতার আবশ্যক ছিল; কিন্তু এখন আর সে আবশ্যক নাই। আমাদের প্রত্যেককে এখন বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া এই নবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে, অপরকে বুঝাইতে হইবে এবং তাহাদিগকেও এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। কেবল অন্ন-সমস্যাই মানবজীবনের সমস্যা নহে, ইহা সত্য; কিন্তু, অন্ন ব্যতীত মানুষের চলে না, ইহাও সত্য। বর্ত্তমান যুগে শ্রমিকগণকে যদি সুশৃঙ্খলিত করা যায়, তাহা হইলে অন্নের জন্য কাহাকেও অমিত পরিশ্রম করিতে হইবে না, কাহাকেও অনাহারে থাকিতে হইবে না, কোন স্ত্রীলোক বা শিশুকে অভাব-ক্লিষ্ট হইয়া মরিতে হইবে না। ধন আছে, অন্ন আছে, এখন যথাযথ বিতরণ-ব্যবস্থার দরকার। এই ব্যবস্থার জন্য মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, একটা নব অনুভবের প্রয়োজন। মানুষের হৃদয় অন্ধকারে ভরিয়া রহিয়াছে, এই অন্ধকার দূর হইলেই মানুষ ভক্ত ও লীলা এই দুইটি তত্ত্ব বুঝিবে।

নাম ব্রহ্ম—সংসারের ধনদৌলত, সুখ সুবিধা ও অধিকার লইয়া অকারণ কাড়াকাড়ি ও মারামারি করিয়া অসুর মানুষ সংসারটাকে যে-অবস্থায় আনিয়াছে, তাহাতে এখন সংসারকে পাপ-সংসার বলাই সঙ্গত। ধর্ম্ম আসিলেন, এই পাপ-সংসারের মোচনের জন্য, উদ্ধারের জন্য। সংসার হইল অর্থ, আর ধর্ম্ম হইল পরমার্থ। পরমার্থের দ্বারা অর্থের শোধন হইবে, উদ্ধার হইবে। ইহাই

ছিল ব্যবস্থা, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। সরিষা-পড়াতেই যেমন ভূত ধরে, ঠিক্ সেইরূপ পাপ-সংসারই ধর্ম্মকে বশীভূত করিয়া ফেলিল, পোষ মানাইয়া ফেলিল। সংসারে যেমন একজন লোক বা একদল লোক, গায়ের জোরে বা দুর্ব্বুদ্ধির জোরে মালিক হইয়া বসিয়া গিয়াছে, অন্য লোকের আর স্বাধীন ভাবে কিছুই করিবার উপায় নাই ; বিধাতা দিলেও মানুষে দেয় না। ধর্ম্মরাজ্যেও ঠিক্ সেই রূপ কতকগুলি লোকের মালিকানা স্বত্ব হইয়া গিয়াছে। তুমি শূদ্র, তুমি নারী, তুমি আবার ধর্ম্মাচরণ করিবে কি ? আমি মোহান্ত, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সন্ন্যাসী শ্রীশ্রী ১০০৮, আমাকে সেলামি দাও, আমি তোমাকে যতটুকু অধিকার দিব, তুমি ততটুকু ধর্ম্মাচরণ করিবে, তাহার বেশী কিছু করিলে তোমাকে নরকে পাঠাইয়া দিব। অধিকারীভেদ সত্য হইলেও তাহা ভিতরের কথা, তাহার অর্থ অন্যরূপ। অধিকার ভেদের দোহাই দিয়া, ধর্ম্মরাজ্যে গণ্ডী গড়া হইল। গুরু, লঘু, ছোট, বড় ; রাজা, প্রজা। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বেদবাণী বিস্মৃতির গর্ভে লুকাইয়া গেল। যাহারা চতুর, তাহারাই বিদ্বান, তাহারাই মালিক ; তাহারা পুরুষানুক্রমে মালিকানা স্বত্ব পাকা করিয়া লইল। এই প্রকারের দুর্দ্দশায় পড়িয়া ধর্ম্ম যখন মৃতপ্রায়, সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল।

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি সন্ন্যাসী, আপনি ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চাধিকারী, আপনি জনসাধারণের সঙ্গে নাচিয়া ও গান করিয়া ভাবকের হীনাচার করেন কেন ? মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন—আমার গুরু আমাকে বলিয়াছেন—

"মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হৈবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাইবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিযুগে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

ইহাই মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সার কথা। তুমি ভাবিতেছ, তুমি পণ্ডিত, আর জগতে সবাই মূর্খ ; ইহাতেই তুমি মরিতেছ ! ভগবান্‌কে ভাবো। তাঁহার অনন্ত ও অচিন্ত্য মহিমার পুরোদেশে দাঁড়াও। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি কি ও কতটুকু। বিশ্বনাথের বিশ্বলীলা দেখ। মানুষ হও, মানুষের হইয়া ; মানুষ হও, মানুষকে ভালবাসিয়া, মানুষের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া। নরলীলা বুঝিতে পারিবে। "আমি বড়" ইহা ভাবিলেই, মরিবে। অহঙ্কারের দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেল, সকলের সহিত কেবল

মহাপ্রভু বলিলেন,—আমি কৃষ্ণনামের প্রভাবে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াই। গুরু বলিলেন—ভালই হইয়াছে। তাহার পর বলিলেন—

"নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি, তার সর্ব্বজন।"

ইহাই যুগধর্ম্ম, ইহাই নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম।

কিশোরী-ভজন—বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার দ্বিপাড়া নামক গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটি বেশ ভালরকমের বিচার-বিতর্ক হয়। সেই বিচার-সভার বিবরণ পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। "কিশোরী ভজন" নামে পরিচিত একটি অনুষ্ঠান বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, প্রচলিত আছে। এই অনুষ্ঠান গুপ্ত; ইহার ভিতরের কথা কি, ঠিক বলা যায় না। এই বিচার-সভার মুদ্রিত বিবরণ-পত্রে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বিচার-সভায় শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী মহাশয় কিশোরী ভজনের বিরুদ্ধপক্ষের নেতা হইয়াছিলেন। দুইটি সভা হইয়াছিল। প্রথম সভায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাহেব স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এই দুইটি সভাতেই "কিশোরী-ভজন" অশাস্ত্রীয় ও দুর্নীতিকর বলিয়া নিন্দিত হয়; যে সব ব্রাহ্মণ ইহার পক্ষপাতী তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা আবশ্যক, এইরূপ সাব্যস্ত হয়। ফল কি হইয়াছে, বলা যায় না। এই বিবরণপত্রে কিশোরী-ভজন অনুষ্ঠানের দুইটি গান ছাপা হইয়াছিল।

১

তোরে বলি শোন্, ওরে মূঢ় মন, প্রেমের প্রতিমা কর্‌রে পূজন।
সাধুসঙ্গে মন কর কৃষ্ণ সেবা ভ্রান্ত হয়ে পূজিও না দেবী দেবা,
তবে ব্রজে যাবা, প্রাপ্য বস্তু পাবা, রাইচরণে মতি রাখ অনুক্ষণ॥
চণ্ডীদাস পূজেছিল রজকিনী, বিল্বমঙ্গল পূজেছিল চিন্তামণি,
ধন্য কলিযুগ, তোরে ধন্য মানি, (তোর) মহিমা বুঝিবে হেন কোন্ জন॥
কিশোরী চরণে, গয়াগঙ্গা কাশী,—বৃথা পিণ্ডদান, বৃথা একাদশী।
(কর) আত্মারই মিলন, অজপা উদ্দেশি, আমি তুমি ভেদ না কর কখন॥
অধরে অধর করিবে মিলন, অধরামৃতরস কর আস্বাদন,
প্রেমভরে কর গাঢ় আলিঙ্গন, দেখ যেন শশী না হয় পতন॥
চরণ বলে, চরণ পার্‌লিনা চিন্তিতে, দুদিন পরে যাবি জলন্ত চিতাতে।
তোর পঞ্চভূত মিশে যাবে পঞ্চভূতে, একা একা তুই করবি রে ভ্রমণ॥

২

গুরু গুরু করে' ভ্রম অকারণ।
সন্নিকটে গুরু দেখনা কখন ॥
পুরুষ যোষিতে পরস্পর গুরু, উভয়ের উভয় বাঞ্ছা কল্পতরু,
জাতির বিচার নাহি সে আচার, যে হরিবে মন, গুরু সেই জন ॥
গুরু আর কৃষ্ণ জানিবে অভেদ, গুরুরুষ্টে বৃথা কোটি অশ্বমেধ,
গুরু কৃপা হলে, পাবে অবহেলে, গোলকধামে তব নিত্য নিকেতন ॥
কিশোরী-ভজন, কিশোরী-রমণ, তাইতে গুরুসেবা জেন মূঢ় মন,
সে সুখে পূজিতা লক্ষ্মী নারায়ণ, অন্ত উপচারে নাই প্রয়োজন ॥
গুরু কৃষ্ণ আর গুরু সাধুজনা, দেহদানে কর তাদের অর্চ্চনা,
জীবন যৌবন, দিও তার দক্ষিণা, বাকি যা' থাকিবে তাই অকারণ ॥
চরণ বলে কৃষ্ণ-গুরু রাই-কিশোরী, এক ভেবে মন পূজা করলি না সেই চারি,
বৃথা দিন যায়, কি হবে উপায়, ঐ শুন কৃতান্ত, করিছে গর্জ্জন ॥

এই গান দুইটি,—চরণ,—সম্ভবতঃ রাই-চরণ, নামক কোন আধুনিক বাজে লোকের রচনা, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

'কিশোরী-ভজন' ব্যাপারটা কি, তাহা অনেকেই জানে না। রাঢ়দেশের গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা ইহার নামও শোনেনি। এই মুদ্রিত-পত্রে এ-সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ পাওয়া যায়।

১। 'কিশোরী-ভজন'এ অশাস্ত্রীয় শিক্ষা-মন্ত্র দেওয়া হয়।

২। স্ত্রীলোক লইয়া ভজনা করা হয়।

৩। বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ একত্রে একাসনে বসিয়া ভোজন করে।

৪। নীচজাতির পাক করা ও উচ্ছিষ্ট অন্নাদি উচ্চজাতি ভোজন করে।

৫। নিম্নজাতীয় লোকের নিকট উচ্চজাতির লোকে শিক্ষামন্ত্র গ্রহণ করে।

৬। মৎস্য ও মসুর ডাইলের দ্বারা ভোগ ও বৈষ্ণব সেবা করা হয়।

৭। পুরুষ-বিশেষকে কৃষ্ণ ও নারী-বিশেষকে রাধিকা ও অন্যান্য নারীকে গোপী প্রভৃতি পরিকর সাজাইয়া বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার অনুকরণ করা হয়।

৮। কোন নারী-বিশেষকে আশ্রয়-পাত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত ভজন সাধন করা হয়।

৯। 'পরমহংস' এই শব্দ শিক্ষামন্ত্ররূপে গ্রহণ ও দান করা হয়।

১০। পূর্ব্বোক্ত আচরণ-সমূহকে পঞ্চরসিকের মত বা শ্রীরূপের ধর্ম্ম বলা হয়।

১১। এই সকল কার্য্য গভীর রাত্রিকালে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসে কোনরূপ অনুষ্ঠান হয় না।

পঞ্চরসিক বলিতে শ্রীরূপ গোস্বামী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল ও রায় রামানন্দ, এই পাঁচজনকে বুঝায়।

এই সভায় যে সব পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা মীমাংসা করেন, শিক্ষামন্ত্র বা শিক্ষাবীজ বলিয়া কোন বিষয় শাস্ত্রে নাই। এই সভাটির নাম হইয়াছিল, "বৈষ্ণব-সমাজ-সংস্কার সভা"। প্রথম অধিবেশন হয়, ত্রিপাড়া গ্রামে, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। আর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, আবদুল্লাপুর, পালবাড়ী, ১৯ই আষাঢ়, ১৩২৬। "কিশোরী ভজন"—মতের অশাস্ত্রীয়তা ও অবৈধতা, উভয়ত্রই সিদ্ধান্তিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্ত্তনের অধিকার—হিন্দু সমাজের অধিকার-ভেদ হয়ত কোনও সময়ে ত্যাগের সামর্থ্য ও সমাজ-সেবার যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু, কালে তাহা দম্ভপূর্ণ সুবিধাভোগের দাবীতে পর্য্যবসিত হওয়ায় সমাজ যখন ছিন্ন ভিন্ন সেই সময়ে সাধনগত ঐক্যের উপর সামাজিক মিলন প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। উচ্চনীচ, পণ্ডিতমূর্খ, স্ত্রীলোক পুরুষ সকলের জন্যই তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি বলিলেন এই কৃষ্ণনাম সকল মন্ত্রের ও সকল শাস্ত্রের সার। এখনও এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা মনে করেন এই কৃষ্ণনাম মানবের ধর্ম্মসাধনার নিম্নতম অধিকার, মহাপ্রভু সেই নিম্নতম অধিকারে আনিয়া সকলকে মিলিত করিলেন। ইংরাজীতে ইহাকে Levelling down বলে, উঁচু জিনিষগুলির মাথা কাটিয়া নীচুর সহিত এক করা। প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের আলোচনা করিলে দেখা যায় মহাপ্রভু তাহা করেন নাই। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন মানবের নিম্নাধিকার নহে, উচ্চতম অধিকার। তিনি এই উচ্চতম অধিকারে তুলিয়া সকলকে মিলিত করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে ইহাকে Levelling up—নীচু জিনিষগুলিকে উঁচু করিয়া সব চেয়ে যাহা উঁচু তাহার সহিত সকলকে সমান করা।

প্রকাশানন্দকে মহাপ্রভু বলিলেন—আমার গুরু আমাকে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥

পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
* * * * *
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক-সম॥

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—কোদর্ম্মা হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২৪শে মার্চ্চ তারিখের একপত্রে লিখিয়াছেন—"এখানে সম্প্রতি একজন ভক্তাবধূত, তাঁহার জনৈক শিষ্যের বাটী আসিয়াছেন। সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তিনি সহসা সাক্ষাৎ দেন না। লোক-পরম্পরায় অবগত হইলাম, যে তিনি "রাধে শ্যাম" একটি, যাহা কীর্ত্তনের পদে গীত হয়, তাহা অশ্লীল বলিয়াছেন। আপনার মনে থাকিতে পারে, একটি কীর্ত্তনের পদ যাহা এখানে গীত হয়—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—উক্ত গীত তিনি দূর হইতে শুনিয়াছিলেন, এবং প্রকাশ, বলিয়াছেন যে উক্ত "রাধে শ্যাম" শব্দ যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানে ভগবান্ আসিতে পারেন না। ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নামকীর্ত্তন ও পদকীর্ত্তন লইয়া মতভেদ আছে, কিন্তু অশ্লীলতা উপরোক্ত পদে কিভাবে সূচিত হইল, তাহা জানা আবশ্যক। উক্ত ভক্তাবধূত মহাশয় কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাও জানি না। আপনি তাঁহাকে জানেন কিনা, তাহাও জানি না। আপনি উক্ত বিষয় মীমাংসা করিয়া দিলে বাধিত হইব। আজকাল সাধু, সন্ন্যাসী, ও গুরু এত প্রকারের এবং এত সুলভ হইয়াছেন যে তাঁহাদের মধ্যে নকল এবং আসল বাছিয়া লওয়া কঠিন। সাধারণ মনুষ্য, বিশেষতঃ গৃহস্থ, এত হুজুগপ্রিয় যে সে নূতন কিছু পাইলেই তাঁহার শিষ্য বা সঙ্গোপাঙ্গ হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন।"

পত্রের উত্তরে মাত্র এই কয়টি কথা লিখিয়া পাঠাইলাম। উক্ত ভক্তবধূতকে আমি জানি না। "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" নাম, ভাল ভাল ভক্তেরা পরম সমাদরে গান করিয়া থাকেন; আমি ঐ নামে খুব আনন্দ পাই। সুতরাং সাধু মহারাজের মত, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য।

নিবেদন

মাঘ মাসের বীরভূমিতে, "চৌর্য্যলীলা" গ্রন্থে খুব বড় ছাপার ভুল হইয়াছে। তজ্জন্য প্রথম আট পৃষ্ঠা পুনরায় ছাপাইয়া এইসঙ্গে পাঠাইলাম। গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন ও বদলাইয়া লইবেন।

উজ্জ্বল চন্দ্রিকা

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক টীকাসহ সঙ্কলিত

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

সিউড়ী—বীরভূম হইতে

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীরূপ গোস্বামীর সুবিখ্যাত রসগ্রন্থ "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থের নাম শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নহে, ভারতের সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত। এই গ্রন্থে অভিজ্ঞতা না থাকিলে শ্রীবৃন্দাবন-লীলার অসাধারণ মাধুর্য্য-জ্ঞান অসম্ভব। বর্দ্ধমান জেলার চাণক গ্রামনিবাসী ভক্ত-পণ্ডিত শ্রীমৎ শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় ১৭০৭শকে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) এই সুবিখ্যাত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পদ্যে ত্রিপদী পয়ারাদি ছন্দে যথাযথ অনূদিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। শ্রীযুক্ত কুলদা বাবু ও শিবরতন বাবুর চেষ্টায় এতদিনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাগবতের একটী মহা অভাব পূর্ণ হইল। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতানিবন্ধন "উজ্জ্বল নীলমণির" আস্বাদ গ্রহণে অক্ষম, তাঁহাদের মনের সাধ এতদিনে পূর্ণ হইবার ব্যবস্থা হইল। নায়ক-নায়িকা ভেদ ও রসভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, বঙ্গদেশের আদি কবিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কীর্ত্তনাদিও উপভোগ করিবার সামর্থ্য জন্মে না। বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ভক্তগণ অতঃপর এই গ্রন্থ পাঠে সংস্কৃত না জানিয়াও রসশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থরত্ন প্রকাশ করিবার জন্য কুলদা বাবু ও শিবরতন বাবু বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গ্রন্থের আকৃতির তুলনায় মূল্য নিতান্তই অল্প হইয়াছে।

—হিতবাদী ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

Regd. No. C. 1631.

নিবেদন

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এখনও পাওয়া যায়। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা। ১। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধা, ২। ললিতমাধবে শ্রীরাধা ৩। দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীরাধা, ৪। গীতগোবিন্দে শ্রীরাধা, ৫। বৃন্দাবন ও তাহার অন্তরায়, ৬। যোগমায়া, ৭। মদনমোহন, ৮। জগন্নাথবল্লভে শ্রীরাধা, ৯। শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব, ১০। শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকা, ১১। শ্রীকৃষ্ণকথার উদয়, ১২। জয়দেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ১৩। মদন-মোহন—আস্বাদন, ১৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও ধর্ম্মসমন্বয়, ১৫। ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞান, ১৬। ধর্ম্মজীবন ও ভক্তিপথ, ১৭। শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধা ১৮। শ্রীকৃষ্ণ ও মহাকাল, ১৯। ভ্রমরগীতা, ২০। পূতনা-মোক্ষণ, ২১। চৌর্য্যলীলা। এই পুস্তকগুলি 'বীরভূমি'র অন্তর্গত। মূল প্রবন্ধ ব্যতীত, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েরও আলোচনা আছে। নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ করিয়া প্রেরিত হইবে।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সিউড়ী—বীরভূম

Printed by Ashu Tosh Chakravarti M.A.B.L., at the Santiniketan Press, Santiniketan and Published by him from Suri, Birbhum.